প্রকাশক : ভারতচন্দ্র সরকার
বি. সরকার এণ্ড কোম্পানী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৬০

মুদ্রক : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
<মুদ্রণী>
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-

ভূমিকা

বইখানির নাম : 'একালের বাঙ্‌লা সাহিত্য'—ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর আবশ্যিক বাঙ্‌লার পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত। আধুনিক পর্বের বাঙ্‌লা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ পুস্তকের বর্ণনীয়। একে বাঙ্‌লা সাহিত্যের' ইতিহাস' নামে চিহ্নিত করিনি। এইজন্য যে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এতে রক্ষিত হয় নি। আমাদের' একালের সাহিত্যের কয়েকটি দিকের এবং কয়েকজন খ্যাতকীর্তি লেখকের রচনার আলোচনা বইখানিতে স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গ বা বিষয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর রচনার সাহিত্যিক-মূল্য—দুদিকেই তাকিয়েছি। সাম্প্রতিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা বাদ পড়েছে। বিস্তৃতপরিসর হাল আমলের সাহিত্যের পরিধি। আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের পরিচয়কথন কোথায় এসে থামবে, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো নির্দেশ দেয়নি। নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

এ পুস্তকে নতুন কথা তেমন-কিছু নেই। পুরনো কথাকে নিজের ইচ্ছামতো করে সাজিয়েছি, নিজ ভাষায় বিন্যস্ত করেছি। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি রেখেছি ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে। যে-সব তথ্য তাদের দরকারে আসবে বলে মনে হয় নি, সেগুলি বাদ দিয়েছি। পাঠ্যগ্রন্থের গন্ধমাদন তাদের বহন করতে হচ্ছে। বোঝা আরও বাড়াতে চাইনি। যেটুকু আলোচনা এ বইতে গ্রথিত হয়েছে এতেই তাদের কাজ চলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে এও স্বীকার্য, কিছু কিছু অপূর্ণতা বইখানিতে থেকে গেছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই অপূর্ণতা দূরীকরণের সুযোগ নিতে পারবো।

বর্তমান পুস্তকটির সম্পর্কে কয়েকজন লেখকের কাছে আমি ঋণী। তাঁদের নাম এবং তাঁদের রচিত পুস্তকনিচয়ের নাম গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করেছি।

এ বই লেখাই হতো না, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান অরুণকুমার সরকারের কাছ থেকে যদি-না তাগিদ আসতো। এই অবকাশে শ্রীমান অরুণকে [বি. সরকার এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা] আন্তর প্রীতি নিবেদন করছি আমি।

যাদের জন্য এ বই লেখা, তারা উপকৃত হলে, আমার শ্রম সার্থক হয়েছে, মনে করবো।

সিটি কলেজ
কলিকাতা

বিভূতি চৌধুরী

বিষয়-সূচী

॥ সেকাল থেকে একালে ॥

একালের বাঙলা সাহিত্য

[১৮০০—১৯৫০]

একালের বাঙলা সাহিত্য

[১]

॥ সেকাল থেকে একালে ॥

প্রারম্ভিক ভূমিকা ঃ একালের সমাজ ও সাহিত্যে রূপান্তর

রামপ্রসাদের কাল পেরিয়ে এলাম আমরা। লোকখ্যাত ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ সেনের সমকালীন কবি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র রায় লোকান্তরিত হন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধে [১৭৫৭] সিরাজদ্দৌলার পতন হলো। এর অল্প-কিছুকাল পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি-রূপে বাঙলার শাসনাধিকার পেল। এখান থেকে ভারতে ইংরেজ-প্রভুত্বের শুরু। দেশে নতুনের দূরাগত পদধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। বলতে পারা যায়, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর বঙ্গভূমিতে ইংরেজগণের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের অবসান ঘটলো, আমরা আধুনিক কালে উত্তীর্ণ হলাম। জাতীয় জীবনে রাজনীতিক বিপর্যয়ের ফলে সেকাল থেকে একালে এই যে উত্তরণ, একেই বলা হয়ে থাকে 'কালান্তর'। ইংরেজ-সংস্পর্শ বাঙালি জাতির মানসলোকে ও প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনে যে-পরিবর্তনের ধারা বইয়ে দিল তা যেমন দ্রুত, প্রকৃতিতে তেমনি বৈপ্লবিক। কালে কালে পরিবর্তন বিশ্বচরাচরের ধর্ম—যুগান্তরে পদক্ষেপ করে আমরাও অভাবনীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এর বিচিত্র কথা বাণীবদ্ধ হয়েছে একালের অর্থাৎ আধুনিক পর্বের বাঙলা সাহিত্যে।

বহুকাল ধরে আমাদের—আমরা বাঙালির—অভিলষিত ছিল প্রগতি। কিন্তু বাঙলার মধ্যযুগে—মুসলমান-আমলে—এর পথ একরূপ অবরুদ্ধই ছিল। ইংরেজের চকিত আবির্ভাব দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়ে এই প্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিল। ১৮০০ সালে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ ও ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হলো। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে খুব বড়ো একটি ঘটনা। দেশময় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার নতুন হাওয়া বইলো। পুরনো আমলের শিক্ষাধারার ওপর ছেদ পড়লো। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘর্ষে প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেক-কিছু গেলো, নবসংস্কৃতি জয়যুক্ত হলো।

আধুনিকী শিক্ষা ও সভ্যতায় দীক্ষিত হওয়ার ফলে বাঙালির সমাজজীবনও দ্রুত রূপান্তরিত হতে লাগলো। গোটা দেশ তখন নানান্ আন্দোলনে অনুক্ষণ আলোড়িত হচ্ছে। ইংরেজের প্রবর্তিত আইনের সাহায্য নিয়ে শ্রুতকীর্তি রামমোহন সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ ঘটালেন, মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করলেন। এ ছাড়া, রামমোহনের গঠিত ব্রাহ্মসমাজ প্রগতিমূলক আরো বহুবিধ আন্দোলন চালিয়েছে যার ফলে এদেশীয় নারীরা শিক্ষার অধিকার পেয়েছে, সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হয়েছে, জতিভেদপ্রথা অনেকখানি লোপ পেতে বসেছে। ব্যক্তির চিন্তায়, সামাজিক রীতিনীতিতে, শিক্ষাধারা ইত্যাদিতে যে-পরিবর্তন এলো তা আমাদের সমাজের কাঠামোটিকে অনেকখানি বদলে দিল। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের, সম্পর্কটি অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিমানুষের মনের ও সমাজ-মনের নতুন ভাবনা বাঙ্‌লা সাহিত্যেও নতুনতা আনলো। মানবমানবীর মনোভঙ্গি ও জীবনাদর্শে যে-পরিবর্তন সূচিত হয় তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সাহিত্যের পাতায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমাদের মন ছিল সংস্কারসম্বল, বিচারবিমুখ, অলৌকিকতার মোহে আবিষ্ট, মানবমহিমাবোধবর্জিত, নিয়তিনির্ভর, অবিশ্রান্ত অসহায়তার হাতে ক্রীড়নক যেন। তখন 'যে-জগতের মধ্যে বাঙালির বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বারবার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে। সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে; সেইসকল কঠিন সংস্কারের কঠিন ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানবব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থবির হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাত-সংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।' নিত্য-চলমান ও অনুক্ষণ-পরিবর্তনশীল বিশ্বজীবনধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ক্ষুদ্রপরিসর একটি ভৌগোলিক সীমায় স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবন-যাপন করার জন্যে সেদিন বাঙালিচিত্তের প্রসার ঘটেনি। হারিয়ে ফেলেছিল সে কালচেতনা ও ইতিহাসচেতনাকে, চতুষ্পার্শ্বের প্রকাণ্ড জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গে সেকালে তার কোনো পরিচয়ই ছিল না। ফলে পুরাতন প্রথা ও শাস্ত্রের বিধিবিধানকে

আমরা অপরিবর্তনীয় বলেই জেনেছিলাম, জীবনে ও সাহিত্যে কল্পিত স্বর্গের বহুতর দেবদেবীর অহৈতুক আধিপত্যকে নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের এই সংস্কারাচ্ছন্ন, প্রথাশাসিত মনের ওপর আঘাত হানলো, পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আমাদের চিত্তপ্রসার ঘটল। এদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত বহু ব্যক্তি সামাজিক কুসংস্কার ও নৈতিক কদাচার দূর করতে বদ্ধপরিকর হলেন, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধিকে ভিত্তি করে সমাজে নবযুগ প্রবর্তনের প্রয়াস করলেন।

পুরাতন কুসংস্কারকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে কিছু কিছু নতুন কুসংস্কারেরও বশীভূত হলাম আমরা। বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান ও আহার-বিহারে ইংরেজের অন্ধ-অনুকরণ, তারা যা করে তা সর্বাংশে উত্তম, আমাদের সবকিছু খারাপ সুতরাং বর্জনীয়—আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তদানীন্তন বাঙালিসন্তানের এরূপ মনোভাবও একপ্রকার কুসংস্কার ছাড়া আর কী! এতদ্ব্যতীত ইংরেজ-বণিকের সান্নিধ্যে এসে বাঙ্‌লাদেশের একশ্রেণীর মানুষের রুচিবিকৃতি ঘটল। নীতিভ্রষ্ট হলো তারা। এরকম একটি অবস্থায় সমাজে পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। বিদেশির বিচারহীন অনুকরণে জাতির সত্তার স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ ঘটে, সে আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে যায়। জাতিকে এহেন আধ্যাত্মিক সংকট থেকে উদ্ধার করবার কাজে ব্রতী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ স্মরণীয় বাঙালি মনীষীবৃন্দ। সাম্প্রতিক কালের আমরা এঁদেরই ভাবসন্ততি। এঁরা যে-পথ দেখালেন, অধুনা সেই পথেই চলেছে আমাদের অগ্রসরণ।

জাতির এই পরিবর্তিত মানসিকতা আধুনিক পর্বের সাহিত্যে নবীনতার সঞ্চার করলো। নবজাগ্রৎ জীবনবোধের ফলে সাহিত্যের মধ্যে বেজে উঠলো নতুন একটি সুর—যার মূলকথা যুক্তিনিষ্ঠা, চিত্তমুক্তি, জীবনপ্রীতি, মর্তমমতা, মানবতাবাদ। এখানেই আধুনিকতার শুরু, এবং পুরাতন সাহিত্যরীতির ক্রমবিলীয়মানতা। প্রসঙ্গত একটি কথা বলি। আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার অঙ্কুরোদ্গম যে সর্বাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল এ মনে করলে অবশ্যই ভুল করা হবে। কেননা, ভারতচন্দ্রের কাব্যে ও তাঁর পরবর্তী কবিওয়ালদের গানে, পাঁচালিতে, টপ্পাসংগীত প্রভৃতিতে, মর্তমাধুরীসিক্ত মানবিকতার সুরটি ধীরে ধীরে বেজে উঠছিল। ওই সময়ের কবিদল ধর্মশাসিত কাব্যভাবনার প্রভাব মোটামুটি কাটিয়ে উঠে মানবজীবনের বহুবিধ আর্তিকে সাহিত্যে বাণীরূপ দেবার কাজে

হাত লাগিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রীয় যুগে বহিরঙ্গের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলেও, স্বরূপ-লক্ষণের দিক দিয়ে সাহিত্য যে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল তা কৌতূহলী পাঠকের চোখে নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে। তাই, বলতে হয়, কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে আধুনিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবে এও অনস্বীকার্য যে, য়ুরোপীয় জীবনভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে আমাদের সাহিত্যে মানবিকতার যে-আদর্শটি ছিল নীহারিকার ন্যায় অনতিপরিস্ফুট, পশ্চিমী জীবনবোধের প্রভাবে আসার ফলে তা সহসা প্রস্ফুট হয়ে উঠলো।

বহিরঙ্গ রূপরীতি ও অন্তরঙ্গ ভাববস্তু—উভয় দিক দিয়ে একালের সাহিত্য সেকালের সাহিত্য থেকে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র। প্রাচীন সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য ছিল না বললে কিছুই ভুল বলা হয় না। কল্পনাভঙ্গির বিচিত্রতার সম্পর্কেও সেই একই কথা। সাহিত্যকর্মে মানবমহিমা তখন স্বীকৃতি পায়নি, ঐহিকতা ও ইতিহাসচেতনার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি, স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবোধের কোনো স্পন্দন তার মধ্যে মেলে না, তখন পর্যন্ত পরাধীন বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়নি। একটানা ধর্মের প্লাবন, শাস্ত্র ও প্রথার মূঢ় অনুসৃতি, দেবকর্তৃত্ব, অলৌকিকতা, পল্লবগ্রাহিতা, বাস্তব জগৎ ও জীবনের প্রতি আত্মঘাতী ঔদাসীন্য, ইত্যাদি আমাদের পুরাতন সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পাশ্চাত্ত্য ভাবমন্ত্রে উজ্জীবিত নবযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য বাঙালির বাস্তবরসপিপাসা চরিতার্থ করলো। এ মানুষের মর্যাদাকে—মানবমানবীর বিচিত্রমুখী জীবনতৃষ্ণাকে—বাঙ্ময় করে তুললো। এর মধ্যেই আমরা প্রথম শুনলাম মানবীয় সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য, আনন্দবেদনার মধুময় কলধ্বনি। প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যে জগৎসংসারকে এমন করে আমরা কদাপি চাক্ষুষ করিনি। দেবলীলাকথন নয়, মানুষ ও জীবনের জয়গান—মানবসত্যের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা—একালের সাহিত্যকৃতিকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকখানি বদলে গেছে। আজকের দিনের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান রস মানব-রস, বঙ্গভূমির প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যালোকে যার সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না। আমাদের জীবন ও সাহিত্য আজ যে অভিনব বিকাশধারার দিকে বাঁক নিয়েছে তার পেছনে প্রেরণা-হিসেবে সক্রিয় রয়েছে য়ুরোপীয় জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শের গভীরচারী প্রভাব। এর দ্বারা প্রাণিত হয়ে উনিশের শতকে বাঙালির চিত্তস্ফূর্তি ঘটেছিল—যার নাম বাঙ্‌লার রেনেসাঁস্—ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ।

পূর্বে বাঙ্‌লা সাহিত্য ছিল পদ্যবাহিত। সাহিত্যকর্মে গদ্যের প্রয়োগ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। সেকালে গদ্যসাহিত্যের অভাব কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। তখন গদ্যের ব্যবহার একেবারে যে ছিল না তা নয়। ছিল—চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, ইত্যাদিতে। ছাপাখানার যুগ শুরু হবার আগে গদ্যে-লেখা সামান্য দুয়েকখানি পুঁথির সন্ধান মেলে। তার সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যরীতি এসে পদ্যরীতির পাশে নিজের স্থান করে নিল। নির্মিত হতে লাগলো প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্প-নাটক! বলতে পারি, সাহিত্যে শ্রমবিভাগ দেখা দিল, সংকুচিত হয়ে এলো পদ্যের ব্যবহার। গদ্যরীতির মহিমান্বিত আবির্ভাব বাঙ্‌লা সাহিত্যের গৌরব-মর্যাদা বহুগুণ বাড়ালো। একালের বাঙালি গদ্যশিল্পীর উজ্জ্বলন্ত কীর্তি বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও স্বীকৃত।

পদ্যের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য দেখা গেলো। পয়ার-ত্রিপদী প্রভৃতি মামুলী ছন্দের জড়তাক্লিষ্ট বন্ধন থেকে মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাঙ্‌লা কবিতাকে মুক্তি দিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে মধুসূদন অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী হলেন। এতে যে শুধু কাব্যের বন্ধনমুক্তি ঘটল তা নয়, বাঙ্‌লা নাট্যরচনার ক্ষেত্রটিও প্রশস্ততর হয়ে উঠলো। কবিকুলোত্তম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসামান্য প্রতিভা বঙ্গীয় কাব্যসংসারে যুগান্তর আনলো। তাঁর প্রবর্তিত মুক্তবন্ধ ছন্দ ['বলাকার'-র ছন্দ] ও গদ্যছন্দ সত্যিই আশ্চর্য বস্তু। এ ছাড়া, কত রকমের মিশ্রছন্দ আবিষ্কার করলেন তিনি। কাব্যসাহিত্যে প্রধানত মধুসূদনের এবং গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমের প্রোজ্জ্বল সারস্বত প্রতিভাকে আশ্রয় করে বাঙ্‌লা সাহিত্য নবাগত আধুনিকতার রূপে-রঙে সুদীপ্ত হয়ে উঠলো। সাহিত্য নির্মাণ করতে বসে মধুসূদন সাহসসহকারে পুরাতন পথ বর্জন করলেন—মহাকাব্যে, নাটকে, গীতিকবিতায়, আর, ছন্দরীতি ও ভাষাভঙ্গিমায়, তাঁর প্রতিভার দান নবীনতায় সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমের বিস্ময়কর প্রতিভা ব্যতিরেকে প্রাণবন্ত গদ্যের গঠন কদাপি সম্ভব হতো না—উপন্যাস, সমালোচনা, বিচিত্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

হৃদয়লোকের গোপন গভীরে প্রবেশের চাবিকাঠি আমাদের হাতে তুলে দিলেন আধুনিক লিরিকনির্মাতা বিহারীলাল চক্রবর্তী। একালের কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার প্রবর্তক তিনি। বিহারীলালের আবিষ্কৃত গীতিকাব্যের মনোরম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথ কুড়িয়ে আনলেন বহুবিচিত্র ভাবানুভূতির মণিমাণিক্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের ঐশ্বর্য বিপুল। এমন করে জগৎ ও জীবনের রহস্যসন্ধান বাঙ্‌লার আর কোন্ কবি করেছেন? ভারতীয় ভাবুকতা ও পাশ্চাত্ত্য

মানসিকতা আর কোন্ কবির কাব্যে এমন স্মরণসুন্দর বাণীমূর্তি লাভ করেছে? বাঙ্‌লাসাহিত্যে শ্রীরবীন্দ্র সর্বতোভাবে আধুনিক। তারপর এলেন নবীনতার পথিকৃৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আমাদের একালের কথাসাহিত্যে অবিস্মরণীয় একটি নাম। শরৎচন্দ্রে এসে আধুনিক সাহিত্যের একটি পর্ব শেষ হয়েছে। অতিআধুনিক বাঙালি লেখকের আনাগোনার ক্ষেত্রটি দিন দিন প্রশস্ত হয়ে উঠছে।

মধুসূদন-বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে হাল আমলের সাহিত্যনির্মাতাগণ—এঁদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বড়ো কম নয়। বাঙ্‌লার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নানান্ দিক্ এঁদের রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বঙ্কিম ও তাঁর সমসাময়িক উপন্যাসকারদের লেখায় অভিজাতশ্রেণীর মানুষের জীবনালেখ্যচিত্রণ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধানত জমিদারশ্রেণী—ভৌমিক শ্রেণীকে—নিয়ে তাঁদের সাহিত্যের কারবার। রবীন্দ্রনাথের রচনায় উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁরই বিচরিত পথে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি আরো একটু নীচে নেমে এসেছেন—নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনকথাকেই মুখ্যত আশ্রয় করেছেন। তা ছাড়া, সমাজের অবজ্ঞাত নরনারীর বেদনার মুখে চিত্তহারী ভাষা দিয়েছেন তিনি।

সাম্প্রতিক কালের বাঙালি লেখকগোষ্ঠী সাহিত্যের নতুনতর দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছেন। সর্বহারা, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি এঁদের মমত্ববোধ ও সহানুভূতির সীমা নেই। এঁরা একেবারে সর্বব্যাপী সামান্যের মধ্যে নেমে এসেছেন। জীবনের ঘোলা গঙ্গাজলে অবগাহন করতে আজকের সাহিত্যনির্মাতারা বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত নন। কয়লাখনির মজুর থেকে আরম্ভ করে অতি-সাধারণ মানুষ ও যাযাবর-জীবনের বিচিত্র কাহিনী এঁরা মনোজ্ঞ ভাষায় গ্রথিত করেছেন, বাস্তব জীবনালেখ্যচিত্রণে প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এসকল গল্পকার উপন্যাসকার কাব্যকার যে-বাণীজগৎ নির্মাণ করলেন, ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা নেই। ভারতবর্ষকে তথা সমগ্র জগৎকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ দান তার একালের সাহিত্য। স্বকৃত সাহিত্যের অপূর্বসুন্দর রূপলোক বাঙালির পরম শ্লাঘার বস্তু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সহস্র বৎসরের পরমায়ু দান করেছেন। আর-কিছু না হোক, নিজের নির্মিত আধুনিক সাহিত্য বাঙালিজাতিকে মৃত্যুঞ্জিৎ করে রাখবে। এ এক আশ্চর্য প্রগতিশীল মনের প্রেক্ষণীয় প্রকাশ।

।। বাঙলা গদ্যের অনুশীলন ।।

—সূচনা-পর্ব—

য়ুরোপীয় মিশনারি ও বাঙলা গদ্য :

ভৌগোলিক জগতে যেমন আগে জলভাগের, পরে স্থলভাগের সৃষ্টি, তেমনি, সাহিত্যসংসারে প্রথমে গঠিত হয়েছে পদ্য। গদ্যের প্রচলন হলো এর অনেক কাল পরে।

রবীন্দ্রের ভাষায় :

পদ্য হলো সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এলো অনেক পরে,
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমাল আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ আঙিনায় এলো
ঠেলাঠেলি করে।…
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।

বাঙলা গদ্য একান্তভাবে আধুনিক কালেরই সৃষ্টি। উনিশের শতকের আগে পর্যন্ত এদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে একাধিপত্য ছিল পদ্যের। দশম-একাদশ শতাব্দীর 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের কাল পর্যন্ত আমাদের যে সাহিত্যকৃতি তার সমস্তকিছু পদ্যে লেখা।

কেন এরূপ হলো তা অবশ্যই চিন্তনীয়। এর মোটামুটি একটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। লেখক আপন মনের আনন্দে—প্রকাশব্যাকুলতার প্রেরণাবশে—সাহিত্য নির্মাণ করেন সত্য, কিন্তু সাহিত্যিক খ্যাতিও তাঁদের অভিলষিত। দূরচারী খ্যাতি অর্জন করতে হলে পুঁথির বহুল প্রচার চাই। কিন্তু সেকালের বাঙলাদেশে তখন ছাপাখানা কোথায়? এর অভাবের জন্যে সাহিত্য-

কারকে লোকস্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হতো। স্মৃতিতে ছন্দে-গ্রথিত, মিলযুক্ত পদ্যকে ধরে রাখা যতখানি সহজ, গদ্যকে ততখানি নয়। একারণে সাহিত্য রচনা করতে বসে লেখককে একরূপ বাধ্য হয়ে পদ্যরীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তা ছাড়া, পুরনো আমলের সাহিত্য সুরসহযোগে পাঠ করা হতো। শ্রোতার কাছে এই সুরের আবেদনও কম ছিল না—মন দিয়ে তারা কাব্যকথা শুনতো। ছন্দ ও মিলের কলধ্বনি মানুষের শ্রুতিরিন্দ্রিয়ের ওপর কেমন একটা মোহ বিস্তার করে এ সত্যটি পাঠক বা শ্রোতার অজানা নয়। স্মৃতিনির্ভরতা আর ছন্দ-নির্ভর সুরে চড়াবার সুবিধেই পুরাতন বাঙ্‌লা সাহিত্যকে পদ্যসর্বস্ব করে তুলেছে। সেকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন থাকলে পদ্যরীতি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না। আরো একটি কথা—সে হলো বাঙ্‌লা পয়ার ছন্দের আশ্চর্য প্রকাশক্ষমতা। পয়ার গদ্যধর্মী ভাবনা-চিন্তাকেও সহজে বহন করতে পারে,—পয়ারে যুক্তি-তর্ককে পর্যন্ত অনায়াসে বাণীবদ্ধ করা যায়। বাঙ্‌লা গদ্যের আত্মোন্মোচন যে এত বিলম্বিত হলো, পয়ার ছন্দটির সুযোগ-সুবিধেও তার একটি বড়ো কারণ বলে মনে হয়। সে যা হোক, তখনকার লেখকেরা চলনসই গদ্য লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই, সেকালে আখ্যান-উপাখ্যান, জীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, নীতিকথা, দার্শনিক ভাবনা, ইত্যাদি, সবকিছু পদ্যে বিধৃত হয়েছে। মুখে মুখে প্রচলিত ছিল যে গদ্য তাকে সাহিত্যেও ব্যবহার করা যায় একথা সেদিন কারুর মনে জাগেনি। অন্তত সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে তো সেদিনকার অনেক লেখকের পরিচয় ছিল। কিন্তু তার আদর্শ অনুসৃত হয়নি। একটানা পদ্যের প্লাবনকে রোধ করতে সেদিনকার একজন লেখকও এগিয়ে এলেন না। অদ্ভুত একটি ব্যাপার!

আদিযুগের সাহিত্যকর্মে গদ্যরীতির নিদর্শন না মিললেও গদ্য লেখার প্রচলন সে সময়ে একেবারেই ছিল না তা নয়। ছিল। চিঠিপত্রে, দলিলে-খতে, হুকুম-নামায়, বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যানে, স্মৃতিশাস্ত্রে, চিকিৎসা-বিষয়ক আলোচনায় অল্পবিস্তর গদ্যের ব্যবহার চোখে পড়ে। এ থেকে বুঝতে পারি, কোথাও কোথাও গদ্য ব্যবহৃত হলেও সাহিত্যে তার স্বীকৃতি ছিল না। বই লেখায় সচেতন-ভাবে গদ্যকে প্রথম প্রয়োগ করলেন য়ুরোপীয় মিশনারি বা ধর্মপ্রচারকের দল। তাঁদের প্রচেষ্টায় আধুনিক বাঙ্‌লা গদ্যের প্রাথমিক ভিত্তি গঠিত হলো। এজন্যে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন।

য়ুরোপীয় বণিকদল বাণিজ্যব্যপদেশেই প্রথমে এদেশে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন পর্তুগীজরা। ষোড়শ শতকে তাঁরা বাঙ্‌লাদেশে

পদক্ষেপ করলেন। তাঁদের পেছন পেছন বঙ্গভূমিতে পর্তুগীজ মিশনারিদের [রোমান-ক্যাথলিক-সম্প্রদায়ভুক্ত] আবির্ভাব হলো। এইসব মিশনারি খ্রিস্টধর্ম-প্রচার-উদ্দেশ্যে বাঙ্‌লার বিভিন্ন অঞ্চলে গির্জা প্রতিষ্ঠা করলেন। এদেশের লোকসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে হলে বাঙ্‌লা ভাষায় অধিকার থাকা চাই। সুতরাং প্রয়োজনবশে তাঁরা বাঙ্‌লা শিখে নিলেন, নিজেদের ধর্মগ্রন্থ এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে জনসমাজে প্রচার করতে লাগলেন।

এই বিষয়ক সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে-বইখানি আমাদের হাতে এসেছে তার নাম —'**ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ**'। পুস্তকটির লেখকের নাম—**দোম আন্তনিও** [Dom Antonio]। ইনি একজন বাঙালি—ভূষণার জমিদারপুত্র। মগদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হলে পর্তুগালদেশীয় এক পাদ্‌রি টাকা দিয়ে তাঁকে কিনে নেন এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তাঁর নতুন নামকরণ করা হলো—দোম আন্তনিও। খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়ে তিনি খ্রিস্টধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন এবং এই ধর্মের মাহাত্ম্যমূলক পুস্তক রচনা করলেন—'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ' পুস্তকটির রচনের এ হলো ইতিহাস। এ বই সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ঢাকার অন্তর্বর্তী ভাওয়াল নামক স্থানে লিখিত হয়েছিল। মিশনারি-প্রবর্তিত বাঙ্‌লা গদ্যের বিশ্বস্ত নিদর্শন এতে মেলে।

এর পর পর্তুগীজ পাদ্‌রির লিখিত আর-একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম—'**কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ**'। লেখক—**মানোএল দ্য আসুম্পসাওঁ** [Manoel da-Assumpcam]। বইখানিতে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমের দিকে বইখানি লেখা হয়েছিল, উদ্দেশ্য—খ্রিস্টধর্মপ্রচার। পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে ১৭৪৩ ইংরেজি সালে পুস্তকটি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। পর্তুগীজ মিশনারিদের বড়ো একটি প্রচারকেন্দ্র ছিল ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চল। বর্তমান পুস্তকখানিতে এই অঞ্চলের উপভাষার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কোনো দেশীয় লোকে সাহায্য নিয়ে আসুম্পসাওঁ এ বই লিখেছেন। ফার্‌সি শব্দের ব্যবহারও বইটিতে যত্রতত্র মেলে। লেখকের মাতৃভাষার [পর্তুগীজ ভাষার] মুদ্রাঙ্কনও এতে চোখে পড়ে। আসুম্পসাওঁ-র রচনার একটুখানি নিদর্শন তুলে ধরি :

'সিদ্ধা পালাধিও বনের মৈধে বসত করিতেন। সেই বনের নজদিক এক শহর আছিল। সেই শহরে অনেক বেপারি বেপার করিত। একদিন

একটা বেপারি জিনিস কিনিয়া আপনের দেশে যাইতে চাহিল। আর বেপারির ঠাঁয় কহিত এহি দেশে অনেক ডাকাইত আছে, একারণ আমারে বিদাএ দিও। আমি রাইত্রে থাকিতে জাইব।'

—এ গদ্য সুবোধ্য। তবে সাহিত্যের স্বাদ নেই। কিন্তু আদিযুগের বা সূচনা-পর্বের গদ্যরীতির নমুনা-হিসেবে কিছুটা প্রশংসা পাবার যোগ্য। কৌতূহলী পাঠক পর্তুগীজ পাদ্‌রিদের গদ্যচর্চাকে নিশ্চয়ই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখবেন না। পাদ্‌রি আসুম্পসাওঁ বাঙ্‌লা ভাষা ভালো করেই শিখেছিলেন। এঁর লেখা বাঙ্‌লা ব্যাকরণও আছে। ইনি একখানি বাঙ্‌লা-পর্তুগীজ অভিধানেরও সংকলয়িতা। বিদেশি একটি ভাষার অনুশীলনে মিশনারিদের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা আমাদের বিস্মিত করে।

এবার ইংরেজ মিশনারিদের কথা। আঠারোর শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে ইংরেজ বণিকের রাষ্ট্রিক প্রভুত্বের শুরু। পর্তুগীজ পাদ্‌রিদের পর ইংরেজ ধর্ম-প্রচারকগণ বাঙ্‌লায় এলেন। ১৮০০ সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর নামক স্থানে তাঁরা মিশন স্থাপন করেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমারদের অধীনে। স্থানটি উক্ত মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠলো। ধর্মীয় প্রচারকার্যের সুবিধে হবে বলে শ্রীরামপুরের ইংরেজ পাদ্‌রিরা বাঙ্‌লাভাষার অনুশীলন ও উন্নয়নে মন দেন।

এসময়ের উল্লেখনীয় একটি ঘটনা হলো মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনা। চার্লস্ উইলকিন্‌স্ নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন লোক বই ছাপবার জন্যে বাঙ্‌লা হরফ উদ্ভাবন করেন। তাঁর উদ্যোগে হুগলিতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হলো। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল [১৭৭৮-এ] নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড-কৃত বাঙ্‌লা ব্যাকরণ। বইটি অবশ্য ইংরেজিতে লেখা। তবে বাঙ্‌লা ব্যাকরণের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই প্রথম বাঙ্‌লা অক্ষরে বাঙ্‌লা ভাষা মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলো। অতঃপর মুদ্রিত হলো দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধির অনুবাদ এবং ফরস্টার-এর [Henry Pitts Forster] 'কর্ণওয়ালিশ কোড' ও তাঁর শব্দকোষের [Vocabulary] অনুবাদ। এগুলির মুদ্রণকার্য সম্পাদিত হয় ১৭৮৫ থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে। আমাদের জ্ঞানবিস্তার জগতে মুদ্রাযন্ত্র বিপ্লব ঘটালো অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ পাদে। বলতে গেলে, এসময় থেকে বাঙ্‌লা গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের শুরু।

পঞ্চানন কর্মকার নামে এক ব্যক্তি উইলকিন্‌স্ এর কাছ থেকে শিখে নিলেন মুদ্রণ-অক্ষর তৈরি করার কৌশল। এই পঞ্চাননের সাহায্যে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ একটি ছাপাখানা খুললেন। নাম—'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস', প্রধান উদ্যোক্তা—কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এই তিনজন ইংরেজ পাদ্রি। মিশন প্রেস থেকে পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি হরফে বাইবেলের বাঙ্‌লা অনুবাদ—'**মঙ্গল সমাচার মত্তিউর রচিত**'—Gospel of St. Mathews—১৮০০ অব্দ থেকে মুদ্রিত হতে থাকে। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই গদ্য-পদ্য বহু পুস্তক উক্ত প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে বাঙ্‌লা গদ্যের দ্রুত প্রসারে বিস্তর সাহায্য করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাঙ্‌লা ভাষার অমর দুখানি গ্রন্থ—বাঙালির ঘরে ঘরে পঠিত, সর্বজনসমাদৃত—কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রথম ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর প্রেসে। আরো স্মর্তব্য, বাঙ্‌লা ব্যাকরণ, বাঙ্‌লা-ইংরেজি অভিধান, বাঙ্‌লা সংবাদপত্র, ইত্যাদি, দেখা দিল ইংরেজ মিশনারিগণের হাত দিয়ে।

এসকল মিশনারি বাঙ্‌লা গদ্যের চর্চায় যে এতখানি যত্নবান হলেন তার প্রধান কারণ এদেশের মানুষের চিত্তভূমিতে খ্রিস্টধর্মের বীজবপন। কারণ যা-ই হোক, এবং এঁদের প্রকাশিত ও প্রচারিত বইপুঁথির মূল্য যৎকিঞ্চিৎই হোক, এ থেকে দেশের সাহিত্য যে আত্মবিকাশের প্রেরণা পেল, আর, বাঙ্‌লা গদ্য অতিক্রুত প্রসার লাভ করলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অসাড় দেহে প্রাণচেতনার সাড়া জাগানোর মূল্যও কি কম। একালের গদ্যনির্মাণের পথিকৃৎ-হিসেবে ইংরেজ পাদ্রিদের নাম অবশ্যই স্মরণীয়।

[৩]

॥ কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম ॥

—বাঙ্‌লা গদ্যের উদ্‌যোগ পর্ব বা কেরির পর্ব—

বাঙ্‌লা গদ্যের ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান :

কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম-এর স্থাপনা [কলকাতায়] বাঙ্‌লা গদ্যের প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। ইংলণ্ড থেকে আগত কোম্পানীর আহেল বিলাতীয় কর্মচারিদের বাঙ্‌লা ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজনে ১৮০০ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। সুনামখ্যাত **উইলিয়ম কেরি** এই

কলেজের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অদ্ভুত কর্মীপুরুষ ভারতপ্রেমিক কেরি সাহেবের কীর্তিকথা কদাপি ভুলবার নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাণকেন্দ্রে তাঁর গৌরবদীপ্ত অবস্থান। অক্লান্ত তাঁর পরিশ্রম, অকম্পিত তাঁর অধ্যবসায়, ঐকান্তিক তাঁর নিষ্ঠা। তিনি শ্রীরামপুর মিশনের স্থাপয়িতা, কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়মের সর্বাগ্রগণ্য পরিচালক, এই কলেজের লেখকগোষ্ঠীর প্রধান প্রেরণাস্থল—অধিনায়ক বললে অত্যুক্তি করা হয় না। কলেজের পণ্ডিত ও মুন্‌সীদের দ্বারা বাঙ্‌লা গ্রন্থ প্রণয়ন ও এসকল গ্রন্থের মুদ্রণব্যাপারে নেতৃত্ব করেন তিনি। কেরি দেশীয় পণ্ডিতদের আহ্বান করে গদ্যে গ্রন্থ রচনা করাতে প্রবৃত্ত হলেন। চুঁচুড়া থেকে এলেন রামরাম বসু, মেদিনীপুর-উড়িষ্যা থেকে এলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। এ ছাড়া, ক্রমে কেরির সহকারীরূপে যোগ দিলেন গোলোকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুন্‌সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি। ১৮০১ থেকে ১৮১৫ অব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান পুস্তকগুলি কেরির উৎসাহে ও তাঁর সহকারী পণ্ডিতবর্গের উদ্‌যোগে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়:

১।	রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	···	রামরাম বসু [১৮০১]
২।	কথোপকথন	···	উইলিয়ম্ কেরি [১৮০১]
৩।	হিতোপদেশ	···	গোলোকনাথ শর্মা [১৮০১]
৪।	বত্রিশ সিংহাসন	···	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার [১৮০২]
৫।	লিপিমালা	···	রামরাম বসু [১৮০২]
৬।	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট	···	তারিণীচরণ মিত্র [১৮০৩]
৭।	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্	···	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় [১৮০৫]
৮।	তোতা ইতিহাস	···	চণ্ডীচরণ মুন্‌সী [১৮০৫]
৯।	হিতোপদেশ	···	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার [১৮০৮]
১০।	রাজাবলি	···	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার [১৮০৮]
১১।	ইতিহাসমালা	···	উইলিয়ম কেরি [১৮১২]
১২।	প্রবোধচন্দ্রিকা	···	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার [১৮১৩ ?]
১৩।	পুরুষপরীক্ষা	···	হরপ্রসাদ রায় [১৮১৫]

দেখা যায়, কেরি সাহেব গদ্যে পুস্তক রচনার উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নিজেও অধ্যবসায়-সহাকারে গ্রন্থরচনে হাত দিয়েছেন। উপরে লিখিত দুখানি গ্রন্থ ['কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'] ও একেবারে প্রারম্ভিক বাইবেলের অনুবাদ ছাড়া কেরি একখানি বাঙ্‌লা অভিধানও রচনা করেছিলেন।

কেরির 'কথোপকথন' সেকালের নামকরা একখানি বই, ১৮০১ সালে প্রকাশিত। এতে বাঙ্লাদেশের সমাজের নানান্ স্তরের বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র কথাবার্তা গ্রথিত হয়েছে—যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি, কৌতূহল-উদ্দীপক। বিলেত থেকে সদ্য-আগত ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশের ভাষা শিখুক, বাঙালি-সমাজের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হোক, এই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থখানি রচিত। আমাদের গ্রাম্য-জীবনের প্রায় সমস্ত বিষয় এতে বহুসংখ্যক নারীপুরুষের কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভদ্র-ইতর, মার্জিত-অমার্জিত সর্বপ্রকার কথোপকথনের নমুনা এতে মেলে। এসকল কথাবার্তার নির্বাচনে প্রশংসনীয় বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। এ বই পড়লে বাঙ্লাভাষার গম্ভীর ও হাল্কা চাল উভয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। ভদ্রলোকের ও মজুরের কিংবা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের কথোপকথন যে একরূপ হতে পারে না এ সত্যটি কাউকে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। পুস্তকটির ভাষার সাবলীলতা ও সরসতা স্বীকার করতেই হয়। পরবর্তী কয়েকজন খ্যাতিমান বাঙালি গদ্যলেখককে খাঁটি বাঙ্লা ভাষার পথটি দেখিয়েছেন উইলিয়ম কেরি। তবে মনে হয়, 'কথোপকথন'-এর আসল লেখক কেরি নন। এই গ্রন্থের তিনি সংকলয়িতা মাত্র। এতে স্পষ্টত উঁকি দিচ্ছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতপ্রধান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের ভাষারীতির ছাপ। কোনো বিদেশির পক্ষে এ জাতীয় কথোপকথনের ভাষাভঙ্গি আয়ত্ত করা একরূপ অসম্ভব। অবশ্য আমাদের এই অনুমানের সত্যতা নির্ধারণ করা কঠিন একটি কাজ।

কেরির 'ইতিহাসমালা' ইতিহাসের কয়েকটি কাহিনী। এস্থলে 'ইতিহাস' বলতে গালগল্প—প্রকৃত 'হিস্ট্রি' নয়। গল্পগুলিতে মৌলিকতা নেই। বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত কাহিনীর অনুবাদ করেছেন কেরি। সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, ফারশি, বাঙ্লা প্রভৃতি ভাষায় লেখা আখ্যান পড়ে লেখক বর্তমান গ্রন্থখানির প্রণয়নে উৎসাহিত হয়েছেন। ভাষার সরলতার দিকে কেরির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। 'ইতিহাস-মালা' পড়তে ভালোই লাগে, ভাষা বুঝতে কোথাও অসুবিধে হয় না। এ বইটিতেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কারো কারো হাত আছে বলে মনে হয়। সে যা হোক, গ্রন্থখানি অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায়, উনিশের শতকের প্রথম দুই দশকে বাঙ্লা গদ্য বেশ-কিছুটা প্রকাশক্ষমতা অর্জন করেছে, তার গতি বিচিত্রমুখী হয়ে উঠছে। ভাষায় ত্রুটি রয়েছে অনেক, কিন্তু উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

কেরিকে সাহিত্যস্রষ্টা বলা যাবে না। যতখানি লিপিকুশলতা অর্জন করলে

লেখক শিল্পীর স্তরে উন্নীত হন ততখানি কুশলতা তিনি অর্জন করতে পারেন নি বহুভাষাবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও। স্মরণীয় কিছু নিজে সৃষ্টি করেননি তিনি। কিন্তু তাঁর অশেষ উৎসাহ-উদ্যম আধুনিক বিচিত্র জ্ঞান-চিন্তা-আলোচনার বাহন যে বাঙ্‌লা গদ্য তার ভিত্তিস্থাপনে প্রভূত সহায়তা করেছে। সামান্য কৃতিত্ব এ নয়। এইদিক থেকে দেখলে কেরি সাহেবের কীর্তি চিরস্মরণীয়। তিনি বাঙালির নমস্য পুরুষ।

জন টমাস কেরিকে বাঙ্‌লা দেশে নিয়ে আসেন ১৭৯৩ সালে। কেরির বয়স তখন একত্রিশ বৎসর। পরবর্তী একচল্লিশ বৎসর কেরি এদেশে কাটান। ১৮৩৪ সালে তিনি লোকান্তরিত হন। কত কাজ যে তিনি করে গেছেন তার তুলনা হয় না। আমৃত্যু তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮১৫ সালের দিকে কলেজ তার গুরুত্ব হারায়। এ সময়ে রামমোহনের গৌরবোজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ এবং কয়েকটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা—যেমন, হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, ইত্যাদি। একই কালে সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতে থাকলো। ১৮৫৪-তে কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম উঠে গেলো। কলেজ লুপ্ত হলো, কিন্তু কলেজের পণ্ডিতদের লেখা লোকস্মৃতিতে বেঁচে রইলো।

কেরি সাহেবের পর তাঁর মুন্সী **রামারম বসু**-কে স্মরণ করতে হয়। কেরি-রামরাম অবিচ্ছেদ্য দুটি নাম—অতিশয় উল্লেখ্য। রামরাম বসুর সঙ্গে কেরির যখন পরিচয় ঘটে কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম তখনো স্থাপিত হয়নি। নিজের মুন্‌সী [রচনাবিষয়ে উপদেষ্টা ও ভাষাশিক্ষক] রামরামকে কেরি প্রথমে শ্রীরামপুর মিশনে, পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, নিয়ে এলেন। কলেজে তাঁকে পণ্ডিত নিযুক্ত করা হলো। কলেজের ছাত্রদের জন্যে তিনি দুখানা পাঠ্যপুস্তক লেখেন —'রাজা প্রতাপ-আদিত্য-চরিত্র' ও 'লিপিমালা'। প্রথমোক্ত বইখানি বিখ্যাত এইজন্যে যে, এ-ই বাঙ্‌লা গদ্যে প্রথম মৌলিক রচনা। আরো উল্লেখ্য, 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এদেশে প্রথম মুদ্রিত বাঙ্‌লা গদ্যগ্রন্থ। ঘটনাটি মনে রাখবার মতো। বাঙ্‌লার শেষ পাঠান সুলতান দায়ূদ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু থেকে যশোহরে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের রাজ্যলাভ এবং প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব ও মোগল-সৈন্যের হাতে শোচনীয় পরিণামের ইতিবৃত্ত এতে বাণীবদ্ধ হয়েছে। এ ঠিক ইতিহাস নয়, শ্রুত এবং পঠিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। লেখকের গল্প বলার শক্তির পরিচয় নানাস্থানে পাওয়া যায়। পুস্তকটির বাঙ্‌লা স্থানে স্থানে প্রচুর ফারসি-আরবি-

মিশ্রিত। ফারসির প্রয়োগবাহুল্য বইটির একটি বিশেষ দোষ বলে কথিত হয়। রামরাম লেখনীকে সংযমশাসনে বাঁধতে জানতেন না, মাত্রাবোধ তাঁর কম ছিল বলে মনে হয়। শিল্পবস্তুনির্মাণের ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন কিনা, সন্দেহ। সচল স্বচ্ছন্দ গদ্যরীতির আদর্শের অভাবে তাঁর প্রতাপাদিত্য চরিত্র-এর ভাষা সুপাঠ্য ও সুবোধ্য হতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তী গ্রন্থ 'লিপিমালা'য় রামরাম ভাষাপ্রয়োগে অপেক্ষাকৃত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে গদ্যের পথে তাঁর বিচরণ অনেকটা স্বচ্ছন্দ। ফারসির মোহ বেশ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। এস্থলে স্মর্তব্য, ইতোমধ্যে কেরির 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়েছে। কথোপকথন-এর গদ্যভঙ্গি রামরামকে নিশ্চয় বাঙলা গদ্যের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। 'লিপি-মালা'র ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষণীয়। চলিত ধারার ভাষার কিছু কিছু নিদর্শনও পুস্তকটিতে মিলবে। এই বইতে চিঠিপত্র লেখার আদর্শ দেওয়া হয়েছে। কেরির মুন্সী বলেই রামরামের নাম বহুল প্রচারিত। বাঙলা গদ্যের নির্মাতারূপে কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব তেমন স্মরণযোগ্য কিছু নয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ও লেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার**, আর, তিনিই ছিলেন উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্ডিত। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি—বত্রিশসিংহাসন, রাজাবলি, হিতোপদেশ ও প্রবোধচন্দ্রিকা। মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যের ব্যাপক খ্যাতি কেরি সাহেবের কানে পৌঁছেছিল। কেরি কলেজে যোগ দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়কে প্রধান পণ্ডিতের পদে বৃত করলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮১৬ সালে মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রিম কোর্টের 'জজপণ্ডিত'-এর পদ পেয়েছিলেন। এতেই তাঁর বিদ্যাবত্তা প্রমাণিত হয়। তাঁর সম্বন্ধে আরো একটি কথা সবিশেষ উল্লেখনীয়। রামমোহনের পূর্বে তিনিই সহমরণের বিরোধিতা করেন। জজ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৭ সালে প্রকাশ্যে বললেন, শাস্ত্রের নির্দেশ—সহমরণ-প্রথা—অলঙ্ঘনীয় নয়: 'চিতারোহণ-অপরিহার্য নয়, ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন ও ধর্মজীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় বা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয় তাহার কোনো দোষ বর্তে না।' বলতে হয় সেকালের একজন হিন্দু-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এই অভিমত রীতিমতো বৈপ্লবিক। মানবতাকে তিনি শাস্ত্রবাক্যের বহু ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

গ্রন্থরচনে মৃত্যুঞ্জয়ের উৎসাহদাতা উইলিয়ম কেরি। কেরির নির্দেশও তাঁকে মানতে হয়েছে। তাঁর লেখা প্রথম পুস্তক 'বত্রিশ সিংহাসন' সংস্কৃত ও হিন্দীর

অনুবাদ। এর ভাষা মুখ্যত সংস্কৃতানুসারী। প্রথম থেকেই বাঙ্‌লা গদ্যের ওপর তাঁর বেশ অধিকার রয়েছে, লক্ষ্য করা যায়। কয়েক বছর পরে মৃত্যুঞ্জয়ের লেখনী থেকে বেরুলো 'হিতোপদেশ'। মৌলিক গ্রন্থ এ নয়, এও অনুবাদ। ইতঃপূর্বে গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' বেরিয়েছে। কিন্তু শেষাবধি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারে অনূদিত গ্রন্থটিই লোকসাধারণের মধ্যে অধিক প্রচারিত হয়েছে। তৃতীয় পুস্তক 'রাজাবলি'-কে আগে মৌলিক রচনা মনে করা হতো। কিন্তু অধুনা সেই ধারণা পালটিয়েছে—বইখানি সংস্কৃতের অনুবাদ। 'রাজাবলি' হলো ভারতবর্ষের হিন্দুরাজগণের ও কতক পরিমাণে মুসলমানরাজগণের ইতিবৃত্ত। মুখে-শোনা কাহিনী ও কল্পনার টানা-পোড়েনে রাজাবলির'-র কায়া গঠিত।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রণীত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' সত্যিই তারিফ করবার মতো একখানা বই। এতে বিচিত্র জ্ঞানের বিষয় সাধু গদ্যরীতি থেকে সকলপ্রকার প্রচলিত গদ্য-রীতিতে নিবদ্ধ হয়েছে। বহু শাস্ত্রকথা, ব্যাকরণ-ছন্দ-অলংকার-প্রহেলিকা, এমন কি, জেলেনিদের কথাবার্তাও, এই পুস্তকে গ্রথিত। সংকলনগ্রন্থ হলেও এ মৌলিক রচনার মর্যাদা দাবি করতে পারে—বিষয়বস্তু পরিবেশনে ও ভাষার বৈচিত্র্যতায়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যকে অনেকে কঠিন ও জটিল বলে দোষারোপ করেছেন। এ কিন্তু ঠিক নয়। বরং সংস্কৃত বাক্যকে বাঙলায় সহজ করে বলার ভঙ্গিটি তিনিই প্রথমে দেখালেন। এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের যোগ্য পূর্ববর্তী। এই লেখকের ভাষাজ্ঞান ছিল, সাধু ও চলিত এ দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য তিনিই প্রথম চিনে নিয়েছিলেন। তাঁর বইগুলি মন দিয়ে পড়লে উপলব্ধি করা যায়, বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর গুরুত্বভেদে তিনি স্বতন্ত্র চাল বা লেখনভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। এতে তাঁর শিল্পবুদ্ধির পরিচয় ফুটেছে। 'স্টাইল' বলতে যা বোঝায় তা মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এ স্বীকার করতেই হয়। ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সচেতন। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সেকালের বিশৃঙ্খল বাঙ্‌লা গদ্যকে তিনি শৃঙ্খলায় বেঁধেছেন। অবশ্য তাঁর রচনায় যে ত্রুটি নেই এমন নয়—এতে বিরামচিহ্নের অভাব রয়েছে, সর্বথা সাহিত্যসুষমা ফুটে ওঠেনি। পরবর্তী বিদ্যাসাগরের গদ্যে এসব বস্তুর অভাব ঘুচলো। সেই উনিশের শতকের গোড়ার দিকে বাঙ্‌লা গদ্য-নির্মাণে মৃত্যুঞ্জয় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতীব প্রশংসার্হ। কারো কারো মতে তিনি বাঙ্‌লা গদ্যের প্রথম শিল্পী। এরূপ মন্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার্য, একে অযথার্থ বলে উপেক্ষা করা যায় না।

অধুনা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের নাম একরূপ বিস্মৃত। কিন্তু একালের বাঙ্‌লা

গদ্যের প্রখ্যাত শিল্পী প্রমথ চৌধুরী শ্রদ্ধাসহকারে মৃত্যুঞ্জয়কে স্মরণ করে তাঁর রচনা সম্পর্কে ['প্রবোধচন্দ্রিকা'-র ভাষা সম্পর্কে] বলেছেন: 'এ ভাষা সজীব সতেজ সরল সচ্ছন্দ ও সহজ। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই।··· এই ভাষার গুণেই বিদ্যালংকার মহাশয়ের পল্লীচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।···আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালংকার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।'

আজ বাঙ্লা ভাষার মনোরম সৌধ গড়ে উঠেছে। বিস্মৃতপ্রায় মৃত্যুঞ্জয় এ সৌধের ভিত্তিস্থাপন করেছেন এই সত্যটি আমরা যেন ভুলে না যাই।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র' পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শুধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনই নয়, সেকালের ইতিহাসও গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। ফার্‌শি শব্দ-প্রয়োগের আতিশয্যে এর ভাষা ভারাক্রান্ত নয়। বরংচ লেখক সংস্কৃতের দিকেই ঝুঁকেছেন। পাঠক এতে বর্ণিত কাহিনীটি অনায়াসে পড়ে যেতে পারেন। **চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা-ইতিহাস'** কলেজের ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হলেও সেকালে সাধারণ্যে বেশ সমাদৃত হয়েছিল—বোধ করি এর গল্পরসের জন্যে। বইটি ফারসি তোতা-কাহিনীর অনুবাদ। কিন্তু এ পুস্তকে ফারসির দৌরাত্ম্য তেমন লক্ষ্য করা যায় না। **হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা'** মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সংস্কৃতে-লেখা 'পুরুষপরীক্ষা'-র তর্জমা। সংস্কৃত ভাষারীতি এই অনুবাদে অতিরিক্ত প্রাধান্য পেলে তেমন অস্বাভাবিক কিছু হতো না। কিন্তু লেখকের সম্বন্ধে প্রশংসার কথা, তা হয়নি। হরপ্রসাদ মাত্রা হারিয়ে ফেলেন নি।

কেরির ন্যায় মার্শম্যান সাহেবও উদ্‌যোক্তা হয়ে ও স্বয়ং গ্রন্থ রচনা করে ও সংবাদপত্রের সম্পাদনা করে বাঙ্লা গদ্যের উপকার করেছেন। বহুপরে প্রকাশিত হলেও তাঁর প্রণীত 'ভারতের ইতিহাস' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ যুগটি বাঙ্লা গদ্যের উদ্‌যোগ-পর্ব, এবং দেখা যায়, কেরির মতো অক্লান্তকর্মী ও বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি না থাকলে গদ্যের প্রসার এতখানি হতো না।

এই পর্বের গদ্যরচনার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা :

॥ ১ ॥ 'আমার আর জয় হয় বা না হয়। আপনে দিল্লীশ্বর সমস্ত সৈন্য সসর্জমান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন। এখন আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে তাহার সহিৎ। বুঝি আমার এই শেষ দশা নতুবা

এমত কুবুদ্ধি আমাকে ঘটিত না। আমি পতঙ্গ কমরবন্দি করি সিংহের সাতে। যাহা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ি।'

—['প্রতাপাদিত্য-চরিত']

॥ ২ ॥ 'পত্র করিতে এত খরচ হইবে কেমনে। সে মিথ্যা কথা। এমন শুনি না।'

'আপনি না শুনিলে শুনিতে কহে কে। আমিই যেন মিথ্যা কহিলাম। গ্রামে আর লোক আছে জিজ্ঞাসা করুন গা দিকি তাঁহাদিগকে তাঁহারা কি বলেন।' —['কথোপকথন']

॥ ৩ ॥ 'ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে। সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন। সেই ভূপতি একসময়ে কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান। তাহার অর্থ এই, অনেক সন্দেহের নাশক এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু। ইহা যাহার নাই সে অন্ধ।'

—[গোলোকনাথের 'হিতোপদেশ']

॥ ৪ ॥ এক অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরালয়ে গমন করত মাঠের মধ্যে এক গোয়ালাকে কহিলেন, হে গোপ, আমি অন্ধ, তুমি আমাকে শ্বশুরের ঘরে লইয়া যাও। গোপ কহিলেন, আমি অনেকের গরু চরাই, তোমাকে তোমার শ্বশুরবাড়ী লইয়া গেলে গরু সব কে কমনে যাবে, অতএব আমার যাওয়া হয় না।

—[স্বকীয় রচনা : 'প্রবোধচন্দ্রিকা']

॥ ৫ ॥ 'কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন। তিনি অযাচিত-প্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদিতে যথাকথঞ্চিদ্রূপে গ্রাসাচ্ছদন ও পরিজন-পরিচালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ এই কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষীতে তাবৎ শস্য নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল, তৎপ্রযুক্ত ঐ অযাজক ব্রাহ্মণের বড় অপ্রতুল হইল এবং পরিবার-পরিপোষণে অনির্বাহ হইল।'

—[সংস্কৃতের অনুবাদ : 'প্রবোধচন্দ্রিকা']

গদ্য রচনের এই প্রথম প্রয়াসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাঙ্‌লা গদ্যের ছাঁদটি সম্পূর্ণ ধরতে না পারলেও এঁরা বাঙ্‌লা ভাষার জড়ত্বমুক্তিসাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেকালে গদ্যের প্রচলন একরূপ ছিল না। ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর লেখকগণ অপরিচিত অপরীক্ষিত অন্ধকার পথে সাহসভরে পা বাড়ালেন। এঁদের এ কৃতিত্ব কদাপি ভুলবার নয়। চতুষ্পার্শ্বের শূন্যতার মধ্যে যাঁরা প্রথম ভিৎ তৈরি করলেন তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ কি কম! এঁরা সকলে ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের লেখক। তাও আবার বাঙালি ছাত্র নয়। অধিক মূল্যের জন্যে এসব পুস্তক সহজপ্রাপ্যও ছিল না। মৌলিক রচনার সাক্ষাৎ এখনো মেলেনি। তথাপি বাঙ্‌লা গদ্যের ক্রমবিকাশে কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়মের প্রচারিত বইগুলার দান অবশ্যস্বীকার্য। এতে যে-গদ্যানুশীলনের শুরু, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অবশেষে পরিণতি লাভ করেছে। যাঁদের প্রচেষ্টার অভাব ঘটলে আজকের পুষ্পিত ফলবন্ত ভাষা-বৃক্ষটির অঙ্কুরোদ্গম সহজ হতো না তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে আমরা বাধ্য।

[৪]

॥ রামমোহন রায় ও বাঙ্‌লা গদ্য ॥

—বাঙ্‌লা গদ্যের ইতিহাসে পর্বান্তর—

বাঙ্‌লা গদ্যের স্মরণীয় নির্মাতা রামমোহনঃ

বাঙ্‌লা গদ্যরীতির উদ্ভব-পর্ব বা উদ্‌যোগ-পর্বের ইতিকথা সংক্ষেপে বলা হলো। এখন দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করছি আমরা। এ কয়টি অধ্যায়ের নাম রাখা যেতে পারে—উন্মেষ-পর্ব। প্রস্তুতিকাল দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সৃষ্টির চেতনা ও কৌশল দেখা দিতে আর বেশি দেরি নেই। সর্বজনস্বীকৃত গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের পর্ব সমাগত-প্রায়। আমরা সৃষ্টিশক্তির ব্রাহ্মমুহূর্তের তোরণদ্বারের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এদেশে পশ্চিমী রেনেসাঁস্-মন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা বিরাট পুরুষ রামমোহন রায় [১৭৭৪-১৮৩৩]।

হুগলির রাধানগরের সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ-জমিদারবংশের সন্তান রামমোহন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে তাঁর নামটি অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের প্রথম 'আধুনিক মানুষ' তিনি, নব্যবঙ্গের স্রষ্টা, বাঙ্‌লা গদ্যের স্মরণীয় একজন নির্মাতা। অসামান্য মনীষা ও প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন রেনেসাঁসবাদী এই রামমোহন রায়। ভারতবর্ষে তিনি জন্মেছেন, ভারতের জলহাওয়ায় আজন্ম লালিত। কিন্তু এমন অসাধারণ তাঁর

চরিত্র, ভারতবর্ষীয় বলে তাঁকে মনে হয় না—ভারত-ভূখণ্ডে এ চরিত্রের তুলনা মেলে না। সোৎসাহে বেদান্তপ্রচার করেছেন তিনি কিন্তু সংসারকে মিথ্যাজ্ঞানে দূরে সরিয়ে দেননি, ঐহিকতাকে কদাপি উপেক্ষণীয় বলে বোঝেন নি; আজীবন সত্য ও জ্ঞানের তপস্যা করেছেন, ধর্মগুরুর আসনে বসেছেন কিন্তু অর্থার্জন-পিপাসাকে কখনো সকল অনর্থের মূল বলে জানেন নি, উপাসনাগৃহে যাওয়ার সময়েও দরবারি পোষাক ছাড়েন নি; উপনিষৎ-কোরান-বাইবেলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন কিন্তু সমাজ-শিক্ষা-অর্থনীতি-রাজনীতি, ইত্যাদি লৌকিক জগতের বস্তুর প্রতি সমানই আসক্ত থেকে গেছেন। একেই বলে জীবনের সমগ্রতার সাধনা। ভারত-ভূমিতেও দূর থেকে উড়ে এসে পড়েছিল য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের বীজ। এ বীজ থেকে প্রথম যে-বনস্পতিটি এদেশে জন্মালো তার নাম রামমোহন রায়। দ্বিতীয় বনস্পতি—শ্রীমধুসূদন দত্ত—ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক কবি। এঁদের একজন ধর্ম ও সমাজসংস্কারক, পূর্ণতর মনুষ্যত্বের সাধক; অপরজন স্বরূপত শিল্পী। রেনেসাঁসবাদ উভয়কে কমবেশি বিদ্রোহী করে তুলেছে। আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অটল ভূমিতে দুজনারই নিঃশঙ্ক অবস্থান।

রামমোহনের মনের চেহারাটি বুঝে নেবার চেষ্টা করছি। এ না হলে তাঁর নানামুখী কর্মধারার পেছনকার প্রবর্তনাকে আমরা সঠিক বুঝে নিতে পারব না। উনিশের শতকের গোড়ার দিকের তিনটি দশকে বাঙ্‌লাদেশে যত আন্দোলন হয়েছে রামমোহন রায় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁকে এই শতকের প্রথমার্ধের প্রধান পুরুষ বলা যেতে পারে। তাঁর সমগ্র জীবনটি ছিল বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। বহুবিচিত্র কর্ম সম্পাদন করে গেছেন তিনি, পেয়েছেন বিজয়ী বীরের দুর্লভ মর্যাদা। রামমোহনের নানাবর্ণরঞ্জিত ব্যক্তিত্বের পূর্ণায়ত আলোচনার অবকাশ আমাদের হাতে নেই। আমরা এখানে বাঙ্‌লা গদ্যের কীর্তিমান নির্মাতা [Maker of Prose] রামমোহন সম্পর্কে দুচারটি কথা বলব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠী যখন পাঠ্যপুস্তক রচনা করছিলেন সে-সময় ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের বিষয়বহির্ভূত স্বাধীন মননের ক্ষেত্রে গদ্যরীতি প্রয়োগ করলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্য তাঁর গদ্যরচনাতেও প্রতিফলিত। তিনি একটি সুদৃঢ় কাঠামোর ওপর বাঙ্‌লা বাক্যের বিন্যাস করতে চাইলেন। তাঁর গদ্য ঠিক সাহিত্যগুণান্বিত গদ্য নয়, যুক্তিতর্কের গদ্য। তিনি 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম'-সংস্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন; এবং একদিকে যেমন তাঁকে বহুদেবতাপূজক, পৌত্তলিকতার অনুরাগী গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মত নিরসন করতে হয়েছিল,

আরেক দিকে, তেমনি, খ্রিস্টীয় মিশনারিদের সঙ্গে প্রচণ্ড বাগ্‌যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। এ ছাড়া, সতীদাহ-নিবারণের জন্যেও তাঁকে কম চেষ্টিত হতে হয় নি। এরূপ অবস্থায়—তুমুল তর্কসভায়—রূপরসময় সাহিত্য নির্মিত হতে পারে না, প্রচার-পুস্তিকাই লেখা চলে। এই প্রচারধর্মী রচনার ভাষা তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছিল। অথচ এর কোনো আদর্শ সেদিন তাঁর হাতের কাছে ছিল না। স্বহস্তে নতুন পথ কেটে অগ্রসরণ সে কী দুরূহ কর্ম! রামমোহনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

তখন-যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা নহে, তখন লোকে অনভ্যাস-বশত গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না। ··· রামমোহন যেখানে ছিলেন সেখানে কিছুই প্রস্তুত ছিল না—গদ্য ছিল না, গদ্য-বোধশক্তিও ছিল না। যে-সময়ে একথা উপদেশ করিতে হইত যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় অনুসরণ করিয়া গদ্য পাঠ করিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য কী উপহার প্রস্তুত করিতেছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। ··· সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের দেশে আধুনিকতমকালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথমে মানব-সাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন : সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথি-সৎকার করিব; আমার অরণ্যে ইঁহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া দিব। কেবল পণ্ডিতদিগের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরমবিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে বাঙ্‌লা দেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙালি সর্বসাধারণকে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাঙ্‌লাদেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

কথাগুলির তাৎপর্য অনুধাবনীয়। এবং রামমোহনের কীর্তির পরিমাপ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন'—এ উক্তির সত্যতা সংশয়াতীত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাদ্রি ও পণ্ডিতবর্গ যে-বাঙ্‌লার চর্চা করছিলেন,

বাঙ্‌লা ভাষার যে-রীতির দিকে ঝুঁকেছিলেন, তাতে আড়ষ্টতা ছিল, সরলতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল। ওই গদ্যের পদনিচয়ের অন্বয়ে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা ছিল, মিশনারি তথা পণ্ডিতী বাঙ্‌লায় দেশি-বিদেশি শব্দের মিশ্রণ ছিল, ওতে ভারবহন-ক্ষমতা তেমন ছিল না। এহেন গদ্যে রামমোহন ঋজুতা ও স্বচ্ছতা এনেছিলেন। বহুবিসর্পিত সংস্কৃতপদবিন্যাসরীতি বর্জিত হলো, বাঙ্‌লাভাষার অন্তঃপ্রকৃতির প্রায় সমীপবর্তী হলেন তিনি; দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা এবং নানা সংস্কারমূলক প্রচারকর্মের জন্যে যে বলিষ্ঠ গদ্যভাষা প্রবর্তন করলেন তা তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। তাঁকে নতুন ব্যাকরণ লিখতে হয়েছে, নতুন পদ্ধতিতে বাক্যগঠন করে এগুতে হয়েছে। রামমোহনের হাতে বাঙ্‌লা গদ্য দৃঢ়বদ্ধ ও সংহত হয়ে উঠেছে। রাম-মোহন ফারসি-সংস্কৃত-ইংরেজিতে সমান ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ব্যাপক ভাষাজ্ঞান নিশ্চয়ই বাঙ্‌লা-গদ্য-নির্মাণে তাঁকে সহায়তা করেছিল। তথাপি বলতে হয়, তাঁর ভাষা সম্পূর্ণ আড়ষ্টতামুক্ত হতে পারেনি, এবং তা স্থানে স্থানে অকারণে বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। আরো বলা যায়, রামমোহন আমাদের গদ্যকে দিয়েছেন তর্কযুক্তি বহন করার ক্ষমতা, তার চেহারায় সাহিত্যিক লাবণ্যের স্পর্শ নেই। তাঁর লেখা অপেক্ষাকৃত সরল বটে কিন্তু এতে সরসতার অভাব। রামমোহন-রচনাবলী প্রায়শ যুক্তিসর্বস্ব। তর্কে জেতার দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল স্থিরবদ্ধ। ধর্মীয় ও সমাজসংস্কারমূলক মতপ্রচারে সর্বদা নিরত থাকার জন্যে সাহিত্যসৃষ্টির কোনো অভিপ্রায় তাঁর মনে এতটুকু স্থান পায়নি। একারণে বক্তব্যের চারুতা নয়, স্বচ্ছতা সরলতার বিষয়ে অনুক্ষণ তাঁকে সজাগ থাকতে হয়েছে। রচনায় প্রকৃত সাহিত্য-ধর্মের স্ফুরণ ঘটে তখন যখন বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হয় বাচনকলার সৌন্দর্য, যখন প্রচারবাসনা কিছুটা স্থান ছেড়ে দেয় প্রকাশব্যাকুলতাকে। যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্ত যতই অকাট্য ও সারবান হোক, উক্তির রম্যতা না থাকলে তা কখনো হৃদয়স্পর্শী হতে পারে না। চিত্তহারী বাঙ্‌নির্মিতি রসপরতন্ত্র; যেখানে বাণীসমুচ্চয়ের রূপরসতা নেই সেখানে সাহিত্যও নেই।

রামমোহন ১৮১৪ ইংরেজি সালে রঙ্‌পুর থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৮১৫ সালে তাঁর রচিত 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য—একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা। এর পূর্বে তিনি ফার্‌শি ভাষায় একেশ্বরবাদ সম্পর্কে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এর পর ক্রমে ক্রমে তাঁর উপনিষদের অনুবাদ-গ্রন্থ [ঈশোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ প্রভৃতির অনুবাদ], 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'সহমরণ-বিষয়ে প্রবর্তক

ও নিবর্তকের সম্বাদ' [সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার], 'পথ্যপ্রদান', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্মসংগীত', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', ইত্যাদি, ১৮৩৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে তাঁকে ইংরেজি ও বাঙ্‌লাতে মসীযুদ্ধ চালাতে হয়। রামমোহনের অপর একটি কীর্তি সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের পরিচালনা। অবশ্য তাঁর এ উদ্‌যোগের পূর্বেই 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচারদর্পণ', 'বাঙ্গাল গেজেটি' এ তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'ব্রাহ্মণসেবধি' ও 'সংবাদ-কৌমুদী' প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়োক্ত পত্রিকাটি তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে বার করেন।

রামমোহনের রচনার একটি লক্ষণীয় গুণের কথা বলি। এই গুণটির নাম ভব্যতা বা শালীনতাবোধ। প্রতিপক্ষের লোক তাঁকে এবং তাঁর প্রচারিত মতবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন, রুচিবিগর্হিত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে দ্বিধান্বিত হননি। রামমোহন কিন্তু এর জবাবে কোথাও কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ ভাষার আশ্রয় নেননি, এতটুকু অসংযমের পরিচয় দেননি, শাস্ত্রবাক্যের তীক্ষ্ণ শর হেনে বিরুদ্ধবাদীকে পর্যুদস্ত করেছেন। সাহিত্যে যে-শিষ্টতার শোভন আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন, সাহিত্যিক-মাত্রেরই তা অনুসরণীয়।

বাঙ্‌লা গদ্যের ভিত্তিগঠনে রামমোহন রায়ের প্রতিভা কম সহায়ক হয়নি। তাঁর অনুবর্তীরা [ব্রাহ্মসম্প্রদায়] তাঁকে 'বাঙ্‌লা গদ্যের জনক' বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই প্রতিভাধর মানুষটির অধ্যবসায়ী গদ্যানুশীলনের কথা স্মরণে রেখেও আমরা বলবো, বাঙ্‌লা গদ্যের প্রকৃত জনক বলে তাঁকে চিহ্নিত করা যেতে পারে না। তিনি তর্ক-বিতণ্ডার গদ্যের নির্মাতা,—ভাবের ভাষা, রস-সাহিত্যনির্মাণের.ভাষা, তাঁর লেখনী থেকে বেরুয়নি। রামমোহনের সমকালীন কয়েক জন লেখক উন্নততর গদ্যের আদর্শ রেখে গেছেন। এতে অবশ্য তাঁর অসামান্য কীর্তি ম্লান হয়ে যায় না। আগে গদ্যভাষা পাঠ্যপুস্তকের সীমানায় আবদ্ধ ছিল। এই সংকীর্ণপরিসর সীমা ভেঙে দিয়ে গদ্যকে তিনি লোকসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন, বাঙালিসমাজকে তিনি বাঙ্‌লা গদ্যের আগ্রহশীল পাঠকে পরিণত করেন। বৃহত্তর পাঠকসমাজ তৈরি করা কি সহজ কথা!

রামমোহন নিঃসন্দেহে একজন যুগপুরুষ। তাঁর প্রতিভাকে আশ্রয় করে একটি যুগ কথা কয়েছে। আধুনিক ভারতীয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই বীর্যবান মানুষটির দানের পরিমাপ করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। আজীবন সংগ্রামী পুরুষ রাজা রামমোহন রায় ['রাজা' উপাধি তাঁকে দিল্লির সেকালের

নামে-মাত্র বাদ্‌শাহ্‌ দ্বিতীয় আকবরের প্রদত্ত] ১৮৩৩ সালে বিলাতে দেহত্যাগ করেন। এমন প্রদীপ্ত কীর্তি যিনি রেখে গেছেন তিনি তো মৃত্যুজিৎ।

রামমোহনের বাঙ্‌লা গদ্যের কিছু নমুনা :

॥ ১ ॥ 'যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাসদ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্পশ্রমে ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এ দুয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়।···যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।'

॥ ২ ॥ 'শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। কিন্তু ইদানীন্তন বিশবৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনারি নামে বিখ্যাত, হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিস্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন।'

॥ ৩ ॥ 'ইহাতে এই সমুহ আশঙ্কা আমাদিগের হইতেছে যে, যে-ব্যক্তি বেদান্ত-শাস্ত্রের মত পূর্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে, 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।'

রামমোহনের লেখা বহুধরণের—বিচিত্র-বিষয়ক। দুয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর রচনারীতির পরিচয় পরিস্ফুট করা যায় না। অধুনা রামমোহন-রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এতে গদ্যলেখক রামমোহনের সর্বাঙ্গীণসম্পূর্ণ পরিচয় মিলবে। এদিকে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেলো।

সমাজবিপ্লবী রামমোহনের সেদিনকার বিরুদ্ধবাদী দুয়েকজন গদ্যলেখক ঃ

উনিশের শতকের প্রথমার্ধের বাঙ্‌লা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাস, বলতে গেলে, পরোক্ষভাবে সমাজ আন্দোলনেরই ইতিহাস। ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেন যুগনায়ক রামমোহন রায়। ফলে রক্ষণশীল বাঙালিসমাজে প্রকাণ্ড আলোড়ন জাগলো। হিন্দুধর্মের বহুদেবতাবাদ ও সাকারোপাসনা রামমোহনের ভালো লাগেনি, সহমরণপ্রথাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাই, এসমস্ত-কিছুর বিরুদ্ধে নিজের মত প্রচারে নামলেন। ১৮১৫-তে তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হলো, 'আত্মীয়সভা' স্থাপিত হলো, এবং ১৮২৮-এ ব্রাহ্মসমাজ। এই প্রথম সংঘাত বাধলো—প্রগতিকামী ও সনাতনপন্থীদের মধ্যে—বড়ো রকমের সংঘাত। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, প্রচণ্ড তর্কবিতণ্ডা চলতে লাগলো। প্রকাশিত হতে থাকলো প্রচারপুস্তিকা ও পুস্তক, এবং পত্রিকা। এ তর্ক নিরাকার ব্রহ্ম বনাম সনাতন হিন্দুধর্মের, শাস্ত্র বনাম যুক্তির। এক পক্ষ সংস্কারসাধনের প্রয়াসী, অন্য পক্ষ ওতে বাধাদানে বদ্ধপরিকর।

প্রত্যেক সংঘর্ষেই জয়পরাজয় আছে। এতেও প্রগতিকামীরা জয়ী হয়েছেন, রক্ষণশীলেরা প্রায়শ হেরেছেন। হারজিৎ এক্ষেত্রে বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো এই সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে পরোক্ষে লাভবান হয়েছে সেকালের বাঙ্‌লা গদ্য। নানান্ রীতির গদ্যভাষা গড়ে উঠলো—আত্মপ্রকাশ করলো যুক্তিতর্কের ভাষা, নির্মিত হলো গুরুচিন্তার ভাষা, দেখা দিল রসবহনের ভাষা আর লঘু ব্যঙ্গের ভাষা। একদিকে চলেছে সমাজের ভাঙাগড়া, অন্যদিকে বাঙ্‌লা গদ্যের গঠন। হিন্দুসমাজে সংঘাত বাধিয়ে, বহুতর পুস্তকপুস্তিকা লিখে, পত্রিকা বার করে, রামমোহন রায় প্রত্যক্ষত ও পরোক্ষত আমাদের গদ্যভাষার ক্রমবিকাশের সহায়ক হয়েছেন। প্রতিপক্ষের দল রামমোহনের যতই বিরুদ্ধাচরণ করুন না কেন, তাঁর রচনাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেননি, এবং ওতে প্রণোদিত হয়েই সেদিন এঁরা হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন। সেদিনকার পণ্ডিতমণ্ডলী আর সমাজপ্রধানরা যে-প্রতিবাদের ঢেউ তুললেন তা ব্যক্তিত্ববান পুরুষ রামমোহন রায়ের মতামতের বিরুদ্ধে। কাজেই, বলতে পারা যায়, বাঙ্‌লাগদ্যের এই পর্বটিও আসলে রামমোহনী পর্ব। অতঃপর 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিদ্রোহ—১৮৩০-এর পর। ডিরোজিও-র ভাবশিষ্য 'নব্যবাঙালি'-র

কণ্ঠে উচ্চরবে ধ্বনিত হলো সত্য ও স্বাধীনতার বাণী। দেখা দিল ঝড়-তুফানের যুগ। এর কিছুকাল পরে শুরু হয়েছে বিদ্যাসাগরের পর্ব। তাঁর বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন গোটা বাঙ্‌লাদেশে এক দারুণ বিক্ষোভের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়েছিল। এ বিক্ষোভের বাহন হয়েছে কত পুস্তিকা, সংবাদপত্র—ছড়ার গানেও তা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাঙ্‌লা গদ্যের গঠনে ধর্ম-সংঘাত ও সমাজ-সংঘাতের প্রভাব স্বল্প নয়।

১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল এই যে কাল-পরিধি, এসময়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যমণি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর 'বেদান্তসার' ও 'বেদান্ত-গ্রন্থ' প্রকাশিত হলে পর [১৮১৫], এবং ব্রহ্মোপসনার জন্যে 'আত্মীয় সভা' স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, সংঘাত শুরু হলো। রামমোহনের মতামতের বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়ালেন তাঁদের মধ্যে প্রথম গণ্য ব্যক্তি হলেন **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার**, সেদিনকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বহুশ্রুত গদ্যলেখক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাঁর কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। রামমোহনের বেদান্তচর্চাকে তিনি ভালো চোখে দেখেননি, নিরাকার উপাসনাকে সমর্থন জানাতে পারেননি। বেদ-উপনিষদের অনুশীলন করেছেন পণ্ডিতপ্রবর মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় উপনিষদাদির আলোচনা হোক এ তিনি চাননি—লৌকিক ভাষায় এসকল বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন। তথাপি **'বেদান্তচন্দ্রিকা'** তিনি লিখলেন [১৮১৭]—একরূপ বাধ্য হয়ে—রামমোহন রায়ের প্রতিবাদে। মৃত্যুঞ্জয় শাস্ত্রীয় বিচারে নামলেন কিন্তু দার্শনিক যুক্তি-বিচারের দিকে তেমন ঘেঁষলেন না। কোথাও কোথাও কুযুক্তিকেই তর্ক বলে চালাতে চেয়েছেন তিনি, তর্ক করতে বসে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, রামমোহনের প্রতি অশ্লীল ভাষাপ্রয়োগেও দ্বিধান্বিত হননি। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের স্বাধীন রচনা। লক্ষণীয়, এর ভাষারীতিতে প্রশংসা করবার মতো কিছুই নেই। 'বাঙ্‌লা গদ্যের প্রথম শিল্পী' মৃত্যুঞ্জয় এই গ্রন্থে একেবারে বৈশিষ্ট্যবর্জিত। এখানে তাঁর প্রযুক্ত ভাষা সংস্কৃতের চাপে নিষ্প্রাণ, এখানে-ওখানে অনেকটা দুর্বোধ্য, সহজ গতি কোথাও চোখে পড়ে না। যুক্তিকে জটিলতামুক্ত করতে পারেননি তিনি। পক্ষান্তরে, যে-ভাষা রামমোহন প্রয়োগ করেছেন তা অনেক বেশি সুবোধ্য, গতিমান, স্বচ্ছতায় চিত্তা-কর্ষক। রামমোহনের আলোচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ মত প্রকাশে প্রাণবন্ত, শালীনতার স্পর্শে সুন্দর। মোটকথা, শাস্ত্রের বিচারের ক্ষেত্রে রামমোহনের

ব্যক্তিত্বের পাশে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। চিত্তস্থৈর্য ও সহনশীলতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

রাজা রামমোহন রায়ের আর-একজন প্রতিপক্ষ **কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন**। রামমোহনী পর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পণ্ডিত ছিলেন তিনি। স্মৃতি-সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি সর্বজনস্বীকৃত। তবে একালেও তাঁকে যে আমরা মাঝে মাঝে স্মরণ করি তা তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়; তিনি একদা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন কিংবা জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন [১৮২৭], সে-কারণেও নয়। কাশীনাথ আমাদের কাছে পরিচিত **'পাষণ্ডপীড়ন'** নামীয় গ্রন্থখানির লেখক বলে। অমানবীয় সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন মানবতার সাধক রামমোহন। এই প্রথার বিলোপসাধন করতেই হবে। পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি প্রচারকার্যে ব্রতী হলেন। প্রথমে লিখলেন 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' [১৮১৮]—সহমরণের বিরোধিতা করে। এর উত্তরে কাশীনাথের লেখনী থেকে বেরুলো 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' [১৮১৯]। ইংরেজ মিশনারিদের প্রকাশিত পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'-এর পাতায়ও কাশীনাথ চারটি প্রশ্ন করলেন [পত্রাকারে] রামমোহনকে। এর উত্তর দিলেন রামমোহন, প্রকাশিত হলো 'চারি প্রশ্নের উত্তর'। এই উত্তরেরই প্রত্যুত্তর কাশীনাথ-লিখিত 'পাষণ্ডপীড়ন'—প্রকাশকাল ১৮২৩ ইংরেজি সাল। এ গ্রন্থের উত্তরদানকল্পে রামমোহন লেখেন 'পথ্যপ্রদান' [১৮২৩]। কাশীনাথ-রামমোহনের বিতর্ক এখানে শেষ হলো। রামমোহনকে কাশীনাথের আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র। এই আক্রমণে কাশীনাথ শোভনতার সীমা অতিক্রম করেছেন, প্রতিপক্ষের প্রতি কটূক্তিবর্ষণে তিনি নিরঙ্কুশ। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সেদিনকার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিলুপ্তি ঘটাবেন, সাধারণ্যে বেদান্ত প্রচার করবেন, গোঁড়া ব্রাহ্মণসন্তান কাশীনাথের কাছে এ অসহ্য। তাই, একরূপ ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি 'পাষণ্ড'-দলনে এগিয়ে এলেন। কিন্তু যুগধর্মের সঙ্গে সংগ্রামে—রামমোহনের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে—কাশীনাথ পরাভূত হলেন। এর অল্পকাল পরে ইংরেজের আইনের সহায়তায় সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ ঘটালেন রামমোহন [১৮২৯]।

পণ্ডিতী বিচারের দিক থেকে দেখলে 'পাষণ্ডপীড়ন'-এ তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। নীরস শাস্ত্রবচনের মুখরতা কারুর ভালো লাগবার কথা নয়। তাছাড়া, কাশীনাথ অনুশীলিত রুচির মানুষ ছিলেন না। এসব কারণে তাঁর লেখায় আকর্ষণের বস্তু অনুপস্থিত। তথাপি ব্যঙ্গবিদ্রূপে শাণিত কাশীনাথের লেখনভঙ্গি

মাঝে-মধ্যে উপাদেয় হয়েছে, ভাষায় সাহিত্যগুণ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। বুঝতে পারা যায়, বাঙলা গদ্যের ওপর তাঁর বেশ দখল ছিল। সেকালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর অনেকের রচনার চেয়ে তাঁর রচনা উন্নততর, পাঠ করতে মন্দ লাগে না, অর্থ বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। তখনকার গদ্যরীতির অনগ্রসরতার দিনে রীতিমতো সহজবোধ্য ও রসযুক্ত বাঙলা লিখে গেছেন কাশীনাথ। এজন্যে পাঠকসমাজের প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। এখানে লোকখ্যাত ঈশ্বর গুপ্তের একটি উক্তি স্মর্তব্য। 'পাষণ্ডপীড়ন' সম্বন্ধে তিনি লিখছেন: 'রামমোহনের ভাষা ত্রুটিহীন নয়, কিন্তু 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর ভাষা সর্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য প্রাচুর্য সর্বদিকেই উত্তম হইয়াছিল, তদৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।' মনে রাখতে হবে, তৎকালীন খ্যাতিমান লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যুদয় ঘটছে সে সময়ে। তাঁর রচনারীতির প্রভাব কাশীনাথের লেখায় রয়েছে কিনা তা বিচার্য। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের প্রযুক্ত গদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা:

> 'অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে ভক্ততত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়দিগের [রামমোহনের প্রতি শ্লেষোক্তি] নিগূঢ় শাস্ত্র দর্শন করিলাম। যে নিগূঢ় শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা শৈব বিবাহ, যবনাগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্মের অনুষ্ঠান ও ছাগীমুণ্ড, বরাহমুণ্ড, হংসাণ্ড ও কুক্কুটাণ্ড ভোজন করিয়া থাকেন...ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এইসকল গর্হিত কর্ম করিলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি ডোম চাঁড়াল ও মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহাদিগকেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানী না কহা যায়, তাহারা ভক্ততত্ত্বজ্ঞানি মহাশয় সকল হইতেও এইসকল কর্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না, অধিকন্তু তাহারা রাজপথের মধ্যে কতপ্রকার হাস্যকৌতুক নৃত্যগীত অঙ্গভঙ্গ রঙ্গরস করে।'

—ব্যঙ্গরসসমন্বিত এ ভাষা নিঃসন্দেহে সাহিত্যগুণোপেত, এর উপভোগ্যতা অবশ্যস্বীকার্য। যুক্তিবাদী রামমোহনের তর্কবিচারমূলক স্থির গম্ভীর রচনায় এহেন সরসতা কদাচিৎ চোখে পড়ে। ভাষার গুণে কাশীনাথের রচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংস্কারপন্থী রামমোহন রায়ের অপর একজন প্রবল বিরুদ্ধবাদী গদ্যলেখক স্বনামখ্যাত **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** [১৭৮৭-১৮৪৮]। অথচ এই ভবানীচরণ

একদা রামমোহনের সাংস্কৃতিক কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহী সহযোগী ছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা বেশিদিন অক্ষুণ্ণ রইল না—ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার-বিষয়ে দুজনার মতভেদ ঘটলো। ভবানীচরণ রামমোহন থেকে দূরে সরে এলেন। ধর্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহন বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন, প্রগতিবাদী তিনি। আর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, সংস্কারবিরোধী। রামমোহন রায় সতীদাহ-নিবারক ; ভবানীচরণ সতীদাহ-সমর্থক— সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বতোভাবে অক্ষত রাখার প্রয়াসী। এরূপ অবস্থায় দুজনের একযোগে কাজ করা অসম্ভব। কালক্রমে একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজের নেতা হলেন ভবানীচরণ। রামমোহন রায়ের পোষকতায় প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্পাদনার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি 'সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন [১৮২২]। এই পত্রিকাখানি আক্রমণ চালিয়েছে একদিকে রামমোহনের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে, 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিরুদ্ধে। এঁরা তখন প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের কাছে ভয়ের কারণ। 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠাতাও ভবানীচরণ। এটি তৎকালীন হিন্দুরক্ষণশীলদেরই প্রতিষ্ঠান।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অসাধারণ কর্মীপুরুষ, এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তিও বটেন। গীতা, ভাগবত, মনুসংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুপ্রকট। তবে ভবানীচরণের খ্যাতি স্বকৃত গদ্যবাহিত রচনার জন্যে। ফোর্ট উইলিয়ম-পর্ব ও রামমোহনী পর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এবং রামমোহন রায়ের পর তাঁর নামটিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। তখন শাস্ত্রীয় বিচারের তুমুল ঝড় বইছে, সমাজসংস্কার নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়টি মতখণ্ডন ও মতামত প্রতিষ্ঠারই কাল। এহেন পরিবেশে যথার্থ সাহিত্য নির্মিত হতে পারে না, সাহিত্যশিল্প ধ্যানভিত্তিক। এই তর্কবিতর্কের দিনে ভবানী-চরণের কলম থেকে যে-লেখা বেরুলো তা কিন্তু যুক্তিধর্মী বিতণ্ডামূলক নয়। সেদিনকার নীরস বাঙ্‌লা গদ্যে তিনি রসসঞ্চার করলেন—তাঁর রচনা ব্যঙ্গরসের স্বাদযুক্ত। বিদ্রূপাত্মক গদ্যনির্মাণে তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এ জাতের রসসিক্ত রচনা ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি। তাই, অচিরকালমধ্যে বিশিষ্ট একজন গদ্যলেখক-হিসেবে ভবানীচরণ প্রতিষ্ঠা পেলেন। তাঁকে বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যে ব্যঙ্গপ্রধান রচনার প্রথম শিল্পী বলা যেতে পারে। দেখতে পাচ্ছি, বাঙ্‌লা গদ্যভাষা ধীরে ধীরে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের বাহন হয়ে উঠছে। স্মরণ করতে হবে, বিদ্যাসাগর তখনো সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। ভবানীচরণ প্রাক-বিদ্যাসাগর-যুগের

স্মরণীয় গদ্যনির্মাতা। তাঁকে সাহিত্যসেবী বলতে দ্বিধাবোধের কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো :

[১] **কলিকাতা কমলালয়**—প্রকাশকাল ১৮২৩, [২] **নববাবুবিলাস**—প্রকাশকাল ১৮২৫, [৩] **নববিবিবিলাস**—প্রকাশকাল ১৮৩১। লেখক ভবানীচরণ ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন—প্রমথনাথ শর্মা ['নববাবুবিলাস'] ও ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ['নববিবিবিলাস']। 'কলিকাতা কমলালয়' প্রশ্নোত্তরের ঢঙে লিখিত। এই গ্রন্থে সেকালের কলিকাতার বিচিত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। বহু মূল্যবান তথ্য এতে মেলে। গ্রন্থখানি কিন্তু ব্যঙ্গপ্রধান নয়। ভবানীচরণ সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছেন 'নববাবুবিলাস' নামাঙ্কিত বইখানি লিখে। পুস্তকটিতে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের কলকাতার 'বাবু'-সমাজের নিন্দার্হ আচার-আচরণ ও নীতিভ্রষ্টতার প্রতি তিক্ত বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। 'নববিবিবিলাস'-এও তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ লক্ষিত হয়। এ পুস্তকে এমন বর্ণনা রয়েছে, একালের রুচিসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন। অধুনা এ জাতের রচনা, বলতে গেলে, একরূপ অপাঠ্য। তখনকার দিনের হাস্যরস ছিল একান্ত স্থূল। মার্জিত রুচির প্রতিফলন ওতে নেই। ভবানীচরণের ব্যঙ্গবিদ্রূপ এই ঐতিহ্যবাহী। উন্নত জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা তখনো হয়নি। সে যা হোক, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিপিচাতুর্য প্রশংসা পাবার মতো। ভালো বাঙ্‌লা গদ্য তিনি লিখতে পারতেন এ স্বীকার করতেই হবে।

একটি কথা। কেউ কেউ ভবানীচরণের রচনায়, বিশেষে তাঁর 'নববাবু-বিলাস'-এ, আধুনিক বাঙ্‌লা উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এরকমের কিছু আমাদের চোখে পড়েনি। ভবানীচরণ নিজের লেখা বইগুলোতে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন, চরিত্রনির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেননি। প্রহসন-জাতের রচনায় উপন্যাসের সূচনার সন্ধান করতে যাওয়াটা ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঙ্‌লা সাহিত্যসংসারে সর্বজনপরিচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'-ই, আমাদের মতে, উপন্যাস-জাতীয় প্রথম রচনা। একে যথার্থ উপন্যাসের ভ্রূণাবস্থা বলা যেতে পারে।

ভবানীচরণের প্রযুক্ত গদ্যের সামান্য নমুনা :

॥১॥ 'অমাত্যবর্গরা কহিলেন, বাবুরদিগের···বাঙ্‌লা লেখাপড়া একপ্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ-বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সম্প্রতি এই

অবধি পারশি পড়াইলে ভাল হয়। কর্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গালা এক বেলা পারশি পড়াইলে ভাল হয় অমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোশামোদের কথা কহিতে লাগিলেন।'

॥২॥ 'যদ্যপি নববাবুবিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে কিন্তু সে গ্রন্থের ফল-খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই। এ নিমিত্তে তা প্রকাশে, প্রয়াসপূর্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।'

এই ব্যঙ্গাত্মক রচনার সরসতা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। তবে এর লক্ষণীয় ত্রুটি হলো বিরামচিহ্নের স্বল্পতা। বাঙ্‌লা গদ্যরচনার এই অভাবটি ঘোচালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামমোহনের আরো দুজন প্রতিপক্ষের নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে— **গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য** ও **গৌরমোহন বিদ্যালংকার**। রামমোহন বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হলে গৌরীকান্ত এর বিরুদ্ধে যান, এবং স্বকৃত একটি পুস্তকের মাধ্যমে নিজের মত প্রচার করেন। তাঁর লেখা যদিও কিছুটা সরস, রামমোহনের রচনার ন্যায় যুক্তিনিষ্ঠ নয়। ভাষার সহজ গতিও এতে অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে রামমোহন-বিরোধী গৌরমোহন বিদ্যাংলকার পাঠকের প্রশংসা দাবি করতে পারেন। সাবলীল গদ্য লিখতে পারতেন তিনি। তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থখানি [১৮২২] উল্লেখযোগ্য। মতবাদে প্রাচীনের অনুসারী হলেও এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তনের ব্যাপারে তিনি আশ্চর্য উদারতার পরিচয় দয়েছেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার যৌক্তিকতা গৌরমোহন নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নারীশিক্ষাবিষয়ে তাঁর ভাবনার এই আন্তরিকতা তাঁর লেখায় প্রতিফলিত। গৌরমোহন বিদ্যালংকার প্রাণবন্ত গদ্যের লেখক এ বলতে কোনো বাধা দেখি না।

[৬]

॥ বাঙ্‌লা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ॥

< সূচনা-পর্ব ঃ ১৮১৮-১৮৩১ >

বাঙ্‌লা গদ্যের বিবর্তনধারার সঠিক পরিচয় জানতে হলে বাঙ্‌লা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা উল্টোতে হবে। উনিশের শতকের নামকরা বহু বাঙালি লেখক সাময়িকপত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক জীবন গড়ে উঠেছে প্রধানত এসকল পত্র-পত্রিকা আশ্রয় করে। এইসব কারণে সেকালের পত্র-পত্রিকার কথা স্মরণ করতেই হয়। প্রত্যেকটি যুগ আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ করে এজাতের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সেদিনকার বাঙালি জাতিও তাই করেছে।

আমরা সাময়িকপত্রের প্রকাশন-ব্যাপারে সচেতন হলাম ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে। এদেশে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি সংবাদপত্র—ইংরেজেরই সম্পাদনায়। হিকি-র সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট' ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। প্রকাশকাল—১৭৮০। এর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে আরো কতকগুলি সংবাদপত্র ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়, যেমন—'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা', ইত্যাদি। ইংরেজি পত্রিকা বলে এগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

বাঙ্‌লা সাময়িকপত্রের অগ্রদূত হলো **'দিগ্‌দর্শন'**, ১৮১৮ সালের এপ্রিলে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত। এও ইংরেজ মিশনারিদের বড়ো একটি কীর্তি। এখানে স্মর্তব্য, এঁরাই এদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন, সেই ১৮০০ সালে। 'দিগ্‌দর্শন' একখানি মাসিক পত্রিকা। তরুণদের উদ্দেশে 'নানা উপদেশ' এতে, প্রচারিত হতো। বহু-তথ্য-সংবলিত ছিল এই পত্রিকা। তৎকালীন ইংরেজ-সরকার সংবাদপত্রকে তেমন সুনজরে দেখতেন না। তবে ওপরে-কথিত পত্রিকাখানার প্রতি তাঁরা বিরূপতার ভাব দেখাননি। কিঞ্চিদধিক দু-বৎসর কাল এ পত্রিকা চলেছিল।

বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে **'সমাচার-দর্পণ'**—প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের মে মাসে। এরও প্রকাশক শ্রীরামপুর মিশনের ইংরেজ পাদ্রিরা। তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক জন

ক্লার্ক মার্শম্যান। এই ইংরেজ সম্পাদকের লেখা এ পত্রিকার কলেবর কতখানি পূর্ণ করতো সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে অনায়াসে অনুমান করা যায়, 'সমাচার দর্পণ'-এর সংবাদ রচনায় বাঙালি পণ্ডিতদের হাত ছিল। এঁদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালংকারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে নানান্ তথ্য পরিবেশন করা হতো, বিচিত্র-বিষয়ক চিত্তগ্রাহী বর্ণনা বা উপাখ্যান স্থান পেতো। এই কাগজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা লিখতেন বলে এতে প্রকাশিত রচনার ভাষা সংস্কৃতগন্ধীই হবে এ তো স্বাভাবিক। তবে প্রত্যেকটি লেখায় সংস্কৃতের আড়ম্বর দেখা যেত এমন নয়। কোনো কোনো রচনার সারল্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। কাগজটি মিশনারি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রিত। তা বলে মোটেই 'খ্রিস্টানী কাণ্ড' কিছু নয়। খ্রিস্টধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকলেও মিশনারিরা মাত্রাজ্ঞান কখনো হারাননি। তবে খ্রিস্টান মতবাদের প্রতি দুর্বলতা তাঁদের ছিল। থাকাটা অস্বাভাবিক কী? সে যা হোক, 'সমাচার দর্পণ'-এর গুরুত্ব ও মূল্যের আত্যন্তিকতা স্বীকার করতেই হবে। বাঙালি সমাজ ও বাঙ্‌লা সাহিত্য এর দ্বারা যে অনেকখানি উপকৃত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদিত **'বাঙ্গাল গেজেটি'** নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি 'সমাচার দর্পণ'-এর কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। হতেও পারে। কিন্তু উক্ত পত্রিকার কোনো সংখ্যা অদ্যাপি পাওয়া যায়নি। আর, এ পত্রিকা স্থায়ীও হয়নি। 'সমাচার দর্পণ' দীর্ঘকাল ধরে চলে, তার আয়ুষ্কাল ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ সাল।

অতঃপর **'সম্বাদ কৌমুদী'** পত্রের আবির্ভাব—১৮২১-এর ডিসেম্বর মাসে। এর পৃষ্ঠাপোষকতা করেন রামমোহন রায়। প্রকাশক—তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সাপ্তাহিক পত্রে রামমোহন সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে যখন লিখতে শুরু করলেন তখন ভবানীচরণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিলেন। এরূপ অবস্থায় রামমোহনকে কাগজখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো।

'সম্বাদ কৌমুদী' রামমোহন-পক্ষীয় সাময়িক পত্র, বাঙালির চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি তুমুল বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, হিন্দুসমাজ অন্ধ-আচারনিষ্ঠা ও মূঢ় সংস্কারবন্ধন কাটিয়ে উঠুক, পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে স্নাত হোক। যুক্তিহীন ধর্মের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারলে হিন্দুজাতি নবজীবনের কূলে উত্তীর্ণ হবে এ ছিল প্রগতিবাদী রামমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের প্রেরণাবশে তিনি সাময়িক পত্র প্রকাশ করতে চাইলেন। ফলে 'সম্বাদ কৌমুদী'-র জন্ম।

পত্রিকাখানি প্রকাশের বড়ো একটি কারণ সে-যুগের ধর্ম-সংঘাত। প্রসিদ্ধ গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন : "সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশের আর-একটি উদ্দেশ্য ছিল। পরধর্মের হীনতা প্রমাণ করা বা খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার 'সমাচার দর্পণ'-এর [ইংরেজ পাদ্‌রিদের প্রকাশিত পূর্বোক্ত বিখ্যাত পত্রিকা] উদ্দেশ্য না হইলেও প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি 'প্রেরিত পত্র' প্রকাশিত হয় যাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ, প্রভৃতি ছিল। এই কারণে হিন্দুরা একখানি বাঙ্‌লা সমাচার পত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় কলুটোলানিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এই মর্মে লেখা হইল— 'লোকহিতসাধনই এই সংবাদ প্রচারের প্রধান লক্ষ্য…দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।" প্রগতিকামীরা সমাজসংস্কারের কাজে হাত না দিয়ে পারেন না। সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠী কিন্তু যে-কোনো সংস্কারসাধনকর্মের তীব্র বিরোধী। সমাজবিপ্লবী রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী'-র পাতায় সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করাতে এই পত্র হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন হারালো। ফলে পত্রিকাখানিকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলো না।

রক্ষণশীল হিন্দুরা রামমোহনের সতীদাহবিরোধী মতবাদ বরদাস্ত করতে পারলেন না। রামমোহন রায়ের বৈপ্লবিক মতবাদের বিরোধিতাকল্পে তাঁরা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বার করলেন ১৮২২ সালের মার্চ মাসে, নাম— 'সমাচার চন্দ্রিকা'। এর সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হলো 'সম্বাদ কৌমুদী'-র একদা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। রামমোহন-বিপক্ষীয় এই পত্রিকাখানি 'সম্বাদ কৌমুদী'-র সঙ্গে প্রবল মসিযুদ্ধ চালাতে থাকে। সেকালের শক্তিশালী লেখক ভবানীচরণ তখন গোঁড়া হিন্দুসমাজের নেতার পদে অধিষ্ঠিত। প্রাচীনপন্থী হিন্দুর মতবাদকে তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র পৃষ্ঠায় তুলে ধরেন। একারণে এর প্রচার অল্পকালমধ্যেই বেশ বেড়ে যায়। কেবল রামমোহনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে ভবানীচরণ ক্ষান্ত থাকেননি, বিদ্রোহী 'ইয়ং বেঙ্গল'-ও তাঁর আক্রমণের বস্তু হয়েছে। রামমোহন রায় আর ডিরোজিও-র ভাবশিষ্যের দল সেদিনকার রক্ষণশীল হিন্দুর কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এর পর উল্লেখ্য নাম হলো 'বঙ্গদূত'-এর। এর সম্পাদক ছিলেন নীলরতন

হালদার। এটি রামমোহন রায় ও দ্বারকানথ ঠাকুরের উদ্‌যোগে প্রকাশিত হয়—১৮২৯-এ। এ ছিল সংস্কারকামীদের মতবাদের একটি বাহন। প্রগতির বাণী প্রচার করেছে।

সেকালের বাঙ্‌লা সাহিত্যের সঙ্গে যে-সাময়িক পত্রখানির নাম সমধিক জড়িত সে হলো '**সংবাদ-প্রভাকর**'। সম্পাদক—স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশকাল: ২৮-এ জানুয়ারী, ১৮৩১ সাল। প্রথমে এ সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়, পরে দৈনিক পত্রিকার রূপ নেয়, এবং সর্বশেষে মাসিকপত্রের। বাঙ্‌লা দেশে এ-ই প্রথম দৈনিকপত্র। তখন শিক্ষা সমাজ ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্দোলন চলছে। এহেন বিক্ষুব্ধ যুগসন্ধির কালে সংবাদপ্রভাকর-এর ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন গুপ্তকবি। স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত। 'প্রভাকর'-এর স্মরণীয় একটি ঘটনা—নবীন কবি ঈশ্বর গুপ্ত কয়েকজন নবীন বাঙালি লেখককে আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এঁদের দানে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। সাহিত্যানুশীলের ও 'কলেজায় কবিতাযুদ্ধ'-এর নামকরা আসর ছিল গুপ্তকবির সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'। এই পত্রে ঈশ্বর গুপ্ত যমক-অনুপ্রাসবহুল অলংকৃত এক গদ্যরীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর গদ্যশিষ্যরা [illegible]-এর অনুগামী। কলেজের ছাত্র তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায় ঈশ্বর গুপ্তের [illegible]তির প্রভাব সহজে লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত-কবির গদ্য, বলতে বাধা নেই, গদ্যসাহিত্যের গদ্য নয়। এতে প্রাঞ্জলতার অভাব, এ গদ্য অলংকারের গুরুভারে আড়ষ্ট তথা কৃত্রিম। 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। পত্রিকাখানির প্রকাশের ব্যাপারে আরো কয়েকজন ব্যক্তি সহায়ক ছিলেন। তাঁরা সকলেই পণ্ডিত ব্যক্তি, যেমন—জয়গোপাল তর্কালংকার, সংস্কৃত কলেজের অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, প্রভৃতি। 'প্রভাকর' সে-যুগের একখানি উচ্চশ্রেণীর সাময়িকপত্র বলে স্বীকৃত। বিভিন্ন দেশের নানা সংবাদ এতে ছাপা হতো। এছাড়া, ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। ঈশ্বর-গুপ্তের সংগৃহীত প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনী ও কবিতা এই কাগজেই মুদ্রিত হতে থাকে। এই যুগের বিভিন্ন মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই 'প্রভাকর'-এ লিখতেন। 'তত্ত্ববোধিনী'-র আবির্ভাবের পূর্বাবধি যতগুলি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর স্থান সর্বোচ্চে বললে অতিশয়োক্তি করা হয় না।

এই পর্বের আরেকখানি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য—**'ব্রাহ্মণসেবধি'** বা **'ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি-সম্বাদ'**। ধর্মকলহের তাগিদে এর উদ্ভব। ১৮২১ সালের **'সমাচার দর্পণ'**-এর কোনা এক সংখ্যায় একটি পত্রে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়। এই পত্রের প্রতিবাদ-স্বরূপ রামমোহন রায় ['শিবপ্রসাদ শর্মা'—ছদ্মনামে] একখানি চিঠি পাঠান। উক্ত পত্রিকায় সেই চিঠি ছাপা হলো না। তখন রামমোহন 'ব্রাহ্মণসেবধি' নামে পত্রিকাখানি [মাসিক] প্রকাশ করলেন। এর এক পৃষ্ঠায় বাঙ্‌লা এবং অপর পৃষ্ঠায় ওই বাঙ্‌লায় লিখিত অংশের ইংরেজি অনুবাদ থাকতো। কাগজখানি একবৎসর চলেছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণমূলক লেখার প্রতিবাদ ছাড়া অন্যকিছুই এতে ছাপা হতো না।

এযুগে প্রকাশিত **'জ্ঞানান্বেষণ'**-এর নাম অবশ্য-স্মরণীয়। এটি **'ইয়ং বেঙ্গল'**-এর দান। এর সম্পাদকীয় ভার ছিল পরবর্তীকালের 'সংবাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদক, বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরীশংকর তর্কবাগীশ বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের ওপর। প্রকাশকাল—১৮৩১ সালের জুন। এই পত্রিকায় ধর্ম সম্পর্কিত দলাদলির স্থান ছিল না। 'ইয়ং বেঙ্গল'-গোষ্ঠীর নবীন উদার যুবকদের মতামত এতে ব্যক্ত হতো। এঁরা বাস্তবজীবনে দেশের পশ্চাদ্‌বর্তিতার কথা ভেবেছেন, রাজনীতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং দেশবাসীকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। পত্রিকার 'জ্ঞানান্বেষণ' নামটি লক্ষ্য করবার মতো। বুঝতে পারি, ধর্মসংঘাতের উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে আসছে। বিবিধ জ্ঞানবিদ্যার প্রতি দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। সমাজে ও সাহিত্যে নবযুগের অভ্যুদয়ের পথে উৎসাহী পথিক 'ইয়ং বেঙ্গল'-দলের এই নবীনরা। আমরা মনে রাখবো, ইতঃপূর্বে রামমোহন রায় রেনেসাঁসের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। প্রথমে রামমোহন, পরে ডিরোজিওপন্থীরা, সে-যুগে বাঙালির ভাবজীবনে বিপ্লব এনেছিলেন।

প্রথম পর্বের সাময়িকপত্র বাঙালি সমাজে কী দান রেখে গেছে, এরূপ একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায়—জ্ঞানের বিস্তারসাধন, সমাজচেতনার উদ্বোধন ও ভাষাগঠন। এসব সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যাপকই বলতে হবে। এগুলির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার লোকসাধারণের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। এভাবে নতুন যুগে নতুন শিক্ষার আলোক পেয়ে দেশের মানুষ ক্রমশ সমাজসচেতন হয়ে উঠেছে। সমাজসংস্কার ও জ্ঞানের বিস্তারের প্রয়োজনে সে-সময়ে পত্র-পত্রিকার অনেক

লেখক হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন। আরো বড়ো কথা, বাঙ্‌লা গদ্য ভালো করে চলতে শিখেছে সংবাদপত্রের পাতায় আশ্রয় নিয়ে। এর আশ্রয় না পেলে বিভিন্নমুখী বাঙ্‌লা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ এতখানি ত্বরান্বিত হতো কিনা, সন্দেহ। এও দেখতে হবে, সংবাদপত্র কেবল সংবাদই পরিবেশন করে নি—একদিকে শিক্ষামূলক নানা তথ্য জুগিয়েছে, অন্যদিকে, পাঠকমণ্ডলীকে আনন্দের খোরাকেরও জোগান দিয়েছে। এর ফলে সরস রচনার উদ্ভব। এ না হলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম কি সম্ভব হতো! সাহিত্যানুশীলনের যুগ অবশ্য এটা নয়। কিন্তু এই পত্রিকাগুলি সাহিত্যনির্মাণের ক্ষেত্রটি কিছুটা প্রস্তুত করে দিয়েছে। এসব কথা মনে রাখলে, প্রথম যুগের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের দান কী, তা বুঝে নিতে পারা যাবে।

[৭]

॥ সন্ধিপর্বের কবিকর্ম ॥

পুরাতনের অনুবর্তন ও কাব্যভাবনায় নতুনের পদসঞ্চার

—কবিগীতি, পাঁচালি, টপ্পা ও যাত্রা—

কবিগান :

বাঙ্‌লা গানের দেশ। বাঙালি-মানসের গীতিপ্রবণতা সকলেরই জানা কথা। বাঙালির হৃদয়ানুভব সবচেয়ে ভালো ফোটে গানের ভাষায়। রবীন্দ্র-কবি প্রায়শ বলতেন, তাঁর অপরবিধ রচনার কথা ছেড়ে দিলেও, স্বকৃত গীতিনিচয় দীর্ঘকাল তাঁকে লোকস্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখবে। গোটা বাঙ্‌লাদেশ বৃহদায়তন একটি গানের আসর যেন—বহু কণ্ঠের গীতময় ছন্দিত বাণীতে সর্বদা মুখর। কত বিচিত্র রীতির গান এদেশে উদ্ভূত হয়েছে, যেমন—কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, শ্যামাসংগীত, সারি গান, জারি গান, গাজির গান, টপ্পা প্রভৃতি।

এসকল সংগীত ছাড়া, আরেক ধরণের গান আঠারোর শতকে সারা বাঙ্‌লা জুড়ে নিজ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এক শতাব্দী ধরে আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল; এর নাম—কবিগান। যাঁরা কবিগান গাইতেন তাঁদের 'কবিওয়ালা' বলা হতো। ভাব এই যে, এরা যথার্থ মৌলিক

কবি নন, কবি-ব্যবসায়ী। প্রথমত, এঁরা পূর্ব পূর্ব পদাবলী বা শাক্ত-গীতির কবিদের রচনার অনুকরণ বা অনুসরণ করে কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'তাঁহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাঁহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া, অত্যন্ত লঘুসুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিজোড়া কাঁসি-সহযোগে সদলে সবলে চিৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।' দ্বিতীয়ত, এঁরা 'কবি' গেয়ে দুপয়সা উপার্জন করতেন। তবে এঁদের একটা শক্তির দিক এই ছিল যে, সভাস্থলে এঁরা মুখে মুখেই কবিতা রচনা করতে বা গান বাঁধতে পারতেন। আর, এঁদের সম্বল ছিল শব্দচাতুর্য, যার দ্বারা অনায়াসেই তৎকালীন শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন। বস্তুতপক্ষে, উচ্চতর কবিপ্রতিভার অধিকারী এঁরা কেউ ছিলেন না। ঐতিহাসিক কারণে কবিওয়ালাদের নাম করতে হয়। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের কালাবধি [১৮৩১-এ সাহিত্যসংসারে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব] এই যে কতিপয় বৎসর এসময়ে উত্তম কবিকর্মের তেমন সাক্ষাৎ মেলে না—কবিগান, পাঁচালি, হাপ্‌-আখড়াই, খেউড় প্রভৃতি গানের লেখকরা বাঙ্‌লা কাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের জীর্ণ স্মৃতি রোমন্থন করে চলছিলেন। নতুন কবিকণ্ঠ কিছুটা শোনা গেলো নিধুবাবুর টপ্পা-জাতের রচনায়। ভাষাগত বিচারে নিধুবাবুও [রামনিধি গুপ্ত] পুরাতনপন্থী গীতিকার। এঁরাই একাল ও সেকালের মধ্যে পারাপারের সেতুস্বরূপ। এঁদের স্মরণ না করলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না। ইংরেজ-আমলে নাগরিক পরিবেশে বাঙ্‌লা কাব্য কী ভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল তা কৌতূহল সহকারে লক্ষ্য করার মতো জিনিস।

'কবিগান' তখনকার সমাজের একটি বিশেষ সৃষ্টি। তখন উত্তম কবির আবির্ভাবের যুগ কেটে গেছে। ভারতচন্দ্র অস্তমিত হয়েছেন। সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনও লোকান্তরিত [১৭৭৫]। রাষ্ট্রে আর সমাজেও একটা অনিশ্চয়তা বা শৃঙ্খলাহীনতা ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোম্পানির প্রসাদপুষ্ট শহরঅঞ্চলের কতিপয় ব্যক্তি অথবা পল্লীঅঞ্চলের ভূম্যধিকারিগণ সমাজের নেতা হয়েছেন। শহরে বাবু-বেনিয়ানের আসর বসে গেছে—প্রকাণ্ড মজলিশি আসর। রুচি এঁদের বিকৃত। প্রকৃত কাব্যরসের পিপাসা এঁদের কারুরই জাগেনি। এঁরাই কবি-ওয়ালাদের উৎসাহদাতা হয়েছিলেন। কবিওয়ালাদের কেউ কেউ স্বাভাবিক কবিত্বসম্পন্ন হলেও তাঁদের কবিত্বপ্রকাশের অনুকূল আবহ তখন ছিল না। বিশেষত, 'কবির লড়াই' বা দুইদল কবির মধ্যে হারজিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে-সময়ে এরূপ

ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে, ভালো-কিছু রচনা করার প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়েছিল। দুই দলে লড়াই করতে গিয়ে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হতে বাহবা এবং পুরস্কার এবং পুনরাগমনের বায়না লওয়ার দিকেই এঁদের ঝোঁক থাকতো বেশি। আর, সেইরূপ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন এঁদের করতে হতো যাঁরা সাহিত্য অপেক্ষা শব্দচাতুর্য, রসরুচি অপেক্ষা কুরুচি ও স্থূল আদিরসকেই মর্যাদা দিত বেশি। কবিওয়ালা প্রভৃতির রচনা কেন উচ্চশ্রেণীর শিল্পের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি তার কারণ নির্দেশ করতে বসে রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই-হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিকসম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

এই মন্তব্যের যাথার্থ্য সংশয়াতীত। অমার্জিত রুচির 'সর্বসাধারণ' যে-কবি-সম্প্রদায়ের আশ্রয়দাতা, সমসাময়িক জনমণ্ডলীর তুষ্টির ওপর যাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের রচনা অপরিণত হতে বাধ্য। এঁরা কবিতার বহিরঙ্গের কিছুটা চর্চা করেছেন, সুলভ চাতুর্য ও সাধারণের মনোরঞ্জনের কৌশল মোটামুটি শিখেছেন; কিন্তু ধ্যানের গভীরে ডুব দিতে পারেন নি। তাছাড়া, উঁচুদরের সাহিত্যিক প্রতিভা এঁদের কারুরই ছিল না। সেদিনকার সমাজের বিশেষ একটি অবস্থায় কবিওয়ালাদের উদ্ভব—ক্ষণকালীন উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে এঁরা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির হাওয়া বইলে এবং ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার হলে, এবং বিশেষত প্রতিভাধর কবি মধুসূদন দত্ত অভিনব কাব্যের পত্তন করলে, ক্রমশ কবিগানরচয়িতাদের সমাদর কমে যায়। সাম্প্রতিক কালে কবির দল প্রায়-লুপ্ত, কেবল পল্লীঅঞ্চলে কেউ কেউ আজো এ দের ধারা রক্ষা করে আমাদের সেই অতীত সাহিত্যিক অধ্যায়টির যৎসামান্য প্রত্যক্ষ পরিচয় বহন করছেন।

কবিগানের তিনটি যুগবিভাগ—গঠনযুগ, ঐশ্বর্যযুগ, এবং অন্ত্যযুগ। ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে ১৭৬০ ইংরেজি সাল থেকে ১৮৩০ ইংরেজি সাল হলো এই শ্রেণীর গীতি-রচনার ঐশ্বর্য-যুগ। ডক্টর দে গোঁজলা গুঁইকে আদি-

কবিওয়ালা বলেছেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমের দিকের লোক ইনি। তারপর, গুরুশিষ্য-পর্যায়ক্রমে কবিওয়ালাদের নামের তালিকা দীর্ঘ। গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য—রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল, রামজী। এই তিনজনের শিষ্য রাসু, নৃসিংহ, হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বণিক। হরুঠাকুরের শিষ্য নীলু ও রামপ্রসাদ ঠাকুর আর ভোলা ময়রা ; নিতাই বৈরাগীর শিষ্য রামানন্দ নন্দী ; ভবানী বণিকের শিষ্য রাম বসু। উক্ত রাসু-নৃসিংহ থেকে আরম্ভ করে রাম বসু পর্যন্ত কবিগানের লেখকরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এঁদের পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, ঠাকুর সিংহ প্রমুখ কবিওয়ালারা। সেকালে এঁদের গান শুনবার জন্যে দূরদূরান্তর থেকে লোক ছুটে আসতো।

প্রথম যুগের কবিগানের সঙ্গে পরবর্তী যুগের কবিগানের কথঞ্চিৎ পার্থক্য রয়েছে। প্রথম যুগে কবিগীতের বিষয় ছিল ধর্মসংক্রান্ত—রাধাকৃষ্ণের কাহিনী এর মূল-আশ্রয়-স্বরূপ, বলা যেতে পারে। পরে পরে এ জাতের গানে বিষয়বৈচিত্র্য দেখা গেলো। নামকরা কবি-গীতিনির্মাতাদের মধ্যে কয়েকজন বিরহ, সখীসংবাদ, ইত্যাদি ছাড়া, আগমনী ও ভবানী-বিষয়ক গান লিখেছেন, লহর আর খেউড়-ও রচনা করেছেন। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, প্রথমের দিককার কবিওয়ালারা দু-দলে আলোচনা করে গান বাঁধতেন, সেখানে পূর্ব-কল্পনায় অবকাশ ছিল। কিন্তু উত্তরবর্তীকালে এ প্রথা আর রইলো না—আসরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত-বুদ্ধির আশ্রয়ে দুই পক্ষের [পক্ষ-প্রতিপক্ষ] গানে উত্তর দেওয়াই নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো। এ এক-প্রকার ছন্দোবদ্ধ বাক্‌যুদ্ধ,—শ্লীল-অশ্লীলের বাদবিচার নেই—শহুরে মানুষের আমোদ উপভোগের সুলভ একটি উৎস। তখন কাবগান রূপ নিল 'কবির লড়াই'-এর ; ফলে এতে দেখা দিল কৃত্রিমতা, ভাষায় প্রকাশ পেল নির্লজ্জ ইতরতা—কৃষ্ণলীলার পরিণতি খেউড়-খিস্তিতে। তদানীন্তন সামাজিকের দুষ্ট রুচি এর জন্যে যে অনেকটা দায়ী, সে-কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কবিগানের সবটা ছাপার অক্ষরে পাঠকের সমক্ষে তুলে ধরার অযোগ্য।

কবিগানকে গীতরূপেই দেখা সমীচীন, ঠিক কবিতা এ নয়। এখানে আঙ্গিক-গঠনে গানের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। সংগীতের তাগিদেই এই জাতের রচনাগুলির বিভাগ নির্দেশিত। নির্দেশিত বিভাগের পর্যায়ক্রমে নাম হলো—চিতান, পরচিতান, প্রথম ফুকা, প্রথম মেল্‌তা, মহড়া, সওয়ারি, খাদ ; দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় মেল্‌তা এবং অন্তরা। ডক্টর সুশীলকুমার দে কবিসংগীতের বিশদ

আলোচনা করেছেন। মূল্যবান এই আলোচনা। কবিওয়ালারা বৈষ্ণবপদকারদের প্রযুক্ত ছন্দ বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, এর প্রয়োগে দক্ষতাও দেখিয়েছেন। তবে এও লক্ষ্য করতে হবে, কবিসংগীতের কোনো কোনো লেখক ছন্দোনির্মাণের ক্ষেত্রে অমার্জনীয় অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের হাতে সংগীতের কাব্যকলা অবিশ্বাস্য রকমে লাঞ্ছিত। যত্নকৃত ছন্দোবদ্ধ রচনার বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ উপেক্ষাপরায়ণ। মহৎ কাব্য কাকে বলে, কবিগানের লেখকদল তা জানতেন না। কবিওয়ালাদের কোনো কোনো কাব্যাংশের অনুপ্রাসবাহুল্য রীতিমতো হাস্যোদ্দীপক, আর্টের সংযমের সঙ্গে এতটুকু পরিচয় তাঁদের ছিল না। একালের মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন পাঠকগোষ্ঠী কবিগানের প্রদেশটিতে ঢুকলে প্রতিমুহূর্তে অস্বাচ্ছন্দ্যই অনুভব করবেন। যুগোত্তীর্ণ রচনার লক্ষণ কবিগানে অনুপস্থিত।

তবে কবিগান সম্পর্কে কয়েকটি প্রশংসার কথা বলা যেতে পারে। এসব গানে ভাবের গভীরতা কিংবা উত্তম কাব্যকলার স্পর্শ না থাকলেও কবিওয়ালারা লোকসাধারণের ধ্যানধারণাকে চলিত ভাষায়, সহজ কথায়, ছন্দে গ্রথিত করেছেন বলে কবিগীত সর্বস্তরের জনসমাজের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিল। এ গানের লোকরঞ্জনক্ষমতা অবশ্যস্বীকার্য। কবিগীতের লেখকসম্প্রদায় কবিতার আভিজাত্যের ধার ধারতেন না। একারণে তাঁরা সাধারণ পাঠকশ্রেণীর একেবারে কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—লেখক ও শ্রোতার মধ্যে কোনোরূপ দূরত্ব ছিল না বললেই চলে। লেখকে-শ্রোতায় কিংবা লেখকে-পাঠকে এই সহজ আত্মীয়তার ভাবটি কিন্তু ইদানীন্তনকালে আর দেখতে পাওয়া যায় না। শিষ্টরুচির অভিজাত কবিরা পাঠকগোষ্ঠী থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। কবিতাগান এখন আয়াসসাধ্য অনুশীলনের বস্তু হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবিতার পাঠক বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ। রীতিমতো চর্চা না থাকলে অধুনা-সৃষ্ট কাব্যকবিতার রসাস্বাদন অসম্ভব একটি ব্যাপার। যুগধর্মের প্রভাবে সামাজিকের রুচি পরিবর্তিত হয়েছে, কবিতার আকৃতি-প্রকৃতিও বিলক্ষণ বদলে গেছে। কবিগান এখন অতীতের একটি সামগ্রী।

কবিওয়ালাদের মধ্যে কবিত্বে সর্বাপেক্ষা প্রশংসা অর্জন করেছিলেন **রামবসু** [১৭৮৬-১৮২৮]। এঁর বাস ছিল কলকাতার নিকটবর্তী সালকিয়া অঞ্চলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই রামবসুর সংগীতপ্রতিভার স্ফূর্তি হয়। তাঁর 'সখীসংবাদ' ও 'আগমনী গান' প্রসিদ্ধ। কবিওয়ালা রামবসু অনুপ্রাসের ভক্ত ছিলেন, তবু তাঁর কাব্যে সহজ অনুরাগের স্পর্শ মেলে। প্রথম বয়সে ইনি নীলু

ঠাকুর, ভবানী বেণে, মোহন সরকার প্রভৃতির দলে গান বাঁধতেন। এভাবে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে শেষে নিজে একটি দল সৃষ্টি করেন। তাঁর রচনায় বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। রামবসুর লেখা সবগুলি গানই যে ভালো এমন নয়; তবে যথার্থ ভালো গান তিনি কম লেখেননি। সেগুলি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী, এবং সর্বজনের উপভোগ্য। এমন দুয়েকটি গানের খণ্ডিত নমুনা :

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না।
তোমারে ভালোবাসি, তাই, চোখের দেখা দেখতে চাই—
কিছুকাল থাক থাক বলে ধরে রাখব না।…

* *

ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী।…

* *

মনে রইলো সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হলো না—
সরমে মরমের কথা কওয়া গেলো না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে
নির্লজ্জ রমণী বলি হাসিত লোকে;
সখি, ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে
নারীজনম যেন করে না।

* *

তুমি যে কোয়েছো আমায়, গিরিরাজ, কতদিন কত কথা।
সে-কথা আছে শেল-সম হৃদয়ে গাঁথা।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্তিক, সোনার কার্তিক
ধুলায় পড়ে লুটাতো॥

এসকল রচনার প্রকাশরীতি অত্যন্ত সরল, প্রাণের কথার সহজতম অভিব্যক্তি। রামবসু খাঁটি কবিওয়ালাদের প্রতিনিধিস্থানীয়।

অপর একজন খ্যাতিমান কবিওয়ালা **হরু ঠাকুর** বা **হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী** [১৭৩৮-১৮১৩]। সিমুলিয়ায় এঁর জন্ম। ইনি শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের আশ্রিত ছিলেত। এঁর কবিতারচনের শিক্ষানবিশী চলে রঘুনাথ দাস নামে এক তন্তুবায়ের কাছে। হরু ঠাকুরের গানে স্নিগ্ধতা ও মিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। বিরহ-বর্ণনায় ইনি প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই হরু ঠাকুরের চেলা ছিলেন **ভোলা ময়রা**। চন্দননগরের মানুষ **নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী** [১৭৫৪-১৮২১] একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। এঁর লেখা কয়েকটি গান বেশ শ্রুতিসুখকর। নিতাই বৈরাগীর একটি গান শুনুন :

বঁধুর বাঁশি' বাজে বিপিনে।
শ্যামের বাঁশি বুঝি বাজে বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হৈল, সুধা বরষিল শ্রবণে ॥···ইত্যাদি

গোপাল উড়ে-র নিম্নোদ্ধৃত সংগীতটি মানবীয় আবেদনে চিত্তহারী। এখানে রুচির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। একসময়ে আসরে বসে এরকম গান সকলেই শুনতেন, এমন কি কুলনারীরা পর্যন্ত ; শুনে কেউ কানে হাত দিতেন না। এই উড়িয়া কবিটি গাইছেন :

কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখী।···
কমলেরি বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়,
তা বলে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায় ?
ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি।···ইত্যাদি

কবিওয়ালা-হিসেবে একদা খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন **আন্টুনি ফিরিঙ্গি**। আন্টুনি জাতিতে পর্তুগীজ ছিলেন। কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে মিশে তিনি হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব করতেন। এই আন্টুনি সাহেবের সঙ্গে বিপক্ষদলের লড়াই সম্পর্কে অনেক মজার কথা আছে। সাহেব হয়ে তিনি বাঙালি সাজলেন কেন, খ্রিস্টান হয়ে দুর্গার আরাধনা করেন কেন—এ হলো বিপক্ষদলের প্রধান আক্রমণের বিষয়। প্রতিপক্ষদলের ঠাকুরদাস সিংহ আন্টুনিকে প্রশ্ন করলেন :

বলহে, আন্টুনি, আমি একটি কথা জানতে চাই—
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।

তিনি এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিলেন ঠাকুরসিংহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্যালক প্রতিপন্ন করে :

এই বাঙ্‌লায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি-টুপি ছেড়েছি॥

রামবসু প্রতিপক্ষ হয়ে আণ্টুনিকে কটূক্তি করলেন :

সাহেব, মিথ্যা তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রি সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুনকালি॥

আণ্টুনি উত্তর দিলেন :

কৃষ্টে আর খ্রিস্টে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এমন কোথাও শুনি নাই॥

তারপর দুর্গাভক্ত আণ্টুনি দুর্গার স্তব গাইলেন :

যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না, মা, জেতেতে ফিরিঙ্গি।···
আণ্টুনি ফিরিঙ্গি বলে, নিদানকালে, মা,
দিও চরণ দুখানি, দিও চরণ দুখানি॥

বিপক্ষ কবিওয়ালা গালাগালি করে বললেন :

যিশুখ্রিস্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে।
তুই জাতফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গি পারবি নাক তরিতে॥

কবিগানের সামান্য পরিচয় দেওয়া হলো। বলেছি, খুব প্রশংসার কিছু এতে নেই। লোকরঞ্জনের জন্যে এগুলি রচিত—মুখে মুখে,—'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতির ন্যায় রাজসভার শ্রোতব্য সংগীত এ নয়। ঠিক 'লোকসাহিত্য' বলা না চললেও এগুলিকে মোটামুটি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেহেতু, এ জনসাধারণের উদ্দেশে রচিত গান। ক্রমে 'তর্‌জা' বলে এক নতুন রীতির সংগীত কবিগানের সঙ্গে মিশে যায়। আর, আখড়াই, হাফ্‌-আখড়াই, খেউড় [অশ্লীলতাপূর্ণ গীত] প্রভৃতিরও কিছু কিছু প্রসার হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকের ও উনবিংশ শতকের প্রথমদিকের সেই অনুর্বর কাব্যভূমিতে, অনুন্নত শ্রেণীর হলেও, কিছু গানের ফসল ফলিয়েছিলেন অশিক্ষিতপটুত্বের অধিকারী একদল কবি। এই ফসলকেই আমরা 'কবিগান' নামে চিহ্নিত করে থাকি।

পাঁচালি : অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে বাঙ্‌লাদেশে কবি, টপ্পা, আখড়াই, হাফ্‌-আখড়াই, ইত্যাদির মতো আরেক জাতের সংগীত প্রচলিত ছিল, নাম—'পাঁচালি'। পাঁচালির উদ্ভব কী করে হলো তা সঠিক বলা কঠিন। আচার্য

দীনেশচন্দ্রের মতে এই শ্রেণীর সংগীতের উৎপত্তিস্থান পাঞ্চাল বা কনৌজ। এরূপ অনুমানকে অনেকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না। ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেছেন, 'পদচালন' কথা থেকে 'পা-চালি', এবং এই 'পা-চালি' শব্দের রূপপরিবর্তনে 'পাঁচালি' কথার উদ্ভব হয়েছে। তিনি আরো অনুমান করেছেন, 'নাচাড়ী' থেকেই হয়তো 'পাঁচালি' কথাটি এসেছে। এও অনুমান, স্থির সিদ্ধান্ত কিছু নয়। নৃত্য-গীত এবং আবৃত্তি—এ নিয়েই পাঁচালি। যে-সময়ের কথা আমরা বলছি তখন একজন মূল গায়ক পায়ে নূপুর পরে, হাতে চামর নিয়ে, ছড়া কাটতেন এবং গান করতেন। তাঁর পদ্য-আবৃত্তির মধ্যে কিছুটা অভিনয়ের ঢঙ্ এসে যেতো। আদিতে পাঁচালির প্রিয়বস্তু ছিল পৌরাণিক কাহিনী—এতে ভক্তিরসের প্রাধান্য। আঠারোর শতকের শেষের দিকে পুরনো পাঁচালি যখন রূপান্তরিত হতে থাকে তখন আধুনিক কাহিনী অবলম্বনে পালা রচিত হতে লাগলো।

মনে রাখতে হবে, আগে রামায়ণ-মহাভারত, বিবিধ মঙ্গলকাব্য, সমস্তই পাঁচালির ঢঙে আসরে গান করা হতো, এবং এসমস্ত পদ্যরচনার নাম ছিল 'পাঁচালি', যেমন—'ভারত-পাঁচালি', 'রামায়ণ-পাঁচালি'। এ ছাড়া, 'শনির পাঁচালি', 'মনসার পাঁচালি', 'ষষ্ঠীর পাঁচালি' কথার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আলোচ্য বিশেষশ্রেণীর পাঁচালি এগুলি নয়। পূর্বেই বলেছি, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকেই বাঙ্লা কাব্যে এই বিশেষ শ্রেণীর পাঁচালির আত্মপ্রকাশ। পাঁচালি-গীতের ঐশ্বর্য-যুগ হলো ১৮২৫ থেকে ১৮৬০ ইংরেজি সাল।

সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁচালিকারের নাম—**দাশরথি রায়** [১৮১০-১৮৫৭]। ইনি বর্ধমান জেলার লোক। দাশু রায় প্রথমে কবির দলে যোগ দিয়েছিলেন, পরে পাঁচালি লেখায় হাত দেন। পাঁচালির দল গড়ে তিনি দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন। গানের অপূর্ব অনুপ্রাসঝঙ্কারে ও সুরমাধুর্যে দাশরথি একদা পশ্চিমবাঙ্লাকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। পল্লীঅঞ্চলে এখনো বহুকণ্ঠে দাশুর গান শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর লেখনীর বিশ্রাম ছিল না। অজস্র পালা লিখে গেছেন তিনি, যেমন—দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, নলিনীভ্রমরোক্তি, প্রভাস, চণ্ডী, ইত্যাদি। বিধবাবিবাহ পর্যন্ত দাশরথির নির্মিত পালার বিষয়বস্তু হয়েছে। 'শব্দকবি' বলতে যা বোঝায়, দাশু রায় তা-ই, এবং অভাবনীয় ক্ষিপ্রহস্তে পালা লিখে যেতেন তিনি। তাঁর রচনা নানাস্থানে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট। কিন্তু এই ত্রুটি দাশরথির একার নয়, সেই যুগটিই ছিল স্থূল-আদিরস-ঘটিত কথার অনুরাগী। নির্দ্বিধায় এই আদিরসের জোগান

দিয়েছিলেন বলেই দাশু রায় ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ওই যুগে শিষ্টরুচির শ্রোতার সংখ্যা ছিল নগণ্য।

দাশু রায়ের উপমা অবন্ধন। কথার ঝোঁকে কবির লেখায় উপমার পাহাড় জমে উঠতো, ঔচিত্যবোধের কথা তাঁর মনে থাকতো না। তিনি সংযম শিক্ষা করেন নি। পালার কাহিনীনির্মাণেও তিনি অমার্জনীয় অসাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রচিত্রণে তিনি অপটু। দাশরথি রায়ের সম্পর্কে একজন সুধী সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ :

দাশুর পাগলপ্রতিভা প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালি পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্ধশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দাশু গাহিয়া যাইতেছেন ; যে-কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাশু প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেইদিকেই গল্পের স্রোত বহাইয়া দিতেছেন—অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা ঋ গ ম বাঁধিয়া সুর দিতেছেন: এবং কোন্ সময় কবি মূল সুর ধরিলেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,—ইতোমধ্যে দেখিলেন, পালা শেষ হইয়া গিয়াছে।

দাশরথির কবিস্বভাবের এই হলো স্বরূপ। তবে দাশু রায় যখন ভক্তির গান লিখতে বসেছেন, শ্যামাবিষয়ক সংগীতরচনে হাত দিয়েছেন, তখন সমস্ত চপলতা পরিহার করেছেন, স্বস্থ হয়েছেন, যতখানি সম্ভব, নিজেকে আবিলতামুক্ত করে নিয়েছেন। এইসব গানে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত, ভক্তিকাতরতার ভাবটি গুঞ্জিত—এগুলির প্রশংসা করতেই হয়। তাঁর 'দোষ কারো নয় গো, মা' গানটিতে ভক্তের মর্মস্পর্শী ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়, এক অসহায় শিশু মাতৃরূপিণী শক্তির পদতলে লুটিয়ে জননীর অকৃপণ করুণা ভিক্ষা করছে। বৈষ্ণববিষয়ক সংগীতনির্মাণেও দাশরথির কৃতিত্ব ফুটেছে। দাশুর—'হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি, ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী'—গানটি অনেকেরই পরিচিত।

দাশরথির পরবর্তীকালে যাঁরা পাঁচালি লিখেছেন তাঁদের মধ্যে **রসিক রায়, নবীন চক্রবর্তী** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কবিগানের জনপ্রিয়তা কিছুটা কমে এলে পাঁচালি লোকসাধারণের আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বাল্যকালে দাশরথির গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। রামায়ণ আবৃত্তি করা হচ্ছে এমন সময়—'আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে আসিয়া দাশু রায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও

ঝঙ্কারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।' বাঙলাদেশের বৃহত্তর অঞ্চল একদিন উৎকর্ণ হয়ে দাশরথির পাঁচালি শুনেছে।

টপ্পা : কবিগীতের সমকালীন রচনা 'টপ্পা' গান। এদেশে এই জাতের গানের প্রবর্তক লোকখ্যাত **রামনিধি গুপ্ত** বা **নিধুবাবু**। আঠারোর শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশের শতকের তৃতীয় দশকের প্রায় শেষাবধি তাঁর জীবৎকাল। দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন তিনি। নিধুবাবুর পৈতৃক ভিটা কুমারটুলিতে। তিনি জন্মেছিলেন হুগলি জেলার চাঁপতা গ্রামে। কলকাতায় এসে কিছু লেখাপড়া শেখেন। উত্তরতিরিশে তিনি বিহারে যান, সেখানকার কালেক্টরিতে কেরাণীর কাজ নেন। এখানে অবস্থানকালে এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সংগীতশিক্ষণব্যাপারে ওস্তাদজির কার্পণ্য লক্ষ্য করে নিধুবাবু দেশে চলে আসেন। নানা কারণে সরকারি কর্মও তাঁর ভালো লাগছিল না। দেশে ফিরে সংগীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। হিন্দি গান ভেঙে লিখলেন 'টপ্পা'—একরকমের বৈঠকী গীত। এ গানের আসল রসিক মার্জিত রুচির শ্রোতারা, সর্বসাধারণের অধিগম্য এ নয়, যেমন অধিগম্য কবি, পাঁচালি, যাত্রা, ইত্যাদি। অল্পকাল-মধ্যে নিধুবাবুর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, বাঙালি তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো। সকলে সংগীতশিল্পী নিধুবাবুর নাম রাখলো—'বাঙলার শরি মিঞা'। এতে বোঝা যায়, টপ্পা গান লিখে এবং তা শুনিয়ে সেদিনকার শ্রোতৃমণ্ডলীকে কতখানি অভিভূত করেছিলেন তিনি।

টপ্পা প্রেমগীতি—স্বল্পায়তনবিশিষ্ট। এ প্রেম একেবারে লৌকিক। এখানে রাধাকৃষ্ণের মুখোশ নেই, দেবদেবী এসে মাটির পৃথিবীর রক্তমাংসের মানবমানবীর মুখ ঢেকে দেয়নি। কৃষ্ণরাধার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে, নিধুবাবুর গানে, প্রণয়ী-প্রণয়াস্পদা অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। টপ্পা বৈকুণ্ঠমুখী নয়, এখানে কোনোরূপ আধ্যাত্মিকতার আড়াল নেই—মানবমুখিতা হলো এর উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণীর গীতাত্মক কবিতায় নরনারীর দেহমনের আকুলতাবিজড়িত প্রণয়-আর্তিই রসোদ্বেল বাণীরূপ লাভ করেছে। দেবতার গান শুনে শুনে সেকালের শ্রোতারা যখন ক্লান্ত তখন রামনিধি গুপ্তের কণ্ঠে শোনা গেলো মানুষের গান—মানবীয় প্রেমের মধুগীতি। ওই যুগে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কবিওয়ালাদের কদর ছিল বেশি। এঁদের রচনা সকলে উপভোগ করতেন, এঁদের প্রদর্শিত পথেই ছিল কাব্যকারদের অনায়াস পদচারণা। নিধুবাবু কিন্তু পূর্ববর্তী কীর্তিমান কবিদের

চিহ্নিত সড়কে পা বাড়ালেন না, প্রচলিত রীতিকে পাশ কাটিয়ে একটি নতুন পথ রচনা করার দুঃসাহস দেখালেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। তাঁর হাতে এক অভিনব রীতির গান তৈরি হলো, কাব্যের ভাবগত আদর্শে তিনি নতুনতা আনলেন। নিধুবাবুর এই কবিকীর্তি ভুলবার নয়। বাঙালির প্রণয়-চেতনার এমন অকৃত্রিম প্রকাশ সেকালের ছন্দে-গ্রথিত রচনায় একরূপ চোখেই পড়ে না—ময়মনসিং গীতিকাকে বাদ দিলে। খাঁটি লৌকিক প্রণয়সংগীত নিধুবাবুর টপ্পা—প্রাণ ভোলায়, মনকে টানে, নতুনের স্বাদ মেলে। গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের মনের কথা গানের ভাষায় ফোটাতে পারেন যিনি, রসিকজনের চিত্তের তৃপ্তিবিধান করতে পারেন, তাঁর প্রতিভা অস্বীকার করবে কে!

বৈষ্ণবগানে প্রেমের কথা শেষ হয়ে যায়নি, আর, পূর্ববঙ্গগীতিকা-ময়মনসিং-গীতিকার কবিদলও নরনারীর প্রণয়াকুতির সব কথা বলে শেষ করতে পারেন নি। এ কদাপি শেষ হবার নয়। নয় যে, তার প্রমাণ রামনিধি গুপ্তের প্রেমমূলক গীতিগুচ্ছ। বহুরূপী প্রেমের বিচিত্র বর্ণনা এতে লভ্য। দেহ ও আত্মার এখানে অপূর্ব মিশ্রণ, এ গান আশা-নৈরাশ্যের নানা রঙে রঞ্জিত। রহস্যময় পার্থিব প্রেমের মুখে নিধুবাবু হৃদয়গ্রাহী ভাষা দিয়েছেন। এতে মামুলি কথা যে নেই তা নয়, পরিচিত উপমারও সাক্ষাৎ মিলবে, এখানে-ওখানে রুচিভ্রষ্টতাও লক্ষিত হবে। দোষেগুণে মিলেই নিধুবাবুর টপ্পা লৌকিক প্রেমের প্রশংসনীয় গান, এবং সকলেই জানেন, তা এককালে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিল। রামনিধি গুপ্তের খ্যাতি শক্তিমত্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ছন্দ আর ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী হলেও তাঁর রচিত প্রেমের গান কোনো কোনো জায়গায় আধুনিক লিরিকের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। ভাবের মনোহারিতায়, মনের কথার অকপট প্রকাশে, নিধুবাবু বিশিষ্ট। দুয়েকটি নমুনা তুলে ধরি :

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।
নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নের দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন-মিলন॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যারে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন॥

তারে কি ভুলিতে পারি যারে আমি সঁপিলাম মন।
দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন ॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত,
সে-জন এমন।
যদি তার বিরহেতে সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্বাণ কখন ॥

*   *

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমাকে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে ॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইলে কুলেতে।
আমি বলি এতদিনে আইলেম কুলেতে ॥

রসিকমাত্রেই এসব কবিতার বা গানের সৌন্দর্য-মাধুর্য উপলব্ধি করবেন। এসকল রচনা মূলত যেহেতু গান, সেহেতু এগুলি সুরসংযোগে শোনার বস্তু। কেবল কবিতা-হিসেবে দেখলে এদের সৌন্দর্যের পূর্ণ-পরিচয় মিলবে না।

রামনিধি শক্তিশালী গীতনির্মাতা। তাঁর কবিপ্রতিভাকে উপেক্ষা করা চলে না। এই কবির কিছু কিছু লেখায় বাঙ্‌লা কবিতার যুগান্ত-নির্দেশ সূচিত। বাঙ্‌লা ভাষার প্রতি অশেষ তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধামিশ্র অনুরাগের স্মরণীয় অভিব্যক্তি হলো নিধুবাবুর নিম্নোক্ত কথাগুলি :

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর,
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥

নিধুবাবু প্রধানত প্রেমের কবিতাই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর অন্যবিধ রচনাও রয়েছে। সেগুলি বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত।

নিধুবাবুর প্রবর্তিত নতুন রীতির প্রণয়কবিতা [টপ্পা] এতখানি লোকপ্রিয় হয়েছিল যে, সেদিনকার আরো কয়েকজন কবির লেখায় এর অনুসৃতি দেখতে পাওয়া যায়। নিধুর টপ্পা **শ্রীধর কথক, কালী মির্জা** [কালিদাস চট্টোপাধ্যায়], **গোপাল উড়ে** প্রভৃতির গানের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এঁদের লেখা কয়েকটি

গান, বিশেষে শ্রীধরের রচিত গান, নিধুবাবুর গানের সঙ্গে মিশে গেছে। এরূপ অবস্থায়, গানগুলির আসল রচয়িতা কে, তা বলা কঠিন। নীচের গানটি :

ভালবাসব বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সেজন্যে দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

এ নিধুর-নামে চললেও, বিশেবজ্ঞের মতে এর নির্মাতা শ্রীধর কথক।

এমন আরেকটি গান হলো :

তবে প্রেমে কি সুখ হত
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।—ইত্যাদি।

কিংবা : তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে—ইত্যাদি।

নিধুবাবুর নামের সঙ্গে জড়িত হলেও, খুব সম্ভব, এ দুটি গান শ্রীধর কথকেরই নির্মিত। পরবর্তী কোনো কোনো টপ্পা-রচয়িতার গান নিধুর রচনার সঙ্গে মিশে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। টপ্পা-নির্মাণে নিধুবাবুর অসামান্য খ্যাতিই এর জন্যে অনেকটা দায়ী।

কালী মির্জা টপ্পা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর গান লিখেছেন। গোপাল উড়ের কয়েকটি গানকে টপ্পার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়, কিন্তু সেগুলিকে প্রকৃত টপ্পার অন্তর্ভুক্ত করাটা ঠিক হবে না ; ওতে সংগীতের ভিন্ন আদর্শের পরিচয় সুপ্রকট। ওস্তাদী সুরের প্রতিক্রিয়াতেই গোপাল উড়ের উক্ত শ্রেণীর গানগুলি রচিত বলে মনে হয়।

এই গীতিকারের একটি গান উদ্ধৃত করি—ভাষায় ও ছন্দে মনোমদ :

কি ফুল ফুটেছে মজার তারিপ
বাহাওয়া কি বাহাওয়া।
সৌরভে গা গর্‌মে উঠে।
লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া
জাতি যুতি শেফালিকে,
টগর গোলাপ কাঠমল্লিকে,
গন্ধ তাদের লেগে নাকে,
ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।
যারা ছিল উঁচু ডালে, নাগাল না পাই হাত বাড়ালে,

কটাক্ষে মন ঘুরিয়ে দিলে,
আপশোষে আর যায় না যাওয়া ॥

টপ্পা গান বাঙ্‌লা সাহিত্যের খুব বড়ো একটি বৈশিষ্ট্য।

যাত্রাগান : 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষপ্রকারের জনসম্মেলন। এ থেকে ক্রমশ 'নাটগীত'। সেকালের যাত্রা এখন আর নেই বললেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় থিয়েটার 'যাত্রা'-কে পরাস্ত করে তার স্থান দখল করেছে। প্রাচীন 'যাত্রা' বলতে গানের সমাহারই বোঝাতো। কৃষ্ণলীলাই ছিল যাত্রার প্রধান বিষয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানিতে রাধা-কৃষ্ণ, বড়াই-নারদ প্রভৃতি নিয়ে সেকালের যাত্রা বা নাটগীতের আদিরূপটি ফুটে উঠেছে। যাত্রায় উক্তি-প্রত্যুক্তি গানে, ঘটনার ক্রমবর্ণনও গানে, মনের ভাববিশেষ তো গানে বটেই। ক্রমশ স্থানে স্থানে গদ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তির সন্নিবেশ হতে থাকে।

যাত্রাগানে শুধু কৃষ্ণলীলাই স্থান পায়নি—চণ্ডীলীলা, রামলীলা প্রভৃতিও বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে। পরে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীও যাত্রায় স্থান পেয়েছে। তৎকালীন কলকাতার 'বাবু'-সমাজ গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' শোনবার জন্যে আসরে ভিড় জমাতো।

যাত্রারচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত **কৃষ্ণকমল গোস্বামী** [উনিশের শতকের প্রথম দিকে এঁর জন্ম] 'স্বপ্নবিলাস', 'নিমাইসন্ন্যাস', 'রাই-উন্মাদিনী' প্রভৃতি পালা রচনা করেন। সেকালে এগুলি—বিশেষত 'রাই-উন্মাদিনী'—খুব প্রশংসা পেয়েছিল। কৃষ্ণকমল চৈতন্যপ্রদর্শিত ভক্তিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। **পরমানন্দ অধিকারী**, **গোবিন্দ অধিকারী**, **বদন অধিকারী**, **লোচন অধিকারী** প্রমুখ যাত্রাওয়ালাদের নামের সঙ্গে কমবেশি সকলের পরিচয় আছে। এঁদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগান সর্বাধিক প্রশংসিত হতো। কিছুকাল পূর্বে **মতিলাল রায়** নামে এক ব্যক্তি প্রাচীন যাত্রাকে থিয়েটারের সঙ্গে মিশিয়ে একপ্রকার আধুনিক যাত্রার সূত্রপাত করেন।

আমাদের একালের নাট্যে প্রাচীন যাত্রাগানের রীতি কিছুপরিমাণে প্রবেশ করেছে। বিশেষত পৌরাণিক নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব প্রবল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবধর্মী সংকেতপ্রধান নাটকগুলির রচনায় প্রাচীন যাত্রারীতি স্থানে স্থানে গ্রহণ করেছেন।

[৮]

॥ পথপরিবর্তনের মুখে বাঙ্‌লা কবিতা ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—

একশ বছরের ব্যবধানে ঈশ্বর গুপ্তকে [১৮১২-১৮৫৯] স্মরণ করছি। প্রচুর তিনি লিখেছেন, কিন্তু আজ তার কিছুই টিঁকে নেই। দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকবার মতো প্রাণশক্তি ওতে ছিল না। তথাপি বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। উনিশ শতকী বাঙ্‌লার সাহিত্যপ্রদেশে ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখযোগ্য এক কবি-ব্যক্তিত্ব। একদা তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য। সেদিনকার নবীন লেখকদের কাছে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। পরবর্তী সময়ের কয়েকজন প্রতিভাবান লেখককে তিনি নিজের শিষ্যরূপে পেয়েছিলেন,—সাহিত্যে তাঁদের হাতেখড়ি তাঁর সম্পাদিত 'প্রভাকর'-এর পাঠশালায়। কত বিচিত্র কাজ করে গেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—সাহিত্যনির্মাণ, সাহিত্যসমালোচন, সাময়িকপত্রের সম্পাদনা। নতুন কবিরা তাঁর অকৃপণ উৎসাহে প্রাণিত হয়েছে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা ছাপা হয়ে আজকের দিনে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এমন বহুধা প্রকাশিত যে-ব্যক্তিটির কাজ তিনি অবশ্যই স্মরণযোগ্য, তাঁর অসাধারণত্বে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করি না। আরো স্মর্তব্য, আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের শৈশবপর্বের প্রথম শক্তিমান কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ঠিক নতুন যুগ বলতে যা বোঝায়, গুপ্ত-কবি তা প্রবর্তন করেন নি, যুগোত্তীর্ণ কাব্য-কবিতাও তিনি লেখেন নি। তথাপি তাঁর রচনাবলী পড়লে মোটামুটি এ সত্যটি উপলব্ধি করি যে, বাঙ্‌লা কাব্যে হাওয়া-বদল শুরু হয়েছে, প্রাচীন কাব্য-রীতির দিন ফুরিয়েছে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অভিনবতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি না করে, প্রাত্যহিক জীবনের নানান্ অভিজ্ঞতাকে ছন্দে গেঁথে, ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের সাহিত্যের নতুন পথ খুলে দিয়েছেন এ কথা বললে কেউ বোধ করি প্রতিবাদ জানাবেন না। মোটকথা, ঈশ্বর গুপ্তে পুরনো ঐতিহ্যের কাব্য-ধারায় স্পষ্ট ছেদ পড়লো, নবযুগের সূত্রপাত ঘটলো—বিনা দ্বিধায় এরূপ একটি উক্তি করা যেতে পারে। যতই কিছুটা রুক্ষ, শিথিল, অশিষ্ট, অমার্জিত, অসংযত হোক, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা আধুনিকতার পরিচয়বাহী। ভারতচন্দ্র আর কবিওয়ালাদের সঙ্গে যোগবন্ধন ছিন্ন করতে না পারলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজ-আমলের মানুষ। সাহিত্যের সে-পাড়া ও এ-পাড়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে

তাঁর অবস্থান। এ-পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হতে তিনি চাইছেন, কিন্তু ও-পাড়ার আকর্ষণ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না যেন। পারলে ভালোই হতো, তাঁর হাতে আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতো। এর জন্যে মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত আমোদের অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব সেই যুগে, বাঙ্‌লাদেশ যখন বিচিত্র আলোড়নে বিক্ষুব্ধ, অস্থির, চঞ্চল। এই আলোড়ন সমাজে, শিক্ষায়, ধর্মে, রাজনীতিতে। জীর্ণ পুরাতন বিদায় নিচ্ছে, নতুনের সদর্প পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে; এতকালের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাপ্রণালী শিথিল হয়ে পড়েছে, কিন্তু সুশৃঙ্খল নবীনের প্রতিষ্ঠা তখনো হয়নি,—এই যুগসন্ধিক্ষণে—রামমোহন-ডিরোজিও-ডিরোজিওপন্থী নব্য-বাঙালি আর বিদ্যাসাগরের সেই বিদ্রোহের দিনে—গুপ্ত-কবি আবির্ভূত হলেন। কালটি স্মরণীয়—প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণের কাল। একদিকে সুপ্তির জড়িমা, অন্যদিকে, নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য; একদিকে প্রাচীনকে সর্বশক্তি-প্রয়োগে ধরে রাখবার প্রয়াস, অন্যদিকে, অতি-উৎসাহ-সহকারে নবনবীনকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন; একালটি দুই বিরোধীভাবের অপরূপ এক সংগমস্থল। ভাবাদর্শের এই বিরোধ কেবল বাঙালি সমাজে নয়, বাঙ্‌লার সাহিত্যসংসারেও। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী প্রত্যক্ষ বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। উক্ত আলোড়নচিহ্নিত যুগটির ভাবদ্বন্দ্ব তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট প্রতিফলিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিসত্তার দ্বৈধ সাবধানী পাঠকের চোখে না পড়ে পারে না।

১৮১২ ইংরেজি সালে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম, কাঁচরাপাড়া গ্রামে—মাতুলালয়ে। দরিদ্র এক বৈদ্যবংশের সন্তান তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সাক্ষ্যে জানা যায়, শৈশবে গুপ্ত-কবি লেখাপড়ার বিষয়ে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। বঙ্কিম এও আমাদের জানিয়েছেন, বাল্যকালেই তিনি পদ্যরচনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন; খুব অল্পবয়স থেকেই মুখে মুখে ছড়া তৈরি করতে পারতেন, এবং বয়স বাড়লে কবির দলে—হাফ্-আখড়াইয়ের দলে—গান বেঁধে দিতেন। রীতিমতো বিদ্যাভ্যাস কখনো তাঁর হয়নি। শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে, তথা জীবিকার সন্ধানে, ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতা শহরে এলেন। এখানে যথার্থ বিদ্যার্জন করা হলো না, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সাহিত্যানুশীলনের প্রশস্ত সুযোগ মিলে গেলো। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন, উভয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্য গড়ে উঠলো। এই 'যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশঃকীর্তির সোপানস্বরূপ।'

১৮৩১ সালে, মাত্র উনিশ বৎসর যখন তাঁর বয়স, তিনি প্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করলেন। এই পত্রিকখানি প্রকাশের প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহনের সংস্পর্শে না এলে গুপ্ত-কবির জীবন কোন্ খাতে বইতো তা বলা কঠিন। 'প্রভাকর'-এর সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃভাষার নিরলস সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার দানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাণ্ডার কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়, বঙ্গীয় কবিতায় কী অভিনবতা তিনি আনলেন, এ বুঝে নিতে হবে।

গুপ্ত-কবির কাব্যজগতে প্রবেশ করলে যে-জিনিসটি প্রথমে আমাদের চোখে পড়ে সে হলো বিষয়বৈচিত্র্য ও বিষয়ের নতুনতা, এবং তাঁর বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। কবিতায় দেবদেবীর লীলাকথনের দায়িত্বপালনে এতটুকু তাঁর রুচি ছিল না ; প্রাচীন ধারার অনুসরণে মঙ্গলাখ্য কোনো কাব্য তিনি লিখলেন না, প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার বহির্দেশে কৃত্রিম কথাবস্তুর আশ্রয় নিয়ে কবিতাকে কাল্পনিকতার ছায়াচ্ছন্ন দূর ভূমিতে নির্বাসিত করলেন না ; সর্বজনের পরিচিত জগৎসংসারের দিকে চোখ ফিরালেন, নিকটের বাস্তবকে সহজ স্বীকৃতি জানালেন, ঐহিকতার প্রতি আগ্রহ দেখালেন, জীবনরসরসিকতার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে গেলেন পদ্যের অক্ষরে। 'ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু'—বঙ্কিমের উক্তিটি এই অর্থেই—গুপ্ত-কবির কাব্যবস্তুর কৃত্রিমতার বিরোধিতা সম্পর্কে—অতিশয় যথার্থ। জীবনপ্রীতির কাব্যকার যিনি, তাঁর পক্ষে দেবতার অপ্রাকৃত লীলার ঐকান্তিক চিন্তায় আত্মনিমজ্জন কদাপি সম্ভব নয়,—মর্ত-অনুরাগের কথা ছন্দোবদ্ধ করাটাই স্বাভাবিক। নবযুগের চেতনা ঈশ্বরচন্দ্রে সংক্রামিত, তাই, তাঁর কবিভাবনা মানবসংসারের অভিমুখী, পরিদৃশ্যমান বাস্তবের উদার উন্মুক্ত সড়কে তাঁর সতত সঞ্চরণ। তিনিই বোধ করি প্রথম বাঙালি কবি. যিনি আপনার নির্মিত কাব্যলোকে সকলের চেনা পৃথিবীকে সাগ্রহে স্থান করে দিলেন। তাঁর হাতে বাঙ্‌লা কবিতার বিষয়-ব্যাপ্তি ঘটলো। কবিতার বৈচিত্র্য-সম্পাদনও করলেন তিনি। সমকালীন বাঙালি সমাজ ও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এদেশের উৎসব-পার্বণ, পূজা-অর্চনা, আচার-বিধি, প্রথা-নিয়ম, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, প্রভৃতির চিত্রাঙ্কনে বর্তমান কবি বেশ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে বস্তুতান্ত্রিক কাব্যনির্মাতা বলা যেতে পারে। বঙ্কিমের ভাষায় ঈশ্বর গুপ্ত 'রিয়ালিস্ট'। 'পৌষপার্বণ'-এর বর্ণনায় তিনি বাঙালির অন্তঃপুরে উঁকি দিয়েছেন ; 'এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছ', 'পাঁটা', 'আনারস' প্রভৃতি

বাস্তব প্রয়োজনের বস্তু থেকে কাব্যরস আহরণ করেছেন। নিকটবর্তী সংসারের এসব তুচ্ছ সাধারণ বস্তুনিচয় বঙ্গদেশীয় কবিতার ইতঃপূর্বে কুত্রাপি তেমন অভ্যর্থিত হয়নি। কাব্যবস্তুঘটিত এই অভিনবতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

ঈশ্বরচন্দ্রকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে থাকি আমরা তাঁর হাস্যরসাত্মক লঘু জাতের কবিতাগুলোর জন্যে। বাঙ্‌লাসাহিত্যে নতুন ধরণের হাস্যরস প্রবর্তন করেন তিনি। আমাদের প্রাচীন কবিদের লেখায় হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস অবশ্য আছে, কিন্তু তাঁদের হাসি বড়ো স্থূল। একারণে ওতে উপাদেয়তা কম। ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতেও কোনো কোনো স্থলে স্থূলতা বা কুরুচির মুদ্রাঙ্কন রয়েছে, তথাপি এই হাসি অপেক্ষাকৃত নির্দোষ। তাঁর বিদ্রূপে হুল তেমন নেই, এবং প্রায়শ বিদ্বেষের স্পর্শশূন্য। যেখানে নির্দোষ হাসির তরঙ্গ তুলেছেন তিনি, তা সকলেরই উপভোগের বস্তু হয়ে উঠেছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে নিবেদন করে কবি বলছেন :

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু—
শিখিনি শিঙ্‌ বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস ॥
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভূসি পেলেই খুশি হবো—
ঘুষি খেলে বাঁচব না ॥

—হাস্যরসসৃষ্টির সুন্দর নিদর্শন, কবিকে প্রশংসা না জানিয়ে পারি না। এদেশে পাশ্চাত্ত্য হাওয়া বইতে শুরু হলে পর য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার ক্রমবিস্তার ঘটলো, মেয়েরা অন্দর ছেড়ে স্কুলকলেজে যেতে আরম্ভ করে দিল, ইংরেজিশিক্ষিত দেশীয় তরুণরা পশ্চিমী আচার-আচরণ, সাজপোশাক, নির্বিচারে অনুকরণ করতে লাগলো। এসবের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছুটা রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন :

যত কালের যুবো যেন সুবো
ইংরেজি কয় বাঁকাভাবে।
ধরে গুরু পুরোত মারে জুতো
ভিখারি কি অন্ন পাবে?
আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত ধর্ম কর্‌তো সবে।

একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে ?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ, বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতি বোল কবেই কবে॥
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে ?
সব কাঁটা-চামচে ধোর্‌বে শেষে—
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ?

—এ ব্যঙ্গরচনার উপভোগ্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। বঙ্গীয় যুবকের য়ুরোপীয় হালচাল, হিন্দুর ছেলের বেদ-বাইবেলের ভেদ না-মানা, বিদেশি রীতিতে আমাদের মেয়েদেরকে শিক্ষাদান ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভালো নিশ্চয়ই লাগেনি, এতে হয়তো তিনি শঙ্কাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাই, পশ্চিমের অনুকরণকে তিনি বিদ্রূপ হেনেছিলেন, ব্যঙ্গের আঘাতে জাতীয় চেতনাকে সদাজাগ্রৎ রাখতে চেয়েছিলেন। বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরকেও গুপ্ত-কবি বিদ্রূপের বিষয়-বস্তু করেছিলেন। কিন্তু এখানে হুল ফোটানোর চেষ্টা নেই, নতুন কালের প্রতি বিদ্বিষ্ট তিনি ছিলেন না। তবে তাঁর ঝোঁকটা যে রক্ষণশীলতার দিকে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রগতিবাদকে মেনে নিতে তিনি পারেননি! সেকালে প্রাচীন সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

এখানে এও স্মরণে রাখতে হবে, গুপ্তকবির লেখা কিছু-কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা বিদ্বেষকণ্টকিত, এসব রচনার হাস্যরস নির্দোষ মোটেই নয়। আমরা তাঁর যুদ্ধবিষয়ক দুয়েকটি কবিতার কথা বলছি। ইংরেজদের যুদ্ধজয়ে তিনি উল্লাস প্রকাশ করুন এতে আমাদের আপত্তি নেই, ইংরেজজাতির শৌর্যবীর্য তাঁকে অভিভূত করুক এতেও আমর আপত্তি জানবো না। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয় বীরসন্তানদের অস্ত্রধারণকে যেখানে তিনি অশালীন অসংযত ভাষায় আক্রমণ করেছেন সেখানে তীব্র প্রতিবাদ না জানিয়ে আমরা পারি না। নানাসাহেব ও ঝাঁসির রানীর বীরত্ব দেখে নিজ অন্তরে উদ্দীপনা অনুভব করার মতো মানসিক ঔদার্য তাঁর ছিল না। তাঁদের চরিত্রের ওপর তিনি কালি

ছিটিয়েছেন, ইংরেজের পাশে এ দুই চরিত্রকে কত ছোট করে ফেলেছেন! যে-কবিতায় এহেন কুশ্রী মনোভঙ্গি প্রতিফলিত তা আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করার যোগ্য, এবং সেগুলির রচয়িতাকে দেশপ্রেমী মানুষ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এরূপ অমার্জনীয় ত্রুটি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, বাঙালি লেখকদের মধ্যে দেশবাৎসল্যের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর পূর্বে এদেশের কোনো সাহিত্যকার স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার অবকাশ করে নিতে পারেননি। দেশাত্মবোধ কী জিনিস, তাঁরা তা জানতেন না। দেশপ্রেমের আদর্শের দিক থেকে একালে যতই সংকীর্ণ মনে হোক, গুপ্ত-কবির মুখে আমরা প্রথম শুনলাম নিম্নোক্ত কথাগুলি :

জান না কি জীব তুমি জননী জনমভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে—

এবং

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ যত্ন করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

দেশের প্রতি এই মমত্ববোধ, দেশের মানুষের প্রতি এই ভালোবাসার অকৃত্রিম প্রকাশ, সেযুগে অ-দৃষ্টপূর্ব। কেবল স্বদেশকে তিনি মমতায় জড়াননি, স্বদেশীয় ভাষার প্রতিও তাঁর অগাধ অনুরাগ। সেদিন ইংরেজি ভাষার মোহ 'নব্য বাঙালি'-কে গ্রাস করে নিয়েছে, তখন 'ইয়ং বেঙ্গল' স্বভাষাদ্বেষীই ছিলেন। এহেন ঘোরতর দুর্দিনে স্বদেশপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের শোনালেন—'মাতৃসম মাতৃভাষা'। মাতৃভাষার প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা লক্ষ্য করে তিনি মর্মাহত হয়েছেন ; নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তার বেদনা প্রকাশিত :

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ—
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।

'জননী জনমভূমি'-কে সকল অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন ঈশ্বর গুপ্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক ভারতশাসনের বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি। তাঁর কাব্যে ইংরেজপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি উভয়েরই পাশাপাশি অবস্থান। ভারতীয়ের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজজাতির জয়লাভে ঈশ্বর গুপ্তের উল্লাসের অবধি নেই,—'জয় ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয়' বলতে এতটুকু

সংকোচবোধ করেন না তিনি। একারণে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। জাতীয় জীবনে পরাধীনতার সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কবি, কিন্তু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার বিষয়ে একটি ছত্রও তাঁর লেখনী থেকে বেরোয়নি। এ আমরা পেলাম পরবর্তী কাব্যকার রঙ্গলালে এসে। দেশবাৎসল্যের আদিকবি যে-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তাঁর কলম দিয়ে বেরুল নীচের পঙ্‌ক্তিনিচয়:

ভারতের অবোধ দুর্বল লোক যত
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর,
রাজার সাহায্য-হেতু রণসজ্জা কর।

—এ ভাবতেও কেমন যেন অবাক লাগে—মন বিশ্বাস করতে চায় না। এরূপ অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটবার কারণ হলো, সেকালের আরো অনেক পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত বাঙালিসন্তানের মতোই, গুপ্ত-কবিও, ব্রিটিশ-প্রভুত্বকে বিধাতার আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন, ইংরেজশাসনের প্রতি বিদ্বেষপোষণ তাঁদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। বুঝতে পারা যায়, রাজনৈতিক চেতনার পূর্ণজাগরণ তখনো ঘটেনি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা যে-কোনো জাতির অবারিত আত্মপ্রকাশের পথে বড়ো একটি বাধা। ব্রিটিশ-রাজশক্তির প্রশস্তিকীর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চমুখ। সে যাক্।

গুপ্ত-কবির রচনার বিচিত্রতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরেকটি অভিনব সামগ্রী আমরা তাঁর কাছ থেকে পেলাম—নিসর্গপ্রকৃতিমূলক কবিতা। এ নতুন কালের জিনিস। পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে ঠিক এই ধরণের প্রকৃতিচিত্রণ মেলে না। সেখানে প্রকৃতি আমন্ত্রিত পটভূমি বা পরিবেশ রচনার প্রয়োজনে, তাকে দিয়ে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন বাঙ্‌লা কবিতায় নিসর্গপ্রকৃতির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। মানবমানবীর সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার প্রসঙ্গই সেখানে মুখ্য, তুলনায় প্রকৃতির স্থান গৌণ। ঈশ্বর গুপ্ত প্রকৃতিকে মুখ্য বর্ণনীয়-হিসেবে গ্রহণ করেছেন, প্রকৃতির সংসার সম্বন্ধেও তিনি বেশ কৌতূহলী। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত প্রভৃতি ঋতুকে নিয়ে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন তিনি। তবে ঈশ্বর গুপ্তের লেখা প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি স্বরূপত চিত্রধর্মী, এতে ভাবধর্মিতা ও সংগীতধর্মিতার নিতান্ত অভাব। প্রকৃতির রহস্যময় অন্তঃপুরে কবি প্রবেশ করতে পারেননি, প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের নিগূঢ় যোগস্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। উৎকৃষ্ট নিসর্গকবিতা এগুলিকে বলা যায় না। নিসর্গলোকের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তার বাস্তব

বর্ণনা ছন্দে গেঁথেছেন। এতে কবির পর্যবেক্ষণশক্তির কিছুটা পরিচয় ফুটেছে, আত্মগত ভাবনার এতটুকু প্রকাশ চোখে পড়ে না। রোম্যান্টিক-বাসনা-সঞ্জাত নিসর্গকবিতা লেখার মতো মেজাজ বাস্তবলোকে বিচরণশীল ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাঝে-মধ্যে পরমার্থচিন্তায় ব্যাপৃত হয়েছেন, অনেকগুলি আধ্যাত্মিক কবিতা লিখেছেন। এসব রচনা তাঁর কাব্যের বৈচিত্র্যবিধান করেছে সত্য, কিন্তু রসাপ্লুত কবিনির্মিতি হয়ে উঠতে পারেনি। কবির ঈশ্বর-ভাবনার মধ্যে ভক্তসাধকের অনুভূতির গভীরতা নেই, ভক্তিব্যাকুলতা অনুপস্থিত, ভাব-গাম্ভীর্য অপ্রাপ্তব্য, তাঁর বাণীগ্রন্থনে সাধকোচিত সংযমের একেবারে অভাব। ঈশ্বরের মহত্ত্ব কবি মনে মনে উপলব্ধি করলেও, ভাষায় তাকে ফোটাতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিশেষ এলাকাটিতে প্রবেশ না করলে তিনি ভালো করতেন। ভগবানকে কাব্যে টেনে এনেছেন কবি, কিন্তু সস্তা-অনুপ্রাসদক্ষতা কিংবা শব্দাড়ম্বর দেখাতে ভোলেন নি। অনুপ্রাসসৃষ্টির মোহ কাটানো তাঁর পক্ষে একরূপ অসম্ভব। সর্বগ্রাসী গুপ্ত-কবির এই শব্দপ্রীতি। শব্দের হট্টরোলের তলায় ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরের মহিমা চাপা পড়ে গেছে। তাঁর ওপর পূর্ববর্তী কবিওয়ালাদের দুর্মর প্রভাব। এর ঊর্ধ্বে উঠতে না পারার জন্যে তাঁর বিচিত্র-বিষয়ক অধিকাংশ রচনা স্বাদযুক্ত শিল্পবস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। গুপ্ত-কবির পরমার্থ-বিষয়ক কবিতার সামান্য দৃষ্টান্ত :

বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর,
অকর যদ্যপি তুমি নাহি ধর কর।
দিবাকর, নিশাকর দুই কর কর
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর?
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে॥
যখন এ দেহ তুমি কর নি নিষ্কর।
তখন জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর॥
বুঝিতে না পারি, পিতা, তোমার এ লীলে
নিষ্কর হইয়া কেন নিষ্কর না দিলে?
পাটা নিয়া যে ভূমি দিয়াছ তুমি নাথ!
পরিমাণ মাত্র তার সাড়ে তিন হাত।

—এ রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ যৎকিঞ্চিৎ; প্রকাশরীতি সরল বটে, কিন্তু কবিত্বের স্পর্শবিরহিত।

ব্রিটিশ-আমলে ভারতবর্ষের নানান্ অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধকে উপজীব্য করে [আগ্রাসী ইংরেজের সঙ্গে রাজ্যচ্যুত ভারতীয়ের যুদ্ধ] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। এসকল রচনায় বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ছাড়া উল্লেখ করবার মতো অন্যকিছু নেই। ঈশ্বর গুপ্তের হাতে বাঙলা কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের পরিধি-বিস্তার ঘটেছে, স্বীকার করতে হবে। ধর্মীয় প্রসঙ্গের সীমিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে তিনিই প্রথম চতুষ্পার্শ্বের · চলমান পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলেন। সদ্য-কথিত যুদ্ধসংক্রান্ত রচনাগুলিতে দুই বিরোধী পক্ষের সশস্ত্র সংঘাতের সংবাদ পরিবেশন করেছেন কবি, তার গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তেজনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এখানেও কবি সুলভ শব্দকৌশলের দিকে ঝুঁকেছেন, কথার চাতুরী দেখাতেই ব্যস্ত থেকেছেন। অনুপ্রাসের ঝংকার তুলতে পারলেই তিনি খুশি, শব্দালংকারের আবর্তের সংকীর্ণ সীমায় কবি স্বেচ্ছাবন্দী। ধ্বনিসৃষ্টির মত্ততা গুপ্ত-কবি যেখানে কাটিয়ে উঠেছেন, সহজ উপমাদি অলংকারে কবিতার অবয়ব সাজিয়েছেন, সেই বিরল ক্ষেত্রে, তাঁর কবিসিদ্ধি সংশয়াতীত। এরকম সফলতার একটি দৃষ্টান্ত নীচে তুলে ধরা হলো :

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোনো দোষ।
সোনা আর ধুলিলাভে সম পরিতোষ॥
কোনোরূপে নাহি রাখে কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বরচিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু সাধু সেই—গাই তার যশ॥
সাধু সাধু সাধু রব অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল, সাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক রক্তবর্ণ হয়॥

—মোটামুটি ভালো কবিতা, শব্দালংকারবাহুল্য একে পঙ্গু করে দেয়নি। দেখতে পাই, ভারতচন্দ্রের আমল থেকেই গ্রামবাসিনী বাঙ্‌লা কবিতা শহরবাসিনী হয়ে উঠছে, কাব্যে নাগরিকতার সুরটি বাজতে শুরু করেছে। ঈশ্বর গুপ্তে এসে এর পরিপূর্ণতা। ঈশ্বর গুপ্ত রীতিমতো শহরের কবি। শহর বলতে উনিশের শতকের

মাঝামাঝি সময়ের কলকাতা—বিচিত্র-কলরব-মুখরিত। কলকাতা শহরের প্রতিদিনকার উত্তেজনাকেই গুপ্ত-কবি ছন্দে বেঁধেছেন। একারণে তাঁর লেখায় তথ্য বেশি, ধ্যানতন্ময়তা কম। জীবনের উপর তলার কথাই অধিক বলেছেন তিনি, রহস্যময় গভীরতায় ডুব দিতে পারেন নি। লঘু বিদ্রূপ, হাল্কা রসিকতা ও কৌতুক, অগভীর হাস্য-পরিহাস, শাসনঅসহিষ্ণু চাপল্য, বাহ্যাড়ম্বর, ইত্যাদি, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। আসলে রঙ্গরসিক মানুষ তিনি, তাঁর অন্তরে রয়েছে রঙ্গরসের অফুরন্ত একটি উৎস। সে-যুগের বাঙ্‌লা-দেশটিও ছিল এরূপ রসিকতায় উদার। বোধ করি এ লক্ষ্য করে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন : 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা।'

গুপ্ত-কবিকে যুগস্রষ্টা বলা যায় না। যথার্থ নতুন ভাবনায় তিনি প্রবুদ্ধ হননি, কাব্যরীতিতেও কোনোরূপ নতুনতা আনেননি। যুগের সৃষ্টি তিনি। খাঁটি বাঙ্‌লা বুলিতে, দেশীয় ধারায়, বিচিত্রবিষয়ক, সহজবোধ্য, বাস্তবভিত্তিক কবিতা লিখে গেছেন তিনি—এখানে তাঁর কৃতিত্ব। ঈশ্বরগুপ্তের সম্পর্কে একজন আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য :

ঈশ্বরগুপ্ত সবচেয়ে বড়ো কাজ করেছেন সাহিত্যস্রষ্টারূপে নয়, সাহিত্য-সংস্কারকরূপে, এবং এইদিক থেকেই ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর আমলে তাঁরই চেষ্টায় সাহিত্যের যাবতীয় মফঃস্বলবাহিনীধারা কলকাতার এক মূল ধারায় এসে মিশলো—সে হলো তাঁর 'প্রভাকর'। এখনকার দিনে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরি হয়, তার সূচনা 'প্রভাকর'-এ, এবং ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক পর্বের সর্বপ্রথম ডিক্টেটর।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে ভক্তশিষ্য বঙ্কিম অনেকগুলি কথা বলেছেন। তাঁর সব কথাই সত্য এ আমরা মানতে রাজি নই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি সত্যকে চেপে গেছেন, কোথাও-বা অর্ধসত্যকে পাঠকের সমক্ষে তুলে ধরেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বলবো, গুপ্ত-কবির প্রতিভার মোটামুটি পরিমাপ করে গেছেন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র :

কবির প্রধান গুণ—সৃষ্টিকৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না।··· আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।···তিনি বাঙ্‌লা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি। তিনি বাঙ্‌লার গ্রাম্যদেশের কবি।

যে-কাব্যভূমিতে গুপ্ত-কবি বিচরণ করেছিলেন সেখানে উর্বরতার অভাব, মলিনতাও রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু শ্যামলসুন্দর অরণ্যের সুরভি-নিশ্বাস যে খুব

দূরবর্তী সামগ্রী নয়, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এও আভাসিত। তাঁর কাব্যে নতুনের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত রয়েছে; তা খানিকটা স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে পরবর্তী কবি রঙ্গলালের রচনায়।

[৯]

॥ বাঙলা কাব্যে দেশি-বিদেশি ধারা-সংযোগ ॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

যুগান্তরের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮২৭-১৮৮৭] তাঁর কাব্য-কবিতা নির্মাণ করে গেছেন। তিনি আমাদের সাহিত্যে পরিবর্তন-যুগের সত্যিকার প্রথম কবি, ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সর্বশেষ কবি। রঙ্গলালের কবিকর্মে দেশি-বিদেশি ধারার সংযোগ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। পুরাতন ও নবীন—দুদিকেই তিনি তাকিয়েছেন। তথাপি পুরাতনের প্রতি মমত্ববোধের আধিক্যের জন্যে সাহিত্যের পুরনো আদর্শের গণ্ডী কাটিয়ে বেশিদূর তিনি অগ্রসর হতে পারেন নি। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তুলনায় রঙ্গলাল আধুনিকতার ক্ষেত্রে কিছু-পরিমাণে অগ্রবর্তী হলেও তাঁকে আমরা আধুনিক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলে চিহ্নিত করতে পারি না, যেহেতু মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয়ের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে খাঁটি আধুনিক কাব্য কেউ লেখেননি। ইংরেজ-আমলের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় আধুনিকতার প্রথম অঙ্কুরোদগম। ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক কাব্যের ভিৎ তৈরি করলেন, কিন্তু তাঁর হাতে সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ফলন তেমন হলো না। ১৮৩১ ইংরেজি সালে সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্ত-কবির আবির্ভাব; ১৮৬০ ইংরেজি সালে মধুসূদনের যুগান্তকারী রচনা 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর আত্মপ্রকাশ। এই মাঝখানের স্বল্পপরিসর সময়টিতে একজন-মাত্র উল্লেখনীয় কবির সাক্ষাৎ মেলে; তাঁর নাম—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাম্প্রতিক কালের সমালোচক রঙ্গলালের কবিশক্তিকে উচ্চে স্থান দিতে স্বীকৃত নন। কিন্তু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমের দিকে কবি-হিসেবে রঙ্গলাল প্রচুর খ্যাতি পেয়েছিলেন, দেখতে পাই। বঙ্কিমের চোখে তিনি যথার্থ একজন শক্তিমান কবি। ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী তাঁর ওপর অকুণ্ঠ প্রশংসা বর্ষণ করেছে। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬৫ সালে লিখছেন: 'অধুনাতন বঙ্গীয় কবিবৃন্দমধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।'

কবিকে রাজেন্দ্রলাল পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন: 'You fully deserve the title of the Bharatchandra of this century.' এসব উক্তি থেকে বোঝা যায়, তাঁর জীবনকালে রঙ্গলাল সাহিত্যরসিক কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু এও দেখা গেছে, বড়ো সমালোচকের রায়ও যুগে যুগে পাল্টায়। এর ফলে এক যুগের অনাদৃত সাহিত্যকার অন্য একটি যুগে পাঠকগোষ্ঠীর কাছে প্রভূত সমাদর লাভ করেন; আবার, বহুপ্রশংসিত সাহিত্যনির্মাতা বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যান। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লোকস্মৃতিতে আজ বেঁচে নেই—অপূর্ব-বাঙ্‌নির্মাণ-ক্ষমতা তাঁর ছিল না বলে। যুগদেবতার দ্রুতগতি পদক্ষেপের সঙ্গে সমান তালে তিনি চলতে পারেন নি, কালের প্রভাব কবির চিত্তে কোনো চাঞ্চল্য জাগায় নি, নবীনকে তিনি প্রীতির আলিঙ্গনে জড়াননি। এই কারণে তাঁর নাম কালস্রোতে কোথায় ভেসে গেছে। মহাকালের সোনার তরীতে সত্যিকার প্রতিভাধর ছাড়া অন্য কারুর স্থান হয় না। নির্মম বিচারক মহাকাল।

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় রঙ্গলালের জন্ম। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায়, কৈশোরে মিশনারি বিদ্যালয়ে, তিনি পড়াশুনা করেন। তৎপরে হুগলি কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজিশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। হুগলি কলেজ ছেড়ে আসার পর কবি খিদিরপুরের বাসিন্দা হন—মাতুলালয়েই থাকতেন। সংবাদপত্র ['এডুকেশন গেজেট'] পরিচালনা করেছেন রঙ্গলাল, অল্প কয়েক মাস প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্‌লা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। বাঙ্‌লাদেশে ও উড়িষ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদেও তিনি কাজ করে গেছেন। ইংরেজি ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সরকারি কর্মে তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। ১৮৮৭-তে তাঁর মৃত্যু হয়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন কাব্যকার। দুজনার মধ্যে বয়সের ব্যবধান পনেরো বৎসর। গুপ্ত-কবির 'প্রভাকর'-এ তাঁর কবিতা লেখায় হাতে-খড়ি। কাব্যের সংসারে, রচনাদর্শের বিচারে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট-আত্মীয় তিনি—জ্ঞাতি-সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কটিও নিবিড় ছিল। গুপ্ত-কবি কবিতার যে-ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, রঙ্গলাল সেই আবহাওয়ায় লালিত। রঙ্গলালকে ঈশ্বর গুপ্ত আর ভারতচন্দ্রের শিষ্য বলতে বাধা নেই। তবে এস্থলে মনে রাখতে হবে, সদ্য-কথিত কবিদ্বয়ের কুরুচি তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন, অশ্লীলতা-প্রীতির অনুস্মৃতি তাঁর রচনায় লক্ষিত হয় না। আবার, এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, কাব্যগুরু

ঈশ্বর গুপ্তের মতোই, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগান লিখেছেন। পরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে কাব্য-কবিতা-নির্মাণে হাত দেন।

এদেশে রঙ্গলালের কবিকর্মেই সর্বপ্রথম দেশি ও বিদেশি ভাবধারার যুক্তবেণী রচিত হয়েছে। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-কে ইংরেজি যুগের প্রথম বাঙ্‌লা কাব্য বলা যেতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ মেলাতে বাঙ্‌লা কবিতায় তিনি কিছুটা অভিনবতা সঞ্চার করে যেতে পেরেছেন। তবে উচ্চতর কবি-প্রতিভার অধিকারী না-হওয়ায় পরবর্তী বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে লক্ষণীয় কোনো স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করতে পারেন নি। তাঁর লিখিত কাব্যে যে-সামান্য নতুন নির্দেশ দেখা গিয়েছিল, বিপুল প্রতিভাসম্পন্ন মধুসূদন দত্তের চকিত আবির্ভাবে তা সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কাব্যজগতে মাইকেল বনস্পতি; তার পাশে রঙ্গলাল তৃণগুল্মের চেয়ে বেশি-কিছু নয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিপ্রতিষ্ঠা যে একেবারে ক্ষণস্থায়ী হলো তার অন্যতম প্রধান কারণ শ্রীমধুসূদনের অত্যুজ্জ্বল অভ্যুদয়,—আকাশে মহাজ্যোতিষ্ক সূর্যের উদয় হলে নক্ষত্রের ক্ষীণজ্যোতি মুহূর্তে লোপ পায়। মাইকেল যুগস্রষ্টা—মহানায়ক; রঙ্গলাল যুগপ্রতিনিধিমাত্র—পূর্ববর্তী কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে তৎপর। কী ভাষা, কী ছন্দ, কী কল্পনাভঙ্গি, কোনোটাতেই মৌলিকতার পরিচয় দেন নি তিনি।

তথাপি, বলতে হয়, কাব্যরচনের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। দেবতার মাহাত্ম্যখ্যাপনে তিনি উৎসাহী হলেন না, বহু-বিচরিত ধর্মের আঙিনায় পদক্ষেপ করলেন না,—নিজের কাব্যনির্মাণের উপাদান খুঁজলেন ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের পাতায়। রচিত হলো 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চী-কাবেরী', ইত্যাদি কাব্য। বাঙ্‌লা সাহিত্যে ইংরেজি ধরণের রোম্যান্টিক আখ্যান-কাব্যের প্রবর্তক রঙ্গলাল। তাঁর প্রণীত কাব্যগুলির কথাবস্তুর নতুনত্ব অবশ্যস্বীকার্য। কাব্যের কায়াগঠনেও রঙ্গলাল পুরনো রাস্তা মাড়াননি, মঙ্গলকাব্যের রূপরীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজি কাব্যপন্থার শরণ নিয়েছেন। রঙ্গলালের কবিকৃতিতে যতটুকু ইংরেজিয়ানা আছে ততটুকুই কবির নতুনতা। এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে কবির স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম। এতে জাতির সদ্যমুক্ত আত্মচেতনা ও স্বাজাত্যাভিমান ভাষা পেয়েছিল বলে সেদিনকার পাঠকসমাজে ওপরে-কথিত কাব্যগুলি সমাদর পেয়েছিল।

বাঙালি পাঠকসাধারণের পরিচিত অপ্রাকৃত কথাবস্তুকে পরিহার করে

ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনীর দিকে কেন তিনি ঝুঁকলেন, কবি তার কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথম কারণ, অপ্রাকৃত বা অলৌকিক কথাবস্তুতে ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠকসম্প্রদায়ের রুচি নেই ;—বাঙ্‌লা কাব্যের প্রতি তাঁদের এই বিরূপ মনোভাব দূর করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ, বাঙালির নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের মুখে ভাষা দেওয়া, জাতিকে দেশপ্রেমের প্রেরণায় প্রাণিত করা। 'পদ্মিনী-উপখ্যান'-এর ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখছেন :

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্টকালমধ্যে এদেশের পূর্বতন প্রতিভা ও পরাক্রমের যে-কিছু ভগ্নাবশেষ, তা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালংকারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্ব-গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন-পূর্বক মৎকর্তৃক রচিত হইল।

কথাগুলির মধ্যে রঙ্গলালের কাব্যসাধনার মূল প্রেরণার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, সে হলো—দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতাস্পৃহা, পরাধীনতার বেদনাকে প্রকাশ করা। সেদিনকার বাঙ্‌লার যৌবন কবিকণ্ঠে স্বাধীনতার বাণীই শুনতে চেয়েছিল। ভাষা ও ছন্দ যতই বিশেষত্ববর্জিত হোক, রঙ্গলালের কবিতায় স্বাধীনতার সন্ধানী বাঙালির মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে স্মর্তব্য পদ্মিনী-উপাখ্যানের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত কাব্যাংশটি—ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের প্রতি রাণা ভীমসিংহের উৎসাহবাণী :

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল, বলো, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
অতএব রণভূমে চলো ত্বরা যাই হে,
চলো ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যে, তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।

—এই রচনায় বিদেশি কবি টমাস মুর-এর ছুটি কবিতার ভাবানুসরণ চোখে পড়ে। তা হোক। বাঙ্‌লা কবিতায় এ সুর অভিনব একটি জিনিস। আমাদের সাহিত্যে স্বাধীনতার কবিতা প্রথম লিখলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৫৮ সালে। ১৮৫৮-তেই পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রকাশিত হয়। দেশীয় পুরাতন কাব্যরীতির বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলেও এক্ষেত্রে রঙ্গলাল অবশ্যই নতুন চেতনার কবি। ঈশ্বর গুপ্তে দেশবাৎসল্য প্রাপ্তব্য, কিন্তু রাজনীতিক স্বাধীনতাবোধের স্ফুরণ তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। উল্লিখিত কবিতায় পরিব্যক্ত যবন-বিদ্বেষ [ভীমসিংহ পাঠানদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের উত্তেজিত করছেন] ব্রিটিশ-রাজশক্তির প্রতিরোধ-কামনা ছাড়া অন্যকিছু নয়। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ ঘটে গেছে, ভিন্নতর ভাষায় যার নাম—স্বাধীনতা-সংগ্রাম। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন, এর বাস্তব রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজপুতকাহিনীর মধ্যে। বাঙ্‌লাদেশ তখনো ইংরেজ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেনি বলে মুক্তিপিপাসু রঙ্গলালকে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়েছে।

তাঁর রচিত তিনখানি কাব্যে শৌর্য-বীর্য-পরাক্রমের প্রদীপ্ত ভূমি রাজপুতনা স্থান পেয়েছে। কর্ণেল টডের লেখা 'রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ' নামীয় পুস্তকে ['Annals of Rajasthan'] বর্ণিত ধর্ম ও সতীত্ব-রক্ষায় চিতোরের রানী পদ্মিনীর আত্মোৎসর্জনের কাহিনী আশ্রয়ে রঙ্গলাল 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' রচনা করেন [১৮৫৮]; রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের চরিত্র নিয়ে তিনি লেখেন 'কর্মদেবী' [১০৬২]; এবং রাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের চরিত্র নিয়ে লেখেন 'শূরসুন্দরী' [১৮৬৮]। এই ছন্দিত আখ্যানগুলিতে স্বাধীনতা, বীরত্ব আর সতীত্বের মহিমা—দেশরক্ষায় ও নারীত্বের মর্যাদারক্ষায় আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শ—উদার কণ্ঠে বিঘোষিত। দেশের

গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে কবি বিগত দিনের ভারতবর্ষের লুপ্ত কীর্তি বারংবার স্মরণ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্‌লাদেশের বাইরে নিজদৃষ্টি তেমন প্রসারিত করে ধরেননি। রঙ্গলাল বাঙ্‌লাদেশের সীমা ডিঙিয়ে রাজপুতজাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কাব্যবস্তু খুঁজে ফিরেছেন, উড়িষ্যার কাহিনী আগ্রহসহকারে পড়েছেন। তাঁর 'কাঞ্চিকাবেরী' [১৮৭৯] কাব্যখানি উৎকলদেশীয় বীররসাত্মক আখ্যান অবলম্বনে লেখা হয়েছে। এতে বর্ণিত সংযত নির্মল প্রণয়কথা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেমের বীর্যও কবি-কর্তৃক অভ্যর্থিত। দেশবাসীর সম্মুখে উচ্চাদর্শ-স্থাপন রঙ্গলালের আর-একটি কবি-অভিপ্রায় বলে মনে হয়। বাঙ্‌লা কাব্য শিক্ষাপ্রদ, সুরুচিসুন্দর ও বীর্যদীপ্ত হোক, এ-ই তিনি চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে—আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার সেই পূর্বাহ্নে—কবির উক্ত অভিপ্রায় কিছুটা সফলও হয়েছিল। স্মরণে রাখতে হবে, কাব্যনির্মাণে উচ্চতর কলাকৌশলের আদর্শ তখনো স্থাপিত হয়নি। ১৮৬০-এর দিকে নতুন যুগের নতুন কবি মাইকেলের রচনাবলী প্রকাশিত হলেও তাঁর দুর্ধর্ষ কল্পনাভঙ্গির গভীর-গম্ভীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার মতো অনুশীলিত রুচির পাঠকের সংখ্যা তখন নগণ্য। এ কারণে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষণজীবী প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাধীনতার বিষয়ে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে বলে, বীররসব্যঞ্জক সমরসংগীত শুনতে পেলো বলে, পাঠকমণ্ডলী ঈশ্বর গুপ্ত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রঙ্গলালের কবিকর্মের দিকে তাকালো। এ না হলে গুপ্ত-কবির প্রতিপত্তি সমান অক্ষুণ্ণ থাকতো, রঙ্গলাল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন না। কাব্যকার-হিসেবে ঈশ্বর গুপ্ত অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। আর, সকলেই জানেন, ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারস্থ হলেও কার্যত রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্ত এবং ভারতচন্দ্রকে গুরুর আসনে বসিয়েছেন।

স্কট-বায়রণ-গোল্ডস্মিথ-মূর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য কবিগণের মতো কাব্য-কবিতা লিখতে চেয়েছেন রঙ্গলাল; কিন্তু ভাষারীতি, ছন্দ, অলংকার, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বস্তুত প্রাচীনপন্থীই থেকে গেলেন। আধুনিক মানসিকতা প্রকাশের মাধ্যমটিও যে আধুনিক হওয়া প্রয়োজন, কবি তা ঠিক বুঝতে পারেন নি। যথার্থ কবিভাষার আশ্রয় না পেলে কাব্যের আয়ুষ্কাল দীর্ঘস্থায়ী কখনো হতে পারে না। এসব কারণে সার্থক কাব্যনির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মধুসূদনের এতখানি নিকটে অবস্থান করে তিনি যে জীর্ণপ্রায় ও প্রাচীন কাব্যরীতির মোহ কাটাতে পারলেন না এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আসলে পুরাতনের প্রতি রঙ্গলালের প্রসক্তি সমধিক। যতটুকু নতুনকে নিলে অল্পবুদ্ধি পাঠকের চিত্তরঞ্জন করা যায়, ঠিক ততটুকুই তিনি গ্রহণ

করেছেন। পাঠককে তিনি ঠকিয়েছেন, তাই, উত্তরবর্তী রসিক পাঠকের দল স্বাভাবিক ঔদাসীন্যে :তাঁর দিকে আর দৃষ্টিপাত করেনি। বাঙ্‌লা কাব্যের মহাপ্রকাশের যুগে—বাণীগঙ্গাধর মাইকেলের দীপ্যমান অভ্যুদয়ের সময়ে—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একরূপ বিস্মৃত। আধুনিক কবিবৃন্দের পুরোধা তিনি হতে পারলেন না, যুগসন্ধিস্থলের অল্পখ্যাত কবি হয়ে রইলেন।

অনুবাদকর্মেও রঙ্গলালের আগ্রহ ছিল। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের অনেকগুলি সর্গ তিনি বিচিত্র ছন্দে বাঙ্‌লায় ভাষান্তরিত করেন। কয়েকটি ইংরেজি কবিতারও মোটামুটি ভালো অনুবাদ করেছেন তিনি। বায়রণ ও স্কটের অতিশয় ভক্ত ছিলেন রঙ্গলাল। একখানি গ্রীক কাব্যের ইংরেজি সংস্করণ ['Battle of the Frogs and Mice'] অবলম্বনে তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থ 'ভেক-মুষিকের যুদ্ধ' বিরচিত। তাঁর কৃত দুয়েকটি হিন্দী ও উড়িয়া কবিতার অনুবাদও রয়েছে। ভাষান্তরীকরণ কঠিন একটি কাজ। একাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যানুশীলনে কবির ক্লান্তি ছিল না।

রঙ্গলালের সাহিত্যসমালোচনামূলক একটি পুস্তিকা আছে, নাম—**'বাঙ্‌লা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ'**। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ পুস্তিকায় বাঙ্‌লার প্রাচীন কাব্যের ঐতিহ্যের প্রতি লেখকের অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

সাহিত্যচর্চায় কবির নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মৌলিক কাব্যরচনায় তাঁর কৃতিত্ব যৎসামান্য। বাঙ্‌লা সাহিত্যে রঙ্গলাল স্মরণীয় প্রাণোচ্ছল এক বাণী উচ্চারণের জন্যে—স্বাধীনতালিপ্সার বাণী : 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।' সিপাহীযুদ্ধান্তিক সেই বিপর্যস্ত দিনগুলিতে এই কথাগুলি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, জাতির প্রাণগত উৎকণ্ঠার বহ্নিমান প্রকাশ। এ ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রীতি শুধু নয়, আরো-কিছু বেশি—মহৎ একটি ভাব, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার জন্যে দেশবাসীর মর্মলোকে বিপুল উন্মাদনা জাগানো। হেমচন্দ্র যে 'ভারতসংগীত' গাইলেন, তার সুরটি প্রথম ধরিয়ে দিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বহুপঠিত 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যের কবি।

॥ নবীন যুগেও প্রাচীনের কুণ্ঠামুক্ত অনুসৃতি ॥

—মদনমোহন তর্কালংকার—

ক্ষুদ্রকায় একটি কবিতা। শিশুপাঠ্য। সহজ, সরল। দেড়শ বছরেরও অধিক কাল ধরে কবিতাটি আমাদের সমস্ত বালকবালিকার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরছে। এ রচনার সঙ্গে কে না পরিচিত! স্মরণ করুণ:

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥…ইত্যাদি

সর্বজনের জানা এই লেখাটি। কিন্তু এর রচয়িতার নাম অনেকেই জানেন না। লেখা রয়েছে, লেখক বিস্মৃতির মহাপ্রান্তরে হারিয়ে গেছেন। এমনিই হয়। প্রতিভাবানদেরই আমরা মনে রাখি, লোকস্মৃতিতে অপর-সব নাম ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে। এরূপ প্রায়-বিস্মৃত একজন ব্যক্তি মদনমোহন [চট্টোপাধ্যায়] তর্কালংকার। নিজের জীবনকালে মদনমোহন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কবি, রসিক, পণ্ডিত, এবং সমাজসংস্কারক। যশোলাভের এই সৌভাগ্য তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হয়নি যে এর কারণ, মদনমোহনের প্রতিভা আসলে কর্মীপুরুষের। বাস্তব কর্মোদ্যম তাঁর সাহিত্যসাধনাকে বিঘ্নিত করেছে। আবার, এক্ষেত্রেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার মতো সুযোগ পাননি, অকালে লোকান্তরিত হন। তিনি মাত্র একচল্লিশটি বছর বেঁচেছিলেন। আরো বড়ো কথা, স্বক্ষেত্রে তাঁর কীর্তিকে গ্রাস করে নিয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসামান্য খ্যাতি। বিদ্যাসাগর মশায়ের সমকালবর্তী না হয়ে যদি কিছুটা দূরকালবর্তী মানুষ হতেন তাহলে বাঙালি সমাজ তাঁকে আজো হয়তো মনে রাখতো। আপন মহিমায় বিরাজমান থাকার অধিকার থেকে অদৃষ্টদেবতা মদনমোহনকে বঞ্চিত করেছে। একালে মদনমোহন তর্কালংকারকে আমরা মাঝে-মধ্যে স্মরণ করি তাঁর তরুণ বয়সে রচিত দুখানি কাব্যের জন্যে, তাঁর কয়েকটি সংস্কৃতকাব্যের প্রশংসনীয় সম্পাদনা-কর্মের জন্যে, আর তাঁর সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্যে।

১৮১৭ সালে মদনমোহন তর্কালংকারের জন্ম—নদীয়া জেলায়। বারো বছর

বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এখানে লোকশ্রুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সহপাঠী ও বন্ধুরূপে পেলেন। দুজনে একই শ্রেণীতে পড়েছেন। একই সময়ে উভয়ের ছাত্রজীবন শেষ হয়, ১৮৪২ সালে। তারপর মদনমোহন অধ্যাপক-জীবনে প্রবেশ করলেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক-বৃত্তি ছাড়বার পর ১৮৫০ সালে তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হলেন, এবং শেষে ১৮৫৫ সালে ওই স্থানের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেলেন। ১৮৫৮ সালে তাঁর মৃত্যু। এ অকাল মৃত্যু। আরো কতিপয় বৎসর জীবিত থাকলে, মনে হয়, অধিকতর উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পেতেন।

কবিশক্তি মদনমোহনের ছিল। তিনি নিজের কবিত্বক্ষমতার পরিচয় দেন কৈশোরের দিনে। সতেরো বৎসর বয়সে লিখলেন **'রসতরঙ্গিনী'**—তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। পুস্তকটি সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ-সংকলন। এতে আদিরসের আধিক্য। সেদিনকার সমালোচকগণ এ বইয়ের প্রশংসাই করেছিলেন। সতেরো বছরের এই কবিকিশোর তাঁদের বিস্মিত করেছিল। পাঠকেরও সমাদর পেয়েছিল 'রসতরঙ্গিনী'। অধুনা 'রসতরঙ্গিনী' অচলিত কাব্যগ্রন্থ। কবির লিখিত দ্বিতীয় কবিতার বই **'বাসবদত্তা'**। প্রকাশকাল—১৮৩৬। কবির বয়স তখন উনিশ বৎসর। তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হতে এখনো দেরি। তর্কালংকারের কৃত 'বাসবদত্তা' মৌলিক কাব্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের কবি সুবন্ধুর গদ্য-আখ্যায়িকা 'বাসবদত্তা'-য় বর্ণিত কথাবস্তু কাব্যখানিতে সংক্ষেপে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। অবিকল অনুবাদ এ নয়। ছন্দের ওপর মদনমোহনের বেশ অধিকার রয়েছে, দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাঁর কলাচাতুর্যের পরিচয় ফুটেছে। তবে যে-ছন্দোবৈচিত্র্য তিনি দেখিয়েছেন তার উজ্জ্বল আদর্শ কবি-শিল্পী ভারতচন্দ্র। ভাষা প্রয়োগ করতে গিয়েও মদনমোহন ভারতচন্দ্রের দিকে ঝুঁকেছেন। 'বাসবদত্তা'-র কাহিনী-বর্ণনায় রায় গুণাকরের কাব্যের ভাবানুসরণ অনায়াসলক্ষ্য। সহজে বোঝা যায়, বাঙালি কাব্যানুরাগীর দল ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যরীতির মোহ তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮৩৬-এর দিকে ভারত-কবির কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' নাট্যাকারে অভিনীত হচ্ছে, গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা শুনতে দলে দলে লোক এসে আসরে ভিড় জমাচ্ছে। দেখছি, 'বিদ্যাসুন্দর'-এর দুষ্ট প্রভাব একরূপ দুর্মর। নবীন যুগের মানুষ—সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র, বিদ্যাসাগরের সতীর্থ মদনমোহন তর্কালংকার—কাব্যনির্মাণে উৎসাহী হয়ে ভারতচন্দ্রের মতো কবিতা লেখার ঝোঁক দেখালেন, এ এক অদ্ভুত

ঘটনা। উনিশের শতকের তৃতীয় দশকের শেষের দিকে মদনমোহন এরূপ কাব্যপঙ্‌ক্তি নির্মাণ করতে দ্বিধান্বিত হয়নি :

ভালে ভাল বিকসিত অলকা বিলাসে।
মুখপদ্ম-মধু-আশে অলি আসে পাশে॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে-মুখসুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥…ইত্যাদি

—কাব্যাংশটিতে রায়গুণাকরের রচনার প্রতিধ্বনি সকলেই শুনতে পাবেন। তিনি যখন লেখেন : 'খেলই নাগর নাগরীকোলে। চুম্বই বিম্বাধর দু-কপোলে'—তখন ভারতচন্দ্রীয় কাব্যকৌশল মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়। আসল কথা হলো, যে-কোনো ক্ষেত্রে, নতুনের পথে পদক্ষেপ প্রতিভাসাপেক্ষ ব্যাপার; প্রতিভার অভাববশেই মানুষ নতুনের ভাবনায় মগ্ন না হয়ে পুরনো রাস্তায় পা মাড়ায়। অভিনব বস্তুনির্মাণের ক্ষমতা মদনমোহনের ছিল না, তাই, পুরাতন কাব্যপন্থাই তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।

অথচ সমাজচিন্তায় মদনমোহন যুগচেতনায় সঞ্জীবিত, যুগধর্মকে পাশ কাটিয়ে যাননি তিনি। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার ও বিধবাবিবাহ-প্রচলন-ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ-উদ্যমের কথা ভুলবার নয়। সমাজবিপ্লবী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা কখনো শিথিল হয়নি। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব যখন কলকাতায় 'হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়' [বর্তমান বেথুন কলেজ] স্থাপনে প্রয়াসী হলেন, তখন আরো দুচারজন শিক্ষিত বাঙালিসহ মদনমোহন তর্কালংকার বেথুনকে এই শুভকার্যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। 'তিনি নিজের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বিনা-বেতনে প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের শিক্ষাদন করিয়াছেন, এবং শিশু-শিক্ষা রচনা করিয়া তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকটা মোচন করিয়াছিলেন।' সদ্য-কথিত '**শিশুশিক্ষা**' মদনমোহনের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা। যে-'পাখী সব করে রব' কবিতাটি বাঙ্‌লার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আজো শ্রুতি-মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছে, তা এই 'শিশুশিক্ষা' পুস্তকেরই অন্তর্গত। এর ন্যায় শিশুরঞ্জক বর্ণপরিচায়ক গ্রন্থ অদ্যাপি খুব বেশি লেখা হয়নি। স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারকল্পে কিছু কিছু প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। এহেন কালসচেতন ব্যক্তি যে মদনমোহন, কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে নিতান্ত অনগ্রসরই থেকে গেলেন। তাঁর কবিতায় ভারত-চন্দ্রের জগতের পুনরাবৃত্তি শুনতে পাঠকের ভালো নিশ্চয়ই লাগবে না।

কিন্তু এরূপ করা ছাড়া মদনমোহনের উপায় ছিল না। সৃষ্টিপ্রক্রিয়াশীল কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না তিনি। অবশ্য মদনমোহন কেন, সে-যুগের ঈশ্বর গুপ্ত আর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। তবে এ দুজন কাব্যকার নবযুগের বাণী কিছু কিছু উচ্চারণ করেছেন; পক্ষান্তরে, মদনমোহন তর্কালংকার সর্বথা পুরাতনের প্রতিধ্বনি করে গেছেন। তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য একেবারেই দেখাতে পারেননি। একালের কাব্যামোদীদের কাছে তাঁর রচনা জীর্ণ অতীতের বস্তু।

[১০]

॥ বাঙ্‌লা গদ্যের প্রতিষ্ঠা ॥

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দত্ত

তত্ত্বঃবোধিনী পত্রিকাঃ বাঙালির সাহিত্যজীবন ও মনোজীবন-গঠনে বাঙ্‌লা সাময়িকপত্রের দান অল্প নয়। বিশেষে উনিশের শতকের গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশের খুব বড়ো একটি আসর সাময়িক পত্র-পত্রিকা। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিখ্যাত '**তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**' সম্বন্ধে আমরা দুচারটি কথা বলবো। 'তত্ত্বঃবোধিনী'-র পর্ব বাঙ্‌লা গদ্যের প্রতিষ্ঠার কাল। এই পর্বটিকে 'বিদ্যাসাগরের পর্ব' নামেও চিহ্নিত করা যায়। তত্ত্বঃবোধিনী-পর্বের দুজন মহারথী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। এস্থলে স্মর্তব্য, এ দুই স্মরণীয় পুরুষের জন্ম একই সালে—১৮২০ ইংরেজি সাল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত দুখানি সাময়িক পত্রিকার নাম ভুলবার নয়—স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকর' ও প্রথিতযশা মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী'। এদের সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বলা যায়, সেকালের সাহিত্যচর্চার প্রধান ক্ষেত্র 'প্রভাকর', আর বিবিধ জ্ঞানবিদ্যাচর্চার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র 'তত্ত্ববোধিনী'। প্রথমটি আমাদের সাহিত্যজীবনের পুষ্টিবিধানে সহায়ক হয়েছে, দ্বিতীয়টি আমাদের ভাবজীবন গঠন করেছে। 'প্রভাকর-এর রাজত্ব [সংবাদপ্রভাকর-এর প্রকাশকাল ১৮৩১] যখন মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।' তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশ বাঙ্‌লার সমাজ-সংস্কৃতি, বাঙ্‌লা গদ্য ও জ্ঞানের রাজ্যে উল্লেখনীয় একটি ঘটনা।

এই পত্রিকাখানির প্রকাশের সময়টি লক্ষ্য করতে হবে। বাঙ্‌লার সাহিত্য-সংসারে ঈশ্বর গুপ্ত তখন অধিনায়ক। সমাজে ইয়ং বেঙ্গল-এর বিদ্রোহ ও সংশয়বাদ প্রবল; তাছাড়া, সে-সময়ে আলেকজাণ্ডার ডাফের খ্রিস্টধর্ম-আন্দোলন জোর চলছে। বাঙালিসন্তান বিজাতীয় ধর্মের কবলে গিয়ে যাতে না পড়ে, য়ুরোপীয় ভাববন্যায় ভেসে না যায়, দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না হারায়, দেশের প্রতি তাদের উপেক্ষার মনোভাব না জন্মায়, এই উদ্দেশ্যে শ্রুতকীর্তি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর **'তত্ত্ববোধিনী সভা'** স্থাপন করেন—১৮৩৯ সালে। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার এবং যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ঐতিহ্যাশ্রয়ী। রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই ধারাটি একরূপ লোপ পেতে বসে। দেশে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনেও ভাটা পড়ে। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ পুনঃসংস্থাপিত করলেন দেবেন্দ্রনাথ। নিজেও তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম স্বীকার করে নিলেন। হিন্দুধর্মের ওপর খ্রীস্টানধর্ম-প্রচারকদের আক্রমণের প্রতিরোধ, জ্ঞানের বিস্তার, ধর্মবিষয়ক আলোচনা, ব্রাহ্মধর্মের উন্নতিবিধান, দেশের সংস্কৃতিকে জাতীয় ধারায় সংগঠন—এই উদার অভিপ্রায় সক্রিয় ছিল রামমোহনের ভাবধারার উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক সদ্য-কথিত তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের মূলে। দেখা যাচ্ছে, এ সভা বা প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ছিল বেশ বিস্তৃত। অল্পকালমধ্যে এর সভ্যসংখ্যা আটশতের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। এইসব সদস্যের সকলে সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না। দূরবর্তী স্থানের বাসিন্দা এরূপ অনুপস্থিত সদস্যদের কাছে ব্রহ্মসমাজের ব্যাখ্যান পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার সৌকর্যার্থে, একখানি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র প্রবর্তন [১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ]। এ কীর্তি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

তত্ত্ববোধিনী-র সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পত্রিকাখানির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন প্রতিভাসম্পন্ন যুবক অক্ষয়কুমার দত্ত। সাময়িকপত্রের সম্পাদকরূপে অক্ষয়কুমার যে-আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিলেন তার তুলনা খুব বেশি চোখ পড়ে না। এ পত্রিকা যে দেখতে দেখতে এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করলো, শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠলো, তা অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য পরিচালনায়। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। একটানা বারো বছর সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অক্ষয়কুমার। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দারুণ শিরঃপীড়া অবসর গ্রহণ করতে তাঁকে বাধ্য করলো। তখন, ১৮৫৫ সালে, আরেক

প্রতিভাধর ব্যক্তির ওপর এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়লো—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র। দুই দিকপাল। দুজনার নাম তত্ত্ববোধিনী-র সঙ্গে চিরকালের জন্যে যুক্ত হয়ে গেছে।

'তত্ত্ববোধিনী' ঠিক সংবাদপত্র ছিল না। এতে ধর্ম, দর্শন, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা থাকতো; অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত বহু প্রবন্ধ ছাড়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যান আর বিদ্যাসাগর মশায়ের লেখাও থাকতো। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'সংবাদপ্রভাকর' -এর সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী'-র পার্থক্য এইখানে যে, প্রথমোক্ত কাগজখানিতে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যমূলক রচনা তেমন প্রকাশিত হতো না। 'প্রভাকর' জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের দিকে ঝোঁক দেয়নি, গদ্যে-গদ্যে প্রধানত রসসাহিত্যই পরিবেশন করেছে। অবশ্য প্রাচীন কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ প্রভাকর-এর উল্লেখ্য একটি কীর্তি। বলতে পারি, বলিষ্ঠতর গদ্যভাষা-বিকাশের সহায়ক-হিসেবে তুলনায় তত্ত্ববোধিনী র স্থান অনেক উচ্চে। এ পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত লেখাগুলিও উল্লেখ করবার মতো। এতে প্রবন্ধাদি নির্বাচনের সমস্ত দায়িত্ব ছিল সম্পাদকের হাতে। কোনো মতবিরোধ হলেও এর প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদকের বিচারের ওপর হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমারকে তাঁর মত পরিবর্তনে রাজি করানোটাও অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তির কাছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হার মেনেছেন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটি অনেকটা গুরু-শিষ্যের ন্যায়। এ থেকে বোঝা যায়, কতখানি গভীর ও তীক্ষ্ণ ছিল অক্ষয়কুমারের মনস্বিতা।

তদানীন্তন বাঙ্‌লার সমাজজীবনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। অক্ষয়কুমারের লেখা এর প্রবন্ধগুলি শিক্ষিতসমাজ ঔৎসুক্যসহকারে পড়তেন। একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির ভাষায়: 'বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে-পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, আর-কোনো ব্যক্তি সেরূপ পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহ।' সত্যিই তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ রচনাবলী সেকালে দেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধনিচয় তত্ত্ববোধিনীর গৌরব বাড়িয়েছে। সমাজকল্যাণমূলক কত বিচিত্র লেখা বেরিয়েছে কাগজ-খানিতে, নতুন নতুন ভাবসম্পদে এর পৃষ্ঠা ভরে উঠেছে—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাখানিকে মুখ্যত আধ্যাত্মিক

ভাবাদর্শের বাহন করে তুলতে চেয়েছিলেন। এ কিন্তু হতে দিলেন না অক্ষয়কুমার। দেশের মানুষকে তিনি যুক্তিবাদের পথে টেনে আনলেন, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্বোধিত করলেন। এ লক্ষ্য করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন: 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমস্ত বাঙ্‌লায় য়ুরোপীয় ভাবপ্রচারের মিশনারি ছিল।' কী চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, আর, বাস্তবে কী দাঁড়ালো! বাঙ্‌লার রেঁনেসাস্‌কে 'তত্ত্ববোধিনী' অনেকখানি বেগবান করে তুলেছে। বাঙ্‌লা গদ্যে নবশক্তি সঞ্চারিত হয় এই পত্রিকার মারফৎ। এসব কথা মনে রাখলে তত্ত্ববোধিনী-র দান কী, উপলব্ধি করা যাবে।

পরবর্তী সময়ের কয়েকখানি উচ্চকোটির সাময়িক ও সাহিত্য-পত্রিকার অনুসরণীয় আদর্শ ছিল এই 'তত্ত্ববোধিনী'। এর যা-কিছু দেবার বাঙ্‌লাদেশ দুহাতে তা গ্রহণ করেছে। কিছুকাল পরে বহুখ্যাত 'বঙ্গদর্শন'-এর [১৮৭২ সাল] আবির্ভাব। ততদিনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নতুনকে স্থান ছেড়ে দিতেই হয়। বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কাগজখানির আবির্ভাবে বাঙ্‌লা সাহিত্যপত্রের ইতিবৃত্তে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এ দুয়ের মাঝখানে কয়েকখানি কাগজ বেরিয়েছে: 'সংবাদ-ভাস্কর' [১৮৪৮), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' [১৮৫১], 'মাসিক পত্রিকা' [১৮৫৪], সোমপ্রকাশ [১৮৫৮], 'রহস্যসন্দর্ভ' [১৮৬৩], ইত্যাদি। এগুলির নামও স্মরণে রাখবার মতো। তবে এগুলিকে 'তত্ত্ববোধিনী' কিংবা 'বঙ্গদর্শন'-এর সমপর্যায়ে বিন্যস্ত করা চলে না।

অক্ষয়কুমার দত্ত ঃ 'তত্ত্ববোধিনী'-পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক অক্ষয় দত্ত। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে উজ্জ্বল একটি নাম। উনিশের শতকের বাঙ্‌লার নবজাগরণে এই মনীষীর প্রতিভার দান প্রচুর। কিন্তু হাল আমলের সাহিত্য-পাঠকগোষ্ঠী অক্ষয়কুমারের খবর বড়ো-একটা রাখেন না। না রাখুন। এতে তাঁর গৌরব-মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস অক্ষয়কুমার দত্তকে কখনো ভুলবে না।

অক্ষয় দত্ত। জ্ঞানমার্গের ক্লান্তি-না-জানা পথিক। অতৃপ্য তাঁর জ্ঞান-পিপাসা। জ্ঞানের দ্যুতি তাঁর মস্তিষ্ক ও মুখমণ্ডলকে সর্বদা দীপ্যমান করে রেখেছে। প্রবলভাবে যুক্তিবাদী তিনি। নৈয়ায়িক প্রতিভায় অক্ষয়কুমার বিশিষ্ট। তাঁকে এদেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বড়ো একজন পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। দেশবাসীর মনের অন্ধ-সংস্কারের আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন অক্ষয় দত্ত; তাদের

চিত্তের জড়তা নিঃশেষে মুছে যাক, এ ছিল তাঁর অভিলষিত। তাঁর সাহিত্যসাধনা বাঙালি জাতির কল্যাণসাধনের পবিত্র ব্রতের নামান্তর-মাত্র। স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যভিমান অক্ষয় দত্তের লেখায় লক্ষ্য করতে হবে।

নবদ্বীপের চুপি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। জন্ম ১৮২০ সালে। অল্পবয়সে পিতার কাছে তিনি চলে আসেন কলকাতার খিদিরপুরে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে বিদ্যাভ্যাসের জন্যে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের বিরোধিতায় বেশিদিন পড়াশুনা করতে পারলেন না। পিতা মারা গেলেন। তাঁকে স্কুল ছাড়তে হলো। জীবিকার পথ দেখতে হবে। এদিকে জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁকে পেয়ে বসেছে। একদিকে বাস্তব সংসারের নিষ্ঠুর তাড়না, অন্যদিকে, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের দুর্বার স্পৃহা। উভয়ের মধ্যে বিরোধ গুরুতর।

এরূপ যখন অবস্থা, তখন প্রসন্ন ভাগ্য তাঁকে ঈশ্বর গুপ্তের সান্নিধ্যে নিয়ে এলো—'সংবাদ প্রভাকর'-এর বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গুপ্ত-কবি অক্ষয় দত্তকে তাঁর কাগজে লিখতে বললেন। এভাবে গদ্য লেখার প্রথম পাঠ নিলেন তিনি। শোনা যায়, কিছু পদ্য-রচনাও তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। বোধ করি এ কিশোরদিনের স্বাভাবিক চাপল্য। অক্ষয়কুমার বুদ্ধিবৃত্ত লেখক—হৃদয়াবেগ-প্রধান কাব্যলোক তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহরণক্ষেত্র নয়। কবিতা ছেড়ে তিনি গদ্য নির্মাণে মন দিলেন। 'প্রভাকর' পত্রিকায় কয়েকটি লেখা ছাপা হলো। এসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয় দত্তের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' খুলেছেন। এই প্রতিভাবান যুবকটি 'পাঠশালা'-র শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন। এতে তাঁর বিদ্যানুশীলনের পথ কিছুটা উন্মুক্ত হলো। 'পাঠশালা'-র জন্যে পাঠ্যবই দরকার। অক্ষয়কুমার লিখলেন 'ভূগোল'। এ তাঁর প্রথম গ্রন্থ। এরপর মহর্ষির উদ্‌যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হলে [১৮৪৩ সাল] অক্ষয় দত্তের ওপর তার সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হলো। এবার নিজের প্রতিভা প্রকাশের স্বক্ষেত্রটি তিনি পেলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত, অক্ষয়কুমারের সম্পাদিত, 'তত্ত্ববোধিনী' একখানি অভিজাত পত্রিকা। এর পাতায় মুদ্রিত অক্ষয়কুমারের নানাবিষয়িনী রচনা সেদিনকার ইংরেজিশিক্ষিত নবীনদের মস্তবড়ো একটি আকর্ষণের সামগ্রী ছিল। তত্ত্ববোধিনীর কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার মূলে এর সম্পাদকের কৃতিত্ব রয়েছে অনেকখানি। পরে বিদ্যাসাগর এসে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তত্ত্ব-বোধিনী-কে মাধ্যমরূপে না পেলে অক্ষয় দত্তের মনীষার পূর্ণায়ত প্রকাশ হতো

কিনা, সন্দেহ। সুদীর্ঘ বারোটি বছর এ পত্রিকার সেবা করেছেন তিনি—অনবচ্ছিন্ন নিষ্ঠাসহকারে।

অক্ষয়কুমারের প্রণীত প্রধান বইগুলি হচ্ছে: 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' [দুই ভাগে সমাপ্ত], 'চারুপাঠ' [তিন ভাগে সমাপ্ত], 'ধর্মনীতি', এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' [তিন খণ্ডে সমাপ্ত]। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে তাঁর সর্বোত্তম রচনা।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—প্রকাশিত হয় ১৮৫২ ও ১৮৫৩ সালে। ঠিক মৌলিক গ্রন্থ এ নয়। বইখানি জর্জ কুম্ব-এর [Gecrge Combe—স্কটল্যাণ্ডদেশীয় একজন লেখক] 'The Constitution of Man in Relation to External Objects' নামীয় গ্রন্থের ভাবানুসরণে রচিত। ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা হলেও এতে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার পরিচয় স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে, নতুন কথা সংযোজিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে লেখক প্রাকৃতিক নিয়ম, সামাজিক নিয়ম প্রভৃতি বিবিধ নিয়মপালন ও তার সুফলের বিষয়ে আলোচনা করেছেন; বিধাতার সৃষ্ট নিয়মরাজির বিরোধিতা করলে নিশ্চিত দুঃখভোগ—বোঝাতে চেয়েছেন, এবং মদ্যপানে শরীরের সাংঘাতিক ক্ষতি, বলেছেন। এ মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় আলোচনা, স্বীকার করতে হবে। গ্রন্থখানি পড়ে দেশের শিক্ষিত লোকেরা নিজেদেব জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিষয়ে সাবধানী হয়ে উঠেছিলেন—শুরু কবে দিয়েছিলেন নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা ও নিরামিষ ভোজন; অনেকে প্রতিজ্ঞা করলেন, সুরা স্পর্শ করবেন না। অক্ষয়কুমারের উপস্থাপিত যুক্তিধারা মোটেই উপেক্ষার বস্তু নয়, তাঁর আলোচিত নীতিধর্ম পরিবারে ও সমাজে অবশ্যই পালনীয়। তৎকালীন বাঙালির ওপর বর্তমান লেখকের উপদেশমূলক রচনা কম প্রভাব বিস্তার করেনি। তাঁদের অসংগত উদ্দাম আচরণ এর দ্বারা বেশ-কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল।

১৮৫৬-তে তাঁর **'ধর্মনীতি'** বইয়ের আকারে বেরুলো। সমাজে এ আলোড়ন তুলেছিল। রচয়িতার যে-নীতিবোধ এতে প্রতিফলিত, বহুকালাগত দেশাচারের মূলে তা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই বইখানিতে লেখক সমাজসংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কাজেই, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ একে ভালো চোখে দেখতে পারেনি। না পারুক। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ কোন্ বিবেকী মানুষ সমর্থন করবে! বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ সমাজে চালু হলে হিন্দুসমাজব্যবস্থার কী ক্ষতি—লেখকের জিজ্ঞাসা। বলা বাহুল্য, প্রগতিবাদীদের কাছে 'ধর্মনীতি' সমাদরই পেয়েছিল।

তারা বুঝলো, আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা জীর্ণ হয়ে পড়েছে, যুগধর্মের বিরুদ্ধে চলছে, সুতরাং এর আশুসংস্কারসাধন কর্তব্য। যুগের হাওয়াবদলের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আধুনিক চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। 'ধর্মনীতি'-তে চরিত্রনীতি ও সমাজনীতি মুখ্য আলোচ্য। গৃহকর্ম ও গৃহধর্মের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দুনারীপুরুষের দাম্পত্যজীবনের আদর্শ কীরূপ হওয়া উচিত, বালক-বালিকাদের চরিত্রগঠনের জন্যে কীরকম শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য, ইত্যাদি অনেক বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। এখানেও লেখক ইংরেজি গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছেন।

অক্ষয়কুমারের কৃত **চারুপাঠ'** [তিন ভাগ: প্রকাশকাল—যথাক্রমে ১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৫৯ অব্দ] একদা বহুল প্রচারিত একখানি গ্রন্থ, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে লেখা। বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যনিষ্ঠ বিচিত্র রচনা 'চারুপাঠ'-এ দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যার্থীগণের জ্ঞানের পরিধি বাড়ুক, নীতিধর্মের সঙ্গে তারা পরিচিত হোক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসংসারের দিকে পড়ুয়ারা খোলা চোখে তাকাক, এই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক 'চারুপাঠ' লিখেছেন। এ জাতের পাঠ্যপুস্তক অদ্যাপি বেশি লেখা হয়নি। বিষয়গৌরবে এ অতিশয় সমৃদ্ধ। অক্ষয় দত্তের পাণ্ডিত্য সংশয়াতীত, জ্ঞানের সাধনায় তিনি অক্লান্ত। তাই বলে তিনি সুকুমার কল্পনার কাছে কদাপি ধরা দেন নি, এরূপ ধারণা থাকলে, ভুল করা হবে। 'চারুপাঠ'-এর পাতা উল্টোলে দেখা যাবে, মাঝে-মধ্যে অক্ষয়কুমার কল্পনার পারবশ্য স্বীকার করেছেন। জ্ঞানবিতরণ মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এ বইতে সাহিত্যরসের উদ্বোধন লক্ষণীয়। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'স্বপ্নদর্শন' নামাঙ্কিত তিনটি প্রবন্ধ সত্যিই উপভোগ্য। এগুলি রচনার প্রেরণা অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজ লেখক এডিসনের 'Vision of Mirza' নামক বিখ্যাত রচনা থেকে। প্রেরণা যেখান থেকেই পান, এখানেও অক্ষয়কুমার নিজের সৃষ্টিক্ষমতা দেখিয়েছেন, নিছক অনুবাদক থেকে যাননি।

অতঃপর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়'**-এর কথা। এর দুটি ভাগ। প্রথম ভাগ ১৮৭০ অব্দে, এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ অব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির তৃতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি অধুনা পাওয়া গেছে, পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপাও হয়েছে। বর্তমান পুস্তকটিকে অক্ষয় দত্তের স্মরণীয় সেরা কীর্তি বলা যেতে পারে—বাঙালির উচ্চতর গবেষণার সুদীপ্ত নিদর্শন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, লেখক যখন মাথার অসুখে একরূপ শয্যাশায়ী, তখনো তিনি

কলম ছাড়েননি, এই গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ লিখে শেষ করেন। এর রচনায় তাঁর প্রধান অবলম্বন উইলসন সাহেবের প্রণীত কয়েকটি নিবন্ধ ও বক্তৃতাবলী—'Essays and Lectures on Hindu Religion'। ইংরেজি পুস্তক থেকে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে ঠিক, তথাপি এতে অক্ষয়কুমারের মনীষার নির্ভুল পরিচয় আছে। তিনি বইখানি রচনা করতে বসে আরো কয়েকটি উৎস থেকে তথ্য সমাহরণ করেছেন। ফলে অনেক নতুন বিষয় এতে দেখা যায়, উইলসন যার সন্ধান জানতেন না। কাজেই বলা চলবে না, অক্ষয় দত্ত উইলসনের বই অনুবাদ করেই কাজ সেরেছেন। কঠিন রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি গবেষকের দায়িত্ব ভুলেন নি, নতুনের বিষয়ে কৌতূহলী থেকেছেন, অন্যের অপরিচিত পথে পা বাড়িয়েছেন। উইলসন সাহেবের সঙ্গে তুলনায় তাঁর আলোচনার পরিধি বিস্তৃততর। বইখানিতে কত কত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে! কত গ্রন্থ, কত শাস্ত্র গভীরভাবে তিনি অনুশীলন করেছিলেন! য়ুরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনে কারূপ তাঁর ব্যুৎপত্তি! সেকালের কোনো বাঙালি এমন তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখেন নি। একালেও এজাতের বইয়ের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোণা যায়। ব্যাপক অধ্যয়ন ও অতন্দ্র অধ্যবসায়ের জন্যে অক্ষয়কুমার দত্তকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারি না। সার্থক তাঁর সাহিত্যসাধনা। বিদেশি লেখকের রচনাভাণ্ডার থেকে তিনি বহুতর বিষয় কুড়িয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর সন্ধানপরতা ও উপস্থাপনের কৌশলে ওই সমাহৃত বিষয়বস্তু নতুন রূপ ধরেছে। গ্রহণ-বর্জন-পরিবেশনের গুণে অনুবাদকর্মও অনেকটা মৌলিক রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নিজেদের গ্রন্থনির্মাণের ক্ষেত্রে এক অভিনব মৌলিকতার পরিচয় রেখে গেছেন।

রচনায় সাধুগদ্যভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন অক্ষয়কুমার; তা প্রাঞ্জল ও যথাযথ। বাঙ্‌লা গদ্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক তিনি, বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যকোনো শ্রেণীর সাহিত্যকর্মে তিনি হাত দেননি। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমাদের প্রবন্ধকারদের মধ্যে তাঁর স্থান উচ্চে। এও স্বীকার করতে হয়, বাঙ্‌লা প্রবন্ধ সুঠাম একটি অবয়ব পেলো তাঁরই হাতে। ভাষায়, ভাবনার গ্রন্থনে, শিথিলতাকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেননি, চিন্তাধারায় বিশৃঙ্খলতা দেখাননি, বক্তব্যকে অস্বচ্ছ করে তোলেননি। মননের ঋজুতা, যুক্তির বলিষ্ঠতা, তথ্যবিন্যাসের কুশলতা, ইত্যাদির জন্যে অক্ষয় দত্তের রচনাবলী অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর গদ্যরচনারীতি বিদ্যাসাগরের সমসূত্রে উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রধানত ভাবধর্মী, ওতে হৃদয়াবেগের প্রচুর স্পর্শ লেগেছে। অক্ষয়কুমারের

গদ্যরীতির চেহারা স্বতন্ত্র,—রামমোহনের পথে এগিয়ে গিয়ে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যাশ্রয়ী গদ্যেরই অনুশীলন করেছেন। এরূপ গদ্য ছাড়া দর্শন-বিজ্ঞানাদির আলোচনা সম্ভব হতে পারে না। রামমোহনের গদ্য যুক্তিপন্থী হলেও তাতে অনায়াস গতি ছিল না। অক্ষয়কুমারের হাতে বাঙ্‌লা গদ্য অপেক্ষাকৃত সাবলীল হয়ে উঠেছে, প্রাঞ্জলতা পেয়েছে অথচ তথ্যভার-বহনের দৃঢ়তাটি হারায়নি। অবশ্য স্বীকার করতে হবে, সৃষ্টিমূলক সাহিত্যনির্মাণের মতো কল্পনা তাঁর ছিল না; যাকে বলে জ্ঞানের সাহিত্য, তারই নির্মাতা তিনি। অক্ষয় দত্ত যুক্তিধর্মী গদ্যের যে-পথটি প্রশস্ত করেন, 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর বঙ্কিম, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ লেখক সেই পথেরই অনুসারী।

অক্ষয়কুমারের গদ্যের কিছু নমুনা:

॥ ১ ॥ 'বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পরমসুখোদ্দেশ্য উদ্বাহক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে। পরস্পর-বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত মতাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধিচালনা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে কত কত দম্পতি মহা অসুখে কালযাপন করিয়া থাকেন। উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটার একমাত্র কারণ।'

—বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

॥ ২ ॥ 'ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিজনিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীশ্বর জগতের কোনো পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিব ঐ অভিপ্রায়েই তিনি তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

—ধর্মনীতি

॥ ৩ ॥ 'যদি জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ-গুণ থাকিত, আর তাহার প্রতিবিধানার্থে কোনো শক্তি না থাকিত তবে সমুদায় জড়-পদার্থ পরস্পর দৃঢ়তর আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড হইত। কিন্তু তেজ নামে এক পদার্থ থাকাতে ঐ প্রকার বিপত্তি ঘটনার নিবারণ হইয়াছে।'

—পদার্থবিদ্যা

॥ ৪ ॥ 'আহা কী দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরবপরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে এক পরমশোভাকর অপূর্ব পর্বত দর্শন করিলাম। সে পর্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ; মনুষ্যব্যতিরেকে আর কোনও জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই।'

—চারুপাঠ

—পরিচ্ছন্ন চিন্তার সহজসুন্দর প্রকাশ, বক্তব্যের অস্বচ্ছতা কোথাও চোখে পড়ে না; ভাষা প্রায়-সর্বথা নিরাবেগ, যুক্তিক্রমের একান্ত অনুগত, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ-ই অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যলিখনভঙ্গি। সমকালীন লেখক হয়েও গদ্যরীতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক ভিন্নতর প্রদেশের অধিবাসী। দুজনার মনের গঠন একেবারে আলাদা। উভয়ের গদ্য-রচনা-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কবি-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলছেন:

'অক্ষয়কুমারের ভাষায়···জ্ঞানমার্গের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। মধ্যাহ্নদীপ্ত তাঁহার জগতে ছায়া নাই, ভাষার ধ্বনির উচ্চাবচতাজাত বৈচিত্র্য নাই; ছোট-বড়, দূর-নিকট সকলের উপরেই তাহার সমান গুরুত্ব, অল্প পড়িলেই ক্লান্তি আসে, অথচ বিশ্রামের ছায়ানিকুঞ্জের অভাব। একমাত্র চন্দ্রলোকের মরুভূমির সঙ্গেই তাঁহার স্টাইলের তুলনা চলিতে পারে; পৃথিবীর মরুভূমি সর্বত্র সমান নীরস নয়—মাঝে মাঝে মরূদ্যান আছে।

অক্ষয় দত্তর স্টাইল একপ্রকার গদ্যপয়ার; তাহার শক্তি একান্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাহা একান্ত শক্তিমান।

বিদ্যাসাগরের ভাষা পার্বত্যজগৎ; পথ দুরারোহ, পাথর কঠিন, ভাষা দুরূহ, চড়াই আকাশমুখী, উৎরাই পাতালমুখী, ক্লান্তি অগাধ, কিন্তু বিশ্রামের কুঞ্জবনের অভাব নাই; রৌদ্র প্রখর কিন্তু ছায়াও বিরল নয়, পাহাড় উচ্চ কিন্তু সুগভীর উপত্যকা জনপদখানিকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে; আর তাহারই একান্তে উদ্গত-অশ্রু জানকীর মতো ঝর্ণাধারা নিরন্তর স্বগত বিলাপ করিয়া মরিতেছে। এই ঝর্ণাতলায় একবার বসিবার আশায় উৎকট চড়াই ভাঙিতে কে না রাজী হইবে?

বিদ্যাসাগরের ভাষাই প্রথম স্টাইল। অক্ষয় দত্তর ভাষাকে স্টাইল বলা বৃথা, তাহা স্টাইলের খসড়া মাত্র।

বিদ্যাসাগরের ভাষা গদ্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তাহাতে হৃদয়াবেগের যথেচ্ছ যতিপাত আছে; অক্ষয় দত্তর গদ্যপয়ারে হৃদয়াবেগের উত্থানপতন নাই, ধনুকের টঙ্কারের মতো তাহাতে একপ্রকার শুষ্ক কঠিন শব্দমাত্র ধ্বনিত হয়।'

শুধু যদি গদ্য রচনার রীতির দিকটাই বিচার্য বলে ধরি, তাহলে বলবো, এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের স্থান বিদ্যাসাগরের নীচে—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও।

তথাপি অক্ষয়কুমার দত্তের কলমের প্রশংসা না করে পারি না। সে-যুগে তিনিই প্রথম আমাদের দেখিয়ে দিলেন, বাঙ্‌লার ন্যায় একটি ভাষায় যুক্তি-নির্ভর বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য-নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন-কিছু নয়।

॥ আধুনিক বাঙ্‌লা গদ্যের যথার্থ প্রথম শিল্পী ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

সেই ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষটি! অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তায় এক অটল দুর্গ যেন। চির-উন্নত-শির। কোনো প্রতিকূল শক্তির কাছে কখনো মাথা নোয়ান নি। কী প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, দুর্ধর্ষ আত্মস্বাতন্ত্র্য, অখণ্ড মনুষ্যত্ব। পৌরুষ-বীর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আবার, আমৃত্যু মানবপ্রেমের সাধক। সর্বদা পরদুঃখকাতর। হৃদয়-দেশটি অফুরন্ত করুণার উৎস। দুর্গতজনের ম্লান মুখটি দেখলেই অশ্রুপাত করেন, উদ্বেল সহানুভূতি চিত্তের বিগলন ঘটায়। যতক্ষণ-না দীনদুঃখীর কষ্ট লাঘব করতে পারছেন ততক্ষণ মনের স্বস্তি নেই তাঁর। মমতার হাতের পুতুল বুঝি। লোকে বলে, দয়ার সাগর। কঠোর-কোমলের কী অদ্ভুত একত্র সমাবেশ! সমুদ্রবক্ষেও অগ্নি জ্বলে, জলভারনত মেঘপুঞ্জের বুকেও বজ্র লুকিয়ে থাকে। অনুরাগে কোমল, প্রতিবাদে বজ্রকণ্ঠ—রৌদ্রীমূর্তির সে কী বহ্নিমান্ প্রকাশ!

এই মানুষটি কে? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লার লোকাধিনায়ক। সর্বজনপরিচিত। বিদ্যাসাগরের নাম শোনেনি এমন বাঙালি-সন্তান কেউ আছে, বিশ্বাস করতে মন চায় না। রাজ্যেশ্বর ও দীনতমের গৃহে তাঁর আদরের আসনটি সর্বদা পাতা। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ধুতি-চাদর-চটিধারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অভিজাতের অভিজাত। সামাজিক মানমর্যাদায় সেকালে গোটা দেশের সেরা অভিজাতশ্রেণীর মানুষগুলিকেও বহুদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পাশে দাঁড় করালে বৃহৎও অতিক্ষুদ্র বলে প্রতিভাত হতো। বিদ্যা-

সাগরের সমুন্নত মহিমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারেন এহেন বাঙালি তৎকালীন বঙ্গ-ভূমিতে একজনও ছিলেন না। হিমালয়কে ডিঙোবে কার সাধ্য! —'ভারতবর্ষে এমন কোনো রাজা-মহারাজা নেই যার মুখের উপর এই চটিপরা পায়ের ঠোক্কর দিতে পারি না'—একদা শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র—'বীরসিংহের বীর শিশু'টি। একি ঈশ্বরচন্দ্রের অশোভন অহমিকার উলঙ্গ অভিব্যক্তি? মোটেই নয়। এ হলো আত্মপ্রত্যয়শীল—আত্মশক্তিনির্ভর—পুরুষের সহসা-উচ্চারিত একটি উক্তি। আকাশস্পর্শী দেমাকের কোনো প্রশ্নই এখানে ওঠে না। পুরুষকারের সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেছিলেন দরিদ্র ঘরের মানুষ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সন্তানটি—নির্ভীক-চরিত্র পণ্ডিত রামজয় তর্কভূষণের পৌত্র। দূরবিস্তার অত্যুজ্জ্বল মহিমায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একক। তিনি সেকালের বিস্ময়, এবং একালেরও।

১৮২০ অব্দে বিদ্যাসাগরের জন্ম। জন্মস্থান--মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ নেওয়া শেষ হলে নয় বৎসর বয়সে [১৮২৯-এ] কলকাতায় পড়তে এলেন। পিতা ঠাকুরদাস তখন এ শহরে মাত্র বার টাকা মাইনের চাকুরে। সংসার চালাতে কষ্ট হয়। দারিদ্র্য কিন্তু মেধাবী পড়ুয়া ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসে এতটুকু ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশের ছেলে। সংস্কৃতবিদ্যার চর্চা করতে হবে। তাই, ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে। মনে রাখতে হবে, যুগটি ইংরেজিশিক্ষার। সংস্কৃতানুশীলন ওই সময়ে অনেকটা সেকেলে হয়ে পড়েছে। এ কারণে সকলেরই ঝোঁক হিন্দুকলেজে ঢোকবার দিকে। পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ীর এই সন্তানটি কিন্তু সেদিকে ঘেঁসলেন না, যুগবাহিত দেশীয় বিদ্যাকেই বরণ করলেন। কিঞ্চিদধিক বারো বছর সংস্কৃত কলেজে পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র, প্রায় সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করে নিলেন, সমস্ত পরীক্ষায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখালেন। একুশ বৎসর বয়সে [১৮৪১-এ] উপাধি পেলেন—'বিদ্যাসাগর'। সাধারণ্যে এত পরিচিত এই উপাধি যে, অনেকে একে এই মহাপুরুষটির নাম বলেই জানতো। উপাধি উপাধিধারীর প্রকৃত নামটিকে এভাবে গ্রাস করে নিয়েছে এ সচরাচর দেখা যায় না।

বিচিত্রবর্মান্বিত ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন—স্মরণসুন্দর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছেন তিনি, সেখানে বাঙ্‌লা বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ পেয়েছেন এবং ট্রেজররের কাজ করেছেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি, অধ্যাপক, এবং স্বল্পকিছুকাল পরে অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। এ

কলেজের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করেন ঈশ্বরচন্দ্র—কলেজটিকে এদেশে সংস্কৃতশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সংগঠনশক্তির প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। সে-যুগের বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দান বিপুল। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় এমন কর্মীপুরুষ খুব বেশি চোখে পড়ে না। কত বাধাবিপত্তির পাহাড় ঠেলে তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, বাঙলাদেশের বিভিন্ন পল্লীঅঞ্চলে বহু স্কুল গড়ে তুলেছেন। শিক্ষাবিস্তারের দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। হিন্দুসমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সংস্কার-আন্দোলনে নেমে তাঁকে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলন করতে যখন কৃতসংকল্প হলেন তখন কেউ কেউ তাঁকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার বড়যন্ত্রও করেছে। মৃত্যুভয় পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্রকে আপনার সংকল্প থেকে চ্যুত করেনি। এতে তাঁর কর্তব্যবোধ বহুগুণ বেড়ে গেছে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়েছেন তিনি। সমাজসংস্কারক রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ক্লান্তিহীন যোদ্ধা; এঁদের মহামন্ত্র ছিল—কার্যের সাধন কিংবা শরীর পাতন। উভয়েই বিজয়ীর বরমাল্য পেয়েছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত অসুস্থতানিবন্ধন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৫ সালে তার সম্পাদন-ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। সরকারি চাকুরি ভালো না লাগাতে ঈশ্বরচন্দ্র চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়েব দিকে ঝুঁকলেন, স্থাপন করলেন 'সংস্কৃত বুক ডিপো' ও 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি'। এক্ষেত্রে তিনি সাফল্যও লাভ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তি যে একদা চাকুরিতে ঢুকেছিলেন এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। আত্মমর্যাদা-বিষয়ে কত সচেতন ছিলেন তিনি! তাঁর মর্যাদায় যে-কেউ আঘাত হেনেছে, বীরের ন্যায় সেই আঘাত তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজরাজপুরুষরা পর্যন্ত তাঁর সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করতে সাহস পেতেন না। নিজের আভিজাত্যকে বরাবর অক্ষত রেখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

ইংরেজ সিবিলিয়ানদের পড়াতে এসে তিনি ইংরেজি শিখে নেন, এবং সেই সঙ্গে হিন্দিও। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে তাঁর সে কী নিষ্ঠা! তেমনি অদ্ভুত তাঁর কর্মদক্ষতা। বলতে গেলে বিদ্যাসাগর মশায়ের একক প্রচেষ্টায় মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হলো। এটি বাঙালির প্রথম বে-সরকারি মহাবিদ্যালয়। স্থাপনা-

কাল ১৮৭২ সাল। অধুনা এই শিক্ষায়তনেরই নাম বিদ্যাসাগর কলেজ। দেশের দিকে দিকে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হোক, এর স্পর্শে দেশের মানুষের মন থেকে মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধতা মুছে যাক, পুরুষের সঙ্গে নারীজাতিও শিক্ষিত হয়ে উঠুক, এ ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের অভিপ্রেত। তাঁর অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়নি। দয়াবিতরণের ক্ষেত্রে তো বিদ্যাসাগরের নাম প্রবাদে পরিণত হয়েছে। অগাধ মানবপ্রেমের বশেই ঈশ্বরচন্দ্র 'দয়ার সাগর'। বাঙালি তাঁর প্রতি চরম কৃতঘ্ন আচরণ করেছে। তথাপি তাঁকে যে তাঁরা দয়ার সাগর বলে জেনেছে এ মস্তবড়ো সান্ত্বনার কথা। সমাজের শত্রুতায় শান্তি কখনো তিনি পাননি, নৈরাশ্যের তীব্র বেদনায় তাঁর শেষ-জীবন তিক্ত হয়ে উঠেছে। তাই, মাঝে মাঝে কর্‌মাটারে গিয়ে তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকবর্জিত সরলপ্রাণ সাঁওতালদের সঙ্গ তিনি কামনা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভাঙতে থাকে, মানসিক অশান্তিরও শেষ নেই, দারুণ আশা-ভঙ্গ মুখে গাঢ় বিষাদের ছায়া ফেলেছে। এরূপ অবস্থায় ১৮৯১-তে জীবনযুদ্ধের এই অপরাজেয় সৈনিক ইহধাম ছেড়ে গেলেন। এতদিনে তাঁর আত্মার স্বস্তি—শান্তি—মুক্তি।

* *

বাঙ্‌লা গদ্য ও বিদ্যাসাগর—ব্যাপক একটি আলোচনার বিষয়। এ নিয়ে দীর্ঘায়তন নিবন্ধ লেখা চলে। এতখানি অবকাশ আমাদের হাতে নেই। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে বাঙলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক দানের পরিচয় বাণীবদ্ধ করবো। মনে রাখা প্রয়োজন, ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা তাঁর কর্মসাধনারই একটি প্রকাশ মাত্র। বিবিধ সংস্কার-আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়ে তিনি হাতে লেখনী ধারণ করেন। সাহিত্যনির্মাণের কোনো সজ্ঞান অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি যা লিখে গেছেন তা তাঁকে বাঙ্‌লা গদ্যের প্রথম সাহিত্যশিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর মশায়কে কেউ কেউ বাঙ্‌লা গদ্যের জনক আখ্যা দিয়ে থাকেন। এ খুব অযথার্থ নয়। কারণ, বর্তমান গদ্যের বিশিষ্ট ভঙ্গিটি—এর বাক্যাংশের স্থাপন, ক্রিয়ার স্থাপন, সংযোগাত্মক অব্যয়গুলির যথাযথ ব্যবহারে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্যের সংগঠনের রীতিটি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম ভালো করে আমাদের দেখিয়ে দিলেন। বাঙ্‌লা বাক্যের উচ্চারণে কয়েকটি শব্দের পর পর যে যতি দেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে, এও বিদ্যাসাগর মশায় অনুভব করেছিলেন। ফলত, তাঁকে আমাদের গদ্যের স্রষ্টা বলা না গেলেও [কোনো-একজনমাত্র লেখককে

বাঙ্‌লা গদ্যের জনক বলা যেতে পারে না, নানা লেখকের—যেমন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রভৃতির—যৌথ সাধনায় গদ্যভাষার বিশিষ্ট মূর্তিটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে] আধুনিক গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। প্রাক্-বিদ্যাসাগর যুগে আমাদের গদ্যসাহিত্য ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক গদ্য নামে বস্তুটি ছিল না। এই সাহিত্যিক গদ্য প্রথম বেরুলো ঈশ্বরচন্দ্রের কলম দিয়ে। ইতঃপূর্বে অপর কোনো বাঙালি লেখক গদ্যকে কলালক্ষ্মীর রসান্তঃপুরে স্থান দেননি। বিদ্যাসাগর মশায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙ্‌লা গদ্যে নতুন যুগের সূত্রপাত হলো। এ নতুনতা ভাষায় বিষয়-বস্তুর সারস্বত প্রকাশে—যার গুণে রচনা রসিক পাঠকের মন কেড়ে নেয়। বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যের বেদীতে 'সুন্দর'-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সহজাত শিল্পবোধ তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁকে সৌন্দর্যের সাধক করে তুলেছে।

বিদ্যাসাগরের লেখা প্রথম বই **'বেতালপঞ্চবিংশতি'**—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একখানি পাঠ্যপুস্তক। প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ অব্দে। এ গ্রন্থ হিন্দি 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে রচিত। বইটি পাকা হাতের লেখা অবশ্যই নয়। না হলেও এতে বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির ছাপ কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে দেখলে, ১৮০১ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত যত বাঙ্‌লা গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে, তুলনায় 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হয়। এখানে প্রযুক্ত ভাষা বক্তব্যের বাহন মাত্র নয়, বইখানিতে তদতিরিক্ত-কিছুও আছে ; এ হলো বাক্যগঠনরীতির সুষমা, ভারসাম্য, ছন্দোময় বাগ্‌বিন্যাস, সংস্কৃতের গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্বনিতরঙ্গ, অলংকরণসৌন্দর্যের সুরভি, ভাষার সুশ্রব্য সরসতা ও প্রাঞ্জলতা এবং কমনীয় মাধুর্য। পূর্ববর্তী গদ্যলেখক মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার-আদির রচনায় ভাষাসৌষ্ঠব—ভাষার সুষম গতি ও ছন্দঃস্রোত—সুলভ নয়।

কেবল পদ্যেরই ছন্দ রয়েছে তা নয়, উৎকৃষ্ট গদ্যরচনাও ছন্দে ধৃত। অবশ্য গদ্যের ছন্দ অন্তঃপ্রবাহী বলে অনতিলক্ষ্য। বিদ্যাসাগর মশায়ের বড়ো কৃতিত্ব, বাঙ্‌লা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ ও বাঙ্‌লা গদ্যের ঝংকার তিনিই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রণীত প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' এর সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। এর জন্যে তাঁকে কানের সাধনা করতে হয়েছিল—গদ্যের অন্তঃপ্রকৃতিটি বুঝে নেওয়ার সাধনা। আমাদের গদ্যের যে-ছন্দাভিত্তি সজ্ঞানভাবে তিনি স্থাপন করলেন, স্টাইলের রাজা বঙ্কিম-রবীন্দ্রের শিল্পশোভাময় অনুপম গদ্যকর্ম তার ওপরে

দাঁড়িয়েই সাহিত্যতীর্থের পথিকদলের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর লেখকগণের রচনায় দুর্বোধ্যতা ছিল; রামমোহন তা দূর করলেন। রামমোহনের রচনায় যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল, অক্ষয়কুমার তাকে মুছে দিলেন। আর, এই উভয়ের রচনায় যে-লালিত্য-লাবণ্য-রসোচ্ছলতার অভাব ছিল, বিদ্যাসাগর তা দূর করলেন সুললিত ধ্বনিঝংকারের মাধ্যমে, ভাষার তানলয়সমন্বিত প্রসাদগুণে, ব্যক্তিহৃদয়ের অন্তরঙ্গ স্পর্শ দিয়ে। ছন্দোস্পন্দিত ভাষার লালিত্যের সঙ্গে প্রকাশের সারল্য যুক্ত হয়ে তাঁর গদ্যরচনা প্রেক্ষণীয় সৌন্দর্য লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখকদের গদ্যভাষা ছিল তথ্যবাহী, বিবিধ-তত্ত্ব-চিন্তা-প্রকাশক্ষম, তা বিচিত্রসূক্ষ্ম ভাবানুভূতির উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠতে পারেনি। বিদ্যাসাগর এহেন গদ্যের অঙ্গে শোভনতার সঞ্চার করলেন, তাকে প্রাণগত বাসনাকামনা-প্রকাশের ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুললেন। তাঁর নির্মিত সাধুভাষার সংস্কৃত-সমৃদ্ধ শিল্পশ্রীসমন্বিত সাবলীল রূপটি সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন—যার সূচনা 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-তে। এখান থেকে বাঙ্‌লা ভাষায় সাহিত্যিক গদ্যের পর্বের শুরু। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বাঙ্‌লা গদ্যের আদি-সাধুভাষার সাহিত্যসুষমামণ্ডিতরূপটি সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরলো—বিদ্যাসাগরের স্টাইলের দিকে সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো।

এই ছন্দোময় গদ্য-রচনায় বিদ্যাসাগর সংস্কৃতসাহিত্য থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইংরেজি গদ্যের [বিদ্যাসাগর মশায় ইংরেজি ভাষা বেশ আয়ত্ত করেছিলেন] পরিমাণবোধ, স্বাভাবিকতা, প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির প্রথম প্রকাশ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থে, এবং এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, আমাদের বিবেচনায়, তাঁর লোকপ্রসিদ্ধ **'শকুন্তলা'-য়**। 'শকুন্তলা' কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অনুসরণে লিখিত—১৮৫৪ সালে প্রকাশিত। এ বিদ্যাসাগরের এক অক্ষয় সাহিত্যকীর্তি, বাঙ্‌লা ভাষার অতিশয় মূল্যবান সম্পৎ। এই গ্রন্থে কালিদাস-কবির মৃত্যুঞ্জিৎ সৃষ্টি 'শকুন্তলা'-র মাধুর্য-সৌকুমার্য পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের কৃত 'শকুন্তলা'-কে ঠিক অনুবাদকর্ম বলা যাবে না, আখ্যান-পরিবেশনের রমণীয় কৌশলে এ এক আশ্চর্য অভিনবতা লাভ করেছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প বলার সরস ভঙ্গিটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। নিজে কাহিনী উদ্ভাবন না করলেও তার বর্ণনে তিনি অদ্ভুত কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এজন্যে এই বইকে মৌলিক রচনা বলেই মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র-বিরচিত 'শকুন্তলা'-র সাহিত্যরস দীর্ঘকাল যাবৎ কাব্যামোদী বাঙালি পাঠককে তৃপ্তি

দিয়েছে। এখানে লেখক ভাষা-ব্যবহারে মধ্যপন্থার আশ্রয় নিয়েছেন—সংস্কৃত শব্দ ও দেশি শব্দকে সমন্বিত করেছেন, এদের বিশেষ একদিকে ঝুঁকে পড়েননি—সর্বপ্রকার আতিশয্যকে পরিহার করে চলেছেন। শব্দগুলি যেমন সৌম্য, তেমনি, সরল। গাম্ভীর্য ও প্রাঞ্জলতা রচনায় পরস্পর হাত মিলিয়েছে। বিদ্যাসাগরের লেখায় 'সংস্কৃতপ্রিয়তা' লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা 'সংস্কৃতানুকারী' মোটেই নয়; সংস্কৃতের সৌন্দর্যকে বাঙ্‌লা ভাষায় আত্মসাৎ করে নেবার মতো সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁর ছিল। আর, কী নমনীয় 'শকুন্তলা'-র ভাষা! চারুতা বা রম্যতার কথা আগেই বলা হয়েছে।

১৮৬০-এ প্রকাশিত **'সীতার বনবাস'** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল সাহিত্যনির্মিতি। এক্ষেত্রে তাঁর ঋণদাতা দুজন কবি—ভবভূতি ও বাল্মীকি। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' আর বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত কাহিনী আশ্রয়ে 'সীতার বনবাস' রচিত হয়। এ গ্রন্থেও লেখক অনুবাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সত্য, কিন্তু এ-কে বলতে হবে মৌলিক অনুবাদ; অর্থাৎ অনুবাদ অথচ লেখকের নিজস্ব কল্পনার স্পর্শে তা নতুনের মতো হয়ে উঠেছে। বাল্মীকি ও ভবভূতিকে বিদ্যাসাগর একবৃন্তে গ্রথিত করেছেন, এঁদের বর্ণিত ঘটনা নিয়ে সাহিত্যের এক অভিনব রূপলোক গড়ে তুলেছেন। অনুবাদকর্মে হাত দিয়ে লেখক ভাষার মসৃণতা, প্রাঞ্জলতা, লালিত্য ও সংগীতঝংকারের দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, এবং সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করতে গিয়ে বাঙ্‌লা গদ্যের স্বাভাবিকতাকে গ্রন্থখানির কোথাও তেমন ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। ভবভূতির লেখাকে বাঙ্‌লায় ভাষান্তরিত করা দুরূহ একটি কাজ; এই অগ্নিপরীক্ষায় বিদ্যাসাগর অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, মূলের সৌন্দর্যকে অনুবাদে ঠিক ধরে রেখেছেন। কোনো স্বল্পশক্তি লেখকের পক্ষে 'উত্তররামরচিত'-এর মতো গ্রন্থের অনুবাদে হাত দেওয়া কল্পনাতীত একটি ব্যাপার। 'সীতার বনবাস' দেখে বুঝতে পারি, কিরূপ অসামান্য শক্তির অধিকারী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বর্তমান গ্রন্থের স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধ্বনি, ভাষার সংগীত-গুণ চিত্তহারী। এর সুললিত গদ্যপ্রবাহ কানকে তৃপ্ত করে, পাঠক মুগ্ধ হয়ে যায়।

'সীতার বনবাস' লিখবার সময়ে **'মহাভারতের উপক্রমণিকা'**-অংশের অনুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। এর ভাষা গুরুগম্ভীর। প্রসাদগুণের কিছুটা অভাব লক্ষ্য করা যায়। 'শকুন্তলা'-র ভাষার সেই নমনীয়তা এখানে ততটা দেখতে পাওয়া যায় না, গাম্ভীর্যকে অতিক্রম করে সাবলীলতার আস্মোন্মোচন ঘটেনি।

ঈশ্বরচন্দ্রের অনূদিত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে এগুলিই প্রধান। এসব বই লোকপ্রিয় 'বিদ্যাসাগরী ভঙ্গি'-তে লেখা। পুস্তকগুলি একদা পাঠকসমাজে কী সমাদর লাভ করেছিল, আজকের দিনে তা আমরা ঠিক বুঝতে পারব না। ভাষাশিল্পীর দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গ্রন্থরচনে উৎসাহী হয়ে সেদিনকার কত লেখক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন; এঁদের কয়েকজনের নাম —তারাশংকর তর্করত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন সিংহের গোটা মহাভারতের বঙ্গানুবাদের আদর্শ বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রবর্তিত এই অপূর্ব গদ্যরীতি—বহিঃসৌষ্ঠব ও অন্তঃসামঞ্জস্যে চমৎকারজনক—ধ্বনিকল্লোলিত—শ্রুতিবিনোদন। শকুন্তলা-সীতার বনবাস-আদি পুস্তকের লেখকের নাম তখন সকলের মুখে মুখে, গদ্যশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রশংসার শেষ নেই।

মনীষী বঙ্কিম কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের ভাষারীতিকে প্রশংসার চোখে দেখেন নি, আর, ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যনির্মাতা বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে, অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্‌লা গদ্যের স্বাভাবিকতা মাটি করে দিয়েছেন, দুরূহ শব্দের প্রয়োগে তাঁর ভাষা সহজবোধ্যতা-গুণ হারিয়েছে, শব্দাড়ম্বরের জন্যে ভাষার সুষমা ফোটেনি। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগর মশায়কে সাহিত্যশিল্পস্রষ্টা বলা যাবে না এই কারণে যে, তেমন উল্লেখ্য মৌলিক কোনো গ্রন্থ তিনি লেখেন নি, কাহিনী-উদ্ভাবনের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিদ্যাসাগরী রীতির সৌন্দর্য বঙ্কিমের চোখে ধরা পড়ল না, ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগে। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থখানির রচয়িতার ওপর তিনি অজস্র প্রশংসা বর্ষণ করেছেন, অথচ অবিশ্রান্ত উপেক্ষা দেখালেন 'শকুন্তলা'-র লেখকের প্রতি। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষাভঙ্গির নিন্দা করতে বসে যে-সব যুক্তি বঙ্কিম তুলে ধরেছেন সেগুলি অতিশয় দুর্বল, এবং দুর্বল বলেই অশ্রদ্ধেয়।

আসল কথা, অসংকোচে আমরা বলছি, বিদ্যাসাগরের দেশজোড়া খ্যাতি বঙ্কিমকে তাঁর সম্পর্কে কিছুটা ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। এই বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ-হেতু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি, যেমনটি দেখা গেছে আরো দুয়েকজন লেখকের ক্ষেত্রে। ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদমূলক, এ সত্যি। কিন্তু অনুবাদকর্মে সৃজনীক্ষমতা দেখানোর অবকাশ কি একেবারেই নেই? তা যদি হয়, তাহলে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের অমর খ্যাতি কেন? আরো বলি,— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি মৌলিক গ্রন্থ লেখেন নি? স্বনামে-বেনামেতে লেখা তাঁর

পুস্তকগুলির সম্বন্ধে কী বলবেন বঙ্কিম? তাঁর 'আত্মজীবনী' ও 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' নামে বই-দুখানা কি অপাঠ্য গ্রন্থের আবর্জনায় নিক্ষেপ করার মতো বস্তু? ব্যক্তিজীবনে বিচক্ষণ হাকিম বঙ্কিম ন্যায়বিচারের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের এলাকায় বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর সম্পর্কে যে-রায় তিনি দিয়েছেন তা মোটেই যথার্থ নয়। পরবর্তীকালের সাহিত্যবিচারক তাঁর প্রদত্ত রায় উল্টে দিয়েছেন। বঙ্কিমের মধ্যে উদারতার অভাব দেখে আমরা বেদনাবোধ করেছি। পক্ষান্তরে, বরেণ্য ভাষাশিল্পী বিদ্যাসাগরের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সমালোচক রবীন্দ্র :

বিদ্যাসাগর বাঙ্‌লা ভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্‌লায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্‌লা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলি বক্তব্য বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্তব্য-সমাধান হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে একাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি, ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দর-রূপে সংযমিত না করিলে, সে-ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে ;—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত-প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাঙ্‌লা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাষা-প্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।......ইত্যাদি

সে যাক্। বিদ্যাসাগরের রচনার ভাষারীতিগত বিচিত্রতার দিকে তাকাতে হবে। বিষয়ানুসারে তাঁর লিখনভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরী রীতির ছাঁদ একটি মাত্র নয়। **'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'** [১৮৫৫, ওই নামের 'দ্বিতীয় পুস্তক'—১৮৫৫], **'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'** [১৮৭১, ওই নামের

'দ্বিতীয় পুস্তক'—১৮৭৩], ইত্যাদি গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র যুক্তিধর্মী প্রবন্ধকারের ভূমিকায় নেমেছেন। সমাজসংস্কারক এই মানবপ্রেমিক পুরুষটি বিদ্রোহী-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেও হিন্দুশাস্ত্রকে কখনো তিনি অশ্রদ্ধা দেখান নি। শাস্ত্রবচনের ওপর যুক্তিকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন, তার সাহায্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকে নির্বাক করে দিয়েছেন। এভাবে, বহুবিবাহকেও বিদ্যাসাগর অশাস্ত্রীয় বলে প্রতিপন্ন করেছেন। যুক্তির পথ ধরেও যখন চলেছেন, তাঁর ভাষায় আবেগের দোলা লেগেছে, হৃদয়ধর্মের ছায়াপাত হয়েছে। তাই, এই শ্রেণীর লেখা এখানে-ওখানে সাহিত্যের গা ঘেঁসে গেছে। এগুলি পড়তে পাঠক মোটেই ক্লান্তিবোধ করে না। আর, কী তাঁর সহিষ্ণুতা, কঠোর আত্মসংযম! উপহাস, কটূক্তি, নিন্দাকথনের নির্দয় আঘাতে ধৈর্যহারা তিনি হননি, সৌজন্য ও শালীনতা ভুলে যাননি। এই অকম্পিত সহিষ্ণুতার একমাত্র তুলনা-স্থল রামমোহন রায়।

বিদ্যাসাগরের ভাষার আরেকটি চেহারা দেখি তাঁর বেনামী রচনাগুলিতে —**'অতি অল্প হইল'**, **'আবার অতি অল্প হইল'**, **'ব্রজবিলাস'**, **'রত্নপরীক্ষা'**, ইত্যাদিতে। নিবন্ধগুলি লেখা হয় ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে। এসব রচনায় লেখক লঘুচালের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দকে বিস্তর জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, পোশাকী গদ্যরীতিকে যেন একরূপ ভুলেই গেছেন, কথ্যরীতির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। রচনাগুলির অপরবিধ আকর্ষণও আছে—ব্যঙ্গবিদ্রূপজনিত হাস্যরস। সেই সময়কার বিধবাবিবাহবিরোধী কয়েকজন মহাপণ্ডিতকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কশাঘাত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তবে উচ্চাঙ্গের হাস্যরস এখানে অনুপস্থিত, স্নিগ্ধ রসিকতার স্পর্শও নেই। নিবন্ধগুলি যখন লিখছেন, তখন প্রতিপক্ষের অসহনীয় অশালীন উক্তিতে, নানান্ অত্যাচারে, বিদ্যাসাগরের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙে গেছে। একারণে রচনাগুলিতে তাঁর স্বভাবসুলভ সংযমের পরিচয় ফোটেনি—মাঝে-মধ্যে তাঁকেও কটূক্তি করতে দেখা যায়।

তাঁর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলির কথাও স্মর্তব্য—**'বাঙ্‌লার ইতিহাস'**, **'জীবনচরিত'**, **'বোধোদয়'**, **'বর্ণপরিচয়'**, **'কথামালা'**, **'চরিতাবলী'**, **'আখ্যানমঞ্জরী'**, ইত্যাদি। এদের রচনাকাল ১৮৪৯ থেকে ১৮৬৮। তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ থাকলেও এসকল পুস্তকের ভাষা মোটামুটি সরল; বিষয়নির্বাচনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—বিষয়কে শিক্ষার্থীদের সমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও। প্রাঞ্জল ভাষায়, চমৎকার সরস ভঙ্গিতে, তিনি গল্প বলতে পারেন। তাঁর সকল শ্রেণীর রচনায় কলাকুশলতার ছাপ রয়েছে। ভাষাকে তিনি শিল্পের স্তরে উন্নীত করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রণীত সংস্কৃত উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ আজো কত বিদ্যার্থীকে যে সংস্কৃতশিক্ষায় সহায়তা করছে তা বলে শেষ করা যায় না। **'ভ্রান্তিবিলাস'** শেক্সপীয়রের একখানি নাটকের ভাবানুবাদ। তেমন উল্লেখনীয় রচনা নয়। **'সংস্কৃত-সাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব'** নামের গ্রন্থে লেখকের ব্যাপক পড়াশুনা ও রসগ্রাহিতার পরিচয় ফুটেছে।

বিদ্যাসাগরের স্টাইল চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে তাঁর জীবনের গোধূলিপর্বের দুটি রচনায়—**'প্রভাবতীসম্ভাষণ'** [স্বরচিত] ও **'বিদ্যাসাগরচরিত'**-এ। প্রথমোক্ত রচনাটি অশ্রুজলের মুক্তমালা যেন, এক বন্ধুর শিশুকন্যার মৃত্যুতে লেখকের মর্মান্তিক হৃদয়বেদনার অপূর্বসুন্দর বাণীরূপ। অসমাপ্ত রচনা 'বিদ্যাসাগরচরিত' সত্যিই ঈশ্বরচন্দ্রের আশ্চর্য এক সাহিত্যকীর্তি—সরসতায়, বিবিধ বস্তুর উপস্থাপন-নিপুণতার গুণে, এ গ্রন্থ একরূপ অতুলনীয়। দুঃখ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র রচনাটি শেষ করে যেতে পারেন নি, পারলে, অনুপম একটি আত্মজীবনী পেতাম আমরা। জীবনসায়াহ্নে লেখা বিদ্যাসাগরের রচনা নিজেকে সমস্ত কলাচাতুর্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছিল, আপন দেহ থেকে সকল আভরণ সরিয়ে ফেলেছিল—হয়ে উঠেছিল নিরতিশয় সরল, প্রায়-আধুনিক। এ তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের নিশ্চিত পরিচয় বহন করে।

বিদ্যাসাগর মশায়ের উজ্জ্বল কৃতিত্ব, সর্বজনব্যবহারযোগ্য, ছন্দোময়, শ্রুতিসুখকর, অভিনব এক গদ্যরীতি—মধ্যগা রীতি—প্রবর্তন করলেন তিনি। এর পূর্বে বাঙ্‌লা গদ্যপ্রদেশে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো রীতি ছিল না, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে লিখনভঙ্গির সামঞ্জস্যের অভাবটি প্রায়শ চোখে পড়তো। নিজের প্রতিভাবলে শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যাসাগর এই অভাব দূর করলেন। নবীন লেখকের স্বচ্ছন্দ পদচারণার প্রশস্ত একটি ভূমি তৈরি হলো। বাঙ্‌লা গদ্যের উদ্‌যোগপর্বের এখানে শেষ। এবার সৃষ্টির পালা শুরু হতে চলেছে। পরবর্তী সৃষ্টিসমারোহের উদ্বোধনী সাহিত্যকর্ম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাবলী।

পরিশেষে বলি, ভাষাশিল্পী-হিসেবে বিদ্যাসাগর বড়ো। আরো বড়ো মানুষ-হিসেবে। ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা যেতে পারে তাঁকে।

বিদ্যাসাগরের রচনার কিছু নিদর্শন :

॥ ১ ॥ 'একদিবস রাজকুমার নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোনো নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশপূর্বক তন্মধ্যবর্তী পরমরমণীয় এক সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন, ঐ সরসীর তীরে হংস-বক-চক্রবাক-সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে

চারিদিক আমোদিত হইতেছে, মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ ধ্বনি করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে।' —বেতাল পঞ্চবিংশতি

॥ ২ ॥ 'তানলয়বিশুদ্ধস্বরসংযোগবতী গীতি শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনা হইলেন। কী নিমিত্ত উন্মনা হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই মনোহর গীতি শ্রবণ করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে। প্রিয়জনবিরহব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু আমার প্রিয়জনবিরহ উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা মনুষ্য সর্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা সুমধুর গীতি শ্রবণ করিয়া যে আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট-রূপে জন্মান্তরীণ স্থিরসৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।' —শকুন্তলা

॥ ৩ ॥ 'শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকট ছিল; এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।' —শকুন্তলা

॥ ৪ ॥ 'রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিনীতীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বাণপ্রস্থধর্ম-অবলম্বন-পূর্বক সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'

—সীতার বনবাস

॥ ৫ ॥ 'দুরাচার মারীচ হিরণ্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ দৈবনির্যাতন-দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান-ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।' —সীতার বনবাস

॥ ৬ ॥ 'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ

হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ পাইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরু কী বিষময় ফল ভোগ করিতেছে। হায়, কী পরিতাপের বিষয়! যে-দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত-বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও প্রধান ধর্ম, আর যেন সে-দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।'

—বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে রচনার একটি ছিন্ন অংশ

॥ ৭ ॥ 'এ যাত্রায় খুড়র কাছে দুই-চারিটি প্রশ্ন করিব।…যদি উপেক্ষা করিয়া অথবা ভয় পাইয়া অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণের বশবর্তী হইয়া খুড়মহাশয় উত্তরদানে বিমুখ হন—দুও দুও বলিয়া, হাততালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া কিয়ৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব, পরে রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড় মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।'

—ব্রজবিলাস

॥ ৮ ॥ 'প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন? তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল-স্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল-স্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে এক-একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন, প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।'

—বিদ্যাসাগরচরিত [স্বরচিত]

॥ ৯ ॥ 'বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভালবাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিকক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এতদিন তোমায়

দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু তুমি আমায় না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছিনা।'

—প্রভাবতী সম্ভাষণ

॥ ১০ ॥ 'ঈশ্বর, কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ্, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান ; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু ; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।'

—ঈশ্বর : বোধোদয়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা', এবং তিনি—'বাঙ্‌লা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী', কেননা—'বিদ্যাসাগর বাঙ্‌লা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।' আশা করি, ওপরের আলোচনা থেকে, সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্যপ্রমাতা রবীন্দ্রের উক্তির যাথার্থ্য মোটামুটি উপলব্ধি করা যাবে।

॥ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

তত্ত্ববোধিনী-পর্বের সত্যিকার বড়ো গদ্যশিল্পী দুজন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮১৭-১৯০৫]। বিদ্যাসাগরকে আমরা জেনেছি। এখন দেবেন্দ্রনাথের কথা।

দেবেন্দ্রনাথ একজন অসামান্য পুরুষ। স্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন তিনি। ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নামটি চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে গেছে। এদেশের সমাজসংগঠনে তিনি যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেদিনকার শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ব্যক্তিদের একজন। আর, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর দানের কথা কদাপি ভুলবার নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেকালের অভিজাত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'-র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। এর সম্পাদকরূপে স্বনামখ্যাত অক্ষয় দত্তকে তিনিই নির্বাচিত করেছিলেন। সকলেই জানেন, বাঙ্‌লা সাহিত্যে তত্ত্ববোধিনীকে ঘিরে যে-শক্তিমান লেখকগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হলো, তাঁরা যে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন, সেখানেও দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবশ্যমান্য। তিনি নিজে যদি গদ্যে লেখনী চালনা না-ও করতেন, তত্ত্ববোধিনী কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ও বিচক্ষণ পরিচালক বলে, বাঙ্‌লা সাহিত্যের

ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকতো। যেমন সাহিত্যিক প্রতিভায়, তেমনি, সামাজিক প্রতিভায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতিশয় বিশিষ্ট।

রাজর্ষি অভিধায় ভূষিত করা যেতে পারতো দেবেন্দ্রনাথকে। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে 'মহর্ষি' আখ্যা দিয়েছেন। এ উপাধি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের অনিঃশেষ ভক্তি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচায়ক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহর্ষি'। তাই বলে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নন তিনি। অবশ্য তাঁর গৃহের পরিসর সংকীর্ণ ছিল না—বাঙ্‌লা দেশের গোটা সমাজটাকেই আপন গৃহ বলে জেনেছিলেন। তাই, অধ্যাত্মপথের পথিক হয়েও—ধ্যানরসিক থেকে গিয়েও—জীবনটাকে বহুমুখী কর্মে নিয়োজিত রেখেছিলেন। অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। উপস্থিত ক্ষেত্রে আরো বড়ো কথা, সাহিত্যশিল্পীর সহজাত ক্ষমতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন; এই দুর্লভ শক্তির বিষয়ে নিজে কিন্তু তেমন সচেতন ছিলেন না। সাহিত্যনির্মাণ তাঁর সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল না, সচেতন প্রয়াসে আপনার অধ্যাত্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে বাণীবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এতে যা নির্মিত হলো নিঃসন্দেহে তা রসসিক্ত সাহিত্য। রস বলতে অধ্যাত্ম-রস—দেবেন্দ্ররচনাবলীর এ স্থায়ী রস। তাঁর রচনা পবিত্রসুন্দর ভাবুকতা ও নিবিড় হৃদয়ানুভূতির বাঙ্ময় রূপায়ণ। বোধ করি, লৌকিক খ্যাতির প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন বলেই সাহিত্যচর্চাকে তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেন নি। যদি করতেন, মহৎ সাহিত্যশিল্পীর গৌরবের অধিকারী হতে পারতেন তিনি। দেবেন্দ্রনাথ অসামান্য সন্তানের অসামান্য পিতা। তাঁর ভাবুকতা ও সাহিত্যনির্মাণক্ষমতার উত্তরাধিকার পেয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাধর পুত্ররা। ব্যক্তিজীবনে ও কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথ স্বরূপত কেন আধ্যাত্মিক, পিতা দেবেন্দ্রনাথের কথা মনে রাখলে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো অসুবিধে হয় না।

দেবেন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থনিচয়ের নামের দিকে তাকান: **'ব্রাহ্মধর্ম'** [১৮৫১], **'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'** [১৮৫২], **'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস'** [১৮৬০], **'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা'** [১৮৬২], **'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান'** [১৮৬৯-৭২], ইত্যাদি। সর্বত্র ধর্মের কথা—ধর্মানুভবের অকপট অভিব্যক্তি। ধর্মভাবুকতাকে নিয়েই মহর্ষির গদ্যসাহিত্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনারাজির নাম দেওয়া যেতে পারে ধর্মোপদেশ-সাহিত্য। বাঙ্‌লা গদ্যে এ অভিনব একটি ধারায় সৃষ্টি করেছে, গদ্যবাণীতে এ-জাতের বস্তু ইতঃপূর্বে পরিবেশিত হয়নি—বাচনভঙ্গিতে, লেখনভঙ্গিতে আর দৃষ্টিভঙ্গিতে উজ্জ্বল নতুনতার পরিচয়বাহী।

গদ্যশিল্পী দেবেন্দ্রনাথ বরাবর নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে গেছেন, আপন অন্তরের প্রেরণা ছাড়া অন্যদিকে তাকাবার তেমন কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিদ্যাসাগর

ও দেবেন্দ্র একে অন্যের খুব কাছে ছিলেন। কিন্তু নিজ নিজ সারস্বত সত্তাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে একে অপরের ছায়ায় আসেন নি। তবে এটুকু শুধু মনে রাখতে হবে, সাহিত্যানুশীলনে ঈশ্বরচন্দ্র দেবেন্দ্রের অগ্রবর্তী। বিদ্যাসাগরের কৃত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে; দেবেন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে। বাঙ্‌লা ভাষার সাধুগদ্যের কাঠামোটিকে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র নির্মাতাই যে প্রথম রূপময় করে তুললেন, ফলে বাঙ্‌লা সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত হলো, এই ঐতিহাসিক সত্যটি আমরা যেন বিস্মৃত না হই। আবার, এও মনে রাখতে হবে, সাহিত্যিক গদ্যনির্মাণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ—দুজনেই ভাষার মধ্যমা রীতি, সর্বজনবোধ্য একটি ভাষারীতি, আশ্রয় করেছেন, এবং দুজনেই ভাববাহী গদ্যের চর্চা করেছেন। এদের বিপরীত কোটিতে অক্ষয়কুমারের অবস্থান, তাঁর আশ্রিত গদ্যরীতি মূলত যুক্তিপন্থী। সে যা হোক, এই লেখকত্রয়ীর মিলিত সাধনা বাঙ্‌লা ভাষার বর্তমান উন্নতির সূত্রপাত করলো।

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর ধ্যানপূত কর্মময় জীবনের বেশির-ভাগ কেটেছে ব্রহ্মবাদ-প্রচারে, ধর্মদেশনায় ও ধর্মব্যাখ্যানে। দেবেন্দ্রের রচনাশক্তির বিশেষ স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় এই ধর্মব্যাখ্যানাদিতে। তাঁর প্রথমের দিকের রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, সর্বজনব্যবহার্য গদ্যের রূপটি মোটামুটি তিনি ধরতে পেরেছেন, পূর্ববর্তীদের সমাসাড়ম্বর থেকে নিজের ব্যবহৃত ভাষাকে বহুলাংশে মুক্ত করে নিয়েছেন, শব্দবিন্যাসরীতি বাঙ্‌লাগদ্যের স্বাভাবিক ছন্দের তালভঙ্গ করছে না কোথাও। কিন্তু বলার ঢঙ্‌টি তখনো ঠিক সরস, সাবলীল ও সুললিত হয়ে ওঠেনি। এ হলো আরো-কিছুকাল পরে—তাঁর লেখনভঙ্গির বিশেষত্ব প্রকাশ পেলো পরবর্তীকালের ধর্ম-সম্পর্কিত উপদেশ ও ব্যাখ্যানে। ভাবের গাম্ভীর্যে, সজীব সরস অনাড়ম্বর ভাষার প্রাঞ্জলতা আর প্রসাদগুণে এগুলি আশ্চর্য চারুতা লাভ করেছে। এখানে রচনারীতির সাহিত্যিক-স্বাদযুক্ত নবীনতা অনায়াসলক্ষ্য। বাক্যগুলি জটিলতাহীন, দীর্ঘ-সমাস-বিরল, স্বল্পভার অলংকারে শোভিত, হৃদয়ানুভব প্রাঞ্জল-ভাবে বাণীধৃত। দেবেন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য কারুর দৃষ্টি এড়ায় না।

পূর্বে বলেছি, ধর্মানুরাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন। তাই বলে কেউ যেন এ ধারণা করে না বসেন, দেবেন্দ্ররচনাবলী একমাত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসুদেরই পাঠ্য। আধ্যাত্মিক কথা, শাস্ত্রোপদেশ, দেবেন্দ্রের লিখনচাতুর্যে যথার্থ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে। মহর্ষি তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্মানুপ্রাণিত ব্যক্তি; কিন্তু আচার্যরূপে যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছেন, শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করেছেন, তখন দেখি, তাত্ত্বিক তর্ককে কিংবা পাণ্ডিত্যী দার্শনিকতাকে নিয়ে মেতে থাকেন নি—ধর্মোপদেষ্টার নামে নিজের অধ্যাত্মরসোদ্বেল

চিত্তটিকেই সাহিত্যশিল্পসম্মত বাণীরূপের মাধ্যমে অনাবৃত করে ধরেছেন। তাঁর প্রচারিত ব্রহ্মবাদ বুদ্ধিভিত্তিক কোনো বস্তু নয়, বিনির্মল হৃদয়ানুভূতিই এর প্রতিষ্ঠাভূমি। অনুভূতির গভীর উৎস থেকে যে-বাণী নিঃসৃত, তা যদি স্বচ্ছ সরল হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহলে তার সাহিত্যসিদ্ধি অবশ্যই স্বীকার্য। দেবেন্দ্রনাথের শিল্পবুদ্ধির প্রশংসা করতেই হবে; ধর্মাদির ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিই তাঁকে বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক পথ ধরে চলতে দেয়নি, ভুলতে দেয়নি তাঁর সাহিত্যিক বৃত্তিটিকে। এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সত্যিকার শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রগাঢ় উপলব্ধির সৌন্দর্যবিলসিত প্রকাশে দেবেন্দ্রের রচনা কেমন সহজে সাহিত্যগুণোপেত হয়ে উঠেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদাহৃত হলো :

তাঁহার [স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরের] মহিমা সর্বত্রই রহিয়াছে। ......সূর্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? সূর্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জনে বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই: 'সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ, সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ'—তিনি অধোতে, তিনি ঊর্ধ্বেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন—আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না। সূর্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব। যেমন ঊষাতে, সেইপ্রকার সন্ধ্যাতেও, তাঁহার প্রসন্নমূর্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উত্থিত হইয়া জ্যোৎস্না-বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? 'যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়তি'—যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া, চন্দ্রতারকের অন্তরে থাকিয়া, চন্দ্রতারককে নিয়মে রাখিতেছেন; চন্দ্রতারক যাহাকে জানে না, চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর—তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়।'

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বক্তা দেবেন্দ্রনাথ এখানে শুধু তত্ত্বজ্ঞানী-মাত্র নন, উপনিষদের সেই ঋষিগণের ন্যায় তিনিও কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ—তাঁর তৃতীয় দিব্যনেত্রের দৃষ্টি ভূলোকে-দ্যুলোকে-আকাশে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র—আনন্দরূপ অমৃতরূপ ব্রহ্মের মহিমা-জ্যোতির বিকিরণ চাক্ষুষ করছে, সর্বত্র প্রত্যক্ষ করছে ব্রহ্মবিভূতি। তাঁর রচনার এখানে-ওখানে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শিখা ছড়িয়ে পড়ে অপূর্ব আলোকে তাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে, প্রেক্ষণীয় সৌন্দর্য দান করেছে। মহর্ষির অধ্যাত্ম-উপলব্ধির প্রকাশরূপ বহু-বিচিত্র—এ কোথাও তত্ত্বের আকার নিয়েছে, কোথাও ভক্তিব্যাকুলতায় বিগলিত

হয়েছে, কোথাও সৌন্দর্যতন্ময়তায় ডুব দিয়েছে, কোথাও-বা স্বদেশের কল্যাণকামনায় প্রার্থনার রূপ ধরেছে। ঈশ্বরীয় প্রেমে প্রাণিত রচনাকার দেবেন্দ্রনাথ ধ্যানরসিক, বাণীশিল্পী, কবি, স্বদেশবৎসল। ভিন্নতর পরিচয়ে তিনি সৌন্দর্যসাধক, নিসর্গপ্রেমিক। নিসর্গপ্রীতিবিহ্বলতার সঙ্গে তাঁর প্রবল সৌন্দর্যানুরাগ নিবিড়ভাবে জড়িত-মিশ্রিত। একদিকে, সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারপথে নিসর্গপ্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি; অন্যদিকে, প্রকৃতির বিশাল সংসারকে অরূপসুন্দর ব্রহ্মের বিলাসবিভূতির পবিত্র ভূমিরূপে দেখেছেন। তাঁর নিসর্গসন্দর্শন পরমপুরুষের মধুময় স্পর্শলাভের একটি উপায়; তাঁর চোখে প্রকৃতিলোকের বর্ণ-গন্ধ-শব্দ সেই চিরসুন্দরের বার্তাবহ ছাড়া অন্যকিছু নয়। নীচের কথাগুলি অনুধাবন করুন:

'তাঁর অধিকার সর্বত্রই; তিনি সর্বসাক্ষীরূপে, অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র রহিয়াছেন। যদি উচ্চ পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী আর-এক পর্বত-শৃঙ্গ দর্শন করি, সেখানে তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিতে পাই। যদি সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের ফেনময় প্রবল তরঙ্গরাজি নিরীক্ষণ করি, সেখানেও তাঁহার রাজত্ব দেখি। যদি নদীকূলের বৃক্ষছায়া হইতে নদীর লহরীলীলা দেখি, সেখানেও তাঁহার আনন্দলীলা দেখিতে পাই। তিনি সকল দেশেতে সমানরূপে বিদ্যমান। তিনি সকল কালে সমানরূপে বিদ্যমান।...তিনি শোভার আকর, সৌন্দর্যের সাগর। সকলেই তাঁহার সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্য ধারণ করিতেছে: তাঁহার প্রভাবে প্রভাকর প্রভা দিতেছে, সুধাকর সৌন্দর্য-বর্ষণ করিতেছে, বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকারমধ্যে আলো দিতেছে।'—এখানে ব্রহ্মের সৌন্দর্যময় রূপের চমৎকার একটি বর্ণনা সকলে পাঠ করবেন।

দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি তাঁর **'আত্মজীবনী'** নামে গ্রন্থখানি—উনিশের শতকের শেষ দশকের একেবারে শেষদিকে লিখিত। এতে মহর্ষির অধ্যাত্মজীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস [আঠারো বৎসর বয়স থেকে একচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা] বর্ণিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং লৌকিক জীবনের সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার অনুভূতির মনোজ্ঞ সংমিশ্রণ এখানে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ঘটনার বর্ণনা—অনবদ্য রচনাপ্রণালীর গুণে কেমন রম্যতা লাভ করেছে! এ পুস্তক উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক। কত সহজ সরল চিত্তগ্রাহী ভাষায় মহর্ষি নিজের ধর্মানুভবের আবেগকে প্রকাশ করেছেন, কথার কী আশ্চর্য নিপুণ গাঁথুনি। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তিনি এগিয়ে গেছেন, অন্তরের ও বাইরের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বাণীবদ্ধ করেছেন: কোথাও ভাবনার অতলস্পর্শ গভীরতা, কোথাও চমকপ্রদ ঘটনার মনোরম শোভাযাত্রা—পাঠকের কৌতুহলকে সদাজাগ্রত রাখবার অদ্ভুত কৌশল লেখকের

আয়ত্তে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেবেন্দ্রের গদ্যরচনা কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে, এসকল গদ্যাংশ সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্বের যুগলধারায় অভিষিক্ত। একটুখানি নমুনা তুলে ধরি :

'অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুলসকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজতকাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছলন্দ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সংগীত-স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত।'

কবিত্বময় প্রকাশে আগ্রার তাজমহলের বর্ণনাটি কেমন সুন্দর :

'আগ্রায় আসিয়া তাজ দেখিলাম। এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিমদিকে সমুদয় রাঙা করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে। নীচে যমুনা। মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।'

অধ্যাত্মভাবনাকে বাণীতে ফোটাতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারে এমন একটি বস্তু নির্মাণ করেছেন, নির্দ্বিধায় যাকে শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্য বলা যেতে পারে। দেবেন্দ্রের রচনায় তাঁর ব্যক্তিপুরুষের প্রতিফলন অতিশয় স্পষ্টরেখ, গোটা মানুষটি এখানে ধরা দিয়েছে—কোনোপ্রকার আবরণে নিজেকে ঢাকবার এতটুকু প্রয়াস কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। একেই বলে 'স্টাইল'—লেখায় লেখকের ব্যক্তিত্বের মুদ্রাঙ্কন। পূর্ববর্তী অন্যকোনো সাহিত্যকারের রচনায় লেখক-মানুষটির অন্তরের সামগ্রিক চেহারার এমন গাঢ় ছাপ আমাদের চোখে পড়ে নি। সেকালের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রের কৃতিত্ব দেখে আমরা সত্যিই মুগ্ধ হই। ধর্মের সীমাবদ্ধ আঙিনা ছেড়ে লৌকিক জীবনের উদার ভূমিতে এসে যদি মনুষ্যজীবনের প্রাত্যহিক হাসিঅশ্রু, আশানিরাশার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করতেন, তাহলে আশ্চর্যসুন্দর শিল্পকৃতি নিশ্চয়ই আমাদের উপহার দিতে পারতেন। ওই জিনিসটি আমরা পেলাম না বলে মনে দুঃখ হয়। কিন্তু তাঁর কাছে যা পেয়েছি, তার মূল্য সামান্য নয়। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার দানে বাঙ্‌লা গদ্য-সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ সত্যটি অস্বীকার করবে কে!

॥ তারাশঙ্কর তর্করত্ন ॥

অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর-পর্বের যথার্থ শক্তিমান একজন গদ্যনির্মাতা তারাশংকর তর্করত্ন। তাঁর লেখায় বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির স্বচ্ছন্দ অনুসৃতি লক্ষিত হয়। অবশ্য

বিদ্যাসাগরের পন্থানুসারী লেখক হলেও তারাশংকরের গদ্যনির্মিতিতে তাঁর নিজত্বের ছাপ মনোযোগী পাঠকের চোখে ধরা পড়বেই। অল্পবয়সে তিনি লোকান্তরিত হন। আয়ুষ্কালের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে সাহিত্যানুশীলনের সুদীর্ঘ অবকাশ তাঁর মেলেনি। কিন্তু স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যেও একনিষ্ঠ সাধনায় যে-গদ্যসাহিত্য তিনি নির্মাণ করেছেন, এবং ওতে যে-শক্তিমত্তা ও শিল্পবুদ্ধির পরিচয় ফুটেছে, তা আমাদের বিস্মিত করে। যে-মানুষটি ত্রিশ বৎসর আয়ুষ্কালও পেলেন না, যাঁর নির্মিত সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সেকালের খ্যাতনামা সমালোচকগণ নীরব থাকতে পারেননি, এমন কি, বঙ্কিমের ন্যায় মনীষী ব্যক্তিও তারাশংকরী গদ্যরীতির বিষয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন—তাঁর সাহিত্যরচনপ্রতিভাকে উপেক্ষা দেখানো অসম্ভব। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, একালের সমালোচকের কাছে তারাশংকর তর্করত্ন একরূপ অনাদৃত, এবং সেকালের সুধীজনেরাও তারাশংকরকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছেন।

মনে জিজ্ঞাসা জাগে, কেন এরূপ হলো। এর উত্তর, বোধ করি, এই যে, তিন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি তারাশংকরের প্রতিভার দ্যুতিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। এই মন্দভাগ্য লেখকের একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন অক্ষয়কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [উভয়ের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে], অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বঙ্কিমের জন্ম]। অতি-প্রবল এঁদের ব্যক্তিত্ব; তুলনায় তারাশংকর অল্পায়ু একজন সাহিত্যসাধক-মাত্র—দুয়েকটি অনুবাদ-গ্রন্থের রচয়িতা। এই তিনজন কীর্তিমান গদ্যশিল্পীর নিকট-সান্নিধ্যে অবস্থানহেতু সে-যুগের পাঠকসাধারণ তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ধরেন নি। কাজেই, তিনি লোকলোচনের অন্তরালেই থেকে গেলেন, তেমন খ্যাতি পেলেন না। সে যা হোক, বাঙ্‌লা গদ্যে তাঁর কৃত সংস্কৃত 'কাদম্বরী'-র অনুবাদ স্মরণীয় একটি সাহিত্যকীর্তি, পরবর্তী বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যের ওপরে এর প্রভাব নগণ্য বলে মনে হয় না আমাদের। তাঁর লেখায় বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত গদ্যরীতির পরিণততর রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙ্‌লা গদ্যের বিকাশের ধারায় তারাশংকরের সাহিত্যসাধনার দান অবশ্যস্বীকার্য। তারাশংকরকে প্রদক্ষিণ করেই বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে বঙ্কিমের যুগে পদক্ষেপ করতে হবে।

গদ্যশিল্পী তারাশংকরের ব্যক্তি-পরিচয় অনেকেরই জানা নেই। এখানে খুব সংক্ষেপে তা বিবৃত হলো।

সঠিক তথ্যের অভাবে অনুমান করা হয়, ইংরেজি ১৮৩০ সালে তারাশংকর তর্করত্নের জন্ম। জন্মস্থান নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রাম। পিতার নাম মধুসূদন

চট্টোপাধ্যায়। স্বগ্রামের পাঠশালায় ও চতুষ্পাঠীতে তিনি কিছু সংস্কৃত শেখেন। পরে কলকাতায় এসে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এই বিদ্যায়তনে তাঁর শিক্ষার্থীজীবনের ব্যাপ্তি তেরো বৎসর। কলেজে তিনি কৃতী ছাত্ররূপে পরিচিত হলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ওপরে তাঁর আয়ত্তি ছিল অসামান্য। সংস্কৃত শ্লোক গেঁথে প্রবন্ধ লিখে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি। এই কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়েছিল। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা ছিল না। মেধাবী ছাত্র তারাশংকর ছয় বৎসর কলেজের সিনিয়র বৃত্তি ভোগ করেন। দর্শনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'তর্করত্ন' উপাধি পেলেন তিনি।

ছাত্রজীবন শেষ হলো। এবার কর্মজীবনের শুরু। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে ওই কলেজের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হলেন তারাশংকর—১৮৫১ সালে। বিদ্যাসাগর মশায়েরই সুপারিশে ১৮৫৫ সালে তিনি নদীয়ার 'সাব্-ইনস্‌পেক্টর-অব্ স্কুলস্' নির্বাচিত হন। বুঝতে পারা যায়, তাঁর ওপরে ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃপণ প্রীতি বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু বেশিদিন ওই পদে তারাশংকর কাজ করতে পারেননি। আনুমানিক ১৮৫৮ ইংরেজি সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এ অকালমৃত্যু। ভাবলে মনটা কেমন করে। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে গেলো কবি-প্রবন্ধকার বলেন্দ্রনাথকে ও ব্যঙ্গশিল্পী কালীপ্রসন্নকে। এঁরাও ত্রিশ বৎসরের বেশি আয়ু পাননি। তিনজনেই শক্তিমান লেখক।

গোটা পাঁচেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তারাশংকর। তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। পুস্তকখানি লিখে তিনি 'ডেভিড্ হেয়ার পুরস্কার' পেয়েছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের দিকে দৃষ্টি রেখে এই পুস্তক রচিত হয়েছিল। তখন বাঙ্‌লার সমাজে বিদ্যাসাগর আলোড়ন জাগিয়েছেন; তিনি নারীজাতির বন্ধনমুক্তির কথা ভাবছেন, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রীতিমতো সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। বাঙালি নারী কেন শিক্ষার অধিকার পাবে না, এ তাঁর জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা। সেকালের প্রগতিকামী কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের ভাবনার প্রভাব এড়াতে পারেননি। তারাশংকরও এর ছায়ায় এসেছিলেন, দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের কাজে হাত দিলেন। ফলে প্রণীত হলো সদ্য-কথিত গ্রন্থটি। বাঙ্‌লার নারী-সমাজের দুর্দশা দেখে তারাশংকর বিচলিত বোধ করেছেন। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা যে তাঁদের এই দুর্দশার মুখ্য কারণ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বকৃত গ্রন্থখানিতে তিনি দেখিয়েছেন, নারীজাতি সুশিক্ষিতা হলে সমাজের অশেষ কল্যাণ। প্রাচীন কালে ভারতীয় নারীরা শিক্ষার অধিকারে বঞ্চিত হননি, পরবর্তীকালে তাঁদের ওই অধিকার হরণ করা

হয়। পুনর্বার শিক্ষার আলোকে তাঁরা আসুন, সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যাক্—পুরুষের শক্তি বাড়িয়ে তুলুন তাঁরা। এইসব কথা বলে 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'র লেখক এক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্যের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। বর্তমান পুস্তকখানি যুক্তি-আশ্রয়ী, তথ্যনিষ্ঠ। এর ভাষা কিছুটা সংস্কৃতগন্ধী, কোথাও কোথাও সংযত আবেগের স্পর্শ আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ **'পশ্বাবলী'**, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত। এটিও অনুবাদগ্রন্থ—পশু-বিষয়ক। তারাশংকরের ভাষারীতিগত কোনো বৈশিষ্ট্য এতে প্রকাশ পায়নি। তাঁর প্রণীত তৃতীয় গ্রন্থের নাম **'কাদম্বরী'**, প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। তারাশংকর নিজের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এই বইখানিতে। সংস্কৃত 'কাদম্বরী'-র ন্যায় একখানি কথাকাব্যকে ভাষান্তরিত করা কী কঠিন কাজ, তা অনেকেরই ধারণাতীত। এহেন একটি দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছেন সাহিত্যানুরাগী তারাশংকর তর্করত্ন। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ **'রাসেলাস্'**—বিখ্যাত ইংরেজ-লেখক জনসনের রচিত **'Rasselas'** আখ্যায়িকার অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ কিন্তু নয়, মূল কাহিনীটি মোটা-মুটি অনুসরণ করেছেন লেখক, বর্ণনার অনেক অংশ বর্জিত হয়েছে। বাঙ্‌লা ভাষার ওপরে তারাশংকরের কতখানি দখল ছিল তার পরিচয় মেলে 'কাদম্বরী' ও 'রাসেলাস্' গ্রন্থ-দুটিতে। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও লঘুতা অনুসারে তাঁর ভাষা উঁচু পর্দায় ও নীচু পর্দায় অবলীলায় ওঠা-নামা করেছে। কী ইংরেজি, কী সংস্কৃত—রোম্যান্সমূলক আখ্যায়িকার অনুবাদে তারাশংকর তর্করত্নের দক্ষতা স্বীকার করতেই হয়। এও বুঝতে পারি, গুরু-গম্ভীর আখ্যানের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। মনে হয়, এই প্রবণতাবশেই তিনি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও জনসনের 'রাসেলাস' আখ্যায়িকার ভাষান্তরীকরণে উৎসাহবোধ করেছিলেন। তারাশংকরের অনূদিত 'রাসেলাস্' গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা নীচে উদ্ধৃত করা গেলো:

'তাঁহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদপ্রমোদ করিতেন, রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতেন। রাসেলাস্ ব্যতিরিক্ত আর-সকলেই এই অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন এবং আমোদ-প্রমোদ-আহ্লাদে কালক্ষেপ করিতেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাসেলাসের মনে অসন্তোষের উদয় হইল। যেখানে আমোদপ্রমোদ হইত, যেখানে পাঁচজন আসিয়া একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে ভালোবাসিতেন না। তিনি নির্জনে বসিতেন, নির্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্বদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতেন। চিন্তায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, ভোজনের সময় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী সম্মুখে থাকিত, তিনি খাইতে বিস্মৃত হইতেন।'

তারাশংকরকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে একজন বড়ো গদ্যশিল্পীর গৌরব অর্পণ করা হয়েছে তাঁর কৃত 'কাদম্বরী' অনুবাদগ্রন্থখানির জন্যে। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বাণভট্ট-বিরচিত 'কাদম্বরী'। সংস্কৃত কথাকাব্য 'কাদম্বরী' অজস্র সমাসে ও বহুবিচিত্র অলংকারে গুরুভার। অতিশয় গম্ভীর এর ভাষা। গাম্ভীর্যপূর্ণ হলেও এ ভাষা শ্রুতিবিনোদন, মাধুর্যসিক্ত। তারাশংকরের কৃতিত্ব, নিজের কৃত স্বাধীন অনুবাদে মূলগ্রন্থের সৌন্দর্য কিছুটা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন—মূলের কথার রস ও চিত্রগৌরবের কিয়দংশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাসবাহুল্য, যতদূর সম্ভব, এড়িয়ে গেছেন অনুবাদক, দীর্ঘসমাস প্রায়শ অনুপস্থিত, অলংকারের বোঝা কমিয়ে ভাষাকে করে তুলেছেন স্বল্পভার। এতে মূল আখ্যায়িকার শব্দঝংকার অবশ্যই মন্দীভূত হয়েছে, চিত্ররসের উৎসারের অজস্রতাও কমেছে। তথাপি, স্বীকার করতে হবে, বাণভট্টের প্রযুক্ত সংস্কৃত গদ্যভাষার হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিটুকু মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। যথাসাধ্য সহজ সরল ভাষায় 'কাদম্বরী'-র অনুবাদ করেছেন তারাশংকর, তাঁর এ কৃতিত্ব অবশ্য-স্মরণীয়। তারাশংকরের সাহিত্য-সাধনার কালটিকে, বলা যায়, বিদ্যাসাগরের যুগ। এমন একটি যুগে হাতে লেখনী তুলে নিয়ে, বিদ্যাসাগরী রীতিকে সম্পূর্ণ অনুসরণ না করে, গদ্যরচনায় একটি নতুন আদর্শের সন্ধান করলেন তিনি। এখানেই তাঁর শিল্পবোধ ও গদ্যনির্মাণক্ষমতার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া গেলো। তারাশংকরী গদ্যভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায়, বাঙ্‌লা গদ্য পণ্ডিতী রীতি থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসছে, সরলতার দিকে ভাষার বাঁক-ফেরা ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এভাবে বিবর্তনের পথে এগিয়ে গিয়ে বিদ্যাসাগরী রীতি বঙ্কিমী রীতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মাঝখানে তারাশংকর তর্করত্ন হাইফেনের মতো বিরাজমান।

এস্থলে, প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য বিচার্য। তিনি লিখছেন:

'বাঙ্‌লা ভাষার এক সীমায় তারাশংকরের 'কাদম্বরী'-র অনুবাদ, আর-এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা, এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্‌লা গদ্যে উপনীত হওয়া যায়।'

স্পষ্টত বুঝতে পারা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষাকে পণ্ডিতী সাধুভাষা বা তারাশংকরী ভাষার বিরুদ্ধধর্মী ভাষারূপে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই, বিদ্যাসাগরী ভাষাই সে-যুগের সাহিত্যে-প্রচলিত সাধুভাষার প্রতিনিধিস্থানীয়—তারাশংকরের ভাষারীতি পণ্ডিতী রীতির ততখানি প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ,

সংস্কৃতের প্রভাব ও শাসন থেকে তারাশংকর নিজের ভাষাপ্রণালীকে বেশ-কিছু মুক্ত করে নিয়েছিলেন, ক্রমশ তিনি সহজের দিকে ঝুঁকছিলেন। অবশ্য, তাই বলে, প্রসাদগুণ আর প্রাঞ্জলতার ক্ষেত্রে তাঁর ভাষারীতি বিদ্যাসাগরী রীতিকে অতিক্রম করে গেছে, এমন একটি কথা বলা চলে না। সে যা হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের ওই মন্তব্যটি, আমাদের বিবেচনায়, সংগত হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে বঙ্কিমের বিচার অসতর্কতার পরিচয়বাহী, কোথাও-বা পক্ষপাতদুষ্ট। প্যারীচাঁদ মিত্রের কী প্রশংসাই-না তিনি করেছেন, পক্ষান্তরে, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিও বঙ্কিম সুবিচার করেন নি। দেখছি, মনীষী ব্যক্তিরাও অনেক সময় ভ্রম-প্রমাদ-দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না।

তারাশংকর উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর বাঙ্‌লা রচনা সংস্কৃত-প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। সমাসাদি যে তিনি ব্যবহার করেননি এমন নয়, তথাপি, তারাশংকরী গদ্যরীতিতে কোথাও আড়ষ্টতা নেই, গতিচ্ছন্দ কোথাও তেমন বিঘ্নিত হয়নি, সরসতার অভাবও চোখে পড়ে না। তাঁর ভাষার সৌন্দর্য সাহিত্যরসিকের চোখে পড়বেই। 'কাদম্বরী' থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিচে তুলে দেওয়া হলো :

'ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে-অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে, এবং তদনন্তর পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল; বোধ হইল, যেন বিহঙ্গদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার অঙ্গুলিসংকেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহঙ্গকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন।'

অনুবাদগ্রন্থ 'কাদম্বরী'-তে সরলতর ভাষার প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায় :

'সৎবংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয় একথা অগ্রাহ্য। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে-অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোনো ফল হয় না।'

তারাশংকরের জীবনকালে 'কাদম্বরী'-র চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আগেই আমরা জেনেছি, খুব অল্পবয়সে তিনি মারা যান। বইখানি সমাদর না পেলে চার-পাঁচ বছরে এর চারটি সংস্করণ কখনো প্রকাশিত হতো না। এ বইয়ের লিখনভঙ্গির সৌন্দর্য বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল, যদিচ তিনি বলেছেন, 'কাদম্বরী আদর্শ ভাষায় রচিত নয়।'

'আদর্শ ভাষা' না হলেও বিদ্যাসাগর-তারাশংকরাদির ভাষারীতির প্রভাবে এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—বিদ্যাসাগরী রীতি [তারাশংকর বিদ্যাসাগরের পন্থানুসারী] ও আলালী রীতির সমন্বিত রূপের নামই বঙ্কিমরীতি, এ সর্বজনস্বীকৃত একটি সত্য।

কাজেই, বাঙ্‌লা গদ্যরীতির আলোচনাকালে শক্তিমান লেখক তারাশংকর তর্করত্নের নামটি অবশ্যই স্মর্তব্য। তাঁর অকালমৃত্যু দুঃখজনক একটি ঘটনা।

॥ বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের এক দীপ্ত ব্যক্তিত্ব ॥

॥ প্যারিচাঁদ মিত্র ॥

বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের এক দীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় করতে যাচ্ছি : ইনি হলেন সমাজসেবী সাহিত্যকার স্বনামখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র [১৮১৪—১৮৮৩]। হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র প্যারীচাঁদ, সেই 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের একজন; ছাত্রজীবনে সেকালের বিখ্যাত অধ্যাপক ডিরোজিও-র কাছে পাঠ নিয়েছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন, সামাজিক জীবনে বহু জনকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। উনিশের শতকের বাঙ্‌লার নবজাগরণের দিনের অতি-বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি-রূপে গ্রহণ করতে পারি তাঁকে। ব্যক্তিজীবনে তাঁর সাফল্য অসামান্য, সাহিত্যিক জীবনে যে-সুযশের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি, তা রীতিমতো ঈর্ষার বস্তু। প্যারীচাঁদের উদ্দামতামুক্ত প্রগতিশীল মনোভঙ্গিকে উদার কণ্ঠে প্রশংসা করতে হয়। রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্ত্য মানসিকতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা না নিলেও প্যারীচাঁদ মিত্র যে ব্রাহ্মভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর রচনারাজিতে এর নির্ভুল প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আর, বাঙ্‌লা গদ্যে ও গদ্যসাহিত্যে তাঁর প্রভাব কতখানি ব্যাপক, এ তো সকলেরই জানা। বঙ্কিমচন্দ্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা প্যারীচাঁদকে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ওই প্রশংসা আতিশয্যস্পৃষ্ট, সন্দেহ নেই; তথাপি, বলতে হয়, তাঁর সাহিত্যিক জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল —শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্‌লা গদ্যে খাত-বদল যে হলো, তার পেছনে এই কীর্তিমান পুরুষের সাহিত্যসাধনার প্রভাব সক্রিয়। লোকব্যবহার্য ভাষাকে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানিয়ে বাঙ্‌লা গদ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে তিনি অঙ্গুলিসংকেত করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ভাষারীতি পরবর্তীকালে ঠিক অনুসৃত হয়নি;

না হলেও, কোন্ পথে এগুলে আদর্শ বাঙ্‌লা ভাষার সৃষ্টি হতে পারে, এই ভাবনাটি তিনি অনেকের মনে সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন। কেবল সংস্কৃতায়নের দিকে ঝুঁকলে বাঙ্‌লা গদ্যের সর্বাঙ্গীণতা যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, এ সত্যটি প্যারীচাঁদ যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন। বিপুল অভিনন্দন 'আলাল'-এর লেখকের প্রাপ্য ছিল। সেই আলোচনায় নামছি আমরা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ খ্যাতিমান লেখক সাধুগদ্যরীতির প্রবর্তন করলেও তাতে সংস্কৃত শব্দেরই বাহুল্য লক্ষিত হয়। প্রাকৃতমূলক, দেশজ কিংবা বিদেশি শব্দ তাঁরা কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। ফলে ওই কালের বাঙ্‌লা গদ্যরীতি যে বিদগ্ধজনকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছিল, বৃহত্তর দেশের সঙ্গে আমাদের গদ্যসাহিত্যের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল, এমন একটা কথা যদি কেউ বলেন, তবে বোধ করি, তা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। পণ্ডিতী বাঙ্‌লার সংস্কারসাধন করেছিলেন বিদ্যাসাগর, এই রীতি তাঁর হাতে সরল ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে, কাব্যসুরভিত হয়েছে, এও অনস্বীকার্য। তথাপি বলতে হয়, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিদ্যাসাগরাদির ব্যবহৃত সংস্কৃতগন্ধী সাধুভাষা তেমন সুবোধ্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের সরলীকৃত রচনা-রূপটিকে আরো সরল করা যেতে পারে কিনা, কেউ কেউ ভাবলেন। যদি পারা যায়, তাহলে গদ্যবাণীর চল্‌তি রীতি ও লেখ্য রীতির মধ্যে ব্যবধানটি অনেকখানি দূর হতে বাধ্য। সাহিত্যানুশীলন মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে সাহিত্যের সর্বজনীনতা খর্ব হয়, এরূপ মনে হয়েছিল তাঁদের। সাহিত্যচর্চার এই সীমাবদ্ধতা দেখে দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত কয়েকজন ব্যক্তি তৎকালের সাহিত্যে প্রচলিত বাঙ্‌লা গদ্যকে ভিন্ন খাতে—একটি নতুন পথে—চালাতে যত্নবান হলেন।

এঁদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বার করলেন [১৮৫৪]। কাগজটির গোড়ায় প্রতিসংখ্যায় লেখা থাকতো : 'এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষত স্ত্রীলোকের, জন্য ছাপা হইতেছে। যে-ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব-সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' —কথাগুলি এক অভিনব গদ্যরীতি প্রবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করছে। ক্রিয়াপদে মোটামুটি সাধুরূপ অবিকৃত রেখেই, প্রচুর ঘরোয়া কথাবার্তার বিচিত্র শব্দ ও তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করে, 'মাসিক পত্রিকা'-র ভাষা বাঙ্‌লা গদ্যরীতিতে অভিনবতা আনতে প্রয়াসী হলো। অনেকটা এই ভাষাতেই, প্যারীচাঁদ মিত্র—'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনাম নিয়ে—'মাসিক পত্রিকা'য় প্রতি মাসে লিখতে

থাকলেন 'আলালের ঘরের দুলাল' আখ্যায়িকাখানি। এ আখ্যায়িকা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো ১৮৫৭ ইংরেজি সালে। লোকায়ত গদ্যছাঁদে লেখা 'আলাল' বহুতর পাঠকের কাছে আশ্চর্য সমাদর পেলো।

তৎকালীন সাহিত্যসংসারে আলোড়ন জাগালো প্যারীচাঁদের সদ্য-প্রকাশিত বইখানি। একে মর্যাদা দিলেন অনেকেই, এমন কি, বাঙ্‌লা সাহিত্যের দিক্‌পাল বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চমুখে এর প্রশংসা করলেন। প্যারীচাঁদকে সংবর্ধনা জানিয়ে সমালোচক বঙ্কিম লিখলেন :

'তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে —তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্‌লা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্‌লা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল।'

প্যারীচাঁদ ও তাঁর প্রণীত 'আলাল' সম্পর্কে বঙ্কিমের এই প্রশস্তিবাক্য অযথার্থ নয়। 'আলাল'-এর অসামান্য সমাদার-লাভের প্রধান কারণটি তিনি সকলের গোচরীভূত করলেন। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামী প্যারীচাঁদ মিত্র বর্তমান আখ্যায়িকাটি লিখে প্রথম বাঙ্‌লা সামাজিক উপন্যাসের সূচনা করলেন [এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পরে বলছি]। 'আলাল'-এর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ এতে বিন্যস্ত সুসংলগ্ন পূর্ণাঙ্গ একটি আখ্যান বা কাহিনী। সমসাময়িক যে-কাহিনীর সঙ্গে সকলে পরিচিত, তাকে সাহিত্যের উপজীব্য করেছিলেন বলে সেকালের পাঠক বইখানিতে সরসতার সন্ধান পেয়েছিলেন, এ বই জনমনস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত ঘটনাসূত্রকে উপজীব্য করে ইতঃপূর্বে কোনো গ্রন্থ নির্মিত হয়নি, এভাবে বাঙালির সমাজ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে অন্যকোনো লেখক উপন্যাস বা আখ্যায়িকা-নির্মাণে হাত দেননি। এর পূর্বে সাহিত্যে সামাজিক বিকৃতি-বিভ্রান্তি-উদ্‌ঘাটনের খণ্ডচিত্র বা নক্‌শা আমরা পেয়েছি [দৃষ্টান্ত দিতে পারি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' এবং 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকে গ্রথিত খণ্ড খণ্ড ব্যঙ্গ-চিত্রগুলির], কিন্তু পূর্ণায়ত কাহিনী কোথাও চোখে পড়ে না। প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্ব, এরূপ সরস কাহিনী তিনি বাঙালি পাঠককে প্রথম পরিবেশন করলেন ; পড়ে, পাঠক-সাধারণ ভারি খুশি হলেন, লেখককে অজস্র সাধুবাদ জানালেন।

এবার প্যারীচাঁদের প্রযুক্ত ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও এ ভাষারীতির মর্যাদার দাবির কথা। আলালী রীতি অবশ্যই মর্যাদার দাবি রাখে। বাঙ্‌লা কথ্যভাষা নিয়ে প্যারীচাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্তির জন্যে সকলের প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য।

লোকায়ত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করে তোলার যে প্রয়াস, এর মধ্যে দুঃসাহস নিশ্চয়ই আছে, যদিচ এক্ষেত্রে বেপরোয়া তিনি নন—যা লক্ষ্য করা গেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায়। আলালী ভাষা সম্পর্কে প্রথম কথা, এ সহজবোধ্য। তদ্ভব ও দেশি প্রচলিত শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন তিনি; যুক্ত-ক্রিয়াপদ বর্জিত হয়েছে, পরিবর্তে কথ্যভাষার ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে; লেখক তৎসম শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন; সমাসযুক্ত পদের বিষয়েও একই কথা, এবং আরবি-ফার্শি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ এতে লক্ষ্য করা যায়; কথ্য-ভাষা-মূলকতার টানে কয়েকটি ইংরেজি শব্দও ঢুকে পড়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে, আলালের গদ্যের ভিত্তি কিন্তু সাধুভাষা—সংস্কৃতানুসারী গদ্যরীতির উপদ্রবমুক্ত। এ ভাষাকে একপ্রকার মিশ্রসাধুভাষা বলা যেতে পারে।

মৌখিক ভাষার মাধ্যমেও যে সাহিত্য রচিত হতে পারে, এবং রসসৃষ্টি সম্ভব, তা প্রথম প্রমাণ করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। এর আগে উইলিয়ম কেরি ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার তাঁদের বইতে চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করলেও কতকগুলি কারণে তাতে এই ভাষার সহজ সৌন্দর্য ফোটেনি, সাহিত্যরসেরও স্ফুরণ ঘটেনি। এতে সাফল্য অর্জন করলেন প্যারীচাঁদ। এ তাঁর মস্তবড়ো এক কীর্তি। আলালের ঘরের দুলাল-এ কথ্যভাষামূলক উপভাষার নমুনাও মেলে। উপভাষার প্রয়োগে বইখানি বেশ স্বাদযুক্ত হয়েছে। এই চল্‌তি ভাষাকে রসসৃষ্টির কাজে লাগিয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যকে তিনি উন্নতির পথে এগিয়ে দিলেন। যে-জিনিসটা এতকাল অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, প্যারীচাঁদ তাকে সম্ভব করে তুললেন। বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কৃতের সন্তান হলেও তারও যে একটি স্বতন্ত্র চেহারা আছে, একথাটি অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা এদিকে বাঙালি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ১৮৫৮ সালে আলালের ঘরের দুলাল-এর প্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলা যেতে পারে। পূর্বে আমরা সংস্কৃতগন্ধী ভাষা পেয়েছি, এবার পেলাম লোকব্যবহার্য ভাষা। উভয়ের মিশ্রণেই আদর্শ বাঙ্‌লা ভাষার সৃষ্টি হবে, সাহিত্যাধিনায়ক বঙ্কিম বইখানিতে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন। তাই, বঙ্কিম বলেছিলেন :

'প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্‌লা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।··যে-ভাষা সকল বাঙালির বোধগম্য এবং সকল বাঙালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।···আমি এমন বলিতেছি না যে, আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ ভাষা—উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে, এবং উহাতে অতি-উন্নত ভাবসকল সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা, সন্দেহ। কিন্তু উহাতে প্রথম এ বাঙ্‌লা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে-বাঙ্‌লা সর্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে-রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে-সর্বজনহৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার

পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষায় তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্‌লা সাহিত্যের গতি অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে।...প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্‌লা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্‌লা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।'

'আলালের' লেখক সম্পর্কে এর চাইতে বড়ো কথা আর কী হতে পারে। বঙ্কিমের উচ্চারিত প্রশংসাবাক্য এখনো শেষ হয়নি, আরো কয়েকটি কথা তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে :

'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতাহেতু বাঙ্‌লা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, দুর্বল এবং বাঙ্‌লা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর [প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম] প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্‌লার প্রচলিত ভাষাতেই-বা কেন গদ্যগ্রন্থ বিবৃত হইবে না। যে-ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্‌লা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, সেইদিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।'

সাহিত্যবেত্তা ও সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ওপরে-উদ্ধৃত উক্তি মোটামুটি যথার্থ, কিন্তু তাঁর এই উক্তিকে সর্বাংশে সত্য বলে মনে নেওয়া কঠিন। প্রত্যক্ষত, প্যারীচাঁদের প্রশংসা করেছেন তিনি—কুণ্ঠামুক্ত প্রশংসা। প্যারীচাঁদ নিজ কীর্তির স্বীকৃতি লাভ করেছেন—নিঃসন্দেহে যথাযোগ্য স্বীকৃতি। এহেন কীর্তিমান ব্যক্তির প্রশস্তি গাইতে গিয়ে বঙ্কিম কিন্তু অপরাপর কীর্তমান পুরুষের নিন্দাই করেছেন—পরোক্ষে। বাঙ্‌লা গদ্যের প্রথম শিল্পী বিদ্যাসাগরের রচনা বঙ্কিমের কাছে 'অত্যন্ত নীরস' প্রতিভাত হয়েছে, এ বড়ো আশ্চর্য। আর, এই নীরসতা দূর করলেন টেকচাঁদ ঠাকুর প্রচলিত ভাষার শক্তি-সামর্থ দেখিয়ে, বলেছেন বঙ্কিম। বিদ্যাসাগর কি নিজের সমস্ত রচনাই 'সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষা'য় লিখেছিলেন ? 'বিষয়ানুসারে' কোনো কোনো রচনায় কিছু-পরিমাণে সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় নিয়ে তিনি কি আপনার শিল্পবোধের অল্পতারই পরিচয় দিলেন ? সর্বজনবোধ্য, সকলের মধ্যে প্রচলিত, ভাষার মাধ্যমে সব সময় কি উচ্চতর সাহিত্য নির্মাণ করা সম্ভব ? 'সংস্কৃতপ্রিয়তা' কি সর্বক্ষেত্রেই সাহিত্যরসসৃষ্টির পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ ? এ যদি হয়, তাহলে বঙ্কিম-বিরচিত 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি আখ্যায়িকা-গুলিকেও বলতে হয় নীরস, সাহিত্যগুণবিরহিত, 'বাঙ্‌লাসমাজে অপরিচিত'। 'যে-ভাষায় সকলে কথোপথন করে', নিজের প্রথমের দিকের উপন্যাসগুলি কি বঙ্কিম সেই

ভাষায় লিখেছিলেন? 'সংস্কৃতানুকারিতা'-কে যদি এতখানি দোষাবহ বলেই বুঝেছিলেন, তাহলে তিনি নিজে কেন সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রতি দুর্বলতা দেখালেন? যে-অপরাধে বিদ্যাসাগরাদি লেখকগোষ্ঠী অপরাধী, সেই অপরাধে তাঁকেও কি অভিযুক্ত করা যায় না? কাজেই, ওপরে বর্ণিত বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য আমাদের মনে প্রতিবাদস্পৃহা জাগায়। সে-কথা থাক্।

প্যারীচাঁদের ভাষা প্রশংসার্হ, বঙ্কিমের মতে; কারণ, তিনি ব্যবহার করেছেন কথোপকথনের ভাষা এবং প্রচলিত ভাষা। আমাদের জিজ্ঞাসা, যে-ভাষায় প্যারীচাঁদ আলালের ঘরের দুলাল লিখেছেন, তা কি খাঁটি কথ্যভাষা? কথ্যভাষার সঙ্গে সাধু-ভাষার মিশ্রণ চলে কী? আসলে, প্যারীচাঁদের প্রযুক্ত ভাষা একটি সংকর ভাষা—মৌখিক ভাষা, সাধুভাষা আর কথ্যভাষামূলক বিচিত্র রকমের উপভাষা এতে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া, আলালী ভাষারীতিকে ফার্শিবহুল রীতিও বলা যেতে পারে, ফার্শি শব্দের বহুল প্রয়োগ এতে লক্ষিত হয়। আর, এ ভাষা যে শিষ্ট কথ্যভাষা নয়, তা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। খাঁটি কথ্যভাষায় কোনো পুস্তক প্যারীচাঁদ লেখেননি। তবে তাঁর সম্পর্কে প্রশংসার কথা হলো, মুখ্যত কথ্যরীতিকে সাহিত্যের আমদরবারে চালাতে তিনিই প্রথম চেষ্টা করলেন। ক্ষেত্রবিশেষে এ ভাষা জোরালো, হাল্‌কা, দ্রুতগতি, স্বচ্ছন্দ, এবং এখানে তৎসম শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম বলে, স্বল্পশিক্ষিত পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কীর্তিকে স্বীকৃতি জানাতে না চাইলেও, বিপরীতপক্ষে, আলালী রীতির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেও, পরবর্তীকালে দেখা গেলো, বাঙালি লেখক আলালী ভাষাকে ছেড়ে বিদ্যাসাগরের সরলীকৃত বাঙ্‌লা গদ্যরীতিকেই গ্রহণ করেছেন। কথাটি অদ্ভুত শোনালেও বলবো, একালের পাঠকের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা যতখানি সুবোধ্য, 'আলালের' ফার্শিবহুল ভাষা ততখানি নয়। দেখতে পাচ্ছি, বিদ্যাসাগরী রীতিই কালজয়ী হয়েছে, আলালী রীতি ক্ষণকালীন চমক সৃষ্টি করে 'শরৎ-সন্ধ্যার সোনার মেঘের মতো মিলিয়ে গেছে' বিস্মৃতির প্রান্তরে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দাবাদ সত্বেও কালের কষ্টিপাথরে বিদ্যাসাগরের কীর্তিলেখা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

ওপরে বঙ্কিমের মন্তব্যের কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করলাম আমরা, প্যারীচাঁদের সাহিত্যিক শক্তি, প্রতিভা ও কৃতিত্ব অস্বীকার করিনি। এ সত্যটি সকলকে মেনে নিতে হবে যে, বিদ্যাসাগরী সাধুগদ্যরীতি জীবনের উদাত্ত-গম্ভীর-প্রশান্ত দিকটিকে প্রতিফলিত করার পক্ষে যতখানি উপযোগী, লঘু বা হালকা দিকটির ক্ষেত্রে ততখানি নয়। এ-দিকটিকে যথাযথ প্রতিবিম্বিত করতে পারে, এরূপ একটি ভাষা আমাদের সমক্ষে তুলে ধরলেন প্যারীচাঁদ

মিত্র। আলালী ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক, হাস্য-পরিহাস চমৎকার ফোটে ; জীবন-সমুদ্রের উপরিভাগের তরঙ্গলীলার কলধ্বনিটি শোনাতে হলে টেকচাঁদী কথ্যরীতির আশ্রয় নেওয়াই বিধেয়। মধুসূদন-দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিতে, কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্শাজাতীয় রচনায়, আলালী ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। পরোক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও এই স্টাইলের প্রভাবে এসেছেন। প্যারীচাঁদ নতুন কোনো মৌখিক ভাষারীতি প্রবর্তন করেন নি, কেরি-মৃত্যুঞ্জয়-আদি পূর্ববর্তী গদ্যলেখকদের প্রদর্শিত রীতিটিকে পুনর্জীবিত করেছেন, তার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছেন, এবং একে পূর্ণাঙ্গ আখ্যাননির্মাণের কাজে লাগিয়ে পরবর্তী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারগণের পথপ্রদর্শক হয়েছেন। এ কি কম কৃতিত্বের কথা !

সাধুগদ্যরীতিও প্যারীচাঁদের হাতে কিছুটা নতুন রূপ পেয়েছে, তৎকালপ্রচলিত সাধুভাষার সংস্কারসাধনেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'আলাল'-এর পর যে-বইগুলি তিনি লিখেছেন, যেমন—'যৎকিঞ্চিৎ' [১৮৬৫], 'অভেদী' [১৮৭১], ইত্যাদি, সেগুলিতে তিনি ক্রমশ সাধুভাষার দিকেই ঝুঁকেছেন। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এতে প্রাকৃতমূলক শব্দের প্রয়োগ অবিরল, সংস্কৃত অলংকার ও জটিল বাক্য যথাসম্ভব বর্জিত হয়েছে। ফলে এ দ্রুততর গতিচ্ছন্দ লাভ করেছে, অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠেছে। তবে সাধুভাষায় লিখতে বসেও চলিত ভাষার মিশ্রণ তিনি এড়াতে পারেন নি। কিছু কিছু দোষ তাঁর ভাষায় আছে ; থাকলেও, রসসৃষ্টিতে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।

*   *

প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা সম্পর্কে এযাবৎ যা-কিছু আলোচনা হয়েছে, তা মুখ্যত ভাষাগত, ঔপন্যাসিক-হিসেবে প্যারীচাঁদের কৃতিত্বের দিকটি একরূপ চাপা পড়ে গেছে। বাঙালির সমাজজীবনের কথাকে উপজীব্য করে প্রথম তিনিই উপন্যাসনির্মাণে হাত দিলেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' সমাজ-সমালোচনা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই লেখকের অভিজ্ঞতা ছিল, যেমন বাস্তব, তেমনি, বিস্তীর্ণ। বিচিত্র মানুষের ভিড় এ আখ্যায়িকায়, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতও বিচিত্র। সুশিক্ষা না পেলে, কুসংসর্গের প্রভাবে এলে, ধনীর ছেলে কীভাবে অধঃপাতে যায় ; আর, ভালো শিক্ষা ও সৎপ্রভাবে কেমন সুন্দর মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয়, 'আলালে' এ জিনিসটিই একটি আখ্যানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এই পুস্তকে নীতিপ্রচারই লেখকের আসল লক্ষ্য, এর রচনার মূলে ঠিক সাহিত্যিক প্রেরণা ছিল না। লেখক স্পষ্টত আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত, সুনীতি-সুরুচি-সৎশিক্ষার বাণীই তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন।

তা হলেও, এখানে আদর্শবাদকে—নীতিপ্রচারণার মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে—ছাপিয়ে উঠেছে প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনরসরসিকতা। চরিত্রচিত্রণে বাস্তবতাবোধের প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন তিনি, ছোটবড়ো কত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ছোট চরিত্রগুলি রেখাচিত্র, কিন্তু অতিশয় মনোজ্ঞ। ঔপন্যাসিক নিজ অভিজ্ঞতার বাইরে পদক্ষেপ করেননি, আপনার চোখে-দেখা মানুষ, ঘটনা ও বস্তুকেই আখ্যায়িকখানিতে উপস্থিত করেছেন। এরা সকলেই তাঁর চেনার আলোকে উদ্ভাসিত। কোথাও কৌতুক, কোথাও পরিহাস, কোথাও বিদ্রূপবাহী বঙ্কিম দৃষ্টি উপন্যাসে গ্রথিত বর্ণনকে রসময় উজ্জ্বলতা দান করেছে। বাবুরামবাবু, বরদাবাবু, বেণীবাবু, মতিলাল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ, বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর, ঠকচাচা, বটলর সাহেব ও জানসাহেব প্রভৃতি চরিত্র লেখকের অপূর্ব কৌশলে চমৎকার রূপায়িত। প্যারীচাঁদের অঙ্কিত ঠকচাচা-চরিত্রের তুলনা বাঙলা কথাসাহিত্যে নেই বললে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না। এই কুচক্রী মামলাবাজ মানুষটিকে 'আলালের' কোনো পাঠকই ভুলবেন না। তার একটি উক্তি ঘুরেফিরে কানের মধ্যে নিরন্তর ধ্বনিত হতে থাকে : 'দুনিয়াদারি করতে গেলে ভালাবুরা দু-ই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?'—এক কূটবুদ্ধি ব্যক্তির নির্লজ্জ অকপট উক্তি। এ উপন্যাসে সংলাপের ভাষাটিকে নিখুঁত বলতে পারা যায়। 'আলালে' বহুচরিত্রের মনোরম একটি চিত্রশালা গড়ে তুলেছেন উপন্যাসকার। এর সর্বত্র শোভন শালীনতার পরিচয় মুদ্রিত—নীতিনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের রুচিবোধেরই অভিব্যক্তি।

তবে একটি কথা। জীবনের গভীরে ডুব দেননি প্যারীচাঁদ, মানবচরিত্রের রহস্যময়তার উদ্‌ঘাটন বর্তমান উপন্যাসে নেই, নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে মেলে না, মনুষ্যের মনোজগতের নানামুখী ভাব-ভাবনা, বাসনা-কামনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রথম বাঙলা সামাজিক আখ্যায়িকায় এতগুলা জিনিস প্রত্যাশা কেউ করে না। লেখক যেটুকু রস পরিবেশন করেছেন, ওতেও আমরা কম তৃপ্তিবোধ করি না।

আরো কয়েকখানা বই লিখেছেন তিনি। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'রামারঞ্জিকা', ইত্যাদি। এগুলিতে নীতি-কথার প্রাধান্য, এদের প্রচারমূলকতা অনায়াসলক্ষ্য। এসব বই প্যারীচাঁদের মহিমা ঘোষণা করে না—জীবনরসের অভিসেচন এগুলাতে মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। 'আলালের ঘরের দুলাল'-ই প্যারীচাঁদ মিত্রের স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম।

প্যারীচাঁদের ভাষার নিদর্শন :

॥ ১ ॥ 'ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বলিলেন—মোর উপর এতনা টিটকারী দিয়া বাত হচ্ছে কেন? মুই তো এ সাদি করতে বলি—একটা নামজাদা

লোকের বেটি না আনলে আদমির কাছে বহু শরমের বাত; মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে দেখেছি যে, মনিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি, তেনার নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়…।'
—আলালের ঘরের দুলাল

॥ ২ ॥ 'বেলেল্লা ছোড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন টাট্‌কা টাট্‌কা রঙ্‌ চাই। বাহিরে কোনোরকম আমোদের সূত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া-জেঠা থাকে, তবেই বাঁচোয়া, কারণ, বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাঁহাদিগের গঙ্গাযাত্রার ফিকিরও হইতে পারে, নতুবা বিষম সংকট—একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে।'
—আলালের ঘরের দুলাল

॥ ৩ ॥ 'ভবশংকর। আরে বলা—বলা—বলা।
বলরাম চাকর। এজ্ঞে, এজ্ঞে।
ভবশংকর। আরে বেটা! পাঁচ ডাকের পর আজ্ঞে। নীচে গিয়ে দেখ দেখি হান্‌পে আসিয়াছে কিনা। আর, চারপাঁচ বোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শীঘ্র আন।'
—মদ খাওয়া বড় দায়

॥ ৪ ॥ 'মধ্যাহ্ন উপস্থিত। রবির প্রখর উত্তাপ। মাঠে গোপালেরা গরু চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো-সকল তৃষ্ণাতে আতুর। গোপাল লাঙ্গুল মুচড়াইয়া লাঙ্গল চালাইতেছে। আপন লাভ-জন্য পশুদিগের প্রতি মনুষ্য সর্বদা দয়াহীন হইয়া থাকে।'
—অভেদী

এতকাল প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল'-কেই বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে জানতো সকলে। অধুনা একখানি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, নাম—**'ফুলমনি ও করুণা'**—একজন য়ুরোপীয় মহিলার লেখা। এই পুস্তকের রচয়িত্রীর নাম—হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্স। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রিস্টীয় সালে, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর আত্মপ্রকাশের ছয় বছর আগে। 'ফুলমনি ও করুণা' আখ্যায়িকা-গোত্রের রচনা। কেউ কেউ বলেছেন, বাঙ্‌লা উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস-রূপে এ গ্রন্থের দাবি স্বীকার করা উচিত। কারণ, কয়েকটি চরিত্রসংবলিত বাস্তবজীবনের একটি কাহিনী এতে বিন্যস্ত। বইখানি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল, এর অস্তিত্ব কারুর জানা ছিল না। কেন এরূপ হলো, তার উত্তরে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষত খ্রিস্টধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত বলে লোকসাধারণের সমাদর এ পায়নি—পাঠকের উপেক্ষাই একে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সে যা হোক, বর্তমান আখ্যায়িকাখানি এখন ঐতিহাসিক কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছে।

এক পাদ্রির কন্যা শ্রীমতী ম্যালেন্স [১৮২৬-১৮৬১]। জে. ম্যালেন্স নামে একজন ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীস্ত্রী দুজনেই খ্রিস্টধর্মপ্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেন। কলকাতায় ম্যালেন্সের জন্ম। শৈশবকাল থেকেই বাঙ্‌লা ভাষা শিখতে থাকেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠার জোরে বাঙ্‌লা ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। কলকাতা শহরে মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে তিনি যুক্ত করেছিলেন। শ্রীমতী ম্যালেন্স শিক্ষাদানে ও সমাজসেবায় আনন্দ পেতেন।

'ফুলমনি ও করুণা'য় বর্ণিত কাহিনীটিতে খ্রিস্টান-জীবনাদর্শটিকেই পাঠকের সমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা। কিন্তু আখ্যায়িকাটিতে কাহিনীগ্রন্থনের শিথিলতা অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না, চরিত্রগুলিকে বিকাশধর্মী বলা চলে না, চিত্রপরম্পরা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়নি, লেখিকার জীবনবোধ নিবিড় নয়, বাঙালি খ্রিস্টান-পরিবারের মধ্যে আখ্যান সীমাবদ্ধ—চতুষ্পার্শ্বের বিস্তীর্ণ সমাজের সঙ্গে কোনো যোগ এর নেই। বৃহত্তর সমাজজীবনের আলেখ্য নয় বলে পাঠকসাধারণ এ বই পড়ে পরিতৃপ্তবোধ করে নি। কথাবস্তু পরিচিত না হলে, শিল্পসৌন্দর্যের ন্যূনতম স্ফুরণও না ঘটলে, আখ্যায়িকা-জাতের রচনা পাঠকের কদর পায় না। ঔপন্যাসিকের কলম নয় লেখিকার ; মনে হয়, উপন্যাসকারের দৃষ্টিও তাঁর ছিল না। নিজ লেখনীকে তিনি নিছক ধর্মপ্রচারের কাজেই লাগিয়েছেন, এবং এই অভিপ্রায়সাধন-উদ্দেশ্যে একটা ক্ষীণকায় কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। তাই, বলতে বাধা নেই, সাহিত্যকৃতি-হিসেবে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পাশে এ কোনোরকমেই স্থান পেতে পারে না। বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে 'ফুলমনি ও করুণা'-কে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখবার বিষয়।

॥ আধুনিক বাঙ্‌লা গদ্যরীতির অন্যতম পথিকৃৎ ॥

—ব্যঙ্গশিল্পী কালীপ্রসন্ন সিংহ—

অকালে লোকান্তরিত প্রতিভাবান তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহের দিকে তাকালে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তাঁর আয়ুষ্কালের পরিধি মাত্র তিরিশ বছর—১৮৪০ খ্রিস্টীয় সালে জন্ম, ১৮৭০-এ মৃত্যু। এহেন স্বল্পায়ত আয়ুর সীমায় অবস্থান করেও যে-কর্মকীর্তি ও সাহিত্যকীর্তি তিনি রেখে গেছেন, তা-ই তাঁকে লোকস্মৃতিতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবে। এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ—উনবিংশ শতকের বাঙ্‌লার রেনেসাঁসের [নবজাগরণের] বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। রামমোহনের উদ্‌ঘোষিত সংস্কারমুক্তির বাণী,

বিদ্যাসাগরের মানবতন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথের প্রগতিবাদী রক্ষণশীলতা, ইত্যাদি বস্তু তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন; সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়াছিলেন, জাতীয় ঐতিহ্যকে নিষ্ঠাসহকারে আঁকড়ে ধরেছিলেন, দেশে সুসাহিত্যসৃষ্টির পথটি প্রশস্ত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অপরিসীম উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী-সভা'র প্রতিষ্ঠা, 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ'-স্থাপন, সংবাদপত্রসেবা, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিজের স্থাপিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা-জ্ঞাপন, প্রভৃতি জিনিস নব্যবাঙলার সংস্কৃতিবান্ পুরুষ কালীপ্রসন্নের সংকীর্তির স্মারক। শিক্ষিত মন, উদার হৃদয়, সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সমাজসচেতন কৌতূহলী দৃষ্টি এই বিস্ময়জাগানো কর্মী মানুষটিকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। তাঁর আরেকটি অবিস্মরণীয় কীর্তি বড়ো বড়ো বাঙালি সংস্কৃত পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারতের ন্যায় বিপুলকায় গ্রন্থের অনুবাদকর্ম-সম্পাদন। এই গদ্যানুবাদে, এবং এর মুদ্রণে ও বিতরণে, আড়াই লক্ষ টাকা তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল। কথাগুলি একালে আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, গল্পের মতোই শোনায়। কিন্তু এ ঘটনাটি সত্য, যদিচ বিস্ময়াবহ। দুহাতে তিনি টাকা উড়িয়েছেন।

টাকা উড়িয়েছেন, তবে অধঃপতনের পথে নামতে গিয়ে নয়। ওই পথটি ধরে যদি তিনি আত্মবিনাশের দিকে এগুতেন, তাহলেও বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। কারণ, সেকালের কলকাতার বহু ধনীর ছেলে কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে মদ আর বারবিলাসিনীদের নিয়ে মেতে থেকেছে, অসদুপায়ে অর্জিত টাকাকে ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করে অবলীলায় উচ্ছৃঙ্খলতার বহ্ন্যুৎসবে পুড়িয়েছে—সেদিনের বাবুতন্ত্রের কলকাতা জঘন্য ইন্দ্রিয়ালুতা ও ঘৃণ্য ইতরামির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছে। নীতিবিবর্জিত 'বাবু-কালচার' সমাজে ক্লিন্নতার যে-মারাত্মক বিষ ছড়িয়েছিল, তা বিত্তবানদের দেহে-মনে দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি করেছে। এর বিষক্রিয়ায় অনেকেরই আত্মিক অপমৃত্যু ঘটলো।

জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশের সন্তান কালীপ্রসন্ন অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত। পিতার মৃত্যু হলে কৈশোরেই তিনি বিপুল বিত্তের মালিক হন। কাজেই, তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হঠাৎ-বাবু' সেজে বসতে কোনোই অসুবিধে ছিল না; ধাপে ধাপে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নেমে যেতে পারতেন তিনি, নোঙরা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলে কিছুই অস্বাভাবিক হতো না। কিন্তু কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ শাসনে নিজ আত্মার মহতী বিনষ্টির পথে পা বাড়ান নি যুবক কালীপ্রসন্ন; পক্ষান্তরে, সর্বপ্রকার সামাজিক গ্লানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণাই করলেন, জনকল্যাণমূলক বিচিত্র কর্মে নিজেকে জড়ালেন, সমাজসংস্কারের প্রবল ইচ্ছার বশীভূত হলেন। কালীপ্রসন্ন

দেশপ্রেমী, লোকহিতব্রতী এবং মনুষ্যত্বের সাধক খাঁটি একজন মানুষ, বলতে পারি—বিরাট এক কর্মীপুরুষ।

সাহিত্যকীর্তি কালীপ্রসন্নের কম নয়। তথাপি, যথার্থ সাহিত্যিক তাঁকে বলবো না আমরা। কেননা, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখনী চালনা করেন নি তিনি। যে-পুস্তকখানি তাঁকে মৃত্যুহীন খ্যাতি এনে দিয়েছে, আত্মপ্রকাশের তাগিদে তা রচিত হয়নি। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র কথাই বলছি। সাহিত্যসাধনা তাঁর কর্মসাধনারই বিশেষ একটি প্রকাশ মাত্র। কর্মোদ্যম এখানে সাহিত্যের পথে চালিত হয়েছে। কয়েকখানা নাটক তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। সাহিত্যের দিক থেকে সেগুলোর মূল্য হয়তো কিছু আছে। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর যে কীর্তি তা মহাভারতের অনুবাদ [খ্রিস্টীয় ১৮৬৬ সালে সমাপ্ত] ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'। এদের প্রথমটিতে কালীপ্রসন্ন জাতীয় ঐতিহ্যের শক্তিমান ধারক, দ্বিতীয়টিতে তাঁর ভূমিকা সমাজসংস্কারক শ্লেষশিল্পীর—স্যাটায়ারিস্টের। দ্বিতীয় পুস্তকে শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করলেও নিজের আসল উদ্দেশ্যটি লেখক কোথাও গুহানিহিত করে রাখেননি—সমাজসংস্কাররূপ কর্মস্পৃহা থেকেই এই পুস্তকের জন্ম। বুঝতে অসুবিধে হয় না, একজন কর্মী এখানে সাহিত্যের আসরে নেমেছেন। এই একই মন্তব্য কিয়দংশে 'বাবু-উপাখ্যান', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামধারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সর্বাংশে বহুশ্রুত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'-প্রণেতা টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পর্কে প্রযোজ্য। মূলত সাহিত্যিক না হয়েও প্যারীচাঁদ সাহিত্যসৃষ্টি করে বসেছেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' [১৮৬২] এক অপূর্ব গ্রন্থ। এর চার বছর আগে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। 'আলালের' কিঞ্চিৎ প্রভাব 'হুতোমে' রয়েছে, এ সত্যটি অস্বীকার করা যায় না। এতে কিন্তু কালীপ্রসন্নের নিজত্ব ক্ষুন্ন হয়নি। দুজনেই সমাজসচেতন সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। তবে 'আলাল' জাতিতে উপন্যাস; আর, কালীপ্রসন্নের নির্মিত 'নক্‌শা' রচনা-সাহিত্যেরই নমুনা—টুক্‌রো টুক্‌রো ব্যঙ্গচিত্রের সমষ্টি, বাস্তবগুণসমৃদ্ধ সমাজ-আলেখ্য; বলি না কেন, 'আজব শহর কলকেতা'র সামাজিক গেজেট। মুখ্যত কলকাতাই এর পটভূমি। বইখানি বেরুলে সেদিন শিক্ষিত বাঙালিসমাজে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল, অত্যন্ত চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর এর আবির্ভাব। পুস্তকখানির ওপরে একদিকে অজস্র নিন্দা বর্ষিত হয়েছে, আবার, অন্যদিকে, কেউ কেউ একে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। অবশ্য বিরুদ্ধদলই ছিল ভারি। তাঁরা 'নক্‌শা'র প্রতি দারুণ বিরূপতা দেখিয়েছেন—বইখানিতে তাঁরা ভাষা

ও ভাবের নীচতা লক্ষ্য করেছেন, অশ্লীলতার পুঞ্জীকৃত আবর্জনা দেখতে পেয়েছেন। তাঁদের মতে সমাজের পাঁক ঘাটবার অত্যুৎসাহবশেই হুতোম প্যাঁচা-বেশধারী কালীপ্রসন্ন সিংহ কুরুচিপূর্ণ নকশা উড়িয়েছেন। পক্ষান্তরে, এ বইকে যাঁরা প্রশংসা জানিয়েছেন, তাঁরা এর ভাষার বৈচিত্র্য ও সরসতা দেখে চমৎকৃত হয়েছেন, লেখকের সামাজিক-দুর্নীতি-প্রদর্শনের দুঃসাহস চাক্ষুষ করে বিস্মিত বোধ করেছেন।

হুতোমের অঙ্কিত 'নকশা' বহুবর্ণরঞ্জিত। তৎকালীন কলকাতার সমাজ এতে প্রতিবিম্বিত; অনেক ব্যক্তির—'হঠাৎ-বাবু'র—ক্লেদাক্ত আলেখ্য উন্মোচিত। হুতোমের ধারালো ঠোঁটের আঘাতে এরা ক্ষতবিক্ষত। পুস্তকটিতে কালীপ্রসন্ন তৎকালীন কলকাতা শহরের ধনী অভিজাতসম্প্রদায়ের ওপর তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ হেনেছেন সমধিক, তাদের মুখোসটি খুলে ধরেছেন। এছাড়া, এই আজব শহরটির আরো কত বিচিত্র চিত্র এঁকেছেন হুতোম তাঁর নিপুণ তুলির টানে—কথার রঙে-রেখায়। অদ্ভুত মনোজ্ঞ বর্ণনা, প্রত্যক্ষ ছবি দেখছি যেন। লেখকের কী বাক্শক্তি, কী স্পষ্ট ভাষণ, ভাষার ওপরে তাঁর দখল কত, কতখানি বর্ণনানৈপুণ্য! রঙ্গে-ব্যঙ্গে-কৌতুকে চিত্রগুলি সমুজ্জ্বল, এতে বর্ণিত ক্ষুদ্রায়তন কাহিনী-সব উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক, যদিচ কোথাও কোথাও বর্ণনা শ্লেষতিক্ত। চড়ক-পার্বণের ও মাহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনা পড়ুন, আপনি চমকিত হবেন, খুশিও হবেন; 'হুজুক' কিংবা 'বুজরুকি' শিরোনামার অন্তর্গত রচনাগুলো অনুধাবন করুন, বুঝতে পারবেন, সেকালের বাঙালি কত হুজুকপ্রিয় ছিল, কীরূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল তারা, ভক্তি ও ভয়ের কাছে কতখানি দুর্বলতা দেখিয়েছে, আর, ধর্মান্ধতা কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে কী কঠিন ছিল। এই মানুষগুলা বারোয়ারীর নামে কি কম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে! রাতারাতি বড়ো মানুষ হয়ে ওঠবার জন্যে 'বাবু'-র দল কি কম জাল-জোচ্চুরির আশ্রয় নিয়েছে! ইতরামি আর নষ্টামির কি শেষ ছিল তাদের! এসব সামাজিক গ্লানির কিছুই হুতোমের নকশা থেকে বাদ পড়েনি। উদার কণ্ঠে তাঁর চিত্রণকুশলতার প্রশংসা করতে হয়। সমাজের আত্মচেতনা ফিরে আসুক, 'নকশা'র দর্পণে নিজেদের মুখ দেখে ধনী অভিজাতেরা সুবুদ্ধির কূলে জেগে উঠুক, এরূপ একটি অভিপ্রায় নিয়ে কালীপ্রসন্ন নকশা আঁকতে বসেছিলেন।

কিন্তু 'হুতোম'-এর এই উদ্দেশ্য অনেকেই সঠিক ধরতে পারেন নি, এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্তও না। 'বাবু'-কালচার-আশ্রয়ে, সদিচ্ছাপ্রণোদিত যে-সামাজিক স্যাটায়ার রচনা করলেন কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম তার প্রতি একেবারেই প্রসন্ন ছিলেন না। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-কে তিনি চরম উপেক্ষা দেখিয়েছেন, এর নিন্দাবাদে মুখর হয়েছেন। অথচ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর যতখানি প্রশস্তি তিনি গেয়েছেন,

তা প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি। একদিকে অতিরিক্ত প্রশংসা, অন্যদিকে, নিন্দার অতিরেক। এ বিচারবিভ্রাট ছাড়া আর কী। আমাদের অভিমত, কালীপ্রসন্নের সম্পর্কে সুবিচার করেননি বাঙ্‌লার এই 'সাহিত্যসম্রাট'। বঙ্কিমচন্দ্র বইখানির মধ্যে অতি-আত্যন্তিক অশ্লীলতার স্পর্শ দেখতে পেয়েছেন, দেখতে পেয়েছেন পবিত্রতার অভাব। তাছাড়া, হুতোমের ভাষাও তাঁর ভালো লাগেনি। এখানে সাহিত্যসম্রাটের কিঞ্চিৎ মন্তব্য তুলে দিই :

'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।'

অদ্ভুত একটি রায় দিলেন, গ্রন্থপ্রণয়নের বিধিবিধান উপস্থিত করলেন, বঙ্কিমচন্দ্র। 'আলালী' ভাষায় পুস্তক রচিত হতে বাধা নেই, কিন্তু সাহিত্যে 'হুতোমি' ভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। কী কারণে? যেহেতু এর ভাষা অশালীন, অশালীন এর বর্ণনা; যেহেতু এ ভাষা নিস্তেজ, অসুন্দর, দরিদ্র। প্রথমে ভাষা ও বর্ণনের অশালীনতার কথা। বঙ্কিমের চোখে হুতোমের নক্শা যতখানি অসুন্দর বা অশালীন বা অশ্লীল ঠেকেছে, আমাদের চোখে ততখানি নয়। 'মাহেশের রথযাত্রা'-র খানিকটা অংশ ছাড়া এ বইয়ের অন্যত্র কোথাও রুচিবিরুদ্ধতার পরিচয় ফোটেনি; ঠিক অশ্লীলতা যাকে বলে, পুস্তকটিতে এমন-কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্বত্র নির্মল কৌতুক ও সরসতা—হিউমারের উদ্ভাসন—সকলে লক্ষ্য করবেন। এতে এতটুকু গ্রাম্যতাদোষের ছায়াপাত হয়নি, সেকালের ভাঁড়ামির চিহ্ন কুত্রাপি নেই। হুতোম কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেগুলি অধুনা ব্যবহৃত হয় না, অথচ এককালে ভদ্রসমাজে হামেশা ব্যবহৃত হতো। এরূপ কিছু কিছু শব্দ কারো কারো কাছে অশালীন বা অমার্জিত মনে হতে পারে। এগুলিকে লেখকের রুচিবিকৃতির পরিচায়ক বলে ধরলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। কালীপ্রসন্নের পরিহাসে তেমন স্থূলতা কোথায়? কোথায় নিন্দনীয় অপরুচির মুদ্রাঙ্কন? 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-কে সুনজরে দেখেননি বঙ্কিম, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত 'কল্পতরু'-র প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে তাঁর বাধেনি। অথচ ওই পুস্তকটিতে অনেক বেশি রুচিবিরুদ্ধতার পরিচয় মেলে। কাজেই, কালীপ্রসন্নের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত মন্তব্য অশ্রদ্ধেয়। তাঁর নিন্দা সত্ত্বেও হুতোমের নক্শা আপন মহিমায় অদ্যাপি বিরাজমান। হুতোমের রচনায় অতিবর্ণন আছে, অতিভাষণের ত্রুটি আছে, শৃঙ্খলার অভাব দেখতে পাই, কিন্তু অপরুচির অভিযোগ এর বিরুদ্ধে মানতে পারা যায় না।

এবার, হুতোমি ভাষারীতির কথা। একশ বছর আগে কলকাতায় যে-চলতি

ভাষা প্রচলিত ছিল, বর্তমান 'নক্‌শা'-য় তাকে অবিকৃতরূপে তুলে ধরা হয়েছে। 'নক্‌শা'-র বিষয়বস্তুর উপযোগী ভাষা আশ্রয় করেছেন কালীপ্রসন্ন। সুষ্ঠু সাবলীল কথ্যভাষার প্রয়োগে তিনি নিরঙ্কুশ। চল্‌তি ভাষার ব্যবহারে কালীপ্রসন্ন আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এ কৃতিত্ব সামান্য নয়, এবং সাহসেরও কথা। সর্বজনবোধ্য মৌখিক ভাষায় এই প্রথম রসাত্মক বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্য নির্মিত হলো। এর আগেই অবশ্য আলালী রীতির আত্মপ্রকাশ। কিন্তু কথ্যভাষার মোটামুটি একটা ধাঁচ ওতে লক্ষ্য করা গেলেও ওর মূলভিত্তি সরলীকৃত গদ্যভাষা। তাছাড়া, টেকচাঁদী ভাষায় সাধুরীতি ও কথ্যরীতির মিশ্রণ অবিরল। একে মস্তবড়ো একটি ত্রুটি বল্‌তেই হবে। এই দোষ থেকে হুতোমি ভাষা সম্পূর্ণ মুক্ত। কালীপ্রসন্নের অভিনব স্টাইল 'নক্‌শা'-বইখানির চমকপ্রদ একটি বৈশিষ্ট্য। বিংশ শতকের প্রথম পাদে বীরবল ও শ্রীরবীন্দ্র যে-চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহনরূপে সাগ্রহে বরণ করলেন, সেই চলতি রীতির অন্যতম পথিকৃৎ কালীপ্রসন্ন সিংহ। হুতোমি ভাষারই বিচিত্র পরিণতি ঘটলো বীরবলাদির রচনায়। প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যকারগণের হাতে হুতোমি ভাষা বা কল্‌কাতার লোকের নিত্যব্যবহার্য ভাষা একটা শিষ্টরূপ পেলো। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা প্রতি মুহূর্তে হুতোমের স্টাইল্‌কে মনে পড়িয়ে দেয়।

হুতোমি ভাষা, বঙ্কিমের মতানুসারে, হয়তো দরিদ্র, এর চেহারায় হয়তো অনবদ্য শ্রী ফোটেনি, এতে এখানে-ওখানে শব্দপ্রয়োগগত সামান্য অশালীনতাও হয়তো প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা অবাঞ্ছিত আরো-কিছু বস্তু ঢুকে পড়েছে। কিন্তু একে 'নিস্তেজ' বলার সাধ্য কী! অতিপ্রবল এর প্রাণশক্তি। গভীর ভাব-বহনের তেমন উপযোগী এ না হতে পারে, কিন্তু হাল্‌কা ভাব, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, রঙ্গ-কৌতুক-প্রকাশের ক্ষেত্রটিতে এর অশেষ ক্ষমতা। স্বামীজীর রচনাবলীর সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তাঁরা উপলব্ধি করবেন, সর্বজনবোধ্য হুতোমি ভাষার জোর কতখানি।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস বলে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর গৌরব অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে টেকচাঁদের 'আলাল' আর হুতোমের 'নক্‌শা'-র মধ্যে কার গৌরব বেশি, এ বলা সত্যিই কঠিন। আমাদের বিবেচনায়, রসরচনা-হিসেবে 'নক্‌শা'-র স্থান 'আলাল'-এর ওপরে। এতে যে-জীবনের চিত্র উন্মোচিত, বাঙ্‌লা সাহিত্যে তার তুলনা কোথায়? নাটক রচনার দিকে মন না দিয়ে, কালীপ্রসন্ন যদি উপন্যাসনির্মাণে হাত দিতেন, তাহলে হয়তো উপন্যাসজাতীয় ভালো সাহিত্যকর্ম তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতাম। ভাষা-হিসেবেও, 'আলাল'-এর তুলনায়, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষার কিছু নমুনা :

॥ ১ ॥ 'হঠাৎ টাকা পেলে মেজাজ যে-রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তা হয় না……কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন। তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। ওরে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে শহরের বড় দলে খপর এলো যে, কলকেতার ন্যাচ্‌রাল হিস্ট্রির দলে আর-একটি নম্বরে বাড়লো।'

॥ ২ ॥ 'রাস্তার ধারের দুই-একখানা কাপড় কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে, রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোনার বেনেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটছে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙা বাজারে মেচুনিরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিশ ক্রেতাদের—"ও গামচাকাঁদে, ভালো মাচ নিবি?" "ও খেংরাগুপো মিন্‌সে, চার আনা দিবি?"—বলে আদর কচ্চে; মধ্যে মধ্যে দুই-একজন রসিকতা জানাবার জন্যে মেচুনি ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর গেঁজেল ও মাতালরা লাঠি হাতে করে কাণা সেজে—"অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর, দাতাগণ"—বলে ভিক্ষা করচে।

॥ ৩ ॥ 'ভূতকাল যেন আমাদেব ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন, বর্তমান স্কুল-মাস্টারের মতো গম্ভীরভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত। জেলার পুরানো হাকিম বদলি হলে নীলপ্রজাদের মন যেমন ধুকপুক্ করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাস্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্‌গুর্ করে, মদ্দুক্কে পোয়াতির বুড়ো বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়, পুরানোর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।'

॥ ৪ ॥ 'ইংরাজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরাজি পড়াননি; অথচ বিদ্যাসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ-নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই, এটিও তাঁর জানা ছিল; সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"-র দলে পড়তে হয়।'

—হুতোমি ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি, প্রাণশক্তি আর ঔজ্জ্বল্য আপনারা লক্ষ্য করুন; হুতোমের বর্ণননৈপুণ্য দেখে নিন, রসিকতা-পরিহাসের স্বরূপটি বুঝে নিতে চেষ্টা করুন। তারপর বলুন, ওপরে কথিত বঙ্কিমের মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা।

॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥

কালধর্মের ফেরে অকল্পনীয় ঘটনাও ঘটে যায়—অসামান্য কৃতিত্ব, ভাস্বর কীর্তিও বিস্মরণের তলায় চাপা পড়ে। এর প্রমাণ উদ্ধার করতে বেশি-কিছু বেগ পেতে হয় না। উপস্থিত ক্ষেত্রে একটি প্রমাণ হলো: বঙ্গগৌরব, ভাবুক ও মনীষী, বাঙ্‌লা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে [১৮২৭-১৮৯৪] আজ আমরা একরূপ ভুলে গেছি। অথচ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙ্‌লাদেশে কী মহিমান্বিত সামাজিক প্রতিষ্ঠার সমুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন পুণ্যশ্লোক ভূদেব—তাঁর মনীষা, ব্যক্তিত্ব, ভাবুকতা ও চারিত্র্য বাঙালি জাতির, বিশেষে হিন্দুবাঙালির, কতখানি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে! সেদিন শিক্ষিত বাঙালির চরিত্র ও চিন্তাধারা যে-কয়জন প্রবলব্যক্তিত্বসম্পন্ন বঙ্গসন্তানের ভাব-ভাবনা ও উচ্চাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ভূদেবের নামটি অবশ্য-স্মরণীয়।

যে-ব্রাহ্মণ্যের ভাবধারা দূর অতীতে অপস্থত সংহিতা-উপনিষদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে, যুগপ্রাচীন যে-ভাবধারায় সনাতন ভারতবর্ষের পুরাতনী প্রজ্ঞা আর সর্বোত্তম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিধৃত—ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশোদ্ভূত, সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজের ছাত্র, প্রতিভাশালী ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই জ্যোতির্ময় আদর্শটি উনিশের শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম দশকের বাঙ্‌লা সমাজের আত্মিক অরাজকতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের দিনগুলিতে জাতির সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। বাঙালি তখন নিজের জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, জাতীয় জীবনে আত্মহত্যার পথে পা বাড়িয়েছে, কুলভ্রষ্ট হতে চলেছে, মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সেই মারাত্মক আপৎকালে ভূদেবের প্রাণদ বাণীর স্থির জ্যোতি জাতিকে অন্ধকারে পথ দেখিয়েছে, তাকে আধিমানসিক বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে তৎকালীন বাঙ্‌লার তরুণসমাজ নিজেদের সামলাতে পারছিল না, বিলাতি বিদ্যার হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানিতে তাদের অনেকে অন্ধদৃষ্টি হয়ে পড়েছিল, নিদারুণ আত্মবিস্মৃতি তাদেরকে গ্রাস করেছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের মধ্যে কেউ কেউ সমাজ ত্যাগ করে বাইরে চলে যাচ্ছে, কেউ-বা বিজাতীয় ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে, দেশীয় রীতিনীতিকে চরম উপেক্ষা দেখিয়ে পশ্চিমা রীতিনীতির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে,—চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে উৎকেন্দ্রিকতার বিষবাষ্প। সেদিনকার নতুন শিক্ষা মূঢ়তাগ্রস্ত বাঙালি যুবককে আপনার জাতীয় সংস্কৃতি-

বিষয়ে অজ্ঞ করে রাখছিল, তাকে ক্রমশ আত্মবিশ্বাসহীন করে তুলছিল, কেমন একটা অসহায় ভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। জাতিগতভাবে বাঙালি সেদিন আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিচ্ছিল, মনুষ্যত্ববিবর্জিত হয়ে পড়তে যাচ্ছিল। বাঙ্‌লাদেশে যখন এরূপ বিপর্যয় ঘনিয়েছে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদক্ষেপ করেছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দুষ্টপ্রভাবে তিনিও হয়তো বিজাতীয়তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেন, যেমন দিয়েছিলেন তাঁর সহপাঠী কত ছাত্র। কিন্তু আপনার বংশ-মর্যাদাবোধ ও পিতার পূত জীবনাদর্শ আত্মার মহতী বিনষ্টির পথে তাঁকে ধাবিত হতে দেয়নি—তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন, আত্মবিস্মৃত হননি। হিন্দুসংস্কৃতির অনুশীলন ও হিন্দুর যুগবাহিত আচারনিষ্ঠতাকে আশ্রয় করে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মোহ কাটিয়ে উঠলেন ভূদেব। তারপর তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশ, শিক্ষাবিভাগে অত্যুচ্চ পদপ্রাপ্তি, এবং দেশ ও সমাজের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ। তিনি যখন পরিণত জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে দেখা দিয়েছেন; রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বাঙ্‌লার সুসন্তানেরা জাতির বিধ্বস্তপ্রায় আত্মমর্যাদাকে পুনর্বার সুপ্রতিষ্ঠ করতে সচেষ্ট হয়েছেন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ও প্রতীক সংস্কৃত ভাষার চর্চাকে সহজ করে তোলবার পথটি নির্মাণ করছেন। এঁদের সকলেরই পবিত্র অঙ্গীকার, জাতীয় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

এসকল দেশবরেণ্য মনীষী ও মনস্বী পণ্ডিতদের সঙ্গে হাত মেলালেন হিন্দুসাধনার ধারক ও বাহক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আপনার জীবনে যত রকমের অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন তিনি, তাকে স্বকৃত রচনার মাধ্যমে বাঙালি জাতির সম্মুখে তুলে ধরলেন। আমাদের জাতীয় জীবনের বহুবিচিত্র সমস্যা সম্বন্ধে তিনি ভেবেছেন, এইসব সমস্যার সমাধানও তিনি করেছেন। দেশবাসী ধীরে ধীরে ভূদেব-বাণীর সঙ্গে পরিচিত হলো, ফলে অনেকের আত্মবিস্মৃতির ঘোর কেটে গেলো। ভূদেবের রচনা বাঙালিচিত্তে দেশাত্মবোধ ও স্বজাতিবাৎসল্য উদ্বোধিত করেছে, বাঙালিকে আত্মসম্মানবোধের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড় করিয়েছে। বাঙালি হিন্দু যে লুপ্তপ্রায় আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলো, উৎকেন্দ্রিকতাকে পরিহার করে ক্রমশ আত্মস্থ হলো, এর পেছনে ভূদেবের চেষ্টা-চিন্তা-ব্যক্তিত্ব অনেকখানি প্রেরণার কাজ করেছে। এক্ষেত্রে আরো তিনজন অবিস্মরণীয় বাঙালিসন্তানের নাম উল্লেখ করতে হয়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ। এহেন ভূদেবকে অধুনা আমরা একরূপ ভুলতে বসেছি—এ আমাদের পরমতম লজ্জার কথা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মহিমাখ্যাপন করতে বসলে তা আর শেষ হতে চায় না।

তিনি বাঙালির অন্তরে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করেছেন, ভারতীয় ঐক্যবুদ্ধি জাগিয়ে তুলেছেন, ভারতরাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যাতে সংহতিবোধ জাগ্রত হয়, সেই বিষয়ে সকলকে অনেক শ্রোতব্য কথা শুনিয়েছেন। হিন্দীই যে একদিন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে, বহুকাল আগে তিনিই প্রথম এই ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁর চেষ্টায় বিহার প্রদেশের আদালতে ফার্শি ভাষা উঠে গিয়ে হিন্দীর প্রচলন হয়। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যাতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, তার জন্যে তিনি লেখনীচালনা করেছেন। একমাত্র রামমোহন ছাড়া, তাঁর মতো, অপর কোনো বাঙালি হিন্দু, মুসলমানসমাজ ও ইসলামধর্মের প্রতি এতখানি উদারতা দেখান নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায় অপ্রমত্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। উনিশের শতকের শেষদিকে স্বদেশভক্ত ভূদেব অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার কল্পনা করেছিলেন। ভূদেবের এই পরিচয়টি অনেকেরই জানা নেই।

বাঙ্‌লা তথা ভারতের সুবৃহৎ হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হিন্দু-আচারের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার অবধি ছিল না। মনস্বী শিশিরকুমার ঘোষ এই ভাবশুদ্ধ বিভূতিমান্ পুরুষটির সম্পর্কে বলেছেন: 'আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাঙ্‌লায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুতে দেখিয়াছি।' অতিবড়ো সত্যকথা। ভূদেবের পর অন্যকোনো বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধারার পবিত্র আদর্শটিকে এমন উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করে আত্মনির্ভরশীল বীরত্বের পরিচয় দেননি। সেই ইংরেজিয়ানার যুগে উদ্‌ভ্রান্ত জাতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে হিন্দুসাধনার বাণী ঘোষণা করা ভূদেবের ন্যায় ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব ছিল। হিন্দুজাতির ধর্মাদর্শ ও জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা দেখবার মতো একটি জিনিস। তাই বলে তাঁকে অতীতাশ্রয়ী, সংস্কারান্ধ গোঁড়া প্রাচীনপন্থীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রাচীনের প্রতি অন্ধ-আনুগত্য ভূদেবের ছিল না। আমরা যেন না ভুলি, ভূদেব হিন্দুকলেজের ছাত্র, ইংরেজিশিক্ষার আলোকে স্নাত—মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখের সহপাঠী। তাঁর জীবনের মহৎ লক্ষ্য ছিল যুক্তির কঠিন ভিত্তির ওপরে হিন্দুর জাতীয় ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা—নবীনের অবন্ধন উদ্দামতাকে তিনি জাতীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। প্রাচীন ও নতুনের মধ্যে সমন্বয়বিধানেরই প্রয়াসী ছিলেন তিনি। য়ুরোপের যা গ্রহণীয়, নিশ্চয়ই তাকে আমরা স্বাগত জানাবো; আর, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা রক্ষণীয়, সর্বপ্রযত্নে তাকে বাঁচিয়ে রাখবো। কেউ কেউ ভূদেবকে রক্ষণশীলতার অপবাদ দিয়েছেন। যথাযথ আচার-পালনকে তথা-কথিত 'রক্ষণশীলতা' বলা চলে কী? আচারভ্রষ্টতা উচ্চাদর্শের অভাবের দিকেই তো

অঙ্গুলিসংকেত করে। বিশেষ কালের বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে রেখে বিচার করলে ভূদেবের এই আপাত-রক্ষণশীল মনোভঙ্গির যথার্থ হেতুটি উপলব্ধি করা যায়। আমাদের সেদিনকার ভয়াবহ-পরধর্ম-নির্জিত সমাজে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অতি-আত্যন্তিক শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, নতুবা নিদারুণ বিজাতীয়তার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বাঙালিসমাজ নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতো।

*　　　*

বিচিত্রকর্মান্বিত প্রতিভাবান ভূদেবের জীবন। পঁয়ত্রিশ বছর সরকারি চাকুরি করেছেন তিনি, শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। চাকুরিজীবনে যতটুকু অবকাশ পেয়েছেন সেই অবকাশে সাহিত্যানুশীলনে ব্রতী হয়েছেন, পুস্তক লিখেছেন, সাময়িকপত্র-পরিচালনায় হাত দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো সেকালের দেশবিখ্যাত 'এডুকেশন গেজেট'। মুখ্যত এর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে তাঁর শিক্ষানীতি ও বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ। একে বাহন-রূপে না পেলে ভূদেবের গভীর মনীষার এমন অবারিত প্রকাশ ঘটতো না।

পনেরো-ষোলখানি গ্রন্থ লিখেছেন ভূদেব। এগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক—বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে লেখা। বাকি গ্রন্থগুলোর কয়েকটি উপন্যাস-জাতীয় রচনা, আর, অবশিষ্ট অংশ প্রবন্ধশ্রেণীভুক্ত সাহিত্যকর্ম। সেযুগে পাঠ্য-পুস্তকের অভাব ছিল। এই অভাব দূর করবার উদ্দেশ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের নামটিও স্মর্তব্য। পাঠ্য-পুস্তক নিয়েই তো বাঙ্লা গদ্যসাহিত্যের যাত্রা শুরু। ভূদেবের প্রণীত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকগুলা বিবিধ বিষয়ক। তবে, মনে হয়, ঐতিহাসিক পুস্তক-নির্মাণের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। এ জাতের পুস্তকে সাহিত্যিক গুণ তেমন অপেক্ষিত নয়, এখানে সৌন্দর্যসৃষ্টির অবকাশও ঠিক মেলে না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থে প্রচুর সাহিত্যরস সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। ভূদেবের পাঠ্যপুস্তকে এ জিনিসটি বড়ো একটা চোখে পড়ে না। '**শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব**' ভূদেবরচিত প্রথম গ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৮৫৬ ইংরেজি সাল।

ভূদেবের নির্মিত সাহিত্যগ্রন্থ সংখ্যায় বেশি নয়। সাহিত্যগ্রন্থ বলতে উপন্যাসধর্মী রচনা ও প্রবন্ধ।

তাঁর '**ঐতিহাসিক উপন্যাস**' নামে গ্রন্থখানি ১৮৫৭ [?] সালে প্রকাশিত হয়। এতে দুটি উপাখ্যান গ্রথিত—'**সফল স্বপ্ন**' এবং '**অঙ্গুরীয়-বিনিময়**'। উপাখ্যান-দুটিতে লেখকের মৌলিকতা তেমন নেই, '**রোম্যান্স অব্ হিস্ট্রী**' নামক একখানি ইংরেজি

পুস্তক অবলম্বনে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচিত। 'সফল স্বপ্ন' আখ্যায়িকার নায়ক একজন ইতিহাসখ্যাত বীরপুরুষ—সবক্তগীন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর নায়ক হিন্দুবীর শিবাজী। এই উপাখ্যানে হিন্দুশিরোমণি শিবাজীর সঙ্গে মুসলমানসম্রাট ঔরঙ্‌জেব্‌-কন্যা রোশানারার প্রণয়কথা বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা জগৎসিংহ ও আয়েষার প্রণয়চিত্রে শিবাজী-রোশানারার প্রেমকাহিনীর কিঞ্চিৎ ছায়াপাত হয়েছে বলে মনে হয়। ঔরঙ্‌জেবের রঙ্‌মহলের মনোজ্ঞ লিপিচিত্রের সদৃশ চিত্র চোখে পড়ে বঙ্কিমপ্রণীত 'রাজসিংহ' উপন্যাসে। ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর সাহিত্যিক মূল্য হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু বাঙ্‌লা উপন্যাসের বিবর্তনের ধারায় এর মূল্য স্বীকার করতেই হয়। বঙ্কিমের আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাসনির্মাণে হাত দিয়েছিলেন, রোম্যাণ্টিক-কাহিনী-রচনার পথটি প্রস্তুত করছিলেন, এ সত্যটি অস্বীকার করা যায় না।

এর পর প্রকাশিত হয় 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'—১৮৭৫ খ্রিস্টীয় সালে। বর্তমান গ্রন্থে লেখকের দেশানুরাগরঞ্জিত কল্পনা অখণ্ড ভারতসাম্রাজ্য দর্শন করেছে, তৃতীয় পানিপথ-যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি যদি জয়লাভ করতো, তাহলে ভারতের চেহারাটি কী রকম হতো, তা স্বপ্নচ্ছবির মতো দেখেছে। মহারাষ্ট্রের বীরযোদ্ধাদের অপরিসীম শৌর্যের কথা ভূদেব শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করেছেন।

'পুষ্পাঞ্জলি'-র প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৭৬ সাল। পুস্তকখানি 'কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস-মার্কণ্ডেয়-সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্যকথন।' এই গ্রন্থে ভূদেব ভারতবর্ষের মাতৃমূর্তির ধ্যান করেছেন—এখানে মাতৃমূর্তি ও দেবীমূর্তি একাকার হয়ে গেছে। পুস্তকখানিতে ভূদেবের ভারতবোধ, আর হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসাধনার প্রতি তাঁর অতিগভীর শ্রদ্ধা লক্ষ্য করবার মতো বস্তু। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-আখ্যায়িকায় 'মাতৃরূপা জন্মভূমির যে-প্রতিমা' চিত্রিত হয়েছে, তার ভাবদেহে ভূদেবের 'ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তি'-র ছায়াপাত দুর্লক্ষ্য নয়। 'পুষ্পাঞ্জলি'-'আনন্দমঠ'-এর মধ্যে প্রভাবাত্মক যোগ অনস্বীকার্য। ভূদেবের গ্রন্থের সঙ্গে বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এবং ভূদেবকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখতেন। সাহিত্য-শিল্পী-হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনেক ওপরে। তথাপি, বলবো, প্রথমোক্ত সাহিত্যিক দ্বিতীয়োক্ত সাহিত্যিকের ভাবকল্পনা দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন।

ভূদেবের সাহিত্যশক্তির যথার্থ পরিচয় উপন্যাসে নেই,—প্রবন্ধাবলীর জন্যেই তাঁর উজ্জ্বল খ্যাতি। তাঁকে আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধনির্মাতা বলেই জানি। তাঁর লেখা তিনখানা লোকখ্যাত প্রবন্ধপুস্তকের নাম—'**সামাজিক প্রবন্ধ**',

[১৮৯২], **'পারিবারিক প্রবন্ধ'** [১৮৮২] এবং **'আচার প্রবন্ধ'** [১৮৯৪]। এর মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটিই শ্রেষ্ঠ।

খাঁটি হিন্দুর ঘরের ছেলে, 'অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীর শেষ আদর্শ' ভূদেব 'আচার প্রবন্ধ' নামীয় গ্রন্থে বাঙালি হিন্দুকে উদ্দেশ করে ব্যবহারিক জীবনে নিত্য-আচার ও নৈমিত্তিক আচার সম্বন্ধে নানান্ কথা বলেছেন। হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুর প্রতিদিনকার জীবনধারাকে বিচিত্র বিধি-নিষেধে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে। ভূদেব বিশ্বাস করতেন, এগুলির যথাযথ পালনে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলই সাধিত হবে। তাই, তিনি হিন্দুসন্তানকে আচারনিষ্ঠ হতে উপদেশ দিয়েছেন। আচার-সম্পর্কিত শাস্ত্র-নিহিত আদেশ বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতারই ফল। কাজেই, প্রাচীনের নির্দেশ আধুনিকদের পালন করা বিধেয়, ভূদেবের সুচিন্তিত অভিমত। মহৎ উদ্দেশ্যের প্রণোদনায় এ গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাল আর একালের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে, বাঙালি হিন্দুসমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই কারণে ভূদেবের উপদেশ পূর্বেকার সেই মূল্য বর্তমানে আর বহন করে না—সকলের চোখে অবাস্তব ঠেকে। তিনি বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতিই নিজ দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ রেখেছিলেন, কালের পরিবর্তনধর্মের দিকে তেমন তাকাননি। ফলে আদর্শ ও বাস্তবে আজ এতখানি বিরোধ দেখা দিয়েছে। সাহিত্যের কৌতূহলী ছাত্রেরাই অধুনা 'আচার প্রবন্ধ' পুস্তকের পাতা উল্টোবে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র রচনা করতে পারবে না।

একই কথা 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থখানির সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বহুপরিজনময় যে-যৌথ হিন্দুপরিবারকে দৃষ্টির সমক্ষে রেখে পরিবারের সুনিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে এতগুলি সারবান কথা তিনি বলেছেন, সেই পরিবার এখন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে। একশ বছর আগেকার হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবারের সম্মুখে যে-উচ্চাদর্শ তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন, একশ বছর পরে তা অবাস্তব হয়ে পড়বে, এতে আশ্চর্য কী! অতীত দিনের জীবন-চর্যা থেকে আজ কত দূরে সরে এসেছি আমরা! বিধবাবিবাহ, সতীধর্ম, বৈধব্যব্রত, সন্তানপালন, ইত্যাদি বিষয়ে ভূদেবের চিন্তার অবস্থান আমাদের চিন্তার বিপরীত কোটিতে। যুগধর্ম তাঁর মানসিক ঝোঁকের প্রতিকূল হয়ে উঠেছে; তাই, তাঁর মহৎ প্রয়াস একালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এখানে অবশ্য এটুকু বলতে পারি, ভূদেবের কোনো কোনো শিক্ষা ও উপদেশের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা হিন্দুসমাজের পক্ষে এযুগেও স্বীকার্য।

'পারিবারিক প্রবন্ধ-'এ ভূদেব আমাদের ঘরের কথা শুনিয়েছেন; 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এ বাইরের কথা আছে। প্রথমটিতে পারিবারিক জীবন, দ্বিতীয়টিতে জাতীয়

জীবন প্রাধান্য পেয়েছে—ভূদেবের চিন্তা পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে জাতি ও সমষ্টিগত জীবনের দিকে প্রসারিত। 'সামাজিক প্রবন্ধ' নামে গ্রন্থটিতে জাতীয় ভাব বা ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে যে-কয়টি কথা আছে, তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে এমন পূর্ণায়ত অভিমত এযাবৎ অন্যকোনো বাঙালি মনীষী বাণীবদ্ধ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ভূদেবের চিন্তার গভীরতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। 'সামাজিক প্রবন্ধ' অমূল্য একখানি পুস্তক, বলবো—মহৎ গ্রন্থ। কী অদ্ভুত লেখকের বিচারক্ষমতা, অতিশয় প্রেক্ষণীয় তাঁর সুবিবেচনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এমন একটি মহৎ গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমান বাঙালির একেবারেই পরিচয় নেই। আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষেই এরূপ হওয়া সম্ভব। ভূদেবের মনীষা যথোচিত স্বীকৃতি পায়নি।

পরিশেষে, প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি সম্পর্কে দুচারটি কথা বলে বর্তমান আলোচনা আমরা শেষ করবো।

রসের সাহিত্যনির্মাণে হাত দিয়েও ভূদেব নিজের লেখনীকে ভিন্নমুখে পরিচালিত করলেন। অনেকে তাঁকে বাঙ্‌লা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। একথার মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও প্রবন্ধকার ভূদেবকেই আমরা বেশি চিনি। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর কতকগুলা বই 'প্রবন্ধ' নামে চিহ্নিত—'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ'। এই প্রবন্ধলেখক ভূদেব বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারেন। ভূদেবের প্রণীত প্রবন্ধনিচয়ের বিষয়বস্তুর কিঞ্চিৎ পরিচয় ওপরে বিবৃত হয়েছে। এখন, তাঁর গদ্যরীতির বিষয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য :

অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত প্রবন্ধরীতির ধারা ভূদেবের হাতে লক্ষণীয় পূর্ণতা পেয়েছে। যে-ভাষা জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার সত্যকার বাহন, যে-ভাষা বিবিধ চিন্তাভার-বহনে সক্ষম, ভূদেব সেই ভাষার চর্চা করেছিলেন। স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা তাঁর রচনার সবচেয়ে বড়ো গুণ। গদ্য লিখতে বসে তিনি অযথা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি, কোথাও শব্দাড়ম্বর দেখান নি। প্রয়োজনবোধে তাঁর ভাষা কখনো সংস্কৃতানুসারী, কখনো তদ্ভবশব্দবহুল। কিন্তু সর্বত্র তা সাবলীল, ক্ষিপ্রচারী। ভূদেবের চিন্তাক্রম অতিশয় স্পষ্ট, বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ, প্রকাশভঙ্গি ঋজু। ভাষার মণ্ডনকলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। এককথায়, তিনি আদর্শ গদ্য লিখে গেছেন, কাব্যিকতার দিকে ঝুঁকে নিজের গদ্যবাণীকে স্বধর্মচ্যুত করেন নি।

প্রধানত বিষয়গৌরবা, লোকশিক্ষামূলক রচনা বলে সাহিত্যিক সৌরভ ভূদেবের

লেখায় তেমন মেলে না। বক্তব্যকে সরস করে তুলতে হলে যে সমস্ত কলাকৌশলের আবশ্যক হয়, তার বিষয়ে তিনি প্রায়শ মনোযোগী হননি। তবু, স্বীকার করতে হয়, সাহিত্যরসসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল। এর নিশ্চিত প্রমাণ মেলে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে গ্রন্থটির ভাষায়। এই ভাষাশৈলীর প্রভাব বঙ্কিমবিরচিত 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে অনায়াসলক্ষ্য। মনে রাখতে হবে, ভূদেব বঙ্কিমের পূর্ববর্তী গদ্যলেখক। অবশ্য দুজনের সাহিত্যসাধনার কালটি সমদূর-বিস্তীর্ণ। ভাষারীতির ক্ষেত্রে ভূদেব কিন্তু বঙ্কিমী রীতির দ্বারা এতটুকু প্রভাবিত হননি। এখানেই ভূদেবের স্বাতন্ত্র্যের গৌরব। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, সেকালের আরো কয়েকজন লেখকের ওপরে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন—বিষয়মুখ্য আলোচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রদর্শিত গদ্যরীতি তাঁদের কাছে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে। এহেন শক্তিমান প্রবন্ধনির্মাতা ভূদেবের সম্পর্কে 'Calcutta Review'তে প্রকাশিত বঙ্কিমের প্রশস্তি নিম্নরূপ :

'One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style—neither characterised by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tekchand and Hutom—one of the best masters we say, of Bengali style, is Bubu Bhudev Mukherji. He has, unfortunately, written little, except works of a technical character, but his little volume of historical tales……is enough to show that he might have done a great deal more than he actually has done.'

এর চেয়ে বেশি প্রশংসা আর কী হতে পারে! এই প্রশংসা ভূদেবের প্রাপ্য।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যভঙ্গির সামান্য নমুনা :

॥ ১ ॥ 'অতি বাল্যকালে একবার শিকারী পাখীর শিকার-শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। একজন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটি টিয়াপাখী সেইমাত্র পলাইয়া নিকটবর্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া ছিলাম। যে-ব্যক্তির হাতে শিকার বসিয়াছিল সে বোধ হয় আমার দৃষ্টির অনুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল এবং তাহার শিকারকে ছাড়িল। তীরবেগে শিকার গিয়া টিয়ার উপরে পড়িল। আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম।'

—'সামাজিক প্রবন্ধ'

॥ ২ ॥ 'একদা কোনো অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণনিকর বিস্তার

দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক শ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ-ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন, এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আকর হইয়া আছে।'

—'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

॥ ৩ ॥ "বৃদ্ধ কহিলেন: 'পরিবর্তনই কালধর্ম। সকলেরই নিরন্তর পরিবর্তন ঘটিতেছে। যে রাজভবন ছিল, সে পরিবর্তিত হইয়া পর্ণকুটীর হইতেছে; আবার, যে পর্ণকুটীর ছিল, সে পরিবর্তিত হইয়া রাজভবন হইতেছে। তোমার পিতৃবাস যদি পর্ণকুটীর হইত, তবে তুমি এক্ষণে রাজভবনে বাস করিতে; তোমার বাস পর্ণকুটীরে হইয়াছে, তোমার পরবর্তী পুরুষদিগের বাস রাজপ্রাসাদে হইতে পারে।' বৃদ্ধের তীব্রদৃষ্টিপাতসহকৃত এই কথাটি অগ্নিশিখার ন্যায় যাদবের হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তথায় চিরনির্বাপিত আশাপ্রদীপ একবার প্রজ্বলিত করিয়া দিল—তাহার মুখমণ্ডলে ঐ দীপপ্রভা স্ফুরিত হইয়া উঠিল……।"

—'পুষ্পাঞ্জলি'

॥ ৪ ॥ 'বস্তুত, পরমাণুর উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। যে-দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু-সমস্ত কতক বায়ুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার, সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত হইয়া অন্যদ্রব্যে মিশ্রিত হয়। যে-স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানের মৃত্তিকাতে ঐ শব-শরীরের কতক পরমাণু থাকে—ঐ স্থানে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মূল দ্বারা ঐ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জশরীর সৃষ্ট হয়।'

—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

॥ নাট্যসাহিত্যের বিবর্তন ॥

—নাটক ও নাট্যশালা : বাঙলা নাটক রচনার সূত্রপাত—

সংলাপের দ্বারা গ্রথিত, অঙ্কাদির দ্বারা বিভক্ত, অভিনেয় বস্তুই 'নাটক'। সংস্কৃতে নাটক দৃশ্যকাব্যের দশটি বিভাগের মধ্যে একটি; অন্যান্য বিভাগের মধ্যে পড়ে: নাটিকা, ব্যাকরণ, ব্যায়োগ প্রভৃতি। সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনয়যোগ্য বস্তুর সাধারণ নাম— 'রূপক'।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে যাত্রাগানের উল্লেখ করেছি। ওতে কুশীলবগণ কৃষ্ণ, রাধিকা, দূতী, নারদ প্রভৃতির সাজে আসরে অভিনয় করলেও ওই অভিনয় মুখ্যত

সংগীতেই হতো। যাত্রাগানে হৃদয়ভাবেরই খেলা, 'action' বা পরিদৃশ্যমান বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের সংঘাত নেই বললেই চলে। কৃষ্ণ আধখানি বাক্য বলে দীর্ঘ গীত ধরলেন : 'আজ কেন অঙ্গ গৌর হলো রে, ভাবি তাই'। রাধিকার সখী প্রশ্ন করলেন : 'এ হাটে কি সুতা পাওয়া যায়?' কৃষ্ণের দূতী সংগীতে উত্তর দিলেন : 'এ হাটে বিকোয় না অন্ত সুত, বিকোয় নন্দরাণীর সুত। দর না জেনে, নামটি শুনে, ভয়ে পালায় রবি-সুত', ইত্যাদি। এখানে সংঘাত হৃদয়ে হৃদয়ে—অত্যন্ত ধীর গতিতে, বক্তব্য যা-কিছু তা গানে। এ ছাড়া, সঙ্ সেজে সস্তা ধরণের কৌতুকরস [কখনো কখনো কুরুচিপূর্ণ]-পরিবেশনও যাত্রার অঙ্গ ছিল।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে প্রথমে পুরাণো যাত্রা-সংগীতের প্রচলন হয়। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলা এর মধ্যে অত্যধিক প্রাধান্য পায়। একে বৈষ্ণব-প্রভাবের ফল বলতে হবে। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাগানের সাধারণ নাম হলো 'কালীয়দমন যাত্রা'। এর অভিনয় দেখে সেকালের শ্রোতা বা দর্শকের নাট্যরসপিপাসা নিবৃত্ত হতো। এভাবে কিছুকাল গেলে কৃষ্ণলীলাভিনয়ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়লো, লোকের পরিবর্তিত রুচি ভিন্নতর আখ্যানের রসাস্বাদনের জন্যে উদগ্রীব হলো।

এবার বৈষ্ণব-ভাবধারার বাইরের উপাখ্যান নিয়ে যাত্রাভিনয়ের শুরু। সাজ-সজ্জায় এলো নতুনতা; প্রচুর হাস্যকৌতুক যাত্রার নাটকে প্রবেশাধিকার পেলো, সংলাপের মাত্রা বাড়তে লাগলো। পুরাণের সীমা ডিঙিয়ে লৌকিক কাহিনীর এলাকায় পদক্ষেপ করলো যাত্রাপালা, 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কাহিনীও যাত্রানাট্যে স্থান পেলো। একদা গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রানাট্য সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু এর ভঙ্গিটি ছিল বড়ো লঘু। এইজন্যে শিক্ষিত লোকেরা একে তেমন সমাদর দেখায় নি। সে যা হোক, গীতিপ্রধান যাত্রাই এককালে খাঁটি নাটকাভিনয়ের অভাব কতকটা পূরণ করেছে।

ওপরে যে-যাত্রানাট্যের কথা বলা হলো, তা থেকে কিন্তু আমাদের আধুনিক নাটকের উদ্ভব নয়। য়ুরোপীয় নাটকের প্রভাবেই একালের বাঙ্লা নাটকের জন্ম, এ বিলাতি অনুকরণজাত। বিলাতি ধরণের রঙ্গমঞ্চ, বিলাতি নাটক ও ইংরেজের নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় না ঘটলে বাঙ্লা নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তিই হতো না। অবশ্য যাত্রাগানের প্রভাব আমাদের নাটকে প্রচুর, কিন্তু তাকে বাঙ্লা নাটকের মূল বলে জানলে ভুল করা হবে। য়ুরোপীয় রীতির রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় দেখে এদেশের লোক বুঝতে পারলো—প্রকৃত নাটক কী বস্তু, হৃদয়ঙ্গম করলো—যথার্থ নাট্যাভিনয় কাকে বলে। বিলাতি সংস্পর্শ এদেশের নাট্যামোদী শিক্ষিত ব্যক্তিদের রুচির মধ্যে লক্ষণীয়

পরিবর্তন আনলো—কলকাতা অঞ্চলের দর্শকেরা আর পুরাণো যাত্রাগান পছন্দ করলো না।

হাতের কাছে সংস্কৃত নাটক ছিল, তার কিছু কিছু অনুবাদও হয়েছে। কিন্তু দেশে পশ্চিমী হাওয়া বইতে থাকলে এগুলোর অভিনয় যেন অনেকখানি বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়লো। তখন ইংরেজি-আদর্শের নাটক অভিনয়ের বাসনা লোকচিত্তে দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। কলকাতার ইংরেজপাড়ায় প্রবাসী ইংরেজদের স্থাপিত রঙ্গমঞ্চ, ওই রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা এবং অভিনয়ের ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে সেদিনকার নাট্যানুরাগী বাঙালি তার অনুকরণ করতে অধীর হয়েছিল। অভিনয়যোগ্য বাঙ্‌লা নাটক আমাদের রয়েছে কিনা, সেকথা ভেবে দেখবার অবকাশ তাদের ছিল না। তারা নতুন আমোদ চেয়েছিল, তাই, এক্ষেত্রে অবন্ধন উৎসাহ দেখিয়েছে। বাঙালির নাট্যপ্রীতির আসল কারণ হলো অভিনব রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ের একপ্রকার আমোদপিপাসা। একে জাতির নিজস্ব রসতৃষ্ণা বা খাঁটি নাট্যপ্রেরণা বলা চলে না। বাঙ্‌লা নাটকের অভাবে কলকাতা শহরে কিছুকাল ইংরেজি নাটকের অভিনয় চলেছে; এমন কি, সংস্কৃত নাটকও ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাকে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। সত্ত-নতুনের অভ্যুদয়ে প্রাচীনের দিক থেকে সকলে মুখ ফিরালো—ধীরে ধীরে বিদায় দেওয়া হলো পুরাতন নাটগীতিকে, যাত্রাগানকে। অবশেষে একদিন 'যাত্রার আসর' ভাঙ্‌লো, পরিবর্তে ইংরেজি 'স্টেজ্' বা রঙ্গমঞ্চ-প্রবর্তনের চেষ্টা হতে লাগলো। পরিত্যক্ত সংস্কৃত নাটক ও যাত্রাভিনয়ের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের মনোভাব তখন কী রকম হয়ে উঠেছে, তার কিঞ্চিৎ আভাস মেলে মধুসূদন দত্তের কৃত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকাবাক্যে :

অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

প্রথমে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ দেশের কোথাও নির্মিত হয়নি। এরূপ অবস্থায় নাটক অভিনীত হতো দুয়েক-রাত্রির-জন্যে-তৈরি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে—কখনো স্কুল-কলেজে উপলক্ষ্যবিশেষে, কখনো বিত্তবানের গৃহে উৎসব-উপলক্ষ্যে।

এদেশে প্রথম য়ুরোপীয় নাট্যরীতির প্রচলনে এক রুশ পরিব্রাজক হেরাসিম্ [গেরাসিম ?] লেবেডেফের নাম খুব শোনা যায়। ১৭৯৫ খ্রিস্টীয় সালে তিনি একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন। এই নাট্যশালায় বাঙালি নটনটীর দ্বারা দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল; নাটকের নাম—'The Disguise' এবং 'Love is the best Doctor'। বলা বাহুল্য, হেরাসিম্ ইংরেজি হাল্‌কা-জাতের এই নাটক-দুখানিকে বাঙ্‌লায় অনুবাদ করিয়ে মঞ্চে অভিনয় করিয়েছিলেন। দেশীয় দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থে কিছু কৌতুকরস

ও ভারতচন্দ্রের গান এতে সংযোজিত হয়েছিল। এ হলো ১৭৯৫-৯৬ সালের কথা। এর অনেকদিন পরে আরেকটি নাট্যশালা [হিন্দু থিয়েটার] স্থাপিত হয় ১৮৩১-এ, স্থাপয়িতা—প্রসন্নকুমার ঠাকুর। বাঙালির প্রতিষ্ঠিত এ-ই প্রথম নাট্যশালা। এখানে ইংরেজি নাটকের অভিনয়ই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। অতঃপর নতুন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় : ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাকেই অভিনয়োপযোগী রূপ দেওয়া হয়। তারপর আশুতোষ দেব বা ছাতুবাবুর বাড়ীতে, কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বগৃহে—বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে—কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছে; এগুলি ১৮৫৬-১৮৫৮ সালের ঘটনা। এভাবে দুচারটি শখের থিয়েটার গড়ে উঠলো : পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, বৌবাজার রঙ্গনাট্যালয়, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, প্রভৃতি নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত।

পূর্বে বলেছি, তখনো বাঙ্‌লায় অভিনয়যোগ্য নাটক রচিত হয় নি। কাজ চালানো হতো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ দ্বারা। পরে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অনুবাদও আরম্ভ হয়। বাঙ্‌লায় সত্যিকার নাটক লেখা-না-হওয়াতে রঙ্গমঞ্চও বিস্তারলাভ করেনি। বিপরীতপক্ষে, সেকালে স্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে লেখক নাটক-রচনার প্রেরণা পাননি। এস্থলে স্মরণ করিয়ে দিই, নাটকের ইতিহাস আর নাট্যশালার ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্কটি অতিশয় ঘনিষ্ঠ। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হলে নাটক-নির্মাণের তেমন কোনো মূল্য থাকে না। এই কারণে সংস্কৃতে নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' বলা হয়েছে। নাট্যশালা নেই, দর্শক নেই, তো নাটকেরও প্রয়োজন নেই। নাটক সর্বদা ও সর্বথা দর্শকসমাজ এবং প্রেক্ষাগৃহের মুখাপেক্ষী।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যকালে শখের রঙ্গালয় ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে ব্যক্তি-বিশেষের গৃহেই নির্মিত হতো। অবশ্য কলকাতায় ইংরেজদের রঙ্গালয় ছিল, কেউ কেউ সেখানে গিয়ে ইংরেজি নাটকের অভিনয় দেখে আসতেন। তার অনুকরণে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' নামে আরেকটি ইংরেজি নাট্যশালা দেশীয়দের জন্যে স্থাপিত হয়। সে-সময় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করতো। এইভাবে অভিনয়ের সাড়া পড়ে গেলে পাইকপাড়ার ধনাঢ্য ভূস্বামী প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিলে সিংহপরিবারের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে একটি নাট্যশালা [১৮৫৮] স্থাপন করলেন—পূর্বোক্ত বিখ্যাত বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এই নাট্যশালাটিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লায় নাট্যাভিনয়ের ও নাটক-রচনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

ইতোমধ্যে প্রতিভাধর মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলে সোনায়-সোহাগা

হলো। সদ্য-কথিত নাট্যালয়ে [বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে স্থাপিত] ১৮৫৮ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অতিসুন্দর অভিনয় হয়। দৃশ্যসজ্জায় ও বিচিত্র যন্ত্রসংগীতে মনোমুগ্ধকর, আশ্চর্য-সমারোহপূর্ণ, এরূপ অভিনয় ইতঃপূর্বে কেউ দেখেনি। এ দেখেই মধুসূদন বাঙ্‌লায় নাটক প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হন, এবং ১৮৫৯ সালে উক্ত রঙ্গমঞ্চে তাঁর লেখা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনীত হলো। মধুসূদনের প্রথম রচনা এই 'শর্মিষ্ঠা'। নাট্যনির্মাতা মাইকেলই পরে মহাকবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

রঙ্গালয় অর্থাৎ শখের থিয়েটার আরো কিছুদিন ধনীব্যক্তিবিশেষের গৃহে আবদ্ধ রইলো। এগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এসব রঙ্গালয়ের কয়েকটির নাম অন্য একটি কারণেও উল্লেখযোগ্য—কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ নাট্যকারের কয়েকখানি নাটক এই শখের রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এতে উৎসাহিত হয়ে ওই সময়কার বহু নাট্যকার নাটকনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া, উক্ত রঙ্গালয়গুলিকে পরবর্তীকালের পেশাদারি থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের [Public Stage] অগ্রদূত বলা যেতে পারে। এও বলতে পারি, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ শখের থিয়েটারেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

একটু আগে আমরা বলেছি, নাটক প্রণয়নের ইতিহাস বলতে মুখ্যত নাট্যশালারই ইতিহাস। স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ না থাকলে নাটক লেখারও কোনো প্রয়োজন থাকে না। রঙ্গালয়ে নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে জনচিত্তে সাড়া জাগাতে হবে। এখানেই সত্যিকার নাট্যনির্মিতির প্রাণশক্তির আসল পরীক্ষা। ভাবগ্রাহী, সহৃদয় দর্শকের অন্তরে যদি আলোড়ন জাগে, তাহলে বুঝতে হবে, অভিনীত নাটকখানি যথার্থই জীবন্ত। দর্শকদলের ভাবগ্রাহিতা অভিনেতা ও নাট্যকারকে প্রাণিত করে। এভাবে উৎকৃষ্ট নাটকনির্মাণের ক্ষেত্রটি ক্রমে প্রশস্ত হয়ে ওঠে, অভিনয়কলাও সরল ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়। যেখানে নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শকমণ্ডলী একই সুরে বাঁধা, একমাত্র সেখানেই সার্থক-নাটক-সৃষ্টি সম্ভব। এই কথাগুলি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, আভিনয়িক নাট্য-রচনার ইতিহাস রীতিমতো বিঘ্নসংকুল। বাঙ্‌লা নাটককেও তার আদি-যুগে এধরণের বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আমরা জেনেছি, বিলাতি ধরণের রঙ্গমঞ্চ এদেশে দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব পায়নি—বিত্তবানের শখ বস্তুত সাময়িক একটা জিনিস, তাঁদের বদান্যতার প্রকৃতিও অতিশয় চঞ্চল। কাজেই, ধনীর ওপরে নির্ভর করলে রঙ্গমঞ্চের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আধুনিক বাঙ্‌লা নাটক যে অনেকদিন দৃঢ় আশ্রয়ভূমি পায়নি, তার প্রধান হেতু হলো উনিশের

শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের নাট্যশালা অর্থকরী প্রতিষ্ঠান ছিল না, দর্শকগণ নগদ দক্ষিণা দিয়ে নাট্যাভিনয় দর্শন করেনি, ওই আমোদ তারা উপভোগ করেছে বিনা-মূল্যে। নাট্যশালা-নির্মাণ, সাজসরঞ্জাম আহরণ, ইত্যাদি বহুব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, রঙ্গ-মঞ্চের রক্ষণব্যয়ও সামান্য নয়। অনেকেই এ সত্যটি উপলব্ধি করলেন।

এবার, নাট্যশালাকে অর্থকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা চলতে লাগলো, শখের থিয়েটারকে পেশাদারি থিয়েটার-রূপে দাঁড় করাবার প্রয়াস শুরু হলো। এ কাজে এগিয়ে এলেন 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'-এর কয়েকজন যুবক-অভিনেতা বা নাট্যোৎসাহী তরুণ। এঁরাই স্থাপন করলেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ — ১৮৭২ ইংরেজি সালে। এ-ই পেশাদারি প্রথম বঙ্গ-রঙ্গশালা। রঙ্গালয়ে সর্বসাধারণ প্রবেশাধিকার পেলো, অবশ্য বিনিময়ে দর্শনীমূল্য দিতে হবে। নাটকরচনা ও নাটকাভিনয়কে অব্যাহত রাখার জন্যে স্থায়ী নাট্যশালার প্রয়োজন। এতকাল পরে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হলো। নবপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গিরিশচন্দ্র ঘোষ: তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেকালের প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় সাড়া জাগলো। এই নতুনের আবির্ভাবে চারদিকে প্রাণচঞ্চল উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গ খেলে গেলো।

অতঃপর বাঙ্‌লায় নাটক রচনার উদ্‌যোগ ও বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেওয়া যেতে পারে।

॥ বাঙ্‌লা নাটকের আদি-পর্ব ॥

প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যে 'নাটক' বলে কোনো জিনিস ছিল না, সে-যুগে রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় সম্পর্কিত কোনোরূপ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল না। যেমন বাঙ্‌লা নাট্যশালা, তেমনি, বাঙ্‌লা নাটক, হাল আমলের সৃষ্টি। এ দুয়েরই উদ্ভব আধুনিক যুগে—পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে। য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ-সংস্পর্শে এসে কয়েকটি নতুন জিনিস পেলাম আমরা: মহাকাব্য [এপিক], উপন্যাস [নভেল], ছোটগল্প [শর্ট স্টোরি], আর, নাটক [ড্রামা] এবং অস্থায়ী ও স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। শেষোক্ত দুটি সামগ্রীর [নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশালা] উৎপত্তি ও বিকাশকাল একশ দশ-পনেরো বছরের বেশি নয়।

প্রাক্‌-ইংরেজ-আমলে এদেশে এক ধরণের অভিনয়ের আসর বসতো—পাঁচালি, কীর্তন, মঙ্গলগান, কবি, তর্জা, কথকতা প্রভৃতির আসর। দেশীয় রীতির এই অভিনয়কে বলা যেতে পারে, একক অভিনয়। এখানে গায়ক বা কথকেরই সর্বগ্রাসী প্রাধান্য। ইনিই বিবৃত করে যেতেন কোনো পৌরাণিক কাহিনী—গদ্যে, পদ্যে এবং গানে। সংলাপে বিধৃত সুসংলগ্ন আখ্যানের জন্ম তখনো হয়নি। আর, নাটক লেখার উপযোগী গদ্যভাষাই-বা তখন কোথায়। এরপর এলো যাত্রা—আকৃতিতে নাটক হলেও, অন্তঃপ্রকৃতিতে সেই মঙ্গলকাব্য-জাতেরই একটি বস্তু—গীতিমুখ্য রচনা। এ জিনিসটা খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। সবচেয়ে পুরাণো পেশাদারি যাত্রার নিদর্শন বোধ করি গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর'। এসব বস্তু নিয়েই সেকালের নাট্যরুচি তৃপ্ত হতো।

যুগের হাওয়া-বদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচিও বদলায়; পুরাতন বিদায় নেয়, নতুন অভ্যর্থিত হয়। বঙ্গভূমিতে নবীনের অভ্যুদয় ঘটালো এক অভিনব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক তথা বাহক ইংরেজজাতি। এখানে এসে তারা বিলাতি শিক্ষার প্রবর্তন করলো, বিলাতি আদর্শের আমোদপ্রমোদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। বাঙালি যুবকগণ ইংরেজিশিক্ষার দিকে ঝুঁকলো, ইংরেজি রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করতে লাগলো। বিলাতি বিদ্যাধর তরুণরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেবল ইংরেজি নাটকের রসাস্বাদন করলো তা নয়, ইংরেজি নাট্যশালায় এসকল নাটকের চমৎকার অভিনয় দর্শনের সুযোগও তাদের মিলেছিল। য়ুরোপীয় রীতির নাট্যাভিনয় চাক্ষুষ করে তাদের রুচি মার্জিত হলো। এর ফলে তৎকালে প্রচলিত যাত্রার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো তারা, নতুন ধরণের নাটকাভিনয়ে শ্রদ্ধা দেখালো। রামনারায়ণের মতো ব্রাহ্মণপণ্ডিতও নাট্য-নির্মাণের অভিলাষী হয়ে পুরাতনকে আর সম্পূর্ণ আঁকড়ে ধরে থাকলেন না, কৌতূহলী দৃষ্টিতে নতুনের দিকে তাকালেন। এই পশ্চিমী প্রভাবেই নতুন আদর্শের বাঙ্‌লা নাটকের জন্ম; এবং পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে নাট্যাভিনেয়র ভঙ্গিও পালটে গেলো। প্রথমের দিকে বেশি-সংখ্যক নাটক রচিত হয়নি, নাটকের সংখ্যা বাড়তে লাগলো ১৮৬০ সালের পর থেকে। একটু আগে বলা হয়েছে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হলো ১৮৭২ সালে। অতঃপর এক্ষেত্রে নবসৃষ্টির জোয়ার এলো যেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখি। আধুনিক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগে—কাব্যে-উপন্যাসে-ছোটগল্পে—বাঙালির প্রতিভার যে-আশ্চর্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, নাটকের ক্ষেত্রে তা কিন্তু লক্ষিত হয় না। কোনো বাঙালি নাট্যকার অদ্যাবধি উচ্চাঙ্গের নাটক লিখতে পারেন নি, বিলাতির অনুকরণ একরূপ ব্যর্থই হয়েছে। এর কারণ, বোধ করি, বাঙালি জাতির মজ্জাগত ভাবদুর্বলতা। আমরা যে অতিমাত্রায় ভাবাবেগপ্রবণ এতে

কোনো সন্দেহ নেই, এবং গীতিপ্রাণও বটে। এহেন স্বভাব ও সংস্কার কিন্তু সেই বিশিষ্ট কবিশক্তির বিরোধী, যে-শক্তির অধিকারী না হলে নাটক নামীয় বস্তুটি কিছুতেই নির্মিত হতে পারে না। বাঙালিতে আত্মভাবমুক্ত শ্রেষ্ঠ নাটকীয় কবিকল্পনার একান্ত অসদ্ভাব; তাই, মঞ্চে-অভিনয়-উপযোগী উত্তম নাটক-প্রণয়নে তার এতখানি অসাফল্য। জনপ্রিয় নাটক হয়তো আমাদের আছে; কিন্তু সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেতে পারে, এমন একখানি নাটকেরও নাম মনে পড়ে না। উচ্চতর নাট্যপ্রতিভার অভাবে উৎকৃষ্ট নাটক বাঙ্‌লায় সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি, এসত্যটি স্বীকার না করে উপায় নেই।

* *

ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকের কথা বলছি। বাঙ্‌লা নাটকের তখন নিতান্ত অভাব। এইজন্যে ওই সময়ে বাঙ্‌লাদেশে রঙ্গমঞ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। নাট্যানুরাগীদের অনেকেই উক্ত অভাবটি বোধ করছিলেন। এ অভাব দূরীকরণমানসে কেউ কেউ নাটক-প্রণয়নে হাত দিলেন। প্রথমে মৌলিক নাটক রচিত হয়নি। অনুবাদকর্মেই নাট্যকারদের উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে সমধিক। অনুবাদ বলতে সংস্কৃত নাটকের, এবং ক্বচিৎ ইংরেজি নাটকের, ভাবানুবাদ। কিছুকিছু ইংরেজি নাটক অনূদিত হলেও, ভাষারীতি, আঙ্গিক, ইত্যাদির দিক দিয়ে সে-যুগের নাটকরচয়িতাগণ সংস্কৃত নাট্যাদর্শকেই অনুসরণ করে চলেছেন, ইংরেজি আদর্শ তেমন অনুসৃত হয়নি। প্রকৃত বাঙ্‌লা নাটকের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করলেন অনুবাদক-নাট্যকারেরা। আমাদের নাট্যসাহিত্যের এ যুগটিকে সাধারণভাবে 'অনুবাদ-যুগ' নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

অনুবাদের পারবশ্য থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে যে-দুজন নাট্যকার বাঙ্‌লায় প্রথম মৌলিক নাটক রচনা করলেন, তাঁদের একজনের নাম **যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত**, অন্যজন হলেন—**তারাচরণ শিকদার**। নাটক লিখতে বসে দুজনেই পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শকে সামনে রেখেছেন, আর বলেছেন : তাঁদের নাটকনির্মাণপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বিদেশি নাটকের রীতি। বুঝতে পারা গেলো, সংস্কৃত নাট্যরীতির দিন ফুরিয়ে এসেছে, এখন থেকে বাঙ্‌লা নাটকের ভবিষ্যৎ রূপটির নিয়ামক হবে য়ুরোপীয় নাট্যরীতি।

১৮৫২ সালে রচিত যোগেন্দ্র গুপ্তের **'কীর্তিবিলাস'** বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ—এটিই আমাদের ভাষায় প্রথম মৌলিক নাট্যকৃতি। আরো একটি কথা : ইংরেজি ধরণের প্রথম রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি [বিয়োগান্ত নাটক] এই **'কীর্তিবিলাস'**। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নাটককে বিয়োগান্ত করার বিধি নেই। বর্তমান নাটকখানি শেক্‌স্‌পীরীয় রীতিতে বিয়োগান্ত। সংস্কৃতের এতকালের বিধান লঙ্ঘন করার দুঃসাহস দেখালেন যোগেন্দ্রচন্দ্র। প্রচলিত ভারতীয় নাট্যধারার বিরোধিতা

করতে যাচ্ছেন বলেই 'কীর্তিবিলাস'-এর লেখক স্বকৃত গ্রন্থের ভূমিকায় একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এর কিয়দংশ উদাহৃত হলো: 'ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি-মাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে; ধার্মিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে।' ট্র্যাজেডির আনন্দজনকতা সম্বন্ধে নাট্যকার লিখছেন: 'অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে-অভিনয় অবলোকন করিলে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে-অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবত অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়। একারণ সেক্‌স্‌পীয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—"আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোকপ্রয়াসী"।'

ট্র্যাজেডিখানি পঞ্চাঙ্ক। অঙ্কগুলির অন্তর্গত 'দৃশ্য' কথার স্থলে লেখক 'অভিনয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাহ্যত ভারতীয় আলংকারিকদের নাট্যরীতির পোষকতা না করলেও যোগেন্দ্রচন্দ্র যেন নিজের অজ্ঞাতসারে সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা, নান্দী প্রভৃতিকে এই গ্রন্থে স্থান করে দিয়েছেন; ভাষাপদ্ধতি আর ভাবের প্রকাশভঙ্গিতেও সংস্কৃতপ্রভাব অনায়াসলক্ষ্য। এর ভাষা আড়ষ্ট, কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট। গদ্যের সঙ্গে পদ্যও ব্যবহৃত হয়েছে। সেকালের যাত্রা-পাঁচালি-সুলভ যমক-অনুপ্রাসাদির প্রতি লেখকের বেশ দুর্বলতা রয়েছে। 'কীর্তিবিলাস'-এ সপত্নীপুত্রবিদ্বেষ ও তার নিষ্ঠুর পরিণতি দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। তাঁর সজ্ঞান অভিপ্রায় ট্র্যাজেডি-নির্মাণ; কিন্তু ঘটনারাজি কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত না হওয়ায়, কাহিনীবিন্যাসে শিল্পকুশলতার অভাবহেতু, খাঁটি ট্র্যাজেডির কারুণ্য এ নাটকে অপ্রাপ্তব্য। 'কীর্তিবিলাস' দুর্বল রচনা। এর যে মূল্য, তা ঐতিহাসিক। নাট্যসাহিত্যে নয়, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই, এর যথার্থ স্থান।

আদি-পর্বের দ্বিতীয় উল্লেখ্য গ্রন্থ—'ভদ্রার্জুন', ১৮৫২ সালে প্রকাশিত। অনেকেই বলেছেন, য়ুরোপীয় আদর্শে নির্মিত সর্বপ্রথম নাটক 'ভদ্রার্জুন'। আবার, এটিই প্রথম অভিনব পদ্ধতিতে গঠিত পৌরাণিক নাটক। এর বিষয়বস্তু অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ। মহাভারত থেকে সমাহৃত এই কাহিনীতে অবশ্য তেমন কিছু মৌলিকতা নেই, মৌলিকতার পরিচয় আছে রচনাপ্রণালীতে। লেখক তারাচরণ শিকদার স্পষ্টত ইংরেজি নাট্যপ্রথা অনুসরণ করে এ নাটক লিখেছেন। এই প্রথা-অনুযায়ী নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত; প্রত্যেকটি অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত 'দৃশ্য'-এর স্থলে 'সংযোগস্থল' কথাটি প্রযুক্ত।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ভূমিকা পরিত্যক্ত হয়েছে, নান্দী ও প্রস্তাবনা নেই; কাজেই, সূত্রধার এবং নটীকে রঙ্গভূমিতে টেনে আনার প্রয়োজন হয়নি। এ নাটকের দীর্ঘায়ত বিজ্ঞাপনটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। নাট্যকার আমাদের জানিয়েছেন :

'এতদ্দেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না; কারণ, কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সংকলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম·····।

'এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে; অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। সংস্কৃত-নাটক-সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই : যথা—প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক, ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমত অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় [Act] এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক [Act] এক্ট যেরূপ [Scene-এ] সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে; তন্নিমিত্ত [Scene] সিন্ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল।···এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।'

'ভদ্রার্জুন'-এর সংলাপে গদ্য, এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদ্যের ব্যবহার, লক্ষ্য করতে হবে। নাটকের প্রারম্ভে কাহিনীর পয়ারে-গ্রথিত একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এর নাম—'আভাস', নটনটীর উক্তি নয়, গ্রন্থকার নিজেই বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। অতঃপর নাটকের শুরু। এতে কয়েকটি গান সংযোজিত। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে, এ নাটক অবিমিশ্র ইংরেজি আদর্শে গঠিত নয়, নাট্যকার সংস্কৃত আদর্শ সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি। সুতরাং বলতে হয়, এ মিশ্র আদর্শে নির্মিত। 'সুধাসম নাটক প্রচার' তারাচরণের অভিপ্রেত হলেও, সে-সুধার পরিমাণ বেশি, এমন একটি কথা বলা যায় না। কারণ, নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে এতে চরিত্রগুলার বিকাশ দেখানো হয়নি, সংলাপের সাহায্যে পৌরাণিক একটি কাহিনী গল্পের আকারে বিবৃত করে গেছেন লেখক। এখানে বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ

দেখতে পাওয়া যায়; বর্ণিত আখ্যানটি মোটামুটি সংহত; কিন্তু যথার্থ নাট্যিক ক্রিয়ার [Action] অভাবটি অনুভূত হয়। ফলে রূপায়িত চরিত্র-সব নাট্যসম্মত হয়ে ওঠেনি। নাটকখানির এই ত্রুটি উপেক্ষা করা যায় না। সুরচিত নাটকে ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাত অপেক্ষিত—'ভদ্রার্জুন'-এ এ জিনিসটি বড়ো-একটা চোখে পড়ে না। তাই, উত্তম শিল্পকৃতির মর্যাদা এ পেতে পারে না। আখ্যানবস্তু-নির্মাণে লেখকের কুশলতার পরিচয় ফোটে নি।

এ সকল দোষ নাটকটির শিল্পসৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করলেও, বলবো, ইংরেজি আদর্শের এই প্রথম নাট্যকর্মে প্রশংসা করার মতো বস্তুও আছে। লেখক বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ওপরে দাঁড়িয়ে নাটক-প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন; সে যুগের পক্ষে যতখানি সম্ভব, ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন, সংলাপকে আড়ম্বরের চাপে পিষ্ট করেন নি, সংস্কৃত প্রভাবের বাইরে থাকতে বেশ সচেষ্ট হয়েছেন। মূল-কাহিনী পুরাণ থেকে সংগৃহীত হলেও, বাঙ্‌লার সমাজের চেনা পরিবেশ আর বাঙালি-জীবনের চিত্র যুক্ত হওয়াতে এর স্বাদে অভিনবতা এসেছে। সজীবতার গুণে দুচারটি চরিত্র চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, নাটকখানির বয়স একশ বছরেরও বেশি, এ একেবারে প্রাথমিক পর্বের রচনা। কথাগুলি স্মরণ করে আলোচ্যমান গ্রন্থের রচয়িতাকে নিশ্চয়ই আমরা অভিনন্দন জানাবো।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'কীর্তিবিলাস' এবং 'ভদ্রার্জুন' কোথাও অভিনীত হয়নি।

এর পর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো হরচন্দ্র ঘোষের নাট্যগ্রন্থাবলী। **হরচন্দ্র ঘোষ** [১৮১৭-১৮৮৪] ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি, হুগলি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর দখল কম ছিল না। হরচন্দ্রের প্রণীত নাটক-পাঠে বুঝতে পারি, ভারতচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন বাঙালি কবিদের রচনার অনুরাগী পাঠক ছিলেন তিনি।

হরচন্দ্রই প্রথম ইংরেজি নাটকের অনুবাদকর্মে হাত দেন। শেক্‌স্‌পীয়রের কৃত 'মার্চেন্ট অব্‌ ভিনিস'-কে বাঙ্‌লায় রূপান্তরিত করে তিনি ওই অনূদিত গ্রন্থের নাম দেন **'ভানুমতী-চিত্তবিলাস'**। এটিই তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ—পূর্বোক্ত 'ভদ্রার্জুন-এর এক বছর পরে—১৮৫৩ সালে প্রকাশিত। হরচন্দ্রের দ্বিতীয় অনুবাদ-গ্রন্থ **'চারুমুখ-চিত্তহরা'**, প্রকাশকাল ১৮৬৪ সাল—শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' অবলম্বনে লেখা। বর্তমান নাট্যকারের শেক্‌স্‌পীয়রপ্রীতি সবিশেষ লক্ষণীয়। এই নাটক-দুখানি পাঁচ অঙ্কে

সমাপ্ত। অঙ্কবিভাগ ইংরেজি 'এ্যাক্ট'-এর অনুরূপ, তবে অঙ্কান্তর্গত 'দৃশ্য' শব্দের পরিবর্তে 'অঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, দেখা যায়। প্রথমোক্ত নাটকের ঘটনার স্থল 'কদা উজ্জয়িনী কদাচিদ্বা গুজরাট দেশ'; দ্বিতীয়োক্ত নাটকের ঘটনার স্থল কর্ণাট দেশ। নাটকরচনে প্রবৃত্ত হয়ে ইংরেজি পদ্ধতির অনুসরণ করতে চাইলেও, সংস্কৃতরীতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠা হরচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নাটকের প্রারম্ভে লেখক 'নান্দী' বর্জন করেননি, সূত্রধার ও নটীর আলাপ এবং গান বাদ দিতে পারেননি। নাট্যকার পয়ার ছন্দের মোহে আবিষ্ট, নায়ক-নায়িকার বিদ্যাসুন্দরী মিলন-বর্ণনে উৎসাহী, কৃত্রিমতাপূর্ণ সাধুভাষা-প্রয়োগে তাঁর অরুচি নেই। সংলাপে যে-গদ্যভাষা প্রযুক্ত হয়েছে, তাতে সারল্যের অভাব, কথোপ-কথনের মোটেই উপযুক্ত নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ যিনি করবেন, তাঁকে বেশ-কিছুটা কবিদৃষ্টির অধিকারী হতে হবে, অনুবাদের ভাষাটিও উন্নত ধরণের হওয়া প্রয়োজন, এবং এটুকু আশা করতে পারি যে, অনুবাদক মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ হবেন। আমাদের এই ধারণা হয়েছে, সত্যিকার কবিত্বশক্তি হরচন্দ্র ঘোষের ছিল না, নরনারীর চরিত্রবিষয়েও অভিজ্ঞ তিনি নন, অনুবাদের উপযুক্ত ভাষা তিনি তৈরি করে নিতে পারেন নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে, শেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদে হরচন্দ্র শোচনীয় ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদে তিনি দুয়েকটা ছোটখাট চরিত্র ও দুচারটি নতুন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও তাঁর নাট্যরচনকুশলতার কোনো পরিচয় ফোটেনি। ভাষার আড়ষ্টতা, নাট্যোক্তির দীর্ঘতা, কবিকল্পনার অভাব, দুর্বল পদ্যাংশের বাহুল্য, ইত্যাদি হরচন্দ্রের অনুবাদকর্মে যত্রতত্র চোখে পড়ে। এসমস্ত কারণে বলতে হয়, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অনুবাদ করতে বসাটা তাঁর পক্ষে ধৃষ্টতারই কাজ হয়েছে।

হরচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাট্য—'কৌরববিয়োগ' [১৮৫৮]। ঐটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। এ অনুবাদ নয়, নাট্যকারের নিজের রচনা। এর আখ্যানভাগ মহাভারত থেকে নেওয়া। 'মহাভারত' বলতে কাশীরাম দাসের মহাভারত। নাটকটির পরিচয়-পত্রে হরচন্দ্র লিখছেন: 'কৌরববিয়োগ নাটক। এতাবতা রাজা দুর্যোধনের উরুভঙ্গাবধি অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশে গদ্যে ও অতি স্বল্পাংশ-মাত্র পদ্যছন্দে···বিরচিত হইয়া···মুদ্রিত হইল।' নাট্যকার এও জানিয়েছেন, বর্তমান নাট্যে আদিরসাত্মক বিজাতীয় কথাবস্তু তিনি পরিহার করেছেন। আদিরস পরিহার করার উদ্দেশ্য, নাটকখানিকে নীতিজ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের পাঠের যোগ্য করে তোলা। যেখানে নাট্যনির্মাতার মুখ্য অভিপ্রায় ছাত্রদের নীতিজ্ঞান-পরিবেশন, সেখানে রচনার নাট্যসৌন্দর্য খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী ভাষা এ নাটকের সংলাপকে একেবারে মাটি করে দিয়েছে, গুরুগম্ভীর রীতির চাপে চরিত্রগুলোর

কথোপকথন চূড়ান্ত অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছে। সংলাপের বর্ণনামূলকতার জন্যে নাটকটিতে ক্রিয়াদ্বন্দ্ব ফুটতে পারেনি, আখ্যানবস্তুতে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়নি। নাটকীয় চরিত্র অঙ্কনের দক্ষতা লেখকের নেই, কোনো চরিত্রে সজীবতার লক্ষণ চোখে পড়ে না। 'কৌরববিয়োগ'কে কিছুতেই সুলিখিত নাটক বলা চলে না। তবে হরচন্দ্র নাট্যামোদী ব্যক্তি; রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার উপযুক্ত বলে গণ্য না হলেও, নাটকনির্মাণে তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি।

আরো একখানি নাটক হরচন্দ্রের কলম থেকে বেরিয়েছে, নাম—'রজতগিরি-নন্দিনী'—১৮৭৪ খি্স্টীয় অব্দে প্রকাশিত। এটিকে মৌলিক রচনার পর্যায়ভুক্ত করা চলে না—ব্রহ্মদেশীয় উপকথা-জাতের একখানি কাব্যকে [ইংরেজিতে অনূদিত] লেখক নাট্যরূপ দিয়েছেন। কাব্যাত্মক কাহিনী প্রধানত কল্পনাবহুল; কাজেই, নাট্যের বাস্তবধর্মিতা ওই জাতীয় কাহিনীতে কেউ তেমন প্রত্যাশা করে না। হরচন্দ্র ঘোষ এহেন একটি কাহিনী থেকে 'রজতগিরিনন্দিনী'-র কথাবস্তু আহরণ করেছেন। এ নাটকে পিঙ্গলদেশের যুবরাজ ও পরীরাজ্যের রজতগিরি নামক রাজার কন্যা ক্ষণপ্রভার অনুরাগ, বিবাহমিলন, বিচ্ছেদ এবং পুনর্মিলনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নাটকটিতে কাব্যরস যতখানি মেলে, নাট্যরস ততখানি নয়। নাটকরচয়িতা এখানে বিভিন্ন দৃশ্য একসূত্রে গেঁথে আমাদের একটি গল্প শুনিয়েছেন—নাটকীয়তার স্বাদ নিতান্তই কম। চরিত্রগুলিকে তিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট করে তুলতে পারেন নি। পুরুষ-চরিত্রে পৌরুষ লক্ষ্য করা যায় না, নারী চরিত্রগুলা বৈচিত্র্যবিরহিত, ঘটনাধারা কার্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। নাট্যের ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতার অভাব; ভাবের প্রকাশে যাত্রারীতির সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। মোটকথা, 'রজতগিরি-নন্দিনী'-তে কেউ যদি নাট্যসৌন্দর্য খুঁজতে যান, তিনি নিরাশ হবেন।

হরচন্দ্রের নাট্যপ্রীতি সংশয়াতীত, কিন্তু নাট্যরচনকৌশলটি তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও নাটক নামীয় যে-বস্তু পাঠকের সমক্ষে তিনি তুলে ধরেছেন, তার মতো অনাটকীয় সামগ্রী আর-কিছু হয় না। এখানে দ্বন্দ্বজটিল জীবনালেখ্য দেখতে পাওয়া যায় না, রক্তমাংসের মানুষ, বলতে গেলে, চোখেই পড়ে না, অস্বাভাবিকতার জন্যে কোথাও নাট্যকলার স্বাক্ষর মেলে না। লেখকের নাট্য-প্রতিভা না থাকলে তাঁর লেখনী থেকে যে-জিনিসটি বস্তুত মেলে, তা আকৃতিতে নাটক হলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে নয়।

হরচন্দ্র ঘোষের প্রণীত কোনো নাটকেরই অভিনয় হয়নি। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হলে লিখিত নাটক লোকচিত্তে সাড়া জাগাতে পারে না, দেশের নাট্যসাহিত্যের ধারায় তার মূল্যও স্বীকৃত হয় না। এদিক থেকে দেখলে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ওপরে হরচন্দ্র অণুমাত্র

প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। নাটকের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিনি কাব্যের সংসারে পদক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু কবিখ্যাতিও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি।

কোনো উত্তম নাটকের স্রষ্টা নন **কালীপ্রসন্ন সিংহ** [১৮৪০-১৮৭০]। তথাপি, বাঙলা নাট্যশালা ও নাটকের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নামটি চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে গেছে। ভালো নাটক তিনি লেখেন নি; কিন্তু 'যে-নাটকের দ্বারা সহজে সাধারণ্যে লোকশিক্ষা বিস্তৃত করা যায়, যে-নাটকের অভিনয়দ্বারা জাতিকে উন্নত করা যায়, সেই নাটকের দ্বারা বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন যে-চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত'—বলেছেন তাঁর বিখ্যাত জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ। এই উক্তির মধ্যে আতিশয্য কিছু নেই। নাট্যশালা-স্থাপন ও নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে কালীপ্রসন্নের সে কী উৎসাহ! সেকালে অভিনয়যোগ্য বাঙলা নাটকের যেমন অভাব ছিল, তেমনি, অভাব ছিল রঙ্গালয়ের। তখন নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হতো দুচারজন ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে। নাটক ও নাট্যমঞ্চের অভাব দেখে নাট্যোৎসাহী, অভিনয়রসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ আপনার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র অধীনে, একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন [১৮৫৬], এবং ওই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের রচিত 'বেণীসংহার' প্রথম অভিনীত হয়। উক্ত বিদ্যোৎসাহিনী নাট্যমঞ্চে সেই বৎসরই আরেকটি নাটকের অভিনয় হলো— 'বিক্রমোর্বশী', নাট্যকার স্বয়ং কালীপ্রসন্ন। বলতে পারি, এই দুই নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে 'নিয়মিত নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার সূত্রপাত হলো'। প্রসিদ্ধ বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল [১৮৫৮] জোড়াসাঁকো নাট্যশালারই দৃষ্টান্তে। বেলগাছিয়া নাট্যশালা সুপরিচিত। এর সংস্পর্শে এসেই মধুসূদন দত্ত প্রথম সাহিত্যসংসারে আত্মপ্রকাশ করলেন—'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখলেন; আর, রামনারায়ণ নাট্যকাররূপে প্রভূত খ্যাতি পেলেন, তাঁর 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের দ্বারা বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চের দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ নাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গশালার মস্তবড়ো একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এ কথাটি কদাপি ভুলবার নয়।

কালীপ্রসন্নকে অনুবাদক-নাট্যকার বলাটাই বোধ করি সমীচীন। তিনটি নাটক তিনি লিখেছিলেন: **'বিক্রমোর্বশী'** [১৮৫৭], **'সাবিত্রী-সত্যবান'** [১৮৫৮], এবং **'মালতী-মাধব'** [১৮৫৯]; তখন তাঁর বয়স সতেরো থেকে উনিশের মধ্যে। লেখকের বয়সের দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। শোনা যায়, **'বাবু'** নামে আরো একখানি নাটকের [১৮৫৩ ?] প্রণেতা তিনি। এ গ্রন্থ আমাদের হাতে আসেনি। বোধ হয়, সেকালের বাবু-সমাজকে ব্যঙ্গ করেই গ্রন্থটি লেখা।

'বিক্রোমোর্বশী' অনুবাদ-নাটক। মূল রচয়িতা সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোত্তম কবি কালিদাস। এই অনূদিত নাট্যের অভিনয় হয় জোড়াসাঁকোর রঙ্গমঞ্চে—দর্শকদের যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। তৃতীয় নাটক 'মালতী-মাধব' প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-কবি ভবভূতির উক্ত নামের নাটকের অনুবাদ। দ্বিতীয় নাটক 'সাবিত্রী-সত্যবান' কালীপ্রসন্নের নিজস্ব রচনা—এর আখ্যানভাগ গৃহীত হয়েছে প্রধানত মহাভারতের 'বনপর্ব' থেকে। এ দুটি নাট্যও জোড়াসাঁকো রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল। 'বিক্রমোর্বশী'তে অনুবাদকের প্রশংসার্হ দক্ষতার পরিচয় মেলে না। মূল নাটকের রস বাঙ্‌লা বুলির আধারে গ্রন্থকার যথাযথ পরিবেশন করতে পারেননি। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা কৃত্রিম, এতে সরসতার অভাব। অবিকল অনুবাদে হাত দিয়ে তিনি প্রকাণ্ড ভুল করেছেন। বর্তমান অনুবাদক নিজের এই ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, 'মালতী-মাধব'-এ কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা হয়েছে, এর অনুবাদ আক্ষরিক নয়—আনুপূর্বিক। দ্বিতীয় অনুবাদে, ভাষা যাতে কৃত্রিম না হয়ে পড়ে, এবং ভাষার লালিত্যহানি না হয়, সেদিকে তিনি নিজ দৃষ্টি সজাগ রেখেছিলেন। তথাপি, ভাষাগত কৃত্রিমতা এতেও থেকে গেছে, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। লক্ষণীয়, দ্বিতীয় অনুবাদ-নাট্যে কালীপ্রসন্ন চলতি ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে গুরুগম্ভীর সংস্কৃতগন্ধী ভাষা সম্পূর্ণ পরিহার করেননি। কোথাও কোথাও ভাষার সাধুরীতি ও চল্‌তি রীতি পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। এরূপ মিশ্রণের ফলে সংলাপ হাস্যাবহ হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, উক্তির দীর্ঘতা, দীর্ঘায়ত স্বগত ভাষণ প্রভৃতি নাট্যোপযোগী হয়নি। তাঁর তিনটি নাটকেই এই ত্রুটি অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়।

'সাবিত্রী-সত্যবান' নাট্যে কাণ্ড ও অঙ্কবিভাগ ইংরেজি প্রণালীর অনুযায়ী। রঙ্গমঞ্চে নট ও নটীর কথোপকথনের দ্বারা নাট্যবস্তুর অবতারণায় সংস্কৃত প্রণালীই অনুসৃত। য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শের দিকে তাকালেও, গ্রন্থকার সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব বর্জন করতে পারেননি। বর্ণনে আতিশয্য আছে, ভাবপ্রবণতা ও বাগাড়ম্বর-বহুলতা প্রায়শ চোখে পড়ে, চিত্রিত চরিত্রগুলোতে স্পষ্টতার অভাব, নায়কনায়িকার আলেখ্য আঁকতে বসে নাটকনির্মাতা বাস্তব সংসারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কাব্যের সংসারের ওপরেই স্থিরবদ্ধ করেছেন যেন। একারণে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করতে পারেননি তিনি। বিদূষক চরিত্রটি মামুলি-রীতির, হাস্যরস-পরিবেশনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, বলতে হবে।

কালীপ্রসন্নের নাট্যাবলী সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য হলো, তাঁর অনুবাদ-নাটক-দুখানি অপটু হাতের রচনা, মৌলিক নাটক 'সাবিত্রী-সত্যবান'-এ গ্রন্থকারের নাট্যপ্রতিভার প্রস্ফুট স্বাক্ষর বহন করে না। সুতরাং বলা যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের রচিত নাটকরাজির মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তবু, তাঁর নামটি স্মর্তব্য, এইজন্যে যে, নিজ উদ্যমে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা

করে বাঙ্‌লা নাট্যাভিনয়ে নবযুগ প্রবর্তনের সহায়ক হয়েছিলেন তিনি। অস্থায়ী হলেও, এরূপ নাট্যশালা যদি-না স্থাপিত হতো, তা হলে ওই যুগে নাটক রচনায় কেউ উৎসাহ বোধ করতো না, এবং ফলে আমাদের নাট্যসাহিত্যেরও উন্নতি দেখা যেতো না। কালী-প্রসন্নের লেখা নাটক তিনখানি অধুনা-বিস্মৃত, কিন্তু নাট্যানুরাগী এই মানুষটিকে আমরা কখনো ভুলবো না।

বাঙ্‌লা নাটকের আদিপর্বের ইতিহাসে সবচেয়ে খ্যাতিমান নাটকপ্রণেতার নামটি হলো—**রামনারায়ণ তর্করত্ন** [১৮২২-১৮৮৫]। আমাদের নাট্যসাহিত্য-সংসারের ভোরের পাখী বলা যেতে পারে তাঁকে, নব্যতন্ত্রী নাট্যের আগমনী শুনতে পাওয়া গেলো তাঁর কণ্ঠে। রামনারায়ণই দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। বাঙ্‌লা ভাষায় সমাজসংস্কারমূলক নাটক-নির্মাণের পথিকৃৎ তিনি। প্রথম খাঁটি বাঙ্‌লা সামাজিক নাটক বা প্রহসন লিখলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন; তাঁর নির্মিত অবিস্মরণীয় 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি পথচিহ্ন হয়ে আছে। কোন্‌ ধরণের নাটক বাঙালির জাতিগত রসপিপাসার অনুকূল, তার নির্ভুল পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকে। একটু পরে আমরা দেখবো, বাঙ্‌লা নাটকের ধাতুপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় ফুটেছে আরেক ধরণের নাট্যকর্মে—পৌরাণিক নাটকে। পৌরাণিক নাটকও রচনা করেছেন রামনারায়ণ; কিন্তু তাঁর সহজ নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বলতম স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় হাস্যরসের স্পর্শযুক্ত কৌতুকপদ সমাজ-আলেখ্য-চিত্রণে। এক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধু মিত্র একে অন্যকে মনে পড়িয়ে দেয়।

রামনারায়ণ সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজে কাব্য ও অলংকারের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মানসিকতায়, ওই যুগের ইংরেজি-শিক্ষিতদের মতোই, আধুনিক তিনি—ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করতেন, গোঁড়ামি আর যুগবাহিত দৃঢ়মূল সংস্কারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রগতিমুখী মতবাদকে সমর্থন জানাতে তিনি দ্বিধান্বিত হয়নি, প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দুদের অসংগত অতীতচারণা তাঁর ভালো লাগেনি। তাই, বিদ্যাসাগরাদির উদ্‌ঘোষিত মানব-তন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে রামনারায়ণের নিবিড় পরিচয় ছিল না। তবে, বুঝতে পারি, ইংরেজিতে তাঁর কিছু দখল ছিল; তাঁর লেখা 'নবনাটক' এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে যা হোক, তাঁর কৃত কয়েকখানি নাট্যে ও প্রহসনে পাশ্চাত্য-প্রভাব-লালিত মনোভঙ্গির স্পষ্টরেখ প্রতিফলন কারুর দৃষ্টি এড়ায় না।

মধুসূদন-দীনবন্ধুর আবির্ভাবকালের অব্যবহিত পূর্বে নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ তর্করত্ন এতখানি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, সাধারণের কাছে তাঁর নাম-পরিচয় ছিল 'নাটুকে রামনারায়ণ'। এরূপ হবারই কথা। রামনারায়ণের আগে দুচারখানি নাটক রচিত হয়েছিল। সেগুলির কিন্তু অভিনয় কোথাও হয়নি। নাট্যাকারে গ্রথিত 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হলেও শিক্ষিতসমাজের রুচিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তৃপ্তি দিলো রামনারায়ণ তর্করত্নের রচনা—আখ্যানবস্তুতে অভিনব, বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই প্রখ্যাত নাট্যশিল্পীর নির্মিত নাটকের অভিনয় দ্বারা সে-যুগের তিনটি অস্থায়ী নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়—বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ['বেণীসংহার'—১৮৫৭], বেলগাছিয়া থিয়েটার ['রত্নাবলী'—১৮৫৮], এবং জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ['নবনাটক'—১৮৬৭]। স্থায়ী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তখনো স্থাপিত হয়নি, অভিনয় প্রদর্শিত হতো শখের থিয়েটারে। বাঙ্‌লা নাটকের সেই প্রত্যুষকালের বহুখ্যাত প্রধান নাটকনির্মাতা রামনারায়ণ।

ফরমায়েশি রচনার মধ্য দিয়ে রামনারায়ণের নাট্যকার-জীবনের শুরু। তাঁর প্রথম নাটকখানির নির্মাণের প্রেরণা পারিতোষিক-শিরোনামাঙ্কিত এক বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটির মর্ম এই: "বল্লালসেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে দুর্দশা ঘটিতেছে; তদ্বিষয়ক প্রস্তাবসংবলিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তিনি [রঙ্‌পুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী, তিনি ওই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন] তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" বিজ্ঞাপন-পাঠে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' লিখলেন রামনারায়ণ। এই গ্রন্থ সর্বোত্তম বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে প্রতিশ্রুত পারিতোষিক দেওয়া হলো। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রিস্টীয় অব্দ। পুস্তকখানি প্রকাশিত হলে সাধারণ্যে চাঞ্চল্য জাগলো, সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হলো।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' রামনারায়ণকে খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত করলো। এ ধরণের নাট্যকৃতি ইতঃপূর্বে আর চোখে পড়েনি। এ গ্রন্থ প্রথম মৌলিক নাট্যরচনা না হলেও অতিশয় শক্তিশালী রচনা। এতে লেখকের ক্ষমতার ছাপ মুদ্রিত। এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৭ সালে—কলিকাতা নতুন বাজারে [জোড়াসাঁকো চড়কডাঙা জয়রাম বসাকের বাড়ীতে]; ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় হয় যথাক্রমে কলিকাতা বাঁশতলায় [গদাধর শেঠের বাড়ীতে] ও চুঁচুড়ায় [শ্রীনাথ পালের বাড়ীতে]।

সেকালে বাঙ্‌লার হিন্দুসমাজে প্রচলিত নিষ্করুণ কৌলীন্যপ্রথা—জঘন্য একটি কুপ্রথা—বল্লালী অভিশাপ। কৌলীন্যের জন্যেই বহুবিবাহ। এক কুলীন-পিতা নিজের মর্যাদাভিমানের বশবর্তী হয়ে অতিবৃদ্ধ এক কুলীনপাত্রের হাতে তাঁর চারটি কন্যাকে

সম্প্রদান করলেন, এই হলো আলোচ্যমান নাটকের স্থূল তাৎপর্য। দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরে নিষ্ঠুর, অমানবীয়, অসংগত কৌলীন্যপ্রথা আমাদের সমাজে অব্যাহতভাবে চলেছে। এ যেমন পরিতাপের বস্তু, তেমনি, পরিহাসের বস্তু। এই কুপ্রথাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো উনিশের শতকে—ইংরেজিশিক্ষিত লোকের মন একে মেনে নিতে নারাজ। উক্ত বল্লালী বালাইকে সমাজ থেকে দূরীকৃত করবার মানসে নেতৃপুরুষেরা সংস্কার-আন্দোলন শুরু করলেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন এর ওপরে হানলেন বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের আঘাত। 'কুলীনকুল-সর্বস্ব'কে ঠিক নাটক বলা চলে না, নাটকোচিত গুণ এর মধ্যে তেমন নেই। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে এ রচিত হয়নি। লেখক এখানে কথোপকথনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ-বিশেষের রঙ্গচিত্র এঁকেছেন, কয়েকটি সংলগ্ন ও অসংলগ্ন দৃশ্যকে নাট্যাকারে গ্রথিত করেছেন। নাটকীয় আখ্যানবস্তু কিংবা নাট্যক্রিয়া বলতে কিছুই গ্রন্থটিতে লক্ষিত হয় না, কাহিনীগ্রন্থনে নৈপুণ্যের নিতান্ত অভাব। নাটকে চরিত্রের ক্রমপরিণতি দেখানো হয়, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে নাট্যবস্তু বিকাশ লাভ করে, ঘটনার আবর্তে জীবনের অভাবনীয় রূপান্তরের আলেখ্য-উন্মোচনই প্রেক্ষণীয় নাটকীয় বৈশিষ্ট্য। এদিকে রামনারায়ণ দৃষ্টি দেননি, কৌলীন্যপ্রথার মধ্যে যে-অসত্য ও অসংগতি বিদ্যমান, চোখে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দেওয়াই তাঁর অভিপ্রেত।

এ বইতে তদানীন্তন সামাজিক রীতিনীতির বহুতর কৌতুকাবহ বাস্তব ও সরস চিত্র আছে, ধর্মাধর্মের বিবাদ আছে। সামাজিক নক্শা-হিসেবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বেশ উপভোগ্য। কতকগুলি চরিত্র কৌতূহলজনক। চরিত্রগুলির নাম লক্ষ্য করবার মতো, যেমন—বিবাহবাতুল, বিবাহবণিক, কুলপালক, অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, সুমতি, উদরপরায়ণ। এরূপ নামকরণ থেকে বোঝা যায়, বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতীকরূপেই এসব চরিত্রের সৃষ্টি। রামনারায়ণের রচনার ওপরে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই, নাট্যের আঙ্গিকে নান্দী, প্রস্তাবনা, ইত্যাদি স্থান পেয়েছে, দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে; শ্লোক এবং কবিতাংশের প্রক্ষেপও এতে লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম্য-চরিত্র-অঙ্কনের সূত্রে এতে কিঞ্চিৎ গ্রাম্যতা-দোষ ঢুকে পড়েছে,—এ কিন্তু চরিত্রের স্বাভাবিকতা-রক্ষার জন্যে। উচ্চাঙ্গের নাট্যকর্ম না হলেও, এখানে রামানারায়ণের কম কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। সামাজিক বিষয় নিয়ে তিনিই প্রথম নাটক লিখলেন, এ মনে রাখবার মতো একটি তথ্য। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে-সময়ে অনেক লেখক বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, এবং আরো নানা কুপ্রথার নিবারণকল্পে বহু নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। এগুলির মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকটি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

তর্করত্নের **'নবনাটক'** [১৮৬৬]-নামে নাট্যগ্রন্থখানিও সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা। এ তাঁর সুপরিচিত মৌলিক রচনা। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং 'নবনাটক'-এর ওপরই নাট্যকাররূপে রামনারায়ণের যশ প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়োক্ত নাট্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখেছেন: 'ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের জন্য সদুপদেশসূত্রে নিবদ্ধ।' তর্করত্ন এই নাটকখানি লেখেন জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটির অনুরোধে। দেখা যাচ্ছে, এও ফরমায়েশি রচনা। নাটকটি জোড়াসাঁকো রঙ্গমঞ্চে নয় বার অভিনীত হয়েছিল। ভারি সুন্দর হয়েছিল এর অভিনয় ও সজ্জাদি।

উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যকর্ম সাধারণত ত্রুটিমুক্ত হয় না। এর কারণ হলো, সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়, লেখক আপন সংকীর্ণ উদ্দেশ্যটিকে সাহিত্যশিল্পকলার ওপরে স্থান দিয়েছেন। এতে শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। কেবল সদুপদেশ-দানের সংকল্প নিয়ে 'বিশুদ্ধ নাটক' প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 'নবনাটক'-এর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। এতে দীর্ঘ বক্তৃতা স্থান পেয়েছে, নাট্যকার যত্রতত্র নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন, অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনে নাট্যে বর্ণিত আখ্যানকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। ফলে প্লটের সংহতি নষ্ট হয়েছে। প্লটনির্মাণের বিষয়ে রামনারায়ণ সর্বদা ও সর্বথা অমনোযোগী, কাহিনীগ্রন্থনে কোথাও তিনি কুশলতার পরিচয় দেন নি। বর্তমান নাটকে দুয়েকটি চরিত্র সুঅঙ্কিত, যেমন—কলহশীল ভণ্ড দলপতি, গ্রাম্য জমিদার ও তাঁর খোসামুদে অনুচরদ্বয়, রসময়ী গোয়ালিনী, নাগর, চিত্ততোষ, প্রভৃতি; বাকি-সব চরিত্রচিত্র বৈশিষ্ট্য-বর্জিত—কোনো দোষগুণের সাধারণ 'টাইপ' বা প্রতীকমাত্র। চরিত্রের নামকরণে নাট্যপ্রণেতার উদ্দেশ্য সুপ্রকট; এ ধরণের নাম চরিত্রগুলার কোনো গুণ বা দোষের পরিচয়বাহী—চিত্ততোষ, বিধর্মবাগীশ, দন্তাচার্য, গ্রাম্য, নাগর, গবেশ, সুবোধ প্রভৃতি নাম চরিত্রের অন্তঃপ্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করছে।

নাটকখানিতে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। 'নীলদর্পণ' নাট্যের অতি-নাটকীয়তা, দুঃখ-পীড়ন ও মৃত্যুদৃশ্যের আতিশয্য, ইত্যাদি 'নবনাটক'-এও চোখে পড়ে। মনে হয়, গ্রন্থকার ট্র্যাজেডি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে শোকাবহ ঘটনা থাকলেও, এবং নাটকটি বাহ্যত বিয়োগান্ত হলেও, প্রকৃত ট্র্যাজেডির কারুণ্য বস্তুত অনুপস্থিত। বড়জোর একে মেলোড্রামা বলা যায়। একটি বিষয়ে রামনারায়ণকে প্রশংসা জানাতে হয়, নাট্যোপযোগী ভাষার অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন তিনি। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। তবে, সংস্কৃত নাট্যকলার প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। একারণে, নান্দী, সূত্রধার ও নটীর আলাপ প্রভৃতি বস্তুকে নাটকে স্থান করে দিতে হয়েছে।

রামনারায়ণ হাস্যরসব্যঞ্জক তিনখানি ক্ষুদ্র নাটিকা বা প্রহসন লিখেছেন। প্রহসন-রচনায় তাঁর দক্ষতা স্বীকার্য, রঙ্গচিত্র-অঙ্কনেই তাঁর হাত খোলে ভালো। লঘু সংলাপ তৈরি করতে জানেন তিনি, জীবনের হাস্যকর হাল্‌কা দিকটিকে ভাষায় বেশ ফোটাতে পারেন। অবশ্য উৎকৃষ্ট প্রহসন-নির্মাণ তাঁর ক্ষমতার বাইরে। তর্করত্নের প্রণীত তিনখানি প্রহসনের নাম : 'যেমন কর্ম তেমন ফল' [১৮৬৬], 'উভয়-সংকট' [১৮৬৯], এবং 'চক্ষুদান' [১৮৬৯]। এই ক্ষুদ্র নাটিকা-তিনটিরই উদ্দেশ্য সামাজিক-সাধারণকে নাটকচ্ছলে সংশিক্ষা দেওয়া।

'যেমন কর্ম তেমন ফল'-এ এক নির্বোধ মুন্সেফকে রীতিমতো জব্দ করা হয়েছে। বার্ধক্যে সমুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তিনি তারুণ্যধর্মের অধিকারী মনে করেন, অস্বাভাবিক প্রণয়পিপাসাবশে রূপসী যৌবনবতী পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধের এই অবৈধ প্রেমাকৃতির যে-করুণ পরিণাম চিত্রিত হয়েছে, তা পাঠক তথা দর্শকের কাছে আমোদজনক, অসংগত আচরণের জন্যেই বুদ্ধিহীন মুন্সেফের হাস্যকর শাস্তির ব্যবস্থা।

বহুবিবাহ-বিষয়ক ক্ষুদ্রকায় একখানি প্রহসন **'উভয়-সংকট'**। লেখকের বক্তব্য, একাধিক স্ত্রী নিয়ে ঘর করা পুরুষের পক্ষে খুব সুখের জিনিস নয়। দুদিকে সতীন, মাঝখানে বেচারি স্বামী—অবস্থাটি সংকটসংকুলই বটে। পত্নীর মাত্রাতিরিক্ত আদর অবস্থাবিশেষে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, সতীনের কলহ নিঃসন্দেহে স্বামীর মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটায়। এখানে প্রহসনকার মজার সংকট সৃষ্টি করেছেন, রহস্যমধুর ঘটনার মধ্য দিয়ে বহুপত্নীক স্বামীর হাস্যজনক দুর্গতির চিত্র এঁকেছেন।

'চক্ষুদান' [১৮৬৯] ক্ষুদ্রাবয়ব প্রহসন, তিন অঙ্কে সমাপ্ত। এক চরিত্রভ্রষ্ট স্বামীকে তার অবহেলিতা স্ত্রী এক ছলনার আশ্রয় নিয়ে কীভাবে সৎপথে আনলো, সেই কাহিনী এখানে বর্ণিত। সেকালের সমাজে লাম্পট্য একটা ব্যাধিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবিবেকী স্বামীর চৈতন্য উদ্রেক করলেন চতুরা স্ত্রী—এ-ই হলো স্বামীকে, তথা ব্যাধি-কবলিত সমাজকে, চক্ষুদান।

১৮৭১ খ্রিস্টীয় সালে প্রকাশিত **'রুক্মিণীহরণ'** পৌরাণিক নাটক। এর মূল ঘটনা হলো শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে হরণ এবং কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মিলন। আখ্যানবস্তু ও চরিত্র পুরাণ-কথিত। দূর অতীতের ঘটনা ও চরিত্রগুলাকে নাট্যকার অনেকটা আধুনিক কালের মতো করে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। ফলে মৃত অতীত যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে, লেখকের উপস্থাপন-কৌশলে অসাধারণকেও সাধারণের মতো দেখায়; অলৌকিকতার পরিবর্তে উপাদেয় বাস্তবরসের স্বাদ এখানে প্রাপ্তব্য। কৃষ্ণের আলাপ-

আচরণ দেখে তাঁকে একালের মানুষ বলেই ভ্রম হয়। এ নাটকের গল্পাংশে বৈচিত্র্য তেমন কিছু নেই, কয়েকটি চরিত্রের রূপায়ণে স্পষ্টতার অভাব আছে; পেটুক ব্রাহ্মণ তোতলা ধনদাস-চরিত্র-অঙ্কনে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন রামনারায়ণ, তাঁর রসরসিকতা অবশ্যস্বীকার্য। নাটকটির পরিকল্পনায় মনোজ্ঞ নতুনতা সকলেই লক্ষ্য করবেন। 'রুক্মিণীহরণ' পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত, আটটি গর্ভাঙ্ক-সংবলিত, এবং গীতযুক্ত। নাট্যের ভাষা সহজ ও সরস। পৌরাণিক নাটক-হিসেবে 'রুক্মিণীহরণ'-কে মোটামুটি ভালো রচনা বলা যেতে পারে।

তর্করত্নের লেখা আরো কয়েকটি নাটকের নাম: **'কংসবধ'** [১৮৭৫], **'ধর্মবিজয়'** [১৮৭৫], **'স্বপ্নধন'** [১৮৭৩]। 'কংসবধ' ও 'ধর্মবিজয়'-এ পৌরাণিক বৃত্তান্তকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। 'ধর্মবিজয়' হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। এ দুই নাটকে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। 'স্বপ্নধন'-এর কথাবস্তু রূপকথা-জাতীয়। এতে স্বপ্নদর্শনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। নাট্যের আখ্যানে কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হয়। বিদর্ভদেশের রাজপুত্র মতিমান ও কেরলদেশের রাজকন্যা কুসুমলতা পরস্পরকে স্বপ্নে দেখেছে। এই স্বপ্নদর্শনের ফলে পরস্পরের প্রেমাসক্তি, এবং সর্বশেষে উভয়ের মিলন। কাহিনীটি মনোরম। কিন্তু ঘটনাপুঞ্জ নাট্যের উপযোগী হয়নি।

রামনারায়ণের কৃত কয়েকটি রচনা সংস্কৃত নাটকের স্বাধীন অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কারণ, এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত নাটক বাঙ্‌লায় অনূদিত হলে, একালের পাঠকের তা ভালো নিশ্চয়ই লাগবে না, আর, এরূপ অনূদিত বস্তু ঠিক অভিনয়-উপযোগী হতো না। তাই, প্রয়োজন-বোধে রামনারায়ণ মূলের কোনো কোনো অংশ বাদ দিয়েছেন, কোথাও-বা নতুন দৃশ্য, নতুন চরিত্র, সংযোজিত করেছেন। তাঁর অনুবাদকর্মে বেশ দক্ষতার পরিচয় আছে। তিনি চারখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছিলেন: ভট্টনারায়ণের **'বেণীসংহার'** [১৮৫৬], শ্রীহর্ষের **'রত্নাবলী'** [১৮৫৭] কালিদাসের **'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'** [১৮৬২], এবং ভবভূতির **'মালতী-মাধব'** [১৮৬৭]। এগুলির অনুবাদে মূলের গাম্ভীর্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। ভাষা সরলীকৃত ও প্রাঞ্জল, নাট্যাংশ কোনো কোনো স্থানে নতুন করে লেখা। রামনারায়ণের সুপাঠ্য অনুবাদকর্মের সঙ্গে তুলনায় কালীপ্রসন্নের অনুবাদ অপরিপক্ক। 'রত্নাবলী' আর 'মালতী-মাধব'-এ কয়েকটি গান সংযোজিত হয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। গানগুলি অবশ্য তর্করত্নের নিজের রচিত নয়।

রামনারায়ণের নাট্যকার-জীবনের পরিধির বিস্তার প্রায় বিশ বছর—বাঙ্‌লা নাট্যশালার আরম্ভের যুগটিকে তিনি কৌতূহলসহকারে, সোৎসাহে, লক্ষ্য করেছেন;

স্থায়ী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিত্তিস্থাপনাও স্বচক্ষে তিনি দেখেছেন। তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী নাট্যকার মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। তিনজনে সমকালীন হলেও, নব্যতন্ত্রের নাটকপ্রণেতা বলবো না রামনারায়ণকে—বাঙলা নাটকে নবযুগের যথার্থ প্রবর্তয়িতা হলেন মধুসূদন এবং দীনবন্ধু। প্রাথমিক পর্বের বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণকেই সর্বোচ স্থানটিতে বসাতে হয়। দুয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদন-দীনবন্ধুর পথপ্রদর্শক।

বাঙলা নাটকের দ্বিতীয় পর্ব : আধুনিক অধ্যায়ের প্রারম্ভ

॥ মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র ॥

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' পর্যন্ত বাঙলা নাটকের উদ্‌যোগপর্বের মধ্যে ধরা যায়। নাট্যরচনায় মধুসূদনের [১৮২৪-১৮৭৩] হস্তক্ষেপ থেকেই এর বিকাশের সূচনা ও আধুনিক অধ্যায়ের প্রারম্ভ।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ মধুসূদন। তাঁর পাঁচ-ছয় বছরের সারস্বত সাধনা আমাদের একালের কাব্যসাহিত্যের জন্মান্তর ঘটালো। বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার সঞ্জীবন-মন্ত্র তিনিই প্রথম উচ্চারণ করলেন, বঙ্গভারতীর রসান্তঃপুরে পাশ্চাত্ত্য মানসিকতা ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলাকে প্রথম তিনিই স্বাগত জানালেন। বাঙলা কাব্যে মধুসূদনের দান অবিস্মরণীয়।

মধু-প্রতিভার স্পর্শে বাঙলা নাট্যসাহিত্যও সঞ্জীবিত হয়েছে। য়ুরোপীয় আদর্শের প্রথম সার্থক নাটক লিখলেন মধুসূদন দত্ত। ভবিষ্যৎ বাঙলা নাটক কোন্ পথ ধরে এগুবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ লক্ষ্য করা গেলো মধুসূদনের কৃত নাট্যাবলীতে। তাঁকে আধুনিক বাঙলা নাটকের জনয়িতা বললে, বোধ করি, এতটুকু অত্যুক্তি করা হয় না। দেশবিদেশের নাট্যাঙ্গিক ও নাট্যাদর্শের সঙ্গে বহুভাষাবিদ্, সুপণ্ডিত মাইকেলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তার ফলে বাঙলা নাটকে অনেক নতুন জিনিস আনলেন তিনি—ঐতিহাসিক নাটক, রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি, ভদ্রজাতের প্রহসন, ইত্যাদি। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, মধুসূদন দত্তের নাট্য-সাফল্য, কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রদীপ্ত সফলতার সমতুল নয়। হয়তো নিজে তিনি আমাদের নাট্যসাহিত্যকে প্রাণময়তায় অতিশয় বিশিষ্ট করে তুলতে পারেননি। কিন্তু এই সত্যটি স্বীকার করতে হবে, মাইকেল ঠিকই ধরেছিলেন, 'servile admiration of everything sanskrit'-এ নাটক লেখা চিরকাল চলতে

পারে না। তিনি বুঝেছিলেন, পুরনো নাট্যরীতিকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না—নতুনকে সাগ্রহে বরণ করতে হবে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে উপকরণ আহরণ করে বাঙ্‌লা সাহিত্যের শ্রীসৌন্দর্য বাড়াতে হবে; এদেশের যুগপ্রাচীন সাহিত্যের ধারাটিকে যদি বদলে দিতে না পারা যায়, তাহলে অভিনব সৃষ্টির পথটি বরাবর রুদ্ধই থেকে যাবে। এর জন্যে প্রয়োজন পাশ্চাত্য শিল্পকলা ও সাহিত্যাদর্শ সঠিক বুঝে নেওয়া, ভারতীয় ভাব ও ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন মাইকেল, য়ুরোপীয় নাট্যরীতি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এরূপ একটি আদর্শ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন বলেই বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যে অগ্রনায়কের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। এদেশে বিদেশের টেকনিক ও আদর্শের প্রবর্তক মধুসূদনের স্পষ্টোচ্চারিত কয়েকটি কথা এখানে স্মর্তব্য :

'If I live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya-darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real national theatre.'

ভারতীয় নাটকের দুর্বলতাটি সাহিত্যশিল্পবোদ্ধা মধুসূদনের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ বিষয়ে তিনি লিখছেন :

'In the great European drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality, and dream of fairy-lands. The genius of the drama has not yet received even a moderate degree of development in the country. Ours are dramatic poems……'

মাইকেলের সময়ে যুগরুচিসম্মত নাটকের নিতান্ত অভাব ছিল, সংস্কৃত নাট্যের অনুকরণে রচিত নাটক ইংরেজিশিক্ষিত-সম্প্রদায়কে তৃপ্তি বা আনন্দ দিতে পারছিল না। উন্নত নাটকের এই অভাব লক্ষ্য করে, এবং তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চে পুরনো পদ্ধতির নাটক-অভিনয়ের জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করা হচ্ছে দেখে, মধুসূদন এরূপ খেদোক্তি করেছিলেন : 'অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।' তাঁর এহেন খেদোক্তি অকারণ নয়, অযৌক্তিক নয়—সত্যিই, ভালো বাঙ্‌লা নাটক তখন পর্যন্ত একখানিও লেখা হয়নি। এরূপ অবস্থায় যুগের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন তিনি, নিজে নাটক রচনায় হাত দিলেন। কী তাঁর আত্মপ্রত্যয়—বাঙ্‌লা ভাষায় অনভিজ্ঞ,

ইংরেজিনবিশ মাইকেল সংকল্প করলেন, অভিনব ধরণের নাটক লিখবেন। এস্থলে স্মরণ করা যেতে পারে, ইতোমধ্যে মধুসূদন বেলগাছিয়া থিয়েটারের সংস্পর্শে এসেছেন, পাইকপাড়ার নাট্যোৎসাহী রাজাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ১৮৫৮ ইংরেজি সালে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের অনূদিত 'রত্নাবলী'-র অভিনয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনে অতিশয় উল্লেখ্য একটি ঘটনা। উক্ত অভিনয়ই তাঁকে নাট্যকার-রূপে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা জুগিয়েছিল। পরবর্তীকালের যুগন্ধর কবি মধুসূদন নাটক হাতে নিয়েই বাঙ্‌লা সাহিত্যসংসারে প্রথম পদক্ষেপ করলেন। এ এক অভাবনীয়, আকস্মিক ব্যাপার।

নাট্যকার মধুসূদনের সর্বপ্রথম রচনা '**শর্মিষ্ঠা**' [১৮৫৯], একখানি মৌলিক পৌরাণিক নাটক। কথাবস্তু মহাভারত থেকে সমাহৃত—শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন লেখক। পুরাণ-কথিত উপাখ্যান নাট্যবস্তু হলেও নাটক-নির্মাতা অপ্রাকৃত অলৌকিককে যথাসম্ভব পরিহার করতে চেয়েছেন, সম্ভাব্যতার সীমা ডিঙিয়ে যাননি কোথাও। তবে প্রথম-সৃষ্টির দোষত্রুটি 'শর্মিষ্ঠা'-য় বেশ-কিছু লক্ষিত হয়। কাহিনীতে নাটকীয়তার অভাব সকলেরই চোখে পড়বে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত তেমন ফোটেনি, ফলে আখ্যান-অংশ বিবৃতিধর্মী হয়ে পড়েছে। সংলাপ চরিত্রবিকাশক নয়, ঘটনায় গতিবেগ নেই। কথোপকথনের মাধ্যমে ঘাতপ্রতিঘাত-সৃষ্টির যে-সুযোগ ছিল, বুঝতে পারি, নাট্যপ্রণেতা তার সদ্ব্যবহার করেননি। নাট্যোক্তির দীর্ঘতা, অলংকারবহুল কবিত্বময় ভাষার অনাবশ্যক প্রয়োগ, নিসর্গ-বর্ণনার অতিরেক, ইত্যাদি, রসস্ফূরণের পথে মস্তবড়ো বিঘ্নস্বরূপ হয়েছে। সংস্কৃতানুসারী বাগ্‌বিন্যাস পাত্রপাত্রীর মুখে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম বলেই মনে হয়। নাট্যোপযোগী কথোপকথন মাইকেল ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি। নায়িকা শর্মিষ্ঠার চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি; তুলনায়, প্রতি-নায়িকা দেবযানী চরিত্র অধিকতর বিকাশলাভ করেছে—নাটকে তাঁর ব্যক্তিত্বই সর্বাধিক অনুভূত হয়, তিনিই কাহিনীকে প্রভাবিত করেছেন সমধিক। রাজা যযাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্যবর্জিত। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে বিদূষক চিত্রিত, এ চরিত্রে উল্লেখ্য কোনো নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

মাইকেল যাকে সংস্কৃতের গঠিত শৃঙ্খল বলে উল্লেখ করেছেন, সেই শৃঙ্খল এখনো তিনি ছিন্ন করতে সক্ষম হননি, তাঁর রচনায় প্রাচ্য নাট্যরীতির অনিবার্য প্রভাব সুপ্রকট। বিদূষকের মতো চরিত্রকে তিনি বাদ দেননি। 'রত্নাবলী'-'শকুন্তলা'-আদি পাঠের পরেই তিনি 'শর্মিষ্ঠা' লিখেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 'শর্মিষ্ঠা' পড়লে মনে হয়, কোনো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বুঝি। অভিনবতা কিছু থাকলেও, 'শর্মিষ্ঠা'-য় প্রাচীন নাট্যাদর্শই

অনুসৃত। একে সেকালের মোটামুটি ভালো মিলনান্ত নাটক বলা যেতে পারে। 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হলে অনেকেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল। বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম রোম্যান্টিক নাটক বলা যেতে পারে একে।

পরবর্তী রচনা 'পদ্মাবতী' [১৮৬০]। এও পৌরাণিক নাটক। তবে ভাবে-ভঙ্গিতে য়ুরোপীয় রোম্যান্টিক নাটকেরই অনুরূপ। এর নাট্যবস্তু গ্রীকপুরাণ থেকে সংগৃহীত, কিন্তু গল্পাংশকে সংস্কৃত নাটকের ছাঁচে ঢেলেছেন লেখক। নাটকখানির স্থায়ী-ভাব ঈর্ষা। শচী, রতি ও মুরজার সৌন্দর্যবিবাদ, এবং তজ্জনিত পরস্পরের ঈর্ষাই নাট্যে বর্ণিত কাহিনীর গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। গ্রীকপুরাণে কথিত 'অ্যাপল অব্ ডিস্‌করড্'-আখ্যানটি সকলেরই পরিচিত। ওই আখ্যানে জুনো, ভিনাস্ ও প্যালাস্-দেবীত্রয়ের মধ্যে নিজেদের রূপলাবণ্য-বিষয়ে কলহ বেধেছিল। উক্ত সৌন্দর্যকলহে মধ্যস্থতা করেছিলেন প্যারিস। ভিনাস-দেবীকেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলেছিলেন তিনি, এবং ফলে হেলেনকে লাভ করেছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটকে রাজা ইন্দ্রনীল রতিকে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলে অভিমত প্রকাশ করে পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। বর্তমান নাট্যে শচী, রতি ও মুরজা যথাক্রমে জুনো, ভিনাস্ ও প্যালাসের, এবং ইন্দ্রনীল-রাজা প্যারিসের, স্থলাভিষিক্ত। রতির আনুকূল্যে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী মিলিত হয়েছেন, প্রতিহিংসা-পরায়ণা শচীর প্রতিকূলতায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, এবং সর্বশেষে ভগবতীর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে দুজনের মধ্যে পুনর্বার মিলন সংঘটিত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের সমাপ্তি পরিপূর্ণ মিলনে, সকলের শুভকামনায়—'পদ্মাবতী' নাটকেও সংস্কৃতরীতির অনুসরণ লক্ষিত হয়।

পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায়, আলোচ্যমান নাটকে, মধুসূদন অধিকতর নাট্যকলা-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। কথাবস্তুর ক্রমোন্মেষসাধনে তেমন কোনো গুরুতর ত্রুটি নেই। ঘটনাঘনতা একে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। সংলাপ চরিত্রবিকাশের সহায়ক হয়েছে। চরিত্রালেখ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক সজীবতা লাভ করেছে সৌন্দর্যপ্রতিযোগিতায় পরাজিতা ও অপমানবিদ্ধা শচী। শচী গ্রীকসাহিত্যের ঈর্ষাকলহপ্রমত্তা জুনোকে মনে পড়িয়ে দেয়—ভারতীয় পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গের ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁর মিল চোখে পড়ে না। রতির বুদ্ধি ও চাতুর্য প্রেক্ষণীয়। সরলা, কোমলপ্রাণা পদ্মাবতী ভাগ্য ও ঘটনার হাতের ক্রীড়নক। এই নাটকে দেব-চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে বলে মানবীয়তার স্ফুরণ বিঘ্নিত হয়েছে। একারণে মানবরস এখানে তেমন মেলে না। ইন্দ্রনীল চরিত্রে উল্লেখনীয় কিছু নেই। 'পদ্মাবতী'-তেও বিদূষক উপস্থিত। বিদূষকের রঙ্গরহস্য সকলের কাছে উপাদেয় হবে বলে মনে হয় না। নাটকখানির ভাষা সংস্কৃতানুগ। রচনাটিতে 'শকুন্তলা'র প্রভাব

রয়েছে। সংস্কৃতের ছায়া এতে স্পষ্ট। প্রাচ্য নাট্যরীতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠা এ নাটকেও মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এরপর প্রকাশিত হলো **'কৃষ্ণকুমারী'** [১৮৬১]—মধুসূদনের নির্মিত সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এর মূলকথাবস্তু টডের 'রাজস্থান' থেকে গৃহীত। 'রাজস্থান'-কে ইতিহাসের মর্যাদা যদি অর্পণ করা যায়, তাহলে, 'কৃষ্ণকুমারী'-কে ইতিবৃত্তমূলক নাটক বলা যেতে পারে। আর, কেউ যদি একে ঐতিহাসিক নাটক বলতে স্বীকৃত না হন, রচনাটিকে ইতিহাসগন্ধী নাট্যকৃতিরূপে গ্রহণ করতে পারি। সে যা হোক, ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে এর আগে কেউ বাঙলা নাটক লেখেননি। তাই, বলতে বাধা নেই, মধুসূদন ঐতিহাসিক নাটকের প্রবর্তক। 'কৃষ্ণকুমারী'-তে ইতিবৃত্তের বিশ্বস্ত অনুসরণ লক্ষিত হয়, কোনো ঘটনা পরিবর্তিত আকারে এখানে উপস্থাপিত হয়নি। এজন্যে নাটককারকে প্রশংসা না জানিয়ে পারি না।

'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নির্মাণকালে মধুসূদনকে প্রাচ্যনাট্যকলার রীতি ও নির্দেশ মেনে চলতে হয়েছে, এ দুটি রচনায় হিন্দু-ও-গ্রীক-পুরাণের কাহিনীকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলেছেন তিনি। 'কৃষ্ণকুমারী' কিন্তু প্রায় আদ্যন্ত প্রতীচ্য পদ্ধতির রচনা—ট্র্যাজেডি অর্থাৎ বিষাদান্ত নাটক। মধুসূদনই য়ুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের অনুসরণে সার্থক ট্র্যাজেডি বাঙলা ভাষায় এই প্রথম লিখলেন। এর আগে অবশ্য 'কীর্তিবিলাস' ও 'বিধবাবিবাহ' নামে দুখানি বিষাদান্ত বা বিয়োগান্ত নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু ট্র্যাজেডির রস সেগুলিতে তেমন দানা বাঁধেনি। তাছাড়া, সাধারণ্যে ওই দুটি নাটকের প্রচারও নেই। কাজেই, বলতে হবে, ট্র্যাজেডি-জাতের নাট্যকর্মের সঙ্গে, বাস্তবিকপক্ষে, আমরা পরিচিত হলাম মধুসূদন দত্তের রচনার মাধ্যমে।

'কৃষ্ণকুমারী' উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কুমারী কৃষ্ণার আত্মবলিদানেরই শোকাবহ কাহিনী। জয়পুর ও মেরুদেশের প্রতাপান্বিত রাজা জয়সিংহ ও মানসিংহ দুজনেই কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী। উভয়ে কঠিন বিবাহপ্রস্তাব পাঠালেন ভীমসিংহের কাছে; এবং এও জানানো হলো, তাঁদের প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে তাঁরা উদয়পুর আক্রমণ করবেন। দারুণ সংকটের সম্মুখীন হলেন রাণা ভীমসিংহ। একদিকে অপত্যস্নেহ, অন্যদিকে, রাজ্য ও জাতির কল্যাণ। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রোষানল থেকে কাকে তিনি রক্ষা করবেন? কন্যাকে? না, রাজ্য ও জাতিকে? এহেন সংকটাপন্ন অবস্থায় তাঁর চিত্তে বড়ো হয়ে উঠলো দেশহিতৈষণা; অত্যন্ত নির্মম হলেও, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভীমসিংহ প্রাণপ্রতিম নিজ কন্যার মৃত্যুবিধানের আদেশ দিলেন। পিতার সংকল্পের কথা কৃষ্ণা শুনলো তার হত্যাসাধনোদ্যত ব্যক্তির মুখে। শুনে,

জাতিকে—দেশকে—নিশ্চিত বিনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবনান্ত করলো সে। কন্যা কৃষ্ণার আত্মবলিদানে দেশ ও জাতি বাঁচলো, কিন্তু প্রচণ্ড শোকবেদনার আঘাতে পিতা ভীমসিংহের স্নেহদুর্বল হৃদয় দীর্ণ দীর্ণ হয়ে গেলো—উন্মত্ততা গ্রাস করলো তাঁকে। নাট্যে বর্ণিত কাহিনী শোচনীয় পরিণামে অবসিত হয়েছে।

কোমলভাবাপন্ন, দুর্বলচিত্ত নারী কৃষ্ণা, সংকল্পের দৃঢ়তা তার চরিত্রে লক্ষিত হয় না। প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে সে অসমর্থ। ট্র্যাজেডির নায়িকা হবার মতো চারিত্রিক গুণধর্ম তার নেই। আর, বস্তুত, এ নাটকের ট্র্যাজেডি কৃষ্ণার নয়, তার কোনোরূপ ভ্রান্তি বা কার্যের দ্বারা ঘটনার ট্র্যাজিক পরিণাম অনিবার্য হয়ে ওঠেনি ; নাট্যের বিষাদান্ত পরিণতির জন্যে আসলে দায়ী হলো দুয়েকটি অপ্রধান চরিত্র। 'কৃষ্ণকুমারী'র আসল ট্র্যাজিক চরিত্র রাণা ভীমসিংহ—নিজের অনায়ত্ত ঘটনাচক্রের ফলে প্রাণপ্রিয়তম কন্যাকে বলিদান দিতে হলো, কন্যার প্রাণের মূল্যে জাতীয় অনর্থ এড়াতে বাধ্য হলেন তিনি—এখানেই ট্র্যাজেডি। তাঁর মধ্যে পিতৃহৃদয়ের করুণ বাৎসল্যের সঙ্গে জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা রাজার কঠিন কর্তব্যের দারুণ সংঘাত আমরা লক্ষ্য করেছি, অসহায় সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তিনি ; ফলে তাঁর অনিঃশেষ অন্তর্জ্বালা, এবং পরিণামে সুতীব্র আর্তনাদ। বড়োই মর্মস্পর্শী এই কাহিনী।

নাট্যকলাকৌশলের দিক থেকে বিচার করলে দোষত্রুটি 'কৃষ্ণকুমারী'র মধ্যে সহজেই খুঁজে বার করা যাবে, অভিনয়ের অনুপযোগী কয়েকটি দৃশ্যের সংযোজনা বড়ো বেশি চোখে ঠেকে। তবে, এ নাটকে মধুসূদন কাব্যবশ্যতা থেকে নিজেকে অনেকখানি মুক্ত করে নিয়েছেন, এবং দর্শকের রুচির দিকে তেমন তাকান নি, নাট্যকারের দায়িত্বের বিষয়ে সর্বদা সচেতন থেকেছেন। নাটকখানিতে মদনিকা ও ধনদাস উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। প্রথমশ্রেণীর নাট্যকৃতি না হলেও বাঙলা বিষাদান্ত নাটকের ইতিহাসে 'কৃষ্ণকুমারী'-র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

মাইকেল স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন প্রহসন-রচনায়। এক্ষেত্রে তাঁর নাট্যপ্রতিভার সহজ স্ফুরণ দেখতে পাই। প্রহসনকাররূপে তাঁর নামটি ভোলবার নয়। বাঙ্‌লা ভাষায় ভদ্রজাতের প্রহসনের আদি-নির্মাতা মধুসূদন দত্ত। নাটকে তিনি সংস্কৃতের অবাঞ্ছিত প্রভাবের বশবর্তী হয়েছেন, সংলাপে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতার ত্রুটি এড়াতে পারেননি। তাঁর বিখ্যাত প্রহসন-দুখানিকে কিন্তু এসব ত্রুটি স্পর্শ করেনি। স্বাভাবিক ও যথার্থ নাটকীয় সংলাপ-রচনের যথেষ্ট ক্ষমতা যে মধুসূদনের ছিল, এ দুটি প্রহসনে তার নির্ভুল প্রমাণ মেলে। মাইকেলের কৃত 'একেই

কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা'-তে অভিনব ঘটনা-বর্ণনে, ভাষার চমকপ্রদ কায়দায়, সমকালীন বাস্তবজীবন-চিত্রণে যে-নিপুণতা তিনি দেখিয়েছেন, তা বারবার খ্যাতিমান প্রহসননির্মাতা দীনবন্ধুকে মনে করিয়ে দেয়। ভাবতে অবাক লাগে, ভাবগম্ভীর কল্পলোকে সতত স্বপ্নসঞ্চরণে যে-মধুসূদন অভ্যস্ত, তিনি কেমন সহজে বাস্তবের অতিপরিচিত ভূমিতে নেমে এসে, লঘু কল্পনার আশ্রয় নিয়ে, নিজে এতখানি হাসলেন ও অপরের চিত্তে হাসির এহেন তরঙ্গদোলা জাগালেন! কোথায় লুকালো এই প্রহসনরচকের সেই স্বভাব-গাম্ভীর্য! বুঝতে পারি, প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

ধর্মান্তর-গ্রহণ করলেও, বেশভূষায়, আচারআচরণে সাহেব সেজে বসলেও, সেকালের বাঙালিসমাজের সঙ্গে মাইকেলের কম পরিচয় ছিল না। বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে এ ধরণের প্রহসন তিনি লিখতেই পারতেন না। দুখানি প্রহসন লিখেছিলেন মধুসূদন—একখানি, সেদিনকার বয়াটে 'ইয়ংবেঙ্গল'-দের অনাচারকে বিদ্রূপ করে; আরেকখানি, হিঁদুয়ানির নামাবলীপরা প্রাচীনদের গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও চরিত্র-ভ্রষ্টতাকে উদ্‌ঘাটিত করে।

নবীন ও প্রাচীন-সম্প্রদায়ের মূঢ়তা-কপটতা-নীতিদ্রোহিতা-উৎকেন্দ্রিকতার বিশ্বস্ত ও উপাদেয় আলেখ্য এঁকেছেন মধুসূদন দত্ত—যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি, সরস। পক্ষপাতদোষমুক্ত এই প্রহসনকারের দৃষ্টি, অকম্পিত তাঁর লেখনী—হাস্যে-কৌতুকে-ব্যঙ্গে মুখর। দুখানি প্রহসনেরই অবয়ব ক্ষুদ্র, কয়েকটি খণ্ডচিত্র একত্র গ্রথিত। কিন্তু সমাজ-চিত্র-হিসেবে একেবারে নিখুঁত।

'একেই কি বলে সভ্যতা' [১৮৬০] প্রহসনটিতে লেখকের বেদনাজড়িত বিদ্রূপ নিক্ষিপ্ত হয়েছে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাভিমানী তৎকালীন বঙ্গীয় যুবকদের ওপরে—আকণ্ঠ সুরাপানকে যারা সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বুঝেছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্থূল-ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অতিমাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল, যাদের 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো কুৎসিত-আবহাওয়ায়—পঙ্কিল গণিকাপল্লীতে, পাশ্চাত্ত্যাভিমানী যে-সকল উদ্ধত তরুণের নির্লজ্জ উক্তি হলো : 'In the name of freedom let us enjoy ourselves'। নববাবু এবং কালীনাথের মতো ইংরেজিশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের সমাজ, ধর্ম ও দেশের ঐতিহ্য-বিধ্বংসী মূঢ় আচরণের দিকে তাকিয়ে বর্তমান প্রহসনের লেখক ব্যথিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করেছেন—একেই কি বলে সভ্যতা? 'ইয়ংবেঙ্গল'-সমাজকে আঘাত করাই লেখকের উদ্দেশ্য, বুঝতে বেগ পেতে হয় না; কিন্তু নিষ্ঠুর বিদ্বেষ নেই এই আঘাতের পেছনে।

একই রকম আঘাতে জর্জরিত হয়েছে দেশের সমসাময়িক প্রাচীন সমাজ—'বুড়ো

শালিকের ঘাড়ে রেঁা' প্রহসনখানিতে [১৮৬০]। এ বইটিতে মাইকেলের ব্যঙ্গ-উপহাসের লক্ষ্য ভক্তপ্রসাদ নামে একজন গ্রাম্যজমিদার, পল্লীসমাজে যার অশেষ প্রতিপত্তি। এই ভক্তপ্রসাদ তখনকার গ্রামবাঙ্‌লার সেইরকম লোকেরই প্রতিনিধি, বাইরে যারা সাড়ম্বরে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করতো; কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে বারাঙ্গনা-প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকতো, একটুখানি সুযোগ পেলে দুর্বলের সম্পদ ছিনিয়ে নিতো, পরস্ত্রীর প্রতি তাকাতো ভোগ-চঞ্চল লুব্ধ দৃষ্টিতে। মধুসূদনের নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ভক্তপ্রসাদ, তার প্রাপ্য শাস্তি সে পেয়েছে। প্রহসনরচয়িতার পরিহাস-রসিকতা উপভোগের বস্তু হয়ে উঠেছে, দর্শককে লেখক প্রচুর হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছেন।

প্রহসন-দুটিতে সংলাপ-রচনায় মধুসূদন দত্তের বিস্ময়কর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতেন যে-মধুসূদন, মাতৃভাষার ওপর তাঁর কতখানি দখল! 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র পাত্রপাত্রীদের মুখের ভাষা তিনি অবিকল নকল করেছেন। গ্রামের অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষগুলার মুখে ভাষা বসাতে লেশমাত্র বেগ পেতে হয় নি তাঁকে। নাটকে সংযোজিত কথোপকথন অত্যন্ত স্বাভাবিক হওয়াতে বর্ণিত চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া, দ্বিতীয়োক্ত প্রহসনখানিতে ছড়া, প্রবাদ ও কবিতাংশের নিপুণ প্রয়োগ এর কৌতুকরসকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। এসব জিনিসের ব্যবহার শিখিয়েছেন রামনারায়ণ। তারই অনুসৃতি লক্ষ্য করা গেলো মধুসূদনে, এবং এসময়কার নাট্যরচয়িতা দীনবন্ধুর লেখায়।

নাটকনির্মাতা মধুসূদনকে হয়তো অনেকে ভুলে যাবেন, কিন্তু প্রহসনলেখক মধুসূদন অবিস্মরণীয়। বাঙ্‌লা ভাষায় যে-কয়েকখানা প্রহসন নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে অতিশয় উল্লেখ্য হলো 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এ দুটি নিঃসন্দেহে ভদ্রজাতের রচনা। কোথাও অতিরঞ্জন নেই, এদের উদ্দেশ্যমূলকতা কুত্রাপি প্রকট হয়ে ওঠেনি। উজ্জ্বল সব চরিত্র, অভিনব ঘটনা, আর, বাস্তবধর্মী, হাস্যরসসিক্ত বর্ণনা কেমন চিত্তাকর্ষক! মাইকেলের নাট্যরচনক্ষমতা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। মনে এই ভেবে আক্ষেপ জাগে, কেন তিনি আরো দুচারখানা প্রহসন লিখলেন না। নবীন ও প্রাচীন-সমাজের অপ্রিয়ভাজন না হলে, এ জাতের আরো-কিছু লেখা তাঁর কলম থেকে নিশ্চয়ই বেরুতো।

১৮৭৪ সালে মাইকেল **'মায়াকানন'** নামে একটি নাটক লেখেন। তাঁর প্রতিভা তখন নির্বাণোন্মুখ। নেহাৎ জীবিকার দায়ে তখনো লেখনী চালনা করছেন তিনি। 'মায়াকানন'-এ নাট্যকলাগত সৌন্দর্য কিছুই ফোটেনি, নাটকীয় সম্ভাবনাকে লেখক কাজে লাগাতে পারেননি, পুনর্বার সংস্কৃত নাট্যাদর্শের দিকে ঝুঁকেছেন; সংলাপে ও ভাবের

প্রকাশে কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছে। এই নাটকের 'ট্রাজেডি নিষ্করুণ শোকাবহ, এবং মধুসূদনের জীবনে যেমন, এখানেও তেমনি, নায়কনায়িকার সব আশাভরসা চুকিয়া গিয়া যবনিকা-পতন হইয়াছে'। নাটক-হিসেবে 'মায়াকানন' ব্যর্থ রচনা। এই সময়ে মাইকেলের নাট্যকারসত্তা ও কবিসত্তা জীর্ণতার কবলগ্রস্ত।

সে যা হোক, বাঙ্‌লা নাটকের ভিত্তি দৃঢ় করলেন মধুসূদন দত্ত। অতঃপর আমরা পেলাম জাত-নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। এখন থেকে আমাদের নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতি কৌতূহলসহকারে লক্ষণীয়।

॥ বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ॥
—দীনবন্ধু মিত্র—

মধুসূদনের নাট্য-রচনার সমকালেই আরেকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদের নাট্যসাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হন, ইনি স্বনামখ্যাত দীনবন্ধু মিত্র [১৮২৯-১৮৭৩] —মাইকেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকপ্রণেতা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরে দীনবন্ধু নাটকনির্মাণে হস্তক্ষেপ করেন, এবং এঁর প্রতিভা ভিন্নশ্রেণীর ছিল। মধুসূদন ছিলেন প্রধানত রোম্যান্টিক, কাব্যকল্পনাকুশল ; পক্ষান্তরে, দীনবন্ধু ছিলেন বাস্তবধর্মী—চতুষ্পার্শ্বের পরিচিত চলমান সংসারের প্রতি অতিমাত্রায় কৌতূহলপরায়ণ তথা সমাজসচেতন। মাইকেলের বিখ্যাত প্রহসন-দুখানির সঙ্গেই দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যরসিকতার যোগ ছিল, নাটকগুলির সঙ্গে নয়। বলতে পারি, এঁরা দুজনে দুই ভিন্নতর এলাকার বাসিন্দা, উভয়ের মানসিকতায় বিস্তর প্রভেদ। মধুসূদন দত্তের কিছু প্রভাব রয়েছে দীনবন্ধুর রচনায়, রামনারায়ণের কাছেও দীনবন্ধু ঋণী, এ অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী নাটকরচকদের কথঞ্চিৎ প্রভাবে এলেও তাঁর নাটকীয় প্রতিভায় এমন একটি মৌলিক শক্তি ও সৃজনী-দক্ষতার পরিচয় আছে, যা কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। নির্দ্বিধায় বলতে পারা যায়, বাঙ্‌লা নাটকে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছেন তিনি ; এবং এও বলবো, তাঁর নাট্যকর্মে, কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, যে-দীপ্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, এযাবৎ-নির্মিত বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যে কুত্রাপি তা চোখে পড়ে না। দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার অনন্যসাধারণতাকে স্বীকৃতি জানাতে আমরা বাধ্য। খাঁটি নাট্যকারের প্রতিভা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন।

নাটক-বস্তুটি পাঠ্য নয়—দৃশ্য। এখানে জীবনকে বর্ণনীয় করে তোলার পরিবর্তে দর্শনীয় করে তুলতে হয়, আত্মগত রসকল্পনাকে নির্মমভাবে দূরে সরিয়ে রেখে প্রবহমান ঘটনাপুঞ্জের কাছে লেখককে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়—যথাপ্রাপ্ত বস্তুর রসে নিজেকে

ডুবিয়ে দেওয়ার আবেগবশেই নাটক নামীয় সামগ্রীটির সৃষ্টি। এই বিষয়-রসনাভূতি যে-লেখকের রয়েছে, তিনিই যথার্থ নাটক প্রণয়ণের অধিকারী। বলা বাহুল্য, এর জন্যে প্রয়োজন বস্তুসকলের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পারার সহজাত বিশেষ একটা শক্তির—'কল্পনার অবজেক্টিভিটির'। আমাদের নাট্যকর্মে এ জিনিসটা খুব কম লেখকের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। এই স্বল্পসংখ্যক নাটকপ্রণেতাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নাটকীয় কল্পনার অসামান্যতা বিস্ময়ের চমক জাগায়।

তবে একথাও সত্য, আমাদের মনে হয়েছে, নিজ শক্তিকে তদুপযোগী সৃষ্টিতে সার্থক করে যেতে পারেননি দীনবন্ধু। এর প্রথম কারণ, সাহিত্যে একনিষ্ঠ সাধনার ভাব; দ্বিতীয় কারণ, আবেগ-কল্পনাকে সংযমে শাসন করার কৌশলটি আয়ত্ত করতে না-পারা; তৃতীয় কারণ, আপন প্রতিভার স্বধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে—হাস্যরসকল্পনার সীমা ডিঙিয়ে—ভিন্নতর রসের জগতে অনুচিত পদক্ষেপ,—'সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি', এই কবিবচনটি প্রত্যেক শিল্পস্রষ্টার স্মরণে রাখা উচিত। শিল্পসম্পর্কিত মাত্রা-বোধের, এবং নাট্যকারসুলভ অন্তর্দৃষ্টির, অভাবে দীনবন্ধুর নাটকনির্মিতি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর মধ্যে শিল্পীজনোচিত সহানুভূতির প্রবলতাই লক্ষ্য করা যায়।

দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন বাস্তববাদী সাহিত্যিক; সমাজ-সংসার ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে এই মানুষটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল অগাধ, বহুবিচিত্র। সরকারি চাকুরি করতে গিয়ে কত স্থানে তাঁকে বেড়াতে হয়েছে, সমাজের নানান্ স্তরের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে,—ছোটবড়ো, ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত—বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ। এদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে সত্যিকার জীবন ও তার বেদনাকে তিনি জেনেছিলেন; এ-ই তাঁকে দিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা, এখান থেকেই নাটক রচনার উপকরণ কুড়িয়েছিলেন তিনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দীনবন্ধুর উদার মন ও সহজ প্রসন্ন দৃষ্টি, যার ফলে তাঁর নাট্যাবলীর সৃষ্টি। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকীয় কল্পনার আশ্রয় হয়েছে বাঙালি-জীবন ও বাঙালি-চরিত্র, খাঁটি বাঙ্‌লাদেশের অতি-সাধারণ মানবমানবীর লোকায়ত সুখদুঃখকেই তিনি স্বকৃত নাট্যে প্রতিফলিত করেছেন। ঊর্ধ্বগ কিংবা দূরযানী ছিল না দীনবন্ধুর সৃজনীকল্পনা, বর্তমান নাট্যশিল্পীর লেখায় অতি-উচ্চ ভাবুকতার ছাপ তেমন মিলবে না কোথাও, প্রত্যক্ষের অন্তরালে পরোক্ষের সন্ধানে তিনি ফেরেন নি, সর্বদা বাস্তবের ভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছেন। আমরা তাঁকে অত্যন্ত পরিচিত জীবনের মুগ্ধ উপাসকই বলবো। নিজের সামাজিক জীবনের চারপাশে যে-মানুষগুলিকে দেখেছেন, তাদের চিরন্তন দুর্বলতা-ভ্রান্তিকেই দীনবন্ধু উদার রসকল্পনার যোগে স্বরচিত নাটকের পাতায় দৃশ্য করে তুলেছেন।

এদিক থেকে দেখলে, বলতে হয়, সেকালের মানুষ হলেও, দীনবন্ধু মিত্র সর্বকালের বাঙালি—সাহিত্যকে জাতির জীবন থেকে কদাপি তিনি বিচ্ছিন্ন করে নেননি। আজকের দিনের বাঙ্‌লা সাহিত্যে লেখকের এহেন যথার্থ বাঙালিয়ানার প্রকাশ বড়ো একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। মানুষকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন দীনবন্ধু; সেইসব মানুষের বিচরণক্ষেত্র উনিশের শতকের মধ্যভাগের বঙ্গভূমির শহরাঞ্চল ও গ্রামদেশ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের সংসারে স্রষ্টা-হিসেবে এঁরা একে অন্যের পরিপূরক। উচ্চতর সংস্থানে জীবনের যে-রস পান করেছিলেন বঙ্কিম, দীনবন্ধু তা পান করেছেন নিম্নতর সংস্থানে—বর্ণাঢ্য কল্পনারশ্মির বিচ্ছুরণ ব্যতিরেকে। মানবহৃদয়ের ছোট সুখ, ছোট দুঃখের, নরনারীর হাসি-অশ্রুর অনতিগভীর স্রোতের, ঊর্মিলীলার রূপকার তিনি। নাট্যকার দীনবন্ধুর বিহরণভূমির পরিধি হয়তো সংকীর্ণ; কিন্তু যে-চরিত্রগুলো তিনি নির্মাণ করেছেন ও চরিত্রগত যে-বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তার অপূর্বতা অবশ্যই স্বীকার্য। দীনবন্ধুর নাটক বঙ্গসাহিত্যে অভিনব বস্তু। এর স্বতন্ত্র স্বাদ, স্বতন্ত্র এর রসগত বৈশিষ্ট্য—নাট্যকারের প্রতিভার মৌলিক শক্তির পরিচয়বাহী।

মুখ্যত হাস্যরসের রসিক দীনবন্ধু। হাস্যরসই তাঁর স্বভাব-প্রেরণা—ভিন্নতর ভাষায়, তাঁর নাটকীয় কল্পনার সব-চাইতে বড়ো প্রেরণা। এ হাসি কিন্তু মানুষের প্রতি হৃদয়হীন ব্যঙ্গবিদ্রূপ-মাত্র নয়, হালকা-ধরণের সাধারণ রঙ্গরসও নয়। এর সঙ্গে ব্যাপক সহানুভূতি আর উচ্চ রসকল্পনা যুক্ত। গভীর সহানুভবের মধুময় স্পর্শ যদি এতে না থাকতো, তবে তা নিছক পরিহাসের রূপ নিতো, সহৃদয় দর্শক কিংবা পাঠকের কাছে এমন উপাদেয় রসসামগ্রী হয়ে উঠতো না, এবং ফলে তাঁর প্রহসনগুলিতে উৎকৃষ্ট নাটকীয় গুণের নিতান্ত অভাবই লক্ষিত হতো।

হাস্যরসের সীমিত ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর স্বচ্ছন্দ পদচারণা, এই এলাকাটিতে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাট্যকর্মে দেখতে পাই, অতীব করুণ এবং বীভৎস ঘটনাবলীকেও হাস্যচ্ছটার ছোঁয়া লাগিয়ে উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন তিনি। তখন বুঝতে পারি, করুণ ও হাস্যের মধ্যে বস্তুত কোনো বিরোধ নেই—হাসি আর অশ্রু, গঙ্গাযমুনার মতোই, যুক্তবেণী রচনা করে চলেছে। তাঁর নির্মিত প্রহসনে হাস্যের অভিসেচনেই মানুষের চিত্তের ঘৃণ্য মলিনতাও প্রেক্ষণীয় নাট্যবস্তু হয়ে উঠেছে, সেখানে দুশ্চরিত্র মূর্খও আমাদের অন্তরের আত্মীয়তা আকর্ষণ করে। হাস্যরসের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দীনবন্ধু যখন করুণ-আদি রস-পরিবেশনের প্রয়াসী হয়েছেন, তখন, বলতে হবে, তাঁর অকৃতকার্যতা সুপ্রকট—ওই ব্যর্থতা দেখে আমাদের হাসি পায়। এ থেকে বোঝা

গেলো, দীনবন্ধু মিত্র প্রধানত হাস্যরসের শিল্পী। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারে, এমন লেখক বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যসংসারে দুয়েকজনের বেশি নেই।

আমোদ-কৌতুকের কলগীতিতে, উচ্চ হাস্যরোলে, তাঁর নাট্যাবলীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। এখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে আমরা হাসি, হাসতে হাসতে কখনো-বা অশ্রুমোচনও করি, মনুষ্যসুলভ দুর্বলতার প্রতি উদার রসদৃষ্টিতে তাকাই ; আর, এই রসাবিষ্ট অবস্থায় মূঢ় ভ্রান্ত দুর্বলচিত্ত অসহায় নরনারীকেও সমবেদনা জানাতে বাধ্য হই। কী ব্যক্তিজীবনে, কী সাহিত্যজীবনে, হাসির যাদুকর দীনবন্ধু মিত্র। হাস্যরসরসিক দীনবন্ধু চতুর্ধারের সমাজসংসারকে হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের বৃহৎ একটি রঙ্গমঞ্চরূপেই দেখেছিলেন, অভিনেতা—বিচিত্র চরিত্রের মানবমানবী—কেউ ভালো, কেউ মন্দ ; কেউ শিষ্ট, কেউ দুষ্ট। সংসারটাকে অভিনয়ক্ষেত্ররূপে দেখাতে, বর্তমান নাট্যকারের উপলব্ধি হয়েছে, এইসকল চরিত্রের প্রত্যেকেরই আত্মাভিমান যেমন সমান নিরর্থক, তেমনি, সমান কৌতুককর। লৌকিক সংস্কারের আবরণ থেকে নিজের দৃষ্টিকে মুক্ত করে নিতে পারলে, দেখা যাবে, মানুষের কোনো অভিমানই শেষ পর্যন্ত টেঁকে না, সমস্তকিছুই প্রকাণ্ড নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয়। নিরর্থক বলেই, ভালোর ভালোত্ব, আর মন্দের মন্দত্ব, তুল্যমূল্য। জগৎনাট্যমঞ্চের নির্মোহ দর্শকের এরূপ উপলব্ধির ফশ্রুতি—কৌতুকের অনাবিল উচ্চহাসি, যা দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটকগুলার প্রাণবস্তু।

বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

দীনবন্ধু মিত্রের রচিত প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ', ইংরেজি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত। 'নীলদর্পণ' বাঙ্‌লা সাহিত্যের সব-চাইতে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করার পর গোটা দেশে প্রকাণ্ড আলোড়ন জেগেছিল, সমাজের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল—ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল বঙ্গভূমির সর্বস্তরের মানুষ। এহেন বিদ্রোহাত্মক প্রতিক্রিয়ার ফল দূরপ্রসারী, নীলকর সাহেবদের অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন গ্রাম-বাঙ্‌লার বুক থেকে চিরকালের জন্য মুছে গেলো। বইখানি যখন প্রকাশিত হয়, দীনবন্ধু তখন ইংরেজের অধীনে সরকারি কর্মচারী। ফিরিঙ্গ নীলকরেরা ইংরেজেরই সজাতি ও বান্ধব। বহুপ্রকারে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল বলে মুদ্রিত 'নীলদর্পণ'-এ গ্রন্থকার নিজের নাম প্রকাশ করেননি, পুস্তকে শুধু লেখা ছিল : 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্'। দীনবন্ধু সত্যিই ছিলেন 'দীনবন্ধু'—বাঙ্‌লার দুর্গত-দরিদ্র রায়তদের অবর্ণনীয় দুঃখে কাতর হয়ে—নীলকররূপ হিংস্র সর্পকুলের মারাত্মক দংশন থেকে অসহায় প্রজাগণকে রক্ষা করার

মহৎ উদ্দেশ্যের প্রণোদনায়—তিনি 'নীলদর্পণ' লিখেছিলেন। নিজের নাম ছিল না বলে দীনবন্ধু মিত্র প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্দান্ত নীলকরদের রোষবহ্নি থেকে কোনোরকমে রক্ষা পেয়েছিলেন, এ এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

কিন্তু এ বই প্রচার করার জন্য লঙ্-সাহেবের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়েছিল, এবং শোনা যায়, এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন বলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রিম কোর্টের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। নীলকর কুঠিয়ালদের বেপরোয়া অত্যাচার দেখে বুঝতে পারা যায়, সেকালের রাজসরকার 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর'কে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি। এই কারণে আসেন নি, ওই সময়কার ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এসকল অত্যাচারী ফিরিঙ্গি-পশুর সহায়তাই করতেন। সে যা হোক, দরিদ্র বাঙালি চাষীর প্রতিকারহীন লাঞ্ছনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, আপনার সমূহ বিপদের দিকে না তাকিয়ে, 'নীলদর্পণ'-পুস্তকটি প্রচার করেছিলেন দীনবন্ধু। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীলদর্পণ এই গুণের ফল।' কথাগুলি অতিশয় যথার্থ। দীনবন্ধু মিত্রের সহানুভূতিশীল চিত্তের পুঞ্জীকৃত নিরুদ্ধ বেদনা গ্রন্থখানিতে চিত্রিত চরিত্রগুলার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে। অমানবীয় উৎপীড়নে ক্ষতবিক্ষত বাঙ্লার সহায়সম্বলহীন চাষীদের বুকের রক্তে লেখা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ কুঠিয়ালরা এদেশের কালা আদমীদের রক্তাভ শোণিতকে নীলবর্ণে পরিণত করেছিল—'নীলদর্পণ' নাটকে সেই 'নীল'-এর কথাই অশ্রুর অক্ষরে মুদ্রিত। নাটকখানি উনিশের শতকের দরিদ্র কৃষকসমাজের ওপরে নৃশংস ফিরিঙ্গিদের অমানুষিক নির্যাতনের অতি-বিশ্বস্ত সাক্ষীরূপে বঙ্গসাহিত্যে অদ্যাপি বিরাজমান। একালের মানুষ সেকালের এইসব শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের কাহিনী ভুলে গেছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের পাতায় তা গাঢ় রেখায় অঙ্কিত হয়ে আছে। 'নীলদর্পণ' অবিস্মরণীয় একখানি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

নাটকখানিতে দুটি সুখী পরিবারের দারুণ সর্বনাশের শোকাবহ ঘটনা বর্ণিত—গোলোক বসুর ও সাধুচরণের পরিবার। গোলোক বসু প্রভৃতির সঙ্গে নীলকর সাহেবদের সংঘাত বেধেছে। এই সংঘাতে নিষ্ঠুর কুঠিয়াল সাহেবগুলার সঙ্গে নির্দ্বিধায় হাত মিলিয়েছে গোপীনাথ ও পদী ময়রাণী। উক্ত সংঘর্ষের আভাস, সূচনা ও চূড়ান্ত অবস্থা বা করুণ পরিণতির অশ্রুসিক্ত আলেখ্য উন্মোচন করেছেন নাট্যকার। পরিণতিতে দেখি, সর্বস্ব হারিয়েছে এ দুটি পরিবার, সর্বগ্রাসী দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছে পরিবারের মানুষগুলি। দুরদৃষ্টের সে কী নির্দয় ধ্বংসলীলা—একের পর এক মৃত্যুর শোচনীয় দৃশ্য। 'নীলদর্পণ'-এ উন্মোচিত দৃশ্যাবলী বীভৎস, আতঙ্কপাণ্ডুর, হৃদয়বিদারক। বলা নিষ্প্রয়োজন, উদ্দেশ্যমূলক

রচনা 'নীলদর্পণ'। বাঙালি রায়তদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিবারণের জন্যে এবং সেদিকে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নাটকখানি রচিত। সমাজহিতে 'নীলদর্পণ' যা করেছে, অশেষ তার মূল্য। একারণে নাটকটি সর্বসাধারণ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ লিখে দীনবন্ধু দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, একদা দেশবাসী সকলের মুখে মুখে ফিরতো তাঁর নাম। 'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুকে মৃত্যুঞ্জিৎ করে রেখেছে।

প্রপাগ্যাণ্ডা-প্রধান সাহিত্য-হিসেবে অতিশয় উল্লেখ্য হলেও, অনবদ্য নাট্যকৃতি বলা যাবে না 'নীলদর্পণ'-কে। এমন কতকগুলি ঘটনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যা অভিনয়ের অনুপযোগী। এসব বস্তু নাট্যনির্মাতার নাটকীয়-সংস্থান-জ্ঞানের প্রতিকূল। এর আখ্যান-অংশেও বহুতর অসংগতি সুপ্রকট; কাহিনীর শিথিল গ্রন্থন কারুর দৃষ্টি এড়ায় না; সংলাপের কৃত্রিমতার জন্যে ভদ্রজাতের চরিত্রগুলি চিত্তাকর্ষণ করতে পারার মতো সজীবতা লাভ করেনি; কোথাও কোথাও অতিপ্রবল আবেগের বশীভূত হওয়ার জন্যে লেখক কল্পনার সংযম হারিয়েছেন; নাট্যের ঘটনাবস্তু বা 'এ্যাকশান' মেলোড্রামায় অবসিত হয়েছে; স্বল্প-উপকরণ ও সাধারণ চরিত্র নিয়ে ট্র্যাজেডি নির্মাণ করতে গিয়ে নাট্যকার এখানে বিফলমনোরথ হয়েছেন—এরকমের বহুতর ত্রুটি সমালোচকের চোখে ধরা পড়বে।

তথাপি, স্বীকার করতে হয়, নাট্যকার-দীনবন্ধুর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল পরিচয় এতে প্রাপ্তব্য। একশ্রেণীর চরিত্রনির্মাণে যে-দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বাঙ্‌লার রায়তদের অন্তরলোকের গহন অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করেছেন নাটকরচয়িতা, তাদের হৃদয়ানুভূতিকে তাদের প্রাণের ও মুখের ভাষায় অদ্ভুত নৈপুণ্য-সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে। কৃষক ও কৃষককন্যাদের এই বাণীময় অনুভূতির মধ্যে তাদের মুখের চেহারা ও স্বরভঙ্গিটি পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র—ব্যক্তিগত—চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে চিত্রিত। এক্ষেত্রে নাট্যসংলাপ নাটকীয় কল্পনার সম্পূর্ণ অনুগত। 'রিয়্যাল' চরিত্রসৃষ্টি কাকে বলে, এবং যথার্থ 'রিয়্যাল'-এর রস কী বস্তু, তার পরিচয় জানতে হলে 'নীলদর্পণ'-এ চাষা-নামে মানুষগুলার চরিত্রচিত্রণের দিকে তাকাতে হবে। এই রূপায়ণে জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা-মলিনতাকে ভেদ করে প্রকাশ পেয়েছে এসকল মানবমানবীর দুর্বলতা ও অসহায়তা, শক্তি ও অশক্তি, শিশুর মতো অপরিণত বুদ্ধি, অকৃত্রিম সরলতা, প্রাণের প্রাবল্য, অকপট মনুষ্যত্বের মনোরম মাধুর্য। দীনবন্ধুর অঙ্কিত ক্ষেত্রমণি-পদী ময়রাণী-তোরাপ-আদুরী-রাইচরণ প্রভৃতি পাত্রপাত্রীর চরিত্র শিল্পলোকের সার্থক সৃষ্টি। এই ধরণের চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকারের কৃতিত্ব আমাদের মুগ্ধ প্রশংসা আকর্ষণ করে। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি প্রগাঢ়

সহানুভূতি—নিঃসহায়ের করুণতম বেদনার মুখে তিনি নিত্যকালের ভাষা দিয়েছেন 'নীলদর্পণ' নাটকে।

আধুনিক বাঙ্‌লাসাহিত্যে 'নীলদর্পণ'-এর রচয়িতাকে বাস্তবতার পথনির্দেশকারী বলা যেতে পারে। তাঁর আগে সাহিত্যসংসারে বস্তুতন্ত্রতার পদসঞ্চার তেমন শ্রুতিগোচর হয়নি, গণসাহিত্যনির্মাণের প্রতি তেমন প্রবণতাও দেখা যায়নি—না মধুসূদনের কাব্যে, না বঙ্কিমের উপন্যাসাদিতে। কঠিন বাস্তবের ভূমিতে দীনবন্ধুই প্রথম পদক্ষেপ করলেন, সমাজের দুর্গত নরনারীর দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন, বামপন্থী সাহিত্যিক না হয়েও প্রাণের সবখানি দরদ ঢেলে দিয়ে নিরন্ন চাষীর জীবনচিত্রণে হাত দিলেন। সুগভীর চরিত্রানুভূতি আর নিবিড় আন্তরিকতার গুণেই, বহুতর ত্রুটি সত্ত্বেও, 'নীলদর্পণ' সাহিত্যের-স্বরভিমণ্ডিত হয়েছে। নাটকখানিতে গভীর ভাবকল্পনার রস নেই, বাঙালির অতি-সংকীর্ণ জীবন-পরিধির মধ্যেই এর কাহিনীবৃত্তের আবর্তন, নিজের-চোখে দেখা জগতের বাইরে নাট্যকার আপন কল্পনাদৃষ্টিকে মেলে ধরেননি। কিন্তু এতে জীবনের সত্য আছে, গ্রাম্যনরনারীর চরিত্রকে গ্রাম্যভাষায় ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। এই নাটকের স্থানে স্থানে যে-উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার উজ্জ্বল রশ্মিপাত হয়েছে, তা দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার অসামান্যতার স্বাক্ষর বহন করে।

১৮৬৩ সালে প্রকাশিত **'নবীন তপস্বিনী'** দীনবন্ধুর কৃত গম্ভীর রসের দ্বিতীয় নাটক। নাটকটি রোম্যান্সধর্মী, প্রণয়মূলক—মিলন-বিরহের যুগলধারায় সিক্ত। এখানে আদিরস আছে, করুণ-রস আছে, এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাস্যরস। এতে দুটি কাহিনী বর্ণিত। একটি—প্রেমঘটিত, অন্যটি—হাস্যরসাত্মক। ঘটনার জটিলতা ও বৈচিত্র্য নাটকটিকে গতিবেগস্পন্দিত করে তুলেছে। লক্ষণীয়, এ নাটকে গৌণ কাহিনীটিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক, এর পাশে মুখ্য কাহিনী একরূপ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বিজয়-কামিনীর প্রণয়-আখ্যান পাঠকচিত্তে কোনোরূপ গভীর ছাপ অঙ্কিত করে না ; পক্ষান্তরে, জলধর-জগদম্বা প্রভৃতির কৌতুকাবহ বিষয়টিই পাঠক কিংবা দর্শকের কাছে অনেক বেশি উপভোগ্য।

'নবীন তপস্বিনী'-র চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ সকলেরই চোখে পড়বে। নাটক লিখতে বসে লেখক অতীতের দিকে তাকিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক পরিবেষ্টনীর স্পর্শে অতীতের দূরত্ব ও মহিমা নষ্ট হয়ে গেছে—রাজা-রানী-বয়স্য-সভাসদ্ একালের পরিবেশে নিতান্ত বেমানান,—চোখে কেমন অসংগত ঠেকে। তুলনায়, আমরা অনেক বেশি আত্মীয়তা অনুভব করি মল্লিকা-মালতী-জগদম্বা-জলধর-রতিকান্ত-আদি নরনারীর সঙ্গে। এদের নিয়ে লেখকের সাহসিক রসিকতা ও উচ্ছল কৌতুক সত্যিই

উপাদেয় সামগ্রী। নাটকখানির বড়ো একটি ত্রুটি, মুখ্য ও গৌণ কাহিনী নিবিড় ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত হয়নি, ঘটনাবৃত্ত-রচনায় লেখক শিল্পকলাবোধের অভাবের—নিন্দনীয় অসতর্কতার—পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকে শেকস্‌পীয়রের 'Merry Wives of Windsor'-এর প্রভাব সুপ্রকট। 'নবীন তপস্বিনী'-তে দর্শকগণের চিত্তচমৎকার উৎপাদনের প্রয়াসী হয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু সহজে বুঝতে পারি, এ জাতের নাটক-রচনার ঠিক উপযোগী ছিল না দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভা। যেখানে তিনি নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডী লঙ্ঘন করেছেন, সেখানে তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। সুকুমার হৃদয়বৃত্তি নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা তিনি যদি না-করতেন, ভালোই হতো। কারণ, সূক্ষ্ম-সুকোমলের রূপকার নন দীনবন্ধু।

গম্ভীর-রসের তৃতীয় নাটক **'লীলাবতী'**-র প্রকাশকাল ১৮৬৭ ইংরেজি সাল। এ নাটকটিও রোম্যান্সমূলক। জটিল ঘটনার জাল বোনা হয়েছে এখানে। আখ্যান-নির্মাণে নাট্যশিল্পগত তেমন কোনো ত্রুটি প্রকাশ পায়নি। এতে কোথাও লঘু-চপল হাস্যরস পরিবেশন করা হয়নি। ললিতমোহন-লীলা-নদেরচাঁদের কাহিনীর মাধ্যমে লেখক বাঙালি-সমাজের তৎকালীন কৌলীন্যপ্রথার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এদিক থেকে দেখলে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ও 'নবনাটক'-এর সমগোত্রীয়।

এতে চমকারিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু দুর্বল অংশও কম নয়। ললিত-লীলার প্রণয়-জড়িত কথোপকথন দর্শকচিত্তের আনন্দদায়ক বস্তু না হয়ে বিরক্তির সামগ্রী হয়ে উঠেছে। নানান্ সদ্‌গুণে অলংকৃত হলেও নায়ক-নায়িকার চরিত্র দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণে অসমর্থ বলেই, আবেদনহীন। প্রাচীনপন্থী কুলীন-পিতা হরবিলাসের চরিত্র সুন্দর চিত্রিত। লক্ষ্য করতে হবে, নাটকখানিতে দর্শকসমাজের কৌতূহলী দৃষ্টিকে সর্বক্ষণ সজাগ রেখেছে ঘৃণার্হ ও নিন্দার যোগ্য চরিত্রগুলি, বিশেষে, নদেরচাঁদ। নিঃসন্দেহে অকরুণ ব্যঙ্গ ও ঘৃণার পাত্র সে। কিন্তু লেখকের উদার হাস্যের অভিষেকে ধিক্কৃত নদেরচাঁদের চারিত্রিক দুর্বলতাও আমাদের অনুকম্পামিশ্র আত্মীয়তা দাবি করে। এহেন চরিত্রহীন মানুষের প্রতিও আমরা আকৃষ্ট না হয়ে পারি না।

এ নাটক দীনবন্ধুর সৃষ্টিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়, যদিচ স্বয়ং রচয়িতা বলেছেন, 'অপরিমিত আয়াসসহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি'। নাট্যবস্তুর সমাহরণ ও বিন্যাসে লেখকের কথিত 'আয়াস'-এর পরিচয় পাওয়া গেলেও এবং এতে মনোহর ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকলেও, উত্তম অনবদ্য নাট্যের পর্যায়ে একে বিন্যস্ত করতে আমরা দ্বিধান্বিত। কারণ, আদিরস-বর্ণনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব মোটেই লক্ষিত হয় না—হাস্যরসের এই শিল্পী স্বতন্ত্রভাবে ভিন্নতর রস সৃষ্টি করতে গিয়ে বারংবার ব্যর্থ হয়েছেন। 'লীলাবতী' কিন্তু

বঙ্কিমের প্রশংসা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'লীলাবতী' বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প'। মনে হয়, 'দোষ' বলতে বঙ্কিম এস্থলে ভাষাগত ও রুচিগত অশ্লীলতা দোষের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

এরপর ১৮৭৩ সালে 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হয়। এ নাটকেরও মূল আখ্যানবস্তু প্রেম। পরিবেশটি গাম্ভীর্যপূর্ণ। এহেন গম্ভীর পরিবেশেও স্থূল হাস্যরস মাঝে-মধ্যে উঁকি দিয়েছে, ফলে গাম্ভীর্য বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে,—পাঠক-দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। নাটকটিতে সংস্কৃত নাট্যকলার অনুসৃতিও কিছু চোখে পড়ে। কয়েককটি দৃশ্য অভিনয়ের পক্ষে উপযোগী নয়। নাটকের বিশিষ্ট শিল্পরীতির কথা দীনবন্ধু প্রায়শ ভুলে যান, কাজেই, আভিনয়িক ব্যাপারে নানান্ অসুবিধে দেখা দেয়। প্রণয়মূলক নাটক-রচনার ক্ষেত্রে যে-গভীর কল্পনাদৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তা দীনবন্ধুর ছিল না। তবু, তিনি বঙ্কিম প্রমুখ লেখকদের নির্মিত প্রেমকাহিনীর অনুসরণে ওই জাতের আখ্যান নিয়ে নাটক লিখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফলকাম হননি। নিজের শক্তির সীমা ডিঙোতে গিয়ে আপনিই তিনি আপনার ব্যর্থতা ডেকে এনেছেন। এই শ্রেণীর নাট্যকর্ম তাঁর প্রতিভার বিরুদ্ধ বস্তু। একালের পাঠক দীনবন্ধুর 'কমলে কামিনী', 'লীলাবতী' ও 'নবীন তপস্বিনী'-র অভিনয় দেখে তৃপ্তিবোধ করবেন বলে মনে হয় না।

দীনবন্ধু মিত্রের সহজাত শক্তির যথার্থ স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রহসনগুলিতে, হাস্যরসের অবতারণায় বর্তমান নাট্যনির্মাতার অদ্ভুত দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। দীনবন্ধুর প্রতিভার মূল প্রেরণা যে হাস্যরস, একথা পূর্বে বলা হয়েছে। নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত —উভয়ের মধ্যে তিনি যেমন হাসি প্রসারিত করেছেন, তেমনি, মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন ও আচার-আচরণগত বিবিধ অসংগতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকের সামগ্রী করে তুলেছেন। এই প্রতিভাবান শিল্পীর পরিহাসে কুত্রাপি রসভঙ্গ হয়নি। তাঁর হাস্যরসে যে-বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা বাঙ্‌লাসাহিত্যের অন্যত্র বিরলদৃষ্ট। হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

সংস্কারক, উগ্রবাস্তবতার পথিক, হাস্যরসের রসিক দীনবন্ধু সমাজের ক্ষতিকর ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকতে পারেননি। অতিরিক্ত মদ্যপান, অবন্ধন উচ্ছৃঙ্খলতা, সভ্যতার আদর্শ-বিপর্যয়ে উন্মার্গগামিতা, ঘরজামাইপ্রথা, বৃদ্ধের বিবাহ, কুসঙ্গে চরিত্রহানি প্রভৃতি তৎকালীন বাঙালি-সমাজের দোষগুলিকে নানা নাটকে বা নাটককল্প প্রহসনে অঙ্কিত করে উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন তিনি। এসব দোষের কয়েকটির বাস্তব-প্রায় আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে 'সধবার একাদশী', 'বিয়েপাগলা বুড়ো' আর 'জামাই বারিক'-এ।

এ তিনটি প্রহসনে লেখক আমাদের প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন, কৌতুক-পরিহাস-রসিকতার তরঙ্গদোলায় দুলিয়েছেন। এই হাসি স্নিগ্ধ-মধুর, কোথাও-বা কারুণ্যে কোমল।

'সধবার একাদশী' [১৮৬৬] দীনবন্ধুর লেখা প্রসিদ্ধ একখানি প্রহসন। অনেকেরই মতে 'সধবার একাদশী' [অবশ্য কারো কারো মতে 'নীলদর্পণ'] তাঁর সর্বোত্তম রচনা। এতে প্রহসনকারের দুঃসাহসের পরিচয় আছে। সেকালে হিন্দুকলেজের ইংরেজিনবিশ ছাত্ররা কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরেই বিদিত। এসকল শিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খলদের—পাশ্চাত্ত্যসভ্যতামত্ত 'ইয়ঙ্গ বেঙ্গল'-দের চরিত্র এবং তাদের অভব্য, অশালীন আচরণই 'সধবার একাদশী'-তে অতিশয় বিশ্বস্ততাসহকারে চিত্রিত। বিদেশি শিক্ষার দুষ্ট প্রভাবে এসে এরা সুরাপানকে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ বলে জেনেছিল, ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কুক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল, চারপাশের নাগরিক জীবনের আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছিল। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের অনুকরণে দেশের অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতেরাও বেয়াড়া পথে পা বাড়িয়েছিল। সমাজের বড়ো একটি অংশ তখন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছে, নীতিভ্রষ্ট তরুণদের মধ্যে মদ্যপান ও লাম্পট্যলীলার যথেচ্ছাচার চলেছে। এরা সকলেই যেন অপ্রকৃতস্থ, উদ্‌ভ্রান্ত—যেমন সমাজদ্রোহী, তেমনি, আত্মদ্রোহী—অন্তঃপুরের শালীনতাকেও পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

সেকালে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অনেকেই চিত্তের মূঢ়তাবশে সর্বনাশের অতলে ডুবে যাচ্ছিল, তাদের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ফোটানোই সমালোচ্য প্রহসনে দীনবন্ধুর মনোগত অভিপ্রায়। রঙ্গ-রসিকতা, হাস্য-পরিহাস, অপরিমিত মদ্যপান, ইংরেজ কবিতার আবৃত্তি, ইত্যাদি দ্বারা তথাকথিত বিলাতি সভ্যতার ধ্বজাবাহী এইসব যুবক-কালাপাহাড়দের অকথ্য অনাচারজনিত জীবনট্র্যাজেডির ওপরে একখানি সূক্ষ্ম আবরণ টেনে দেওয়া হয়েছে। তাই, বাইরে এ ট্র্যাজেডির প্রকাশ নেই। কিন্তু চোখ যাঁদের রয়েছে, তাঁরা ঠিক দেখতে পাবেন, প্রহসনখানির অবিস্মরণীয় চরিত্র নিমে দত্ত নিতান্ত ট্র্যাজিক চরিত্র, সে আত্মহননে নিরত; তার ইয়ার বারাঙ্গনাবিলাসী অটলবিহারী সর্বনাশা আগুন নিয়ে খেলা করছে; রামমাণিক্যের মতো চরিত্র অনুচিকীর্ষার পরবশ হয়ে আত্মবিনাশের পথটি প্রশস্ত করে তুলছে। ভোলাচাঁদ, ঘটিরাম ডেপুটি প্রভৃতি চরিত্র সেই ক্লেদাক্ত যুগের এক-একটি বিশেষ টাইপ—নিজেদের অজ্ঞাতসারে কী শোচনীয় পরিণামের অভিমুখী হচ্ছে, চিত্তের মূঢ়তাসমাচ্ছন্ন অবস্থায় তা উপলব্ধি করতে পারছে না। এই চরিত্রগুলির মধ্যে শিক্ষিত নিমচাঁদের চারিত্রিক অধোগতি ও দুর্গতি, সাময়িক চৈতন্যোদয়ের মুহূর্তে তার আত্মধিক্কার ও নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি, কখনো কখনো নিজেকে নিয়েও নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, বড়োই করুণ—দর্শক-

চিত্তকে সমবেদনায় বিগলিত করে। হাসির ছলে অশ্রুর মালা গেঁথেছেন নিপুণ হাস্যরসস্রষ্টা বেদনাবিদ্ধ দীনবন্ধু।

বর্তমান প্রহসনে বর্ণিত চরিত্র-সব বাস্তবের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, প্রত্যেকটি ঘটনা নাট্যকারের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে সংগৃহীত। সংলাপের চমৎকারিত্ব কাহিনীকে সরস ও প্রাণবান করে তুলেছে। নাট্যকার পাত্রপাত্রীদের কথাবার্তায়, ইচ্ছা করেই, আব্রু রাখেন নি, অভব্য বা অশ্লীল ভাষাপ্রয়োগকে দূষণীয় মনে করেননি—ভদ্র বুলি ব্যবহার করলে তাঁর কল্পিত রক্ত-মাংসে-গঠিত চরিত্রগুলির বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হবে, এই ভেবে। এ হলো গ্রাম্যতাদোষের কথা। বইখানিতে রুচিগত অশ্লীলতাও দেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তিনি মন্তব্য করেছিলেন: 'এই প্রহসন বিদগ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে।' এই কারণে বন্ধু-নাট্যকারকে প্রহসখানি প্রচার না করতে বলেছিলেন। দীনবন্ধুর রচনায় ভাষাগত অশ্লীলতা লক্ষ্য করা গেলেও তার নিন্দা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু আর্টের অশ্লীলতা বা রুচি-সম্পর্কিত অশ্লীলতা তাঁর চোখে ক্ষমার অযোগ্য। এস্থলে অমাদের বক্তব্য, দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে রুচির প্রশ্ন উঠবেই, তাঁর রচনা স্থানে স্থানে অবশ্যই আপত্তিকর। কিন্তু যে-সমস্ত চরিত্র অবলম্বনে দীনবন্ধুমিত্রের প্রহসনগুলি রচিত, তাদের কার্যকলাপ নিখুঁতভাবে ভাষায় আঁকতে হলে এখানে-ওখানে ভদ্ররুচির সীমা অতিক্রম না করেও প্রহসনকারের উপায় ছিল না। এইকারণে এসব রচনায় অভদ্র রসস্রোত ঢুকে পড়েছে।

এজাতের নাট্যকর্মের অন্তরালে সমাজশোধনের ও নীতিশিক্ষা দেবার একটা অভিলাষ সচরাচর লক্ষিত হয়। 'সধবার একাদশী'তে এরূপ কোনো সজ্ঞান প্রয়াস চোখে পড়ে না; সমাজ-সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, ওই মনোভাবকে লেখক কোথাও প্রকট হতে দেন নি। উচ্ছৃঙ্খল অবিমৃষ্যকারী নিমে দত্তর চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত তিনি অপরিবর্তিত রেখেছেন, তার সাধুতালাভের চিত্র আঁকেননি; তাকে সৎপথে নিয়ে এসে, গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে, প্রহসনের রসভঙ্গ করেননি—এ দীনবন্ধুর শিল্পবোধের পরিচায়ক। কৌতুক-উপহাস-পরিহাসের আচ্ছাদনে অপরিণামদর্শী যুবকদের চরিত্রের অন্তঃশায়ী কারুণ্যকে ঢেকে রেখে প্রহসনলেখক শেষাবধি দর্শকদের হাসিয়েছেন।

প্রহসনটির নামের আপাতপ্রতীয়মান অসংগতি কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। এরূপ নামকরণের মধ্য দিয়ে তিনি একশ্রেণীর পুরুষ-চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন। এই রচনায় মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র প্রভাব সুপরিস্ফুট—সদৃশ চরিত্রাঙ্কনে, বিষয়বস্তুতে, সংলাপ-সংযোজনে। তবে, মধুসূদনের প্রসঙ্গে ভদ্র-রুচি-লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না, তাঁর পরিহাসরসিকতা স্থূলতার স্পর্শমুক্ত। সেইজন্যে, কারো কারো মতে,

বিনির্মল হাস্যরসের অবতারণার ক্ষেত্রে মাইকেল বাঙ্‌লাসাহিত্যে অদ্যাবধি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এও স্বীকার্য, 'সধবার একাদশী'-র রসঘনতা ও নাট্যনৈপুণ্য 'একেই কি বলে সভ্যতা'-য় অপ্রাপ্তব্য। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মদ্যপায়ী মাতালের, মায়ের প্রশ্রয়প্রাপ্ত বিপথগামী বয়াটে যুবকের, শোচনীয় দুর্গতিক্লিষ্ট জীবনের, এমন হাস্যরসোজ্জ্বল ট্র্যাজেডি কোনো বাঙালি লেখকের কলম থেকে বেরুয়নি। বাঙ্‌লা প্রহসনের সংসারে নিমচাঁদ চরিত্রের তুলনা কোথায়?

'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' [১৮৬৬] দীনবন্ধুর নির্মিত উৎকৃষ্ট একখানি প্রহসন। এখানে কাহিনীরই প্রাধান্য, বিশেষ কোনো চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে হাস্যরসসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়নি। বার্ধক্যের দ্বারে সমুপস্থিত, বিয়ের নেশায় আত্মহারা, রাজীবের কারুণ্যমিশ্র কৌতুকাভিনয় বেশ উপভোগ্য। বৃদ্ধবয়সে তার অবাঞ্ছিত নারীসঙ্গলিপ্সা কৌতুক-রসের সঞ্চার করে। এই প্রহসনটি লিখতে বসে দীনবন্ধু নিশ্চয়ই মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-গ্রন্থখানি স্মরণ করেছিলেন। মধুসূদনের কল্পিত ভক্ত-প্রসাদের সঙ্গে দীনবন্ধুর কল্পিত বিয়ে-পাগলা বুড়ো রাজীবলোচনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। অশোভন রমণীসঙ্গপিপাসায় উন্মাদ-প্রায় হয়ে ভক্তপ্রসাদ যেমন নাজেহাল হয়েছে, তেমনি, বিয়ের জন্যে উন্মত্ত হয়ে, যুবক সেজে, নকল শালীশালাজের পীড়াদায়ক কানমলা খেয়ে, পাড়ার ষড়যন্ত্রকারী যুবকদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে, ভীমরতিগ্রস্ত রাজীব লুপ্ত চৈতন্য ফিরে পেয়েছে। উপহাসের আঘাতরূপ কী শাস্তিই-না পেতে হলো বিবাহার্থী বৃদ্ধ রাজীবকে। কোথায় গেলো ছলনাময়ী স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়বিহ্বল এই বুড়োর মধুর-রসের আলাপন, কোথায় মিলালো তার ইন্দ্রধনুবর্ণরঞ্জিত প্রেমের সোনালি স্বপ্ন! নিজ বার্ধক্যকে সবলে দূরে সরিয়ে রেখে বিবাহোন্মাদ রাজীবলোচন বিগত-যৌবনের অভিনয় করেছে, নিষ্করুণ জরার কথা ভুলে গিয়ে অবশে মোহের হাতে ধরা দিয়েছে। কিন্তু বার্ধক্যের নিয়তিকে অস্বীকার করে, কার সাধ্য! তাই, চঞ্চলমতি বালকদের কৌতুকের অশেষবিধ পীড়ন সহ্য করতে না পেরে রাজীব যখন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে: 'মলাম, গিচি, মেরে ফেল্লে,—ও রামমণি'—নিজের করুণতম অসহায় অবস্থায় আপনার বিধবা কন্যা রামমণিকে স্মরণ করে, তখন কৌতুকাবহ পরিবেশের মধ্যেও আমরা কারুণ্যের কলধ্বনি শুনতে পাই। 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'-য় উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের অবতারণা করেছেন প্রহসনরচয়িতা, এখানে হাসি-কান্নার গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হয়েছে।

ভক্তপ্রসাদ আর রাজীবের মতো পুরুষ সেদিনকার সমাজে যেমন ছিল, একালের সমাজেও মাঝে-মধ্যে এদের সাক্ষাৎ মেলে। রাজীবলোচনের দুর্বলতাকে নিয়ে কৌতুক করেছেন দীনবন্ধু, কিন্তু এই দুর্বলচিত্ত মানুষটিকে তিনি সহানুভূতির চোখেই দেখেছেন;

তাকে শাস্তি দিয়েছেন তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার জন্যে। রাজীবের ঘরে দুজন বিধবা কন্যা রয়েছে, তাদের বৈধব্যক্লেশে সে এতটুকু বেদনা বোধ করে না। অথচ পরিণত বার্ধক্যের সীমায় পা বাড়িয়েও রাজীব নিজে বিয়ের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্রূপের রাশিকৃত কাদা মাখিয়ে দিয়ে এহেন নির্লজ্জ বুড়োকে বিবেকের কূলে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই প্রহসননির্মাতার লক্ষ্য।

তৃতীয় প্রহসন 'জামাই বারিক' ১৮৭২ সালে প্রকাশিত। প্রহসনটি পড়ে রামগতি ন্যায়রত্ন মশায় লিখেছিলেন : 'কৌলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘরজামাই রাখেন বা ঘরজামাই থাকেন, এই পুস্তক-পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।' বুঝতে পারি, একদা যেসব অপদার্থ বাঙালি-কুলীন-সন্তান ধনীর কন্যা বিয়ে করে, পত্নীপ্রতিপালনে অক্ষম হয়ে, শ্বশুরমন্দিরে আলস্যে জীবন যাপন করতো, স্ত্রীর উপেক্ষা সত্ত্বেও যারা ওই নিরাপদ ও আরামের আশ্রয়স্থানটি ছেড়ে যেতো না, তাদের লাঞ্ছনার চিত্রই 'জামাই বারিক'-এ অঙ্কিত হয়েছে। 'ঘরজামাইয়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ'—এই করুণ সত্যটি তারা উপলব্ধি করতো অনেক দেরিতে, বহুপ্রকারের অপমানে বিদ্ধ হবার পর। আজকের সমাজে কৌলীন্যপ্রথার বিড়ম্বনা কাউকে সহ্য করতে হয় না, ওই সমাজ থেকে আজ আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। সাহিত্যে কিন্তু তার কৌতুককর আলেখ্য দেখি ; দেখে, হাস্যসংবরণ করতে পারি না।

ঘরজামাই অভয়চরণ নিঃস্ব, মূর্খ, নেশাখোর, শ্রমবিমুখ। ধনীকন্যাকে বিয়ে করে গৃহপালিত জামাতা হয়ে থাকার কী সুখ, হাড়ে হাড়ে সে টের পেয়েছে, স্ত্রীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এহেন পরাশ্রয়ী আত্মমর্যাদাশূন্য অভয়চরণ আমাদের সহানুভূতি দাবি করতে পারে না। কাজেই, তার সমুচিত লাঞ্ছনা উপভোগেরই সামগ্রী।

এই প্রহসনে আরো একটি সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে, দেখতে পাই—একাধিক-পত্নীগ্রহণজনিত ঈর্ষাপরায়ণা সপত্নীদের কলহপ্রসূত সমস্যা। দ্বিপত্নীক স্বামীর অশেষ যন্ত্রণা : দুপাশে দুই নাগিনী স্ত্রী, মাঝখানে অশান্তিজর্জর স্বামী। স্ত্রী-দুজন যখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অনবরত বিষ উদ্‌গিরণ করিতে থাকে, তখন নিরুপায় হয়ে বিমূঢ় স্বামীকে বৃন্দাবনের যাত্রী হতে হয় ; না হলে জীবন্মৃত অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয় তাকে। এক স্ত্রীর ভরণপোষণের, ভারবহনের, ক্ষমতা নেই পদ্মলোচনের, কিন্তু পাঁচ-সাত বছর না-কাটতেই দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে আনলো সে। এমন যে অপদার্থ পুরুষ, পত্নীদের কলহযন্ত্রণা ভোগ করলেও কে তাকে সহানুভূতি দেখাবে! তার জন্যে সমবেদনা নয়। পদ্মলোচনের দুর্দশার ছবি এঁকে প্রহসনকার আমাদের চমৎকার কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন।

ভারি মজার দৃশ্য আছে 'জামাই বারিক' এ। গৃহপালিত জামাতাদলের ব্যারাক বা জামাইগোষ্ঠীর খোঁয়াড়—দর্শনীয় একটি জিনিস। এই খোঁয়াড়ে তারা থাকে, অন্তঃপুরে যায় পাশ নিয়ে। পাশ পেলে জামাইদের মন খুশিতে ভরে ওঠে। রামায়ণের অদ্ভুত ব্যাখ্যা শোনা যায় মহাপণ্ডিত জামাতাবৃন্দের মুখে, একই সঙ্গে মাণিকপীরের গানের অবতারণা করে তারা। এরূপ দৃশ্য দেখে দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে, রস জমে ভালো। 'জামাই বারিক'-প্রহসনটি আদ্যন্ত প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে তরঙ্গিত। বগলা ও বিন্দু যে-ভাষায় ঝগড়া করে, যে-ভাষায় একের প্রতি অন্যে বিষ ছড়ায়, প্রহসনের পাতায় তাকে প্রতিফলিত করার মতো ক্ষমতা একমাত্র দীনবন্ধুরই রয়েছে—বাঙালির অন্তঃপুরের এমন অবিকল চিত্র অঙ্কন করার শক্তি অন্য কোনো নাট্যকারের নেই। দীনবন্ধু মিত্রের অভিজ্ঞতা যেমন ব্যাপক, তেমনি, বহুবিচিত্র।

প্রখ্যাত বাঙালি নাট্যকারদের অন্যতম দীনবন্ধু। বাঙ্‌লা নাটকের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে তাঁর প্রতিভার দান কম নয়। বস্তুত, মধুসূদন এবং দীনবন্ধুই আমাদের নাট্যসাহিত্যে ভবিষ্যতের নির্দেশক—পরবর্তী নাট্যকারেরা উভয়ের কাছে মোটামুটি ইঙ্গিত পেলেন, কোন্ পথে তাঁরা এগুবেন। ইত্যোমধ্যে প্রায় সব রকমের নাটক—পৌরাণিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক—লেখা হলো, আর, হাস্যরসপ্রধান নাটিকাও নির্মিত হলো। এখন থেকে শক্তিমানেরা নাট্যের অবয়ব ও সংলাপকে নিখুঁত করে তুলবেন, নাট্যকৃতির সৌন্দর্যবর্ধন করবেন।

দীনবন্ধুর নাটকে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও ব্যক্তিবিশেষের ছায়াও চোখে পড়ে, বিশেষ করে, প্রহসনগুলিতে। এই কারণে কলকাতার ধনীদের গৃহের বাঁধা-স্টেজে তাঁর নাটকের অভিনয় হয়নি। কিন্তু মহানগরীর বাইরে এগুলির আদর ছিল খুব বেশি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন দীনবন্ধুর নাট্যাবলীর কদর বেড়ে গেলো অত্যধিক, পাব্লিক স্টেজে অভিনয়ের শুরু এগুলি দিয়েই। এ তথ্য মনে রাখবার মতো।

তাঁর রচনায় আমোদ-কৌতুকের শেষ নেই, লেখকটির মধ্যে কৌতুকপ্রবণতার আতিশয্য সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন ; প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান ছোটাতেই যেন তাঁর আনন্দ। কখনো কখনো শ্লীলতার গণ্ডী তিনি ছাড়িয়ে গেছেন। মনে হয়, এর জন্যে যুগের রুচিই অনেকখানি দায়ী। সেকালের লোক স্থূলতা নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামাতো না, যে-কোনো রকমের স্বল্প উত্তেজনায় প্রাণখোলা উচ্চহাসি হাসতে পারতো। সেই হাস্যের ভাষা অধুনা আমরা ভুলে গেছি, উচ্চহাস্যকে কেবল প্রহসনের সামগ্রী বলেই

বুঝেছি। কথার পুনরাবৃত্তি করা হলেও এখানে আবার বলি, দীনবন্ধু মিত্রের ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি, অতিশয়োক্তি আর উচ্চহাস্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার অভাব নেই। তবে, এও স্বীকার্য, তিনি যদি শিল্পীজনোচিত সংযম বা মাত্রাবোধ না হারাতেন, তাহলে তাঁর প্রহসনগুলির সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেড়ে যেতো। সে যা হোক, সহানুভূতির গুণে, তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি, ভালোমন্দের মিশ্রণে, রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে, তারা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। নাট্যকারের সম্পর্কে এ খুব বড়ো প্রশংসার কথা। প্রাণবন্ত চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা, তাঁর মতো, অপর কোনো নাট্যনির্মাতার ছিল না। নাট্যকর্মের বিশেষ ক্ষেত্রে অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় রেখে গেছেন দীনবন্ধু। এহেন শক্তিমান নাটকরচয়িতা বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায়, এ সত্যিই পরিতাপের বিষয়।

দীনবন্ধু ও মধুসূদনকে নিয়ে নাটকরচনার দ্বিতীয় পর্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হলো, বলা যেতে পারে। অবশ্য এঁদের অনুসরণে আরো কয়েক ব্যক্তি নাটক লিখে গেছেন। তৃতীয় পর্বের আরম্ভ গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনজন উল্লেখ্য নাটকপ্রণেতা—মনমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। রঙ্গমঞ্চের প্রিয় লেখক এঁরা।

॥ খ্যাতিমান গীতাভিনয়-প্রণেতা মনমোহন বসু ॥

নাটক লিখে মনমোহন বসু [১৮৩১-১৯১২] একসময়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য নতুন ধরণের পৌরাণিক নাটক-রচনায়—নবপ্রবর্তিত যে-রীতি রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদে এসে পরিণতি লাভ করলো। অন্তঃপ্রকৃতি বা স্বরূপের দিকে তাকিয়ে মনমোহনের রচিত নাটককে 'অপেরা' অর্থাৎ গীতাভিনয়ের পর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর সংগত,—একজাতের অভিনব দৃশ্যকাব্য—চেহারায় নাটক যেন, কিন্তু অভিনীত হয় যাত্রার ঢঙে। এই বস্তুটিকে আধুনিক রুচিসম্মত নবীকৃত যাত্রা বলা যেতে পারে। এতে ভক্তিভাবের প্রাবল্য, করুণ-রসের নির্বাধ অনুপ্রবেশ, সংগীতের অতি-আত্যন্তিক সংযোজন। যাত্রার সঙ্গে এর লক্ষণীয় পার্থক্য অশালীনতামুক্ত ভাষার পারিপাট্যে। অপেরা পুরাতন যাত্রাভিনয়েরই সংশোধিত রূপ। নাট্যজগতে নতুন পথের পথিক হলেও, বলতে হয়, মনমোহন বসু, উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলম ধরেও, নাটককে যাত্রার দিকেই চালালেন। মনমোহন মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পরবর্তী অধ্যায়ের লেখক। নাটক লিখতে বসে কিন্তু পূর্বসূরির প্রদর্শিত পাশ্চাত্য নাট্যকলার আদর্শটি গ্রহণ করলেন না—অগ্রসরণের পরিবর্তে অতীতচারণার প্রতি উৎসাহ দেখালেন সমধিক। লৌকিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মন্ত্রপাঠ করলেন যে-

মানুষটি, নাট্যকার-জীবনে তিনি আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিতে পারলেন না, অদ্ভুত একটি ব্যাপার। সত্তার এই দ্বৈধ ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন।

বাঙ্‌লানবিশ নাট্যকার মনমোহন, যেমন, বিপরীতপক্ষে, মধুসূদন দত্ত ইংরেজি-নবিশ নাটকলেখক। তাই, দেশে রঙ্গালয় স্থাপনের পরেও, বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে নাট্যপ্রণয়নের উৎসাহচঞ্চল যুগেও, মনমোহন বসু ধর্মভাবুকতার দিকে ঝুঁকলেন, নাটকে ভক্তিধারা ও করুণ-রসের প্লাবন বইয়ে দিলেন। এ তিনি করলেন বাঙালির ভাবপ্রবণ মনোধর্ম লক্ষ্য করে, লোকচিত্তরঞ্জনের অভিলাষী হয়ে। হাফ্-আখড়াই, কবি-পাঁচালির আবহাওয়ায় যে-মানুষটির মনোজীবন লালিত, ম্রিয়মাণ যাত্রাকে তিনি নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। একদা-জনপ্রিয় যাত্রা যখন অভব্য রুচি, অশ্লীল রসের অবতারণা আর বৈচিত্র্যহীনতার জন্যে শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, অথচ জনসাধারণের মনের কোণে যাত্রাপ্রীতি সুপ্ত থেকে গেছে, আর, রঙ্গালয়নির্মাণও প্রচুর-ব্যয়-সাপেক্ষ, এরূপ একটি অবস্থায় অপেরার সৃষ্টি। এই অপেরালেখকগণের মধ্যে মনমোহন বসু সর্বশ্রেষ্ঠ। অনুবর্তী লেখকগোষ্ঠীর কলম থেকে এ জাতের নাট্যকল্প রচনা অজস্র বেরিয়েছে।

কবিতা লেখায় হাত ছিল মনমোহনের, গান-তৈরির সহজাত ক্ষমতা ছিল। তাই, দেখতে পাই, স্বকৃত নাটককে গানের রসে সিক্ত করেছেন তিনি। য়ুরোপীয় নাটকে যত্রতত্র গীত সংযোজিত হয় না, বাঙ্‌লা নাটকে গীতাধিক্য। এদেশের নাট্যকর্মে এই সংগীতবাহুল্যকে সমর্থন জানিয়ে মনমোহন বসু তাঁর 'সতী' নাটকের ভূমিকায় লিখছেন: 'ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। এটি জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক।...যে-দেশের সাধারণ জনগণ যাত্রা, কবি, পাঁচালি, ফুল ও হাফ-আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, মরিচা, ভজন প্রভৃতি নিত্যনূতন সংগীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী, যে-দেশের দিবাভিক্ষু ও পথভিখারীরাও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে-দেশের দৃশ্যকাব্য যে সংগীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি।' প্রাচীন রীতির পোষকতা করে, নাটকে-যাত্রায় মিলন ঘটিয়ে, বাঙ্‌লা-নাট্যসাহিত্যের প্রগতিমুখী ধারাটিকে তিনি পশ্চাৎমুখী করলেন। নাটকে ভক্তিভাবের স্রোত বইলো, কিন্তু জাতি খাঁটি আধ্যাত্মিক মানসিকতা থেকে দূরে থেকে গেলো। সুতরাং বলা যায়, মনমোহন বসু বাঙ্‌লা নাটকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালেন। পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের মোহ তিনি কাটাতে পারেন নি, সংস্কৃত নাট্যকলার প্রভাবের কাছে সহজে ধরা দিলেন, পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি প্রীতিপক্ষপাত দেখালেন, সামাজিক নাটকেও প্রচুর গান ঢোকালেন, সংস্কৃত কাব্যসুলভ রূপক-উপমার ভাষায় কাব্যপ্রকাশে সচেষ্ট

হলেন, নাট্যের স্থানে-অস্থানে প্রবাদ ও ছড়া বসালেন, জলো কারুণ্যের মাধ্যমে দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করতে চাইলেন। বলা বাহুল্য, এসব জিনিস আধুনিক রুচির অনুমোদিত নয়। সাধারণের তুষ্টিবিধানের দিকে তাঁর দৃষ্টি অত্যধিক নিবদ্ধ, নাট্যশিল্পের দাবি সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। ধর্মভাবপোষক ভক্তিবিলাসীর প্রিয় নাট্যকার মনমোহন, সমালোচকের কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠার খাস দরবারে এসে দাঁড়াতে পারবেন না তিনি। যুগের চাহিদা তিনি মিটিয়েছেন, যুগজীবী শিল্পীর মর্যাদা তাঁকে অর্পণ করতে আমরা দ্বিধান্বিত।

মনমোহনের প্রথম নাট্যরচনা '**রামাভিষেক**' [১৮৬৭]। রামায়ণে বর্ণিত একটি করুণ ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি লেখা। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের আনন্দপূর্ণ আয়োজন মর্মঘাতী বিষাদে ঢাকা পড়লো, রাজ্য ছেড়ে তাঁকে বনবাস বরণ করতে হলো, বিলাপ করতে করতে মহারাজ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন—এ হলো নাটকটির মূল ঘটনা—করুণ-রসে আপ্লুত, পরিণতি বিয়োগান্ত। রচনা-হিসেবে মন্দ নয়। দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের ঘটনা নিয়ে '**সতী**' নাটক [১৮৭৩] নির্মিত। এখানে দেবদেবীর লীলাকে ছাপিয়ে উঠেছে বাঙ্‌লা সমাজের মানবমানবীর মনোজগতের বিচিত্র ছবি—'দক্ষের সংসার যেন বাঙালি গৃহস্থের ঘর'—মানবিক রসে সমৃদ্ধ। তৃতীয় পৌরাণিক নাটক '**হরিশ্চন্দ্র**' [১৮৭৫]। এতে সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের কিছু প্রভাব আছে। মূল ঘটনা রাজা হরিশ্চন্দ্রকে ঋষি বিশ্বামিত্রের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পরীক্ষা। বর্ণিত ঘটনা পুরাণ থেকে সংগৃহীত, তবে দুয়েকটি চরিত্র নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। এক্ষেত্রে তিনি কিঞ্চিৎ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মূল কাহিনীর পাশে একটি উপকাহিনী সংযোজিত হয়েছে, এ নাট্যবস্তুকে বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করেছে।

এদেশের একটি সামাজিক কুপ্রথা—বহুবিবাহ—'**প্রণয়পরীক্ষা**' [১৮৬৯] নাট্যের কথাবস্তু। বহুবিবাহের অনিবার্য পরিণাম সপত্নীকলহ, ফলে গৃহে নিদারুণ অশান্তি। এ বিষয় নিয়ে ইতঃপূর্বে রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু নাটক লিখেছেন। কাজেই, 'প্রণয় পরীক্ষা'-তে বিষয়গত কোনো নতুনতা নেই। শিল্পকলার দিক থেকে দেখলে, এর ত্রুটি কম নয়। নাট্যের বস্তুনির্ভর সামাজিক পরিবেশ রোম্যান্টিক স্বপ্নালুতায় আচ্ছন্ন হয়েছে, অবাস্তবতার অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশহেতু, শেষের দিকে, লৌকিক ঘটনার বাস্তব আবেদন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সাংসারিক সুখদুঃখের জগতে মনমোহন বসু কেমন যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।

তাঁর লেখা আরো দুয়েকখানা নাটকের নাম—'পার্থ-পরাজয়', 'রাসলীলা', 'আনন্দময় নাটক', ইত্যাদি। উল্লেখ্য কোনো বৈশিষ্ট্য এগুলিতে লক্ষিত হয় না।

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ের সঙ্গে মনমোহন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তিনি দুয়েকটি নাটক লেখেন। শোনা যায়, স্বাদেশিকতা প্রচারের জন্যে তাঁর একখানি নাটকের অভিনয় সরকারের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মনমোহনের রচিত একটি গান—'দিনের দিন হয়ে দীন'—স্বদেশি মেলার যুগে হিন্দু-বাঙালির মুখে মুখে ফিরতো। নাটকে তিনি রাজনীতিকে টেনে এনেছিলেন।

মনমোহন বসুর সেদিনকার খ্যাতি বর্তমানে নিষ্প্রভ।

॥ মনমোহনের অনুবর্তী নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় ॥

সেদিনকার নাট্যামোদীদের রুচির তৃপ্তিবিধায়ক কিছু কিছু ভালো নাটক লিখেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়—মনমোহনের প্রবর্তিত নাট্যধারার নাম-করা লেখক। এদেশের লোক সাধারণত ধর্মপ্রাণ, ভক্তিভাবই তাদের প্রাণের তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে বেশি। তাই, ভক্তিরসপ্রধান পৌরাণিক যাত্রাকে তারা অত্যধিক অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখে, বাস্তবভিত্তিক নাট্যরচনা এ জাতের মানুষের ভক্তিরসপিপাসা নিবৃত্তির পক্ষে অনুকূল নয়। এইজন্যে, পেশাদারি রঙ্গালয়ে ভিন্নতর রসের নাটক-অভিনয়ের দিনেও তাদের ভক্তিবিলাসী চিত্ত অবাস্তব, অলৌকিক ঘটনার প্রতি দুর্মর আগ্রহ দেখিয়েছে, ক্রমবিলীয়মান যাত্রাকে তারা আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে, নাটকের ছদ্মবেশধারী, যাত্রা-প্রভাবিত, গীতাভিনয়কে সাদর স্বীকৃতি জানিয়েছে। এহেন দর্শকদলের মনোরঞ্জনার্থে মনমোহন বসু অপেরা-প্রণয়নে হাত দিয়েছিলেন—ওই পথেরই পথিক রাজকৃষ্ণ। তিনি কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, নাট্যনির্মাণে অশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন, অক্লান্তভাবে সাহিত্যসেবা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্থায়ী কোনো কীর্তি তিনি রেখে যেতে পারেন নি। জীবিকাসংগ্রহের তাড়নায় অতি-লিখনের ফলে অপ-লিখনের, আতিশয্যের, দোষভাগী হয়েছেন রাজকৃষ্ণ রায়। লেখার ঝোঁকে অনবরত তিনি লিখে গেছেন, শিল্পসুষমা-বিষয়ে অবহিত হননি, জীবনরহস্যের গভীরে ডুব দেননি। এ কারণে, তাঁর কৃত নাটকে ঘটনাবিন্যাসে হাসিকান্না থাকলেও, তা দর্শকের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে আলোড়ন জাগায় না। রাজকৃষ্ণের প্রতিভা ছিল। কিন্তু সেই প্রতিভার অনুপাতে ভালো লেখা নিতান্ত স্বল্প। জনপ্রিয় লেখকের পক্ষে সত্যিকার বড়ো স্রষ্টা হবার পথে বিস্তর বাধা।

রাজকৃষ্ণের প্রণীত নাটক সংখ্যায় কম নয়, নাট্যবস্তুও নানাবিধ। পৌরাণিক, ঐতিহাসি, সামাজিক এবং প্রহসনধর্মী অসংখ্য নাটক লিখলেও, ভক্তিরসাত্মক ও পুরাণ-বিষয়ক নাটকের দিকেই তাঁর চিত্তপ্রবণতা সমধিক। তাঁর নাট্যের কথাবস্তুর

প্রধান উৎস রামায়ণ, মহাভারত আর বহুতর পুরাণ। কাহিনী-কল্পনায় মৌলিকতা তিনি দেখান নি, ঘটনার কুশলী বিন্যাসের মাধ্যমে নাটকীয় সৌন্দর্যসমৃদ্ধ কোনো দৃশ্যের অবতারণায় উল্লেখনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেননি, ভক্তিরসসিক্ত পুরাণ-কথাকে নাট্যাকারে গ্রথিত করেছেন—স্থূলরুচি দর্শক সর্বক্ষণ তাঁর দৃষ্টির সমক্ষে বিরাজমান। লোককান্ত হতে পারাটাকেই রাজকৃষ্ণ রচনার সাফল্যের যথার্থ কষ্টি-পাথর বলে বুঝেছিলেন। নিবিড় সাধনায় লভ্যা সাহিত্যের কলালক্ষ্মীকে তিনি বঞ্চিত করেছেন, কলালক্ষ্মীও তাঁকে অপরিম্লান খ্যাতির অধিকারে বঞ্চিত করেছে। দর্শককে তিনি অলৌকিক বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন, অগভীর ভক্তিভাব পরিবেশন করে তাদের মনোরঞ্জনের প্রয়াসী হয়েছেন, অতিলৌকিকের সঙ্গে ধূলিধূসর বাস্তবের বিসদৃশ গ্রন্থি বাঁধতে চেয়েছেন,—রসাভাস বলে যে একটা বস্তু আছে, তার কথা প্রায়শ ভুলে গেছেন। একপাত্রে অলৌকিক ও লৌকিক রসের পরিবেশন মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু অসাবধান রাজকৃষ্ণ রায় তা করেছেন। এরূপ প্রচেষ্টা অবশ্যই রসহানিকর।

স্বলিখিত নাটকে রাজকৃষ্ণ কদাচিৎ গীতাভিনয়ধর্মিতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন, দেশে দৃঢ়প্রোথিতমূল যাত্রার প্রভাবের বাইরে থাকতে সক্ষম হয়েছেন। তাই, দেখতে পাই, গতানুগতিককে পরিহার করতে পারেন নি তিনি, নাটককে সংগীতে ভারাক্রান্ত করে তুলতে দ্বিধান্বিত হননি, অযথা ভাঁড়ামির দৃশ্য আঁকতে একটুও সংকোচ বোধ করেন নি, নিরর্থক গদ্য-পদ্য-প্রলাপ উচ্চারণে বিরত থাকেন নি। প্রতিভাকে ঠিক পথে পরিচালিত করেন নি তিনি।

রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনায় গদ্য-পদ্যের নিরঙ্কুশ প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই দুই রীতির সংলাপ-ব্যবহারে তিনি নিজেকে ভাবানুভূতির নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছেন বলে মনে হয় না, এখানে লেখকের অদ্ভুত খেয়ালই একমাত্র নিয়ামক। এরূপ অনিয়ন্ত্রিত সংলাপ-সংযোজন-হেতু অনেক স্থলে উদ্দিষ্ট রস যথাযথ পরিস্ফুট হতে পারে নি। নিজের লেখা আভিনয়িক নাটকে 'অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ' অর্থাৎ অসমমাত্রিক অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করে রাজকৃষ্ণ নাটকীয় সংলাপের এলাকাটি প্রশস্ত করে তুললেন। এ জিনিসটারই বহুল প্রয়োগ আমরা দেখি গিরিশচন্দ্রের রচনায়, এবং এটিই পরবর্তীকালে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকের রচয়িতা রাজকৃষ্ণ—রামের বনবাস, হরধনু-ভঙ্গ, তরণীসেন-বধ, প্রহ্লাদচরিত্র, অনলে বিজলী, ঋষ্যশৃঙ্গ, ইত্যাদি। এর মধ্যে **'অনলে বিজলী'** [১৮৭৮] ভালো নাটক—রচনায় স্বচ্ছতা আছে, প্রসাদগুণ আছে। এর মূল নাট্যবস্তু হলো লঙ্কাযুদ্ধের অবসানে সীতার অগ্নিপরীক্ষা। নাটকটি অমিত্রাক্ষর

ছন্দে লেখা হয়েছে। **'প্রহ্লাদ-চরিত্র'**-কে [১৮৮৪] সুখপাঠ্য রচনা বলতে কোনো বাধা নেই। দর্শকরা এর অভিনয় চাক্ষুষ করে প্রচুর আনন্দ পেয়েছে। তবে কোনো-রকম নাট্যিক সংঘাত এতে নেই, দর্শকের চিত্তে ভক্তিভাব উদ্রেক করাই এর লক্ষ্য। **'নরমেধযজ্ঞ'** [১৮৯১] নাট্যে নহুসের স্নেহশীল হৃদয়ের দ্বন্দটি সুন্দর ফুটেছে—আট বছরের একটি শিশুসন্তানকে হত্যা করতে তাঁর মন চায়নি। **'বামনভিক্ষা'**য় বর্ণিতব্য বিষয় বলিকে বামনের ছলনা, এবং দেবদলকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। **'যদুবংশ-ধ্বংস'** [১৮৯৩] নাট্যে যাদবগণের ধ্বংস বর্ণিত হয়েছে।

'মীরাবাই' ও **'হরিদাস ঠাকুর'** সাধক ও ভক্তের জীবনকথার নাট্যরূপ। এ দুটি রচনার মধ্যে 'মীরাবাই' অধিকতর নাট্যগুণান্বিত, এতে ঈর্ষাতুর স্বামী কুম্ভসিংহের হৃদয়দ্বন্দ্বের রূপায়ণ চিত্তাকর্ষক।

রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ঐতিহাসিকতা মোটেই রক্ষিত হয়নি; ইতিহাসরস বলতে যা বোঝায়, এখানে তার নিতান্ত অভাব। লোকশ্রুতিকে ইতিহাসের মর্যাদা অর্পণ করা যায় না। **'বিক্রমাদিত্য'** নাটকে রূপায়িত ঘটনা কিংবদন্তী-মূলক। মানবরস পরিবেশনের দিকে লেখক দৃষ্টি দেননি, দেবতা আর মানুষের মধ্যে সীমারেখা একরূপ মুছে গেছে।

'পাঁচ ঝাঁটা', 'ষোল বছরের পেত্নী', ইত্যাদি নামে দুচারখানা প্রহসনেরও রচয়িতা তিনি। গীতিনাট্যনির্মাণেও হাত দিয়েছিলেন। এ দুই জাতের রচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই।

এই ভেবে দুঃখ হয়, সহজাত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণ রায় উত্তম কোনো নাট্যশিল্পকৃতি রেখে যেতে পারেন নি।

॥ দেশাত্মবোধপ্রাণিত নাটকের আদি-রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥

সত্যিকার একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [১৮৪৯-১৯২৫]—জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীর বহু সুসন্তানের মধ্যে একজন—তরুণ শ্রীরবীন্দ্রের সাহিত্যানুশীলন ও সংগীতসাধনার ক্লান্তিহীন উৎসাহদাতা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'আমার সেই কুড়ি বছর বয়সটাতে···পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। এমনি করিয়া ভিতরে-বাহিরে সকলদিকেই···তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, কোনো বিধিবিধানকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।' বাঙ্‌লা সাহিত্য ও বাঙ্‌লার শিল্প-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক

প্রতিভাবান জ্যোতিরিন্দ্রের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হওয়ার জন্যেই রবীন্দ্রের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি এতখানি অবলীলায় মুকুলিত ও বিকশিত হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভিন্নমান প্রতিভাকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র রবীন্দ্রের সুরের গুরুও বটেন।

বহুগুণান্বিত পুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ভালো গান জানতেন, নাম-করা বাদ্যযন্ত্রশিল্পী ছিলেন, উত্তম অভিনয় করতেন, ছবি আঁকতে পারতেন, দেশি-বিদেশি কয়েকটি ভাষার ওপরে তাঁর বেশ দখল ছিল, সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রবল; আর, তাঁর নাট্যকার-খ্যাতির কথা সকলেরই বিদিত। সুসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন, গানও বেঁধেছেন, ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর আগে ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদে এ দেশের কেউ হাত দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। এদিকে তিনিই প্রথম দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদকর্মে প্রশংসার্হ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট নাটক তিনি বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন। এ ছাড়া, তিনি দুয়েকটি ইংরেজি ও ফরাসী নাটকের, এবং কিছু প্রাকৃত নাটকেরও, অনুবাদক। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর ভূমিকাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাঙলা নাটকের মধ্যভাগের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখ্য একটি স্থান আছে। নতুন ভাবাদর্শের নাটক-প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি—স্বদেশী-ভাবোদ্দীপক নাট্যের আদিস্রষ্টার গৌরব তাঁর প্রাপ্য। প্রহসন-নির্মাণে তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। গীতিনাট্য-রচনার একটি অভিনব আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন। এই আদর্শেরই উৎকর্ষ-সাধিত হয়েছে রবীন্দ্রের গীতিনাট্যগুলিতে। প্রহসন ও গীতিনাট্য ছাড়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চারখানি মৌলিক নাটক লিখেছেন: পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী, এবং স্বপ্নময়ী। চারখানি নাটকই জাতীয়-ভাবাত্মক; এগুলিতে দেশানুরাগের সুর বেজেছে—বিদেশির আক্রমণ প্রতিহত করার ও বিদেশি শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করার কঠিন সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে নাট্যকার ক্ষমার চোখে দেখেননি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন নাটক-নির্মাণে হাত দেন, দেশের প্রাণলোকে তখন স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনা-উন্মাদনা জেগেছে—নব-উদ্বোধিত জাতীয়তার মন্ত্রে ধীরে ধীরে অনেকে দীক্ষা নিচ্ছে। এই জাতীয়-চেতনার প্রেরণায় স্বদেশভক্ত ব্যক্তিরা জাতির লুপ্তকীর্তির উদ্ধারে যত্নবান, দেশের অতীত গৌরব-মহিমা-কীর্তনে উচ্চকণ্ঠ। তখন পরাধীনতার ক্ষোভ দেশানুরাগীর মর্মদেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, জাতিকে কী করে আবার তার পূর্বতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায়, দেশপ্রাণ মনীষী

ব্যক্তিগণ এর উপায় খুঁজে ফিরছেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় স্বাদেশিকতার প্রচার শুরু হয়েছে, 'হিন্দুমেলা'-র অনুষ্ঠানে বিবিধ উপায়ে স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভারতীয় সিপাহীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ শাসক ইংরেজ জাতিকে শঙ্কিত করে তুলেছে, আর, উৎপীড়িত বাঙালি নীলচাষীদের বহুকালের অন্তরনিরুদ্ধ ক্ষোভপ্রসূত গণবিদ্রোহ ঘটে গেছে। এর ফলে চারদিকে তখন দেশপ্রীতির তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। তা স্পর্শ করলো আমাদের সাহিত্যকে—শিল্পকে—রাজনীতিকে, সর্বক্ষেত্রে ধ্বনিত হলো নবীন আশা ও উৎসাহের বাণী। হেম-নবীনের কণ্ঠে শোনা গেলো জাতীয় সংগীত, বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চারণ করলেন 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্র। একই বৎসরে—সেই ১৮৭২ সালে—'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ও ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা স্মরণীয় একটি ঘটনা। সকলের কানে এসে প্রবেশ করতে লাগলো জাতীয় আন্দোলনের উদাত্ত কল্লোলধ্বনি।

সকলেই জানেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করে বাঙ্লাদেশে জাতীয় জাগরণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ঠাকুরবাড়ীর সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনাকে দেশময় তিনি ব্যাপ্ত করে দিতে চাইলেন নাটকের মাধ্যমে। এ এক অপূর্বদৃষ্ট মহৎ প্রয়াস। এবার রঙ্গমঞ্চে কীর্তিত হতে থাকলো ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী, নাট্যমন্দিরে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগলো মধ্যযুগের ভারতীয় দেশপ্রেমিকের সুদীপ্ত শৌর্যগাথা। সদ্য-প্রকাশিত টডের 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' হিন্দুর জাতীয়-চেতনার জাগরণের মস্তবড়ো সহায়ক হয়েছিল। এই স্মরণীয় গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে অনেকেই রাজপুতজাতির বীরত্ব ও আত্মোৎসর্জনের স্মারক ঐতিহাসিক নাটক লিখে গেছেন। এদের পথিকৃৎ হলেন নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশহিতৈষণা ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় রচিত জ্যোতিরিন্দ্রের প্রথম নাটক **পুরুবিক্রম** [১৮৭৪]। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পটভূমিতে আত্মমর্যাদা-সচেতন, তেজস্বী প্রাচীন ভারতীয় রাজা পুরুর বিক্রমপ্রদর্শনই নাটকখানির প্রধান লক্ষ্য। এতে অঙ্কিত পুরুরাজের সঙ্গে সেকেন্দার শাহের উদার বীরধর্মপালনের আলেখ্যটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিক নাটক হলেও 'পুরুবিক্রম'-এ কয়েকটি ঘটনাবর্ণনে ও চরিত্ররূপায়ণে নাট্যকার স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, ইতিহাসের সত্যকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। এ নাটকের শেষদিকে প্রণয় ও প্রণয়ঘটিত ঈর্ষার সংঘাত-সংঘর্ষ প্রাধান্য পেয়েছে—প্রেমের রোম্যান্স ইতিহাসের রোম্যান্সকে আচ্ছন্ন করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রায়-সকল নাটকে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নেমেছে।

বর্তমান নাট্যেও তক্ষশীলের ভগ্নী অম্বালিকা আর কুলু-পর্বতের রাণী ঐলবিলার ভূমিকা প্রেক্ষণীয়। প্রণয়স্বপ্নবিভোর অম্বালিকা একটি ট্র্যাজিক চরিত্র, তার কাহিনীর বিষাদান্ত পরিণতি দর্শকের মনে কারুণ্য জাগায়। ঐলবিলার দেশপ্রীতি ও বীর্যবত্তার সঙ্গে মিশেছে তার হৃদয়লীলা। পুরুর বিক্রম দেখেই পুরুকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন। সেকেন্দারের প্রতি অনুরাগবতী অম্বালিকার প্রেম মিলনে চরিতার্থতা লাভ করেনি, বিজয়োল্লাসী সেকেন্দার তাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকটিতে বীররস ফোটানোই নাট্যকারের অভিপ্রেত, কিন্তু সংলাপের দুর্বলতার জন্যে যথার্থ বীররস কোথাও তেমন স্ফুরিত হয়নি। নাট্যনির্মাণের কৌশল এখনো ঠিক আয়ত্ত করতে পারেননি লেখক।

অপেক্ষাকৃত সুলিখিত নাটক 'সরোজিনী' [১৮৭৫]—চিতোর-আক্রমণের ঘটনা নিয়ে লেখা। পটভূমিতে রয়েছে রাজপুত-ইতিহাস। ছদ্মবেশী মুসলমান ভৈরবাচার্য-চরিত্রটি নির্মাণ করে নাট্যকার চিতোরেশ্বরী চতুর্ভুজার 'ম্যয় ভুখা হুঁ' কিংবদন্তীর একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। আলাউদ্দিনের প্রেরিত এই মানুষটি একটি কুটিল ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেছে, চিতোর রাজ্যে আলাউদ্দিনের অভিযান চালাবার পথটি সুগম করে তুলতে চেয়েছে। অন্যতম প্রধান চরিত্র লক্ষণসিংহ এখানে দুর্বল, ব্যক্তিত্ববিরহিত। কিন্তু তাঁর কন্যাবাৎসল্য ও স্বদেশপ্রেম সুন্দর ফুটেছে। দৈবনির্দেশে তিনি মানসিক দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র নায়িকা-নাম্নী সরোজিনীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব নাটকে খুব বেশি চোখে পড়ে না। নাটকখানিতে প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের 'ইফিগেনিয়া'-র প্রভাব অনায়াসলক্ষ্য। লক্ষ্মণসিংহ-চরিত্রে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাট্যের ভীমসিংহের ছায়াও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এতে কয়েকটি দৃশ্যসংযোজনা নাট্যকলাসম্মত হয়নি। চতুর্ভুজাদেবীর পূজারী ভৈরবাচার্য নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত চরিত্র, ইতিহাসে এরূপ কোনো ব্যক্তির উল্লেখ নেই। এ নাটকে রাজপুতরমণীদের শৌর্য জহরব্রতের বহ্নিশিখাস্পর্শে অতি-ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

প্রতাপসিংহ-মানসিংহের দারুণ সংঘাতের পরিণামকে ভিত্তি করে 'অশ্রুমতী' নাটকের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। এখানে দেশপ্রাণ প্রতাপসিংহের দীপ্যমান বীরত্ব ও অশেষ দুঃখবরণের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত লেখক—সর্বস্ব পণ করে রাজপুতবীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ লড়ছেন স্বদেশের শত্রুর সঙ্গে। কিন্তু তাঁর রাজ্য হারানো ততখানি শোচনীয় ঘটনা নয়, যতখানি শোচনীয় তাঁর নিজ কন্যা অশ্রুমতীর অতি-আত্যন্তিক হীনতা—কৌলিক শুচিতা ও সংগ্রামী পিতার দৃঢ়সংকল্পের কথা ভুলে গিয়ে দেশবৈরী মুসলমান-সেলিমকে হৃদয়দান। গর্বোন্নতশির প্রতাপের বক্ষোদেশে সে অসহনীয়

অপমানের বজ্র হেনেছে। অশ্রুমতীর প্রণয়কাহিনীটিকে মুসলমানের সঙ্গে প্রতাপসিংহের সংঘর্ষের ইতিকথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। অশ্রুমতী রাণা প্রতাপের কল্পিত কন্যা, ঐতিহাসিক উপাদানে এ চরিত্র গঠিত হয়নি। তার উক্ত প্রণয়ানুরাগ যেমন ইতিহাসবিরোধী, তেমনি, হিন্দুর ঐতিহ্যবিরোধী। লেখক নাটকখানিতে দুটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন, কিন্তু এদের একে অন্যের রসপুষ্টির সহায়তা করেনি। নাটকটি দীর্ঘায়তন, বহুদৃশ্য-সংবলিত। একারণে অভিনয়ের পক্ষে উপযোগী নয়। লেখকের অবল্লিত রোম্যান্টিক কল্পনা জাতীয়-ভাবাত্মক 'অশ্রুমতী' নাটকের ঘটনাগত ঐক্য ও রসঘনতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে—ঔরঙ্জীবের রাজত্বকালে—বর্ধমানের তালুকদার শোভা সিংহ বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্রোহ-ঘটনাটি রূপায়িত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চতুর্থ নাটক '**স্বপ্নময়ী**'-তে [১৮৮২]। এতে ঠিক ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশ লক্ষিত হয় না, ঘটনাবিন্যাসেও তেমন কুশলতা দেখতে পাওয়া যায় না। দুয়েকটি চরিত্র চিত্তাকর্ষক হয়েছে, যেমন—রাজা কৃষ্ণরাম, ক্রূরস্বভাব রহিম খাঁ, ছলনাময়ী নারী জেহেনা। এই কয়টি চরিত্রের মনোরম আলেখ্য নাটকখানিকে, রচনা-হিসেবে, একেবারে ব্যর্থ হতে দেয়নি।

সত্যিকার ঐতিহাসিক নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একখানাও লেখেননি। কয়েকটি নাম ও ঘটনা ছাড়া, আর-সমস্তই, লেখকের কল্পনার সৃষ্টি। ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে উৎকৃষ্টতর নাটক লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা জাতীয়-ভাব-উদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

রোম্যান্টিক-কল্পনামিশ্র দেশাত্মবোধমূলক নাটকের ওপরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রহসন-রচনার দিকেও তাঁর চিত্তপ্রবণতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কয়েকটি উপাদেয় প্রহসনের নির্মাতা তিনি। এর পূর্বে মধুসূদন-দীনবন্ধু ভালো প্রহসন লিখে গেছেন। এঁদের রচিত প্রহসনের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রহসনগুলির স্বাদগত পার্থক্য সকলে অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন। এঁরা যে-হাস্যরস পরিবেশন করেছেন তা প্রধানত 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ওল্ড বেঙ্গল'-সমাজের অনাচার-অবিমৃষ্যকারিতা কিংবা তৎকালীন সামাজিক কুপ্রথা, ইত্যাদি, নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু এ ধরণের কোনো বস্তুকে তাঁর প্রহসনের উপজীব্য করেননি; কোনো-একটা নির্দিষ্ট টাইপকে প্রহসনে স্থান না দিয়ে, লোকসাধারণের প্রতিদিনকার জীবন থেকে উপাদান কুড়িয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। কোনোরূপ সমাজসমস্যার দিকে মোটেই তিনি তাকাননি,

ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে গিয়ে সমাজের পঙ্কস্তরে তাঁকে নামতে হয়নি। সুরুচিযুক্ত ব্রাহ্ম-আবহাওয়ায় লালিত বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আপন লেখনীকে সর্বদা এবং সর্বথা শালীনতার শাসনাধীন রেখেছেন। রুচির প্রতি তাঁর সদা-সজাগ দৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। এক্ষেত্রে পরবর্তী লেখকদের একটি নতুন পথে বিচরণের প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি।

জ্যোতিরিন্দ্রের রচিত প্রথম প্রহসনখানির নাম **'কিঞ্চিৎ জলযোগ'** [১৮৭১]। সেকালের ব্রাহ্মধর্মাশ্রয়ীগণের সমর্থিত স্ত্রীস্বাধীনতা-জিনিসটার প্রতি কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ আছে এতে। কিন্তু এ ব্যঙ্গ জ্বালাময় কোথাও নয়। স্বামীর অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা, স্ত্রীর ক্ষণকালীন আতঙ্ক, এবং পরিশেষে ওই ঈর্ষা-সন্দেহের নিরসন, এ প্রহসনের কেন্দ্রীয় ঘটনা। ঘটনাধারার অন্তরশায়ী সরস কৌতুক সকলের উপভোগ্য। দ্বিতীয় প্রহসন **'এমন কর্ম আর করব না'** বা নামান্তরে **'অলীকবাবু'** [১৮৭৭]। রচনাটি কোনো কোনো সমালোচকের উচ্চপ্রশংসা পেয়েছে। এতে লেখকের রসিকতা স্থূলতামুক্ত, সর্বত্র অনুশীলিত রুচির মুদ্রাঙ্কণ চোখে পড়ে। আমাদের কমিক-নাট্যের ইতিহাসে বইখানি পথচিহ্ন-স্বরূপ হয়ে আছে। রবীন্দ্রের মার্জিত রসিকতার পরিচয়বাহী 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষরক্ষা', ইত্যাদি, গ্রন্থের অগ্রদূত বলা যেতে পারে একে। এখানে ঘটনার কৌতুকাবহ বৈচিত্র্য চিত্ত-রোচক, মিথ্যাচারী অলীকের মূর্খতা আর অবাস্তব কল্পলোকবিহারিণী, রোম্যান্সস্বপ্নাতুরা হেমাঙ্গিনীর নির্বুদ্ধিতা প্রহসনকারের পরিহাসের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। তবে এও বলবো, প্রেমাকুলা হেমাঙ্গিনী প্রহসন-জাতের নাট্যকৃতির উপযুক্ত চরিত্র নয়, গম্ভীর-রসের রোম্যান্টিক আখ্যানেই তাকে মানাতো ভালো। **'হিতে বিপরীত'** [১৮৯৬] প্রহসনখানিতে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে ঘটনার অদ্ভুতত্বকে কেন্দ্র করে।

অনুবাদকর্মে জ্যোতিরিন্দ্রের কৃতিত্ব অতীব প্রশংসার্হ। পৃথিবীখ্যাত ফরাসী প্রহসন-নির্মাতা মলিয়ের-এর দুখানি হাস্যরসাত্মক রচনা বাঙ্‌লায় তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন— **'হঠাৎ নবাব'** : ১৮৮১ [মূল নাটিকার নাম 'The Cit Turned Gentleman'], এবং **'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'** ঃ ১৯০২ [মূল নাটিকার নাম 'Marriage Force']। অনূদিত রচনা বলে এক্ষেত্রে অনুবাদকের মৌলিকাতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্যসাধনার পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর মনোভঙ্গি যে প্রগতিধর্মী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সদ্য-কথিত নাটকরচয়িতা-দ্বয়ের অনুবর্তী হয়ে, অংশত ভাববস্তু ও মুখ্যত রচনারীতির ব্যাপারে, বিলাতি নাট্যাদর্শকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন, দেশীয় যাত্রা-অপেরার প্রভাব থেকে স্বকৃত নাট্যকর্মকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। এভাবে, বাঙ্‌লা নাটকলেখকরা যখন বিলাতি নাট্যকলাকে

আয়ত্ত করতে যত্নবান হয়েছেন, তখন নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। গিরিশচন্দ্র ঘোষের অভ্যুদয়ে এবং তাঁর নাট্যাদর্শের ব্যাপক প্রভাবে ইংরেজি ধারার অনুসৃতি সহসা রুদ্ধ হয়ে গেলো। ফলে বাঙ্‌লা নাটকে আমাদের অভ্যস্ত ভাবালুতা প্রশ্রয় পেলো—জীবনরসরসিকতার পরিবর্তে ভক্তিভাবভিত্তিক রসাবেশ নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চবিলাসীদের প্রলুব্ধ করলো বেশি। বাঙালির এই মজ্জাগত ভাবদুর্বলতা গীতিনাট্যেরই উপযোগী, খাঁটি নাটকের নয়। সে যাক্। উৎকৃষ্ট নাটকের স্রষ্টা না হলেও, স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তার উদ্বোধক নাট্যের প্রণেতা-রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

॥ বাঙ্‌লা নাটকের তৃতীয় পর্ব ॥

—বহুখ্যাত নাটকনির্মাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ—

বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের তৃতীয় পর্ব শুরু হলো। এখন বাঙ্‌লা নাট্যশালার মধ্যাহ্নযুগ। এযুগের নেতৃস্থানীয় পুরুষ বা প্রধান মুখপাত্র হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১১]। ইনি বহুমুখী শক্তির অধিকারী—একাধারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গমঞ্চপরিচালক, আশ্চর্য অভিনেতা, সুদক্ষ অভিনয়শিক্ষক, এবং বাঙালির রসজীবনের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। গিরিশচন্দ্রের কীর্তিও বিপুল। য়ুরোপের সেরা নাট্যনির্মাতাদের সঙ্গে হয়তো গিরিশের তুলনা হয় না, তথাপি তাঁকে বাঙালির শেক্‌স্‌পীয়র বলেছেন কেউ কেউ। এরূপ একটি উক্তি এই পর্যন্ত সত্য যে, বাঙ্‌লার ধর্মসংস্কার, ঐতিহ্য, সমাজ-সংসার ও পারিবারিক জীবন, বাঙ্‌লার জাতীয় জীবন ও ইতিহাস—সমস্তই গিরিশ-নাট্যাবলীর উপজীব্য হয়েছে, এবং অদ্যাবধি বাঙ্‌লা নাটক গিরিশের প্রণীত নাটককে ছাড়িয়ে গিয়ে বেশি-কিছু ওপরে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। শিক্ষিতসমাজের কাছে পরবর্তী নাটকপ্রণেতা দ্বিজেন্দ্রলালের সমাদর তুলনায় অধিক; অনেকের মতে তিনিই বাঙ্‌লার সর্বোত্তম নাট্যস্রষ্টা। তাঁর রচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চনাটকীয় প্রেরণার সাক্ষ্য বহন করলেও, ওই রচনার স্থানে স্থানে উন্নততর কলাকৌশলের পরিচয় ফুটলেও, বলবো, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শেক্‌স্‌পীয়র-অনুকরণ সর্বথা সার্থক হয়নি; দেশি পাত্রে বিলাতি পানীয় তিনি পরিবেশন করেছেন, বহুতর মেকি জিনিস দিয়ে দর্শকের মনোহরণ করতে চেয়েছেন, বিস্তর কৃত্রিম পণ্যে নাট্যের পসরা সাজিয়েছেন—বাস্তব-বিরোধী অ-নাটকীয় নাটকও তাঁর কলম থকে বেরিয়েছে।

এদিক থেকে দেখলে, গিরিশচন্দ্র অনেক বেশি আন্তরিক, মেকি জিনিস নিয়ে কারবার তিনি করেন নি। তাঁর রচনায় খাঁটি বাঙালি-মন ও বাঙালি-প্রাণের সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। আর, নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির

বাইরে পা বাড়াননি গিরিশ। আমাদের নাট্যসাহিত্যসংসারে খাঁটি বাঙালি-প্রতিভা বলতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত—সর্বস্তরের বাঙালির শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে তাঁর উদ্দেশে। যথার্থ বাঙ্‌লা নাটক কী জিনিস, তা আমরা বুঝলাম তাঁর নাট্যকৃতির অভিনয় দেখে। একদিকে দেশি যাত্রারীতি, অন্যদিকে, য়ুরোপীয় নাট্যের ভঙ্গি, উভয়ের সমন্বয়ে গিরিশনাট্যনিচয় বিশিষ্টতা লাভ করেছে। বাঙালির হৃদয়ধর্মের রহস্য তাঁর ভালো জানা ছিল; সেই হৃদয়াকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি নাটক প্রণয়ন করেছেন—সামাজিক-পৌরাণিক-ঐতিহাসিক বিচিত্র জাতের নাটক। তার মধ্য দিয়ে যে-রসস্রোত প্রবাহিত, তা বাঙালির হৃদয়তট প্লাবিত করেছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো এমন লোককান্ত নাট্যকার বাঙ্‌লাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। অভিনয়ের গুণে দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের কয়েকখানি নাটক বাঙালি-দর্শকের যতই মনোহরণ করুক, বঙ্গভূমির সংখ্যাতীত নরনারীর প্রাণের তন্ত্রীতে গিরিশচন্দ্র যতখানি ঝংকার তুলতে পেরেছেন, তেমনটি অন্য কেউ নন। বঙ্গরঙ্গালয়ে ও বঙ্গীয় নাট্যে তাঁর প্রভাব যেমন গভীরচারী, তেমনি, দূরপ্রসারী। জাতির ভাব ও ভাবনার ব্যাপক, বিশ্বস্ত রূপায়ণ তাঁর কৃত নাটকে লক্ষিত হয় বলেই কারো কারো ভাষায়—গিরিশচন্দ্র জাতীয় মহাকবি। এরূপ একটি আখ্যাকে অতিকথনপ্রসূত ভেবে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, 'জাতীয় মহাকবি' বলতে এ বোঝায় না যে, গিরিশের নাট্যকর্ম ত্রুটিবিরহিত, সর্বাঙ্গে অনবদ্য; এবং জনপ্রিয়তা, সে যতই অসামান্য হোক, তা দিয়ে নাট্যের চিরন্তন শিল্পমূল্য নির্ধারিত হয় না। 'নাটকের শাশ্বত সাহিত্যমূল্য ততটুকুই, যতটুকু দ্বারা ইহাতে মানবজীবনরস কালদেশাতিশায়ী শিল্পসৌন্দর্য লাভ করতে পারে।' লোকসাধারণের বিশেষ মানসপ্রবণতা কিংবা যুগরুচির কারণে কোনো লেখক জনবল্লভ হলেও—নাট্যের 'এ্যাক্‌শান্‌' ও রূপায়িত চরিত্রগুলা নাট্যকলার গূঢ়তর নিয়মের অনুবর্তী না-যদি হয়, তাহলে সেই লেখকের রচনাচাতুর্য সত্ত্বেও—তাঁর লেখা নিকৃষ্ট, তা সাহিত্যে কিছুতেই স্থায়ী আসন লাভ করবে না। উৎকৃষ্ট নাট্যকৃতি রচয়িতার আত্মভাব-মুক্ত, ওতে চিত্রিত পাত্রপাত্রীরা অত্যন্ত স্বাধীন-স্বভাব, তারা নাটকপ্রণেতার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করে না। গভীরতর কবিকল্পনার কৌশলে এসকল পাত্রপাত্রী নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা কৌতুহলী দর্শকগোষ্ঠীকে এমন একটি অনির্বাচ্য ভাবরসে অভিভূত করে, যার ফলে প্রেক্ষাগৃহে সমাগত দর্শকজন, অন্তত ক্ষণকালের জন্যে, সমস্ত লৌকিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে যায়, ব্যাখ্যার অতীত এক বৃহত্তর উচ্চভূমির বাসিন্দা হয়ে ওঠে। এখানেই উত্তম নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত। ভালো নাটক মনুষ্যভাগ্যের

দুজ্ঞের্য় রহস্যকে চাক্ষুষ করায়, দৈবের সঙ্গে মানবের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করে তোলে, ভিন্নমুখী চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব ফোটায়। বনেদি নাটকের এসব কুললক্ষণ গিরিশচন্দ্রের রচনায় কতখানি মেলে তা আমরা একটু পরে দেখবো।

গিরিশচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৪ সালে। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অভিনেতারূপে যোগ দেন। কিছু পরে নাট্যরচনায় প্রণোদিত হয়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে থাকেন। নাটকরচয়িতার ভূমিকায় কখনো অবতীর্ণ হবেন এ বোধকরি গিরিশ নিজেও জানতেন না,—দায়ে পড়ে তিনি নাট্যপ্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। অভিনয়ের উপযোগী ভালো বই যখন পাওয়া গেলো না, তখন তিনি নিজে নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হলেন। এ না করলে রঙ্গালয়ে অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যনির্মাণ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, অভিনয়ের মাধ্যমে লোকরঞ্জনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। নাটক পড়তে কেমন লাগবে, তার বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একেবারেই ভাবতেন না, দর্শকদের চিত্তরোচক হবে কিনা, সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। সুদক্ষ নট গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-বিদ্যাই তাঁর নাটককে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঘটনাবৃত্ত কেমন করে সাজালে, পাত্রপাত্রীদের মুখে কীরূপ সংলাপ বসালে, কী ধরণের দৃশ্যের অবতারণা করলে, নাট্যমঞ্চে অভিনয় জমবে, সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী গিরিশ তা খুব ভালো বুঝতেন। রচনার যা-কিছু ত্রুটি, সমস্ত ঢাকা পড়তো অভিনয়ের গুণে। উত্তম বলতে পারা যায়, এরূপ পাঠ্যনাটক [Reading Drama] গিরিশচন্দ্র একখানিও লেখেননি। স্থায়ী সাহিত্যিক মর্যাদা পাবার মতো নাট্যকৃতি বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, ভক্তিরসাত্মক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নাট্যরচনার অজস্র বর্ষণে রঙ্গালয় ও বঙ্গের শ্রোতাদের রসসিক্ত করে তুলেছিলেন অভিনেতা-নাটকলেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মোটামুটি ১৮৮০ সাল থেকে ১৯১০-১১ সালে তাঁর মৃত্যুবৎসর পর্যন্ত তিনি নাটকরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং আশিটির বেশি বিচিত্র স্তরের নাটক লিখে যান। এই সময়ে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং দুয়েকটি রঙ্গালয় গঠন করেন—ন্যাশনাল ভেংে গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতির উদ্ভব হয়। প্রতিভাধর গিরিশ বাঙ্‌লার রঙ্গালয়ে যুগান্তর ঘটিয়েছেন বললে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁর গৌরবময় অভ্যুদয়ে ও প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টায় এদেশে নাট্যান্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌছয়।

বিভিন্ন স্তরের নাটক প্রণয়ন করলেও গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার দীপ্ত স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় পৌরাণিক ও ভক্তিভাবমূলক নাট্যে। সমগ্রভাবে দেখলে পৌরাণিক নাটক-

নির্মাণেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রকে নতুন যুগের উপযোগী করে গিরিশচন্দ্র বাঙলার দর্শকগোষ্ঠিকে উপহার দিলেন। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগেই গিরিশ নাটক লেখায় হাত দেন। তিনি জানতেন, জাতির মর্মস্পর্শ করতে হলে ধর্মাশ্রয়ণ ছাড়া উপায় নেই। দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলেই দেশবাসীর হৃদয় জয় করতে তাঁকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। এখানে-ওখানে শেক্‌স্‌পীয়রের অনুসৃতি লক্ষিত হলেও, তাঁর নাটকের স্পষ্টরেখ বৈশিষ্ট্য ধর্মভাবের প্রবলতা ও নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতি উগ্র প্রবণতা। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাভব, পরার্থে আত্মোৎসর্জন, সত্যনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য, প্রভৃতি বস্তু তাঁর পৌরাণিক নাট্যের বৃহত্তম অংশ জুড়ে বসেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে অধ্যাত্ম-ভাবুকতায় প্রাণিত হয়েছিলেন তিনি ; বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট-সান্নিধ্য তাঁকে প্রেম ও সেবাধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। তাঁর নাট্যের কয়েকটি চরিত্রে এ দুজন মহামানবের জীবনাদর্শের প্রভাব গভীর রেখায় অঙ্কিত। গিরিশের কৃত মহাপুরুষ সম্পর্কিত রচনাগুলি অনেকটা ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকের সমধর্মী। ভক্তিধর্ম-প্রচারকল্পেই তিনি ভারতবর্ষের সাধু-ভক্ত-মহাপুরুষদের পুণ্যজীবনকথা নাট্যাকারে গ্রথিত করেছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে তৎকালীন প্রচলিত যাত্রার প্রভাব রয়েছে। এই শ্রেণীর নাটক গিরিশের হাতে একটি বিশিষ্ট রূপমূর্তি লাভ করেছে।

পৌরাণিক চরিত্রগুলির মুখে বসানো হয়েছে অনিয়মিত অমিত্রাক্ষর পদ্যভাষা। পদ্যে গ্রথিত সংলাপ আবেষ্টনী-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। এরূপ নাট্যোক্তি পাঠকের মানসদৃষ্টিকে দূর কালের অভিমুখীন করে তোলে—অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। গিরিশ-চন্দ্রের প্রযুক্ত পদ্যবাহিত নাট্যসংলাপ আমাদের মনকে বর্তমানের গণ্ডী থেকে অতীতের দিকে টানে বটে, কিন্তু তেমন সুরচিত নয় বলে এতে কলাশ্রী প্রায়শ ফোটে নি, বাক্য-সৌন্দর্য বড়ো একটা মেলে না। ভক্তিবিহ্বলতাকে তিনি নাট্যকলার সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন নি।

বাঙালিচিত্তে জাতীয়তা ও দেশপ্রীতি জাগানোর উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র ইতিহাসকে পটভূমিতে রেখে কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। এই স্তরের নাটকগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে ইতিবৃত্তে বর্ণিত ঘটনার প্রতি নিষ্ঠা, ইতিহাসের বৃত্তান্তকে কোথাও তিনি বড়ো-একটা বিকৃত করেন নি, নিজের কল্পনাকে স্বেচ্ছাবিহারিণী করে তোলেন নি। স্বাদেশিকতা ও জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাময় দিনগুলিতে এসকল নাটকের সৃষ্টি। জাতিবৎসল নাট্যকার দেশমাতৃকার অহ্বানে সাড়া দেবেন এ তো স্বাভাবিক। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলিতে পরজাতিনির্জিত স্বদেশের অজস্রবিধ দুর্গতি-লাঞ্ছনা-লজ্জা-অপমানের কথা

আবেগস্পন্দিত ভাষায় বিবৃত হয়েছে ; পরাধীন ভারতবর্ষের যে-সকল সন্তান দেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে তেজোদৃপ্ত শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে, নাট্যকার তাদের চরিত্রগৌরব কীর্তন করেছেন। এদের চরিত্ররূপায়ণে অতিরঞ্জন অনায়াসলক্ষ্য।

কিছু সামাজিক নাটকও লিখেছেন গিরিশচন্দ্র। এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর সঞ্চরণ সাবলীল মনে হয় না। বস্তুতন্ত্রীয় নাট্যভাবনা, বোধ করি, গিরিশের মানসপ্রকৃতির অনুকূল ছিল না। তা ছাড়া, রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে অধ্যাত্মভাবুকতার জগতে বিচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, সকলকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শোনাতে ভালোবাসতেন। তথাপি, যেহেতু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর জীবিকার প্রশ্নটি জড়িত, সেহেতু নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, এবং দর্শকদের চাহিদার কথা ভেবে, সামাজিক নাট্যরচনায় হাত দিতে হয়েছে তাঁকে। গিরিশনাট্যে প্রতিফলিত 'সমাজ' বলতে সেকালের শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণী—যারা চাকুরিনির্ভর, জীবন যাদের বহুসমস্যায় কণ্টকিত। এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন, নিম্নমধ্যবিত্তসমাজের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র মোটামুটি ভালোই এঁকেছেন। কলকাতার একেবারে নীচুর তলার মানুষ গিরিশের নাটকে, বলতে গেলে, স্থান পায়নি। সে-যুগের সাহিত্যে এরা তখনো মাথা তোলেনি। অবশ্য দুয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। দুঃস্থের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। সামাজিক নির্যাতনের আলেখ্য তিনি গাঢ় রেখায় আঁকতেন। উদ্দেশ্য, লোকে এসব নির্যাতিত মানবমানবীকে চাক্ষুব করুক, চাক্ষুষ করে তাদের দুঃখলাঞ্ছনার প্রতিকারের উপায় খুঁজে নিক। সামাজিক নাটকে গদ্যসংলাপ লক্ষণীয়, যেমন লক্ষণীয় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার—যার নাম-পরিচয় 'গৈরিশ ছন্দ'।

নাট্যমঞ্চ ও নাট্যকর্মকে গিরিশচন্দ্র লোকশিক্ষার বাহন করে তুলেছিলেন, কেবল নাট্যামোদীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে দুয়েকখানি-মাত্র নাটক লিখেছেন তিনি, প্রহসন জাতীয় রচনা এগুলি। নাট্যমঞ্চের প্রমোদের মধ্য দিয়ে জাতিকে তিনি ধর্মকথা শুনিয়েছেন, তার সমক্ষে সনাতন ভারতবর্ষের ধর্মসম্পদ তুলে ধরেছেন, তাকে ভারতীয় সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু করে তুলেছেন। ধর্মপ্রাণ বাঙালির ধর্মপিপাসার তৃপ্তিবিধানের জন্যেই তিনি পৌরাণিক নাটকগুলি লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকনির্মাণের প্রেরণা ছিল জাতির চিত্তে দেশানুরাগের সঞ্চার, এবং সামাজিক নাটকনিচয় সমাজসংস্কারের অভিপ্রায়েই রচিত।

গিরিশনাট্যাবলীর অধিকাংশ সৃষ্টিমূলক সাহিত্য হয়ে ওঠেনি, একথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু একসময়ে এগুলি লোকসাধারণের বিপুল সমাদর লাভ করেছিল—

রঙ্গমঞ্চের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যে দুহাতে তিনি নাটক লিখে গেছেন। উৎসবশেষে মৃৎপ্রদীপগুলো অবহেলায় কোথায় হারিয়ে যায়, কেবল তৈজস প্রদীপগুলোই সযত্নে রক্ষিত হয়। গিরিশনাট্যের আঙিনায় এরকম কিছু তৈজস প্রদীপ নিশ্চয়ই আছে, সেগুলোকে মর্যাদা দিতেই হবে।

* * *

এবার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রথমে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের কথা।

মনমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ লেখকরা গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বহুসংখ্যক গীতাভিনয় লিখে সেই সময়কার দর্শকগণের মনে অতি সহজে ধর্মবোধ জাগিয়েছেন। এসব রচনা ঠিক নাট্যগুণান্বিত নয়, প্রধানত যাত্রাধর্মী। এগুলির মঞ্চসাফল্য দেখে গিরিশ বুঝে নিয়েছিলেন, ধর্মতৃষ্ণা জনচিত্তে প্রবল—সাধারণ নরনারীর মর্মস্পর্শ করতে হলে ধর্মভাবকেই মুখ্য নাট্যবস্তুরূপে গ্রহণ করতে হবে। এরূপ একটি অভিজ্ঞতা তাঁকে পৌরাণিক ও ভক্তি-রসাত্মক নাটক-রচনায় প্রণোদিত করেছে। তখন, তিনি পৌরাণিক বিষয়ের দিকে ঝুঁকলেন, মহাপুরুষদের লীলাজীবনকে নাটকে বাণীরূপ দিলেন।

গিরিশের প্রণীত পৌরাণিক নাট্যে বিষয়বস্তুগত কোনো মৌলিকতা নেই। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি সর্বজনের সুপরিচিত গ্রন্থ থেকেই নাটকের কাহিনী তিনি আহরণ করেছেন, কোনো ঘটনা বা আখ্যানের রূপান্তর ঘটাননি, কিংবা অভিনব মনোভঙ্গির আলোকসম্পাতে পুরাণে বর্ণিত কোনো চরিত্রকে নবীকৃত করেননি; এগুলিকে তাঁর উদ্দেশ্যের অনুযায়ী করে তুলেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর নাটকে মানবজীবনঘটিত কোন সমস্যা নেই, আখ্যানে নাটকীয় দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের চিত্র সাধারণত অপ্রাপ্তব্য। এদিক থেকে দেখলে, যাত্রার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি নাট্যকার। নাটকে তিনি দেবমাহাত্ম্য প্রচার করেছেন, ধর্মভাব পরিবেশন করেছেন, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে না তাকিয়ে ভক্তিভাবের কাছে অবশে ধরা দিয়েছেন। তাছাড়া, অলৌকিক, অপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণায় তাঁর অরুচি নেই, সকল রসের মধ্যে ভক্তিরসকেই সারবস্তু বলে জেনেছেন, দেবতার নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে অব্যাহত রেখে মানুষের স্বাধীন সত্তার বিকাশে বাধা দিয়েছেন। একারণে গিরিশের লেখা পৌরাণিক নাটক যাত্রার লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে। এগুলিতে মানবরসের স্ফুরণ কদাচিৎ চোখে পড়ে, এসব রচনা মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে বড়ো একটা কৌতূহল জাগায় না। বর্তমান নাটকলেখকের রচিত মহাপুরুষদের জীবনলীলা-বিষয়ক নাট্যরাজিতে মানবিকতার স্পর্শ তেমন নেই, অলৌকিকতার নীচে তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব একরূপ চাপা পড়েছে। ধর্মভাব

জাগানো আর ভক্তিরস উদ্রিক্ত করাই যেখানে আসল লক্ষ্য, সেখানে মানুষের পার্থিব জীবনের কাহিনী প্রাধান্য পেতে পারে না, এ বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। তবে গিরিশের কৃতিত্ব, বিদূষক-জাতীয় দুয়েকটি নতুন চরিত্রের অবতারণা, সংলাপ-গ্রন্থনে অভিনব একটি নাটকীয় ছন্দ, স্বল্প-সংখ্যক ভূমিকায় অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রণ তাঁর পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লেখা নাট্যকে একেবারে 'যাত্রা' হয়ে পড়তে দেয়নি।

তাঁর পৌরাণিক নাটক সংখ্যায় বহু। গিরিশচন্দ্রের খ্যাতির প্রধান প্রতিষ্ঠাভূমি হলো এই শ্রেণীর নাট্যরাজি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে প্রণীত হয়েছে রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক। এগুলিতে রামায়ণী কথাই নাটকাকারে গ্রথিত—চরিত্রসৃষ্টিতে কিংবা ঘটনা-সংস্থাপনে কোনোরূপ নতুনতা দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে লেখক কবি কৃত্তিবাসের অনুগামী—কাহিনীবৃত্তে, ভাবে, ভাষায়। এদের দুয়েকটিতে কিঞ্চিৎ মৌলিকতা ফুটেছে। 'রামের বনবাস'-এ কঞ্চুকী-চরিত্রটি লক্ষ্য করবার মতো। এ হাস্যরসাত্মক একটি চরিত্র। শূর্পণখাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাম-চরিত্রে পৌরুষ-বীর্যের দীপ্তি নেই। সীতা যেন বাঙালি-ঘরেরই মেয়ে—কোমলতা ও কারুণ্যের আধার।

অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জনা, পাণ্ডবগৌরব, প্রভৃতির ঘটনাবস্তু কাশীদাসী মহাভারত থেকে সমাহৃত। অভিমন্যু-বধ একদিকে বীররসাত্মক, আবার, কারুণ্যে সিক্ত। নাটকটি বিয়োগান্ত। দর্শকচিত্তে এর আবেদন কম নয়। গিরিশের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বিখ্যাত হলো 'জনা' ও 'পাণ্ডবগৌরব'। 'জনা' নাটকে জনা-র চরিত্র-চিত্রটি গিরিশচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভার নিদর্শন। অবশ্য, এক্ষেত্রে নাট্যকার কবি মধুসূদন দত্তের কাছে কিছুটা ঋণী। বীরাঙ্গনা-কাব্যে বর্ণিত জনা-র চরিত্র-কল্পনায় মধুসূদন যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই বীরাঙ্গনা নিশ্চয়ই গিরিশের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বীরপুত্র প্রবীরের মৃত্যুর পর শোকাতুরা মাতা জনা-র প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপটি গিরিশচন্দ্রের নতুন অঙ্কন। নাটকখানিতে চিত্রিত বিদূষক-এর চরিত্রটির বাইরে হাস্যরসরসিকতা, অভ্যন্তরে ভক্তিভাবাকুল ধার্মিকতা—এই দ্বৈতভাবের চিত্র তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য হরিভক্তিপ্রচার। নাটকের কূটস্থ চরিত্র বিদূষক-এর দ্বারাই এ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। বলতে গেলে, অপূর্ব চরিত্র বিদূষকই 'জনা' নাটকখানিকে অদ্যাবধি বাঁচিয়ে রেখেছে। 'পাণ্ডবগৌরব'-এর নায়ক ভীম। ভীম আশ্রিতরক্ষণধর্ম পালন করতে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধেও পরাঙ্মুখ হননি। আবার, এর মধ্যেই কৃষ্ণ ভক্তের চরিত্র পরীক্ষা করে ভক্তকে বিজয়ী করে দিলেন।

দক্ষযজ্ঞ, শ্রীবৎস-চিন্তা, নল-দময়ন্তী, প্রভাস-যজ্ঞ প্রভৃতি রচনাও পৌরাণিক নাটকের

পর্যায়ভুক্ত। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'কমলে-কামিনী।' এগুলিতে উল্লেখ করবার মতো বিশেষত্ব কিছু নেই।

অবতার বা মহাপুরুষ নিয়ে রচিত নাটক—চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস, বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেবচরিত, শংকরাচার্য, প্রভৃতি। এগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে নতুন ধর্ম-ভাবুকতার প্রভাবে রচিত। বিল্বমঙ্গল এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এগুলোর প্রায়-প্রত্যেকটিতে ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন। তবে 'শংকরাচার্য' নাটকে দুরূহ-তত্ত্ব-আলোচনা বড়ো একটি স্থান অধিকার করেছে। এতে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। তাত্ত্বিকতার অতিরেক বর্তমান রচনার নাট্যধর্মের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়েছে। 'চৈতন্যলীলা'-য় শ্রীচৈতন্যের মানব-রূপটি অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। 'নিমাইসন্ন্যাস' চৈতন্যলীলার দ্বিতীয়ার্ধ যেন। এতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্তী ঘটনা গ্রথিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের উল্লেখনীয় সৃষ্টি 'বিল্বমঙ্গল'। একে ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক নাট্যের স্তরে বিন্যস্ত করতে হয়। এই শ্রেণীর নাটকে গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক-ব্যাকুলতাময় আত্মজীবনের ছায়াপাত দেখা যায়। 'বিল্বমঙ্গল'-এর আখ্যানকে লেখকের আত্মকাহিনী বলা যেতে পারে। রামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-প্রভাবে ভোগাসক্ত গিরিশের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিল; তেমনি, ভগবানের অহৈতুকী করুণাবর্ষণে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর আর চিন্তামনি-চরিত্রে আশ্চর্য রূপান্তর দেখা গেলো। ভক্তমালের কাহিনীর সঙ্গে সাধু সুরদাসের কাহিনী মিশিয়ে, এবং তার সঙ্গে নিজের মানসিক ব্যাকুলতা মিশিয়ে, গিরিশ যে 'বিল্বমঙ্গল' লিখলেন, তা ভক্তজীবনের অনুপম নাট্যচিত্র। এ প্রেম ও বৈরাগ্যভাব-বিজড়িত নাটক; মানবীয় প্রেম কীভাবে ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় প্রেমের স্বর্গে উত্তীর্ণ হয়, নাটকখানিতে বিধৃত প্রেমতত্ত্বে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। এখানে আসক্তিরক্তিম মর্তপ্রেম ও ভক্তিসিক্ত শুভ্রভাস অমর্তপ্রেমের সেতুবন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-ধর্মপথের সাধক বিল্বমঙ্গলের অন্তর্দ্বন্দ্বের চমৎকার রূপায়ণে এতে নাটকীয় রস সঞ্চারিত হয়েছে, বিভিন্ন ধরণের চরিত্রালেখ্য বৈচিত্র্যের স্বাদ বহন করছে। পার্থিব আকুতি ও অধ্যাত্মচেতনার সমাবেশহেতু নাটকটি সজীব সরস হয়ে উঠেছে। এতে সংলাপের ভাষাও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। অসাধারণ কোনো নাট্যকৌশল হয়তো এতে নেই, কিন্তু রচনাহিসেবে একে নিকৃষ্ট বলে কেউ উপেক্ষা দেখাতে পারবেন না। এর চেয়ে ভালো ভক্তিতত্ত্বমূলক নাটক গিরিশচন্দ্র লেখেননি।

আরো কয়েকটি ভক্তিরসাশ্রিত নাটকের নাম: করমেতিবাই, পূর্ণচন্দ্র, নসীরাম, বিষাদ, কালাপাহাড়। ভক্তিবিহ্বলতা ও ধর্মভাবের উচ্ছ্বাস এগুলিকে খাঁটি নাটকের

মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট করেছে। এগুলির কোনো-কোনোটাতে ঐতিহাসিক সূত্র থাকলেও ভক্তিভাবুকতার অনিয়ন্ত্রিত প্লাবনে তা একরূপ মুছে গেছে। 'বুদ্ধদেব-চরিত'-এ মহামানব বুদ্ধ নারায়ণের অবতার-মূর্তি হয়ে উঠেছেন। এসব রচনাকে উঁচুদরের নাট্যকর্ম বলা যাবে না।

অতঃপর সামাজিক নাটকের কিঞ্চিৎ পরিচয়কথন।

কয়েকখানি সামাজিক নাটক গিরিশের কলম থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু এগুলি নির্মাণের প্রেরণা যতখানি বহিরঙ্গ, ততখানি অন্তরঙ্গ নয় বলেই আমাদের ধারণা। লেখকের লোককল্যাণকামনাকে অবশ্য কিছুটা অন্তঃপ্রেরণা বলা যেতে পারে। আসল কথা, সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক লিখতে গেলে যে-ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, গিরিশচন্দ্রের তা ছিল না। এরূপ অভিজ্ঞতার অভাবের কারণ হলো, কলকাতার মধ্যবিত্তসমাজের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই তাঁর অবস্থান। আর, সমাজসমস্যা বিষয়ে বেশি ভাবেননি তিনি, প্রগতিপন্থী মানসিকতার লক্ষণীয় পরিচয়ও দেননি, প্রায়শ রক্ষণশীল মনোভাবের ধারক ও বাহক রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। ধর্মাদর্শ গিরিশের মনোজগৎকে এতখানি আচ্ছন্ন করেছিল যে, সামাজিক ও ইতিবৃত্তমূলক নাটকেও ধর্মভাবকে টেনে এনেছেন। ফলে এদের বাস্তবতার রঙ ফিকে হয়ে গেছে। বস্তুতন্ত্রী রচনার পক্ষে এ নিন্দারই কথা। বাস্তববাদী সমালোচকেরা নির্দ্বিধায় বলবেন, উত্তম সামাজিক নাটক একখানিও লেখেন'ন গিরিশচন্দ্র—তাঁর প্রতিভার স্বধর্ম একটি মাত্র ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে—তা হলো রামায়ণ-মহাভারত-আদি পুরাণের সংসার, যেখানে বাস্তবের কঠিন দাবি অনুপস্থিত। সামাজিক নাটককে বস্তুনিষ্ঠ হতেই হবে। কিন্তু রিয়্যালিস্টিক রচনার প্রতি গিরিশ কেমন একটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর মুখে শুনতে পাই: 'এসব realistic বিষয়ে নাটক লেখা আর নর্দমা ঘাটা এক!' কথাগুলি থেকে বুঝতে পারা যাবে, সমাজসমস্যা-বিষয়ক নাটক যদিচ তিনি লিখেছেন, সেগুলিতে তাঁর নাট্যকার-সত্তার পূর্ণ জাগরণের সাক্ষ্য যেন মেলে না।

গিরিশের প্রণীত বহুপ্রশংসিত সামাজিক নাটক—'প্রফুল্ল' [১৮৮৯]। রচনাটি বিয়োগান্ত। একান্নবর্তী একটি বাঙালি-পরিবারের শোচনীয় বিপর্যয়ের চিত্র এতে উন্মোচিত। একদিকে বিষয়বুদ্ধিহীনতা, অন্তরের ঔদার্য, আদর্শবাদপ্রসূত আত্মাভিমান ও অত্যধিক সুরাসক্তি, অন্যদিকে, অর্থলোভে শঠতার জাল বিস্তার করে পরস্বাপহরণের ঘৃণ্য প্রয়াস 'প্রফুল্ল'-কে করুণরসাত্মক করে তুলেছে। একটি সাজানো বাগান দেখতে

দেখতে কেমন করে শুকিয়ে গেলো, এ নাটক সেই দুঃখময় ঘটনারই দৃশ্য-রূপ। বাগানটি রচনা করেছিলেন উদারপ্রাণ যোগেশ, আর, তা অচিরে শুকালো ঘোরতর স্বার্থসর্বস্ব, মনুষ্যত্ববিবর্জিত রমেশের বিষশ্বাসস্পর্শে। বাগান শুকিয়েছে, কয়েকটি মনোরম ফুল ধুলায় লুটিয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক চক্ষুবিনোদন ফুলটি হলো প্রফুল্ল। মৃত্যুর করুণতম আলেখ্য এঁকেছেন নাট্যকার, এবং সেই শোকাবহ দৃশ্য উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে যোগেশ। 'প্রফুল্ল' নাটকখানি প্রধানত যোগেশেরই ট্র্যাজেডি।

প্রফুল্লর নামে নাটকের নামকরণ করা হলেও ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী সে নয়, চরিত্রটিকেও সুপরিণত বলা চলে না। কাজেই, নাট্যের নামকরণ ত্রুটিযুক্ত। প্রকৃতিস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ যোগেশের অবিরত মদ্যপান বিরক্তিকর। তার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ প্রত্যাশিত, কিন্তু লেখক দ্বন্দ্বময় সেই মনোজগতের আলেখ্য-অঙ্কন-বিষয়ে মনোযোগী হননি। নাটকটিতে প্রকৃত দুঃখের চেয়ে দুঃখের বিলাসই যেন বেশি। এতে করুণ রস আছে, ট্র্যাজেডির গম্ভীর মহিমা কিন্তু অপ্রাপ্তব্য। সংলাপ-রচনায় লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—যার মুখে যে-ভাষাভঙ্গি স্বাভাবিক, তা-ই বসিয়েছেন। অতিশায়িত দুঃখ, অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন, চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব, সহজ মৃত্যুর দ্বারা ট্র্যাজেডি ঘটানো, প্রভৃতি বস্তু এই নাটকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে দেয়নি।

লোকশিক্ষার জন্যেই 'প্রফুল্ল'-র মতো নাটকের সৃষ্টি। একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে গিরিশ লিখলেন 'মায়াবসান'—নৈতিক-উৎকর্ষ-সাধনই এই শ্রেণীর নাটক-নির্মাণের মূলগত প্রেরণা। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাপের শোচনীয় পরিণাম এতে দেখানো হয়েছে; নিষ্পাপের নির্যাতন, নিরীহের লাঞ্ছনার চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে পাপকর্মের প্রতি ঘৃণা উদ্রেকের প্রয়াসী হয়েছেন নাটকরচয়িতা। 'মায়াবসান'-এ পাপকলুষিত জগৎটি যেমন চিত্রিত, তেমনি, মানবসমাজে মনুষ্যত্ব এখনো টিঁকে আছে, এ দেখে মানুষ নীরন্ধ্র অন্ধকারেও ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পায়—এই সত্যটিও আভাসিত। পুরুষ অমানবীয়তার গভীর পঙ্কে ডুবে গেলেও বাঙালিঘরের নারী মনুষ্যত্বের দীপটিকে অনির্বাণ রেখেছে—এ হলো নাট্যকারের প্রসন্ন অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া, গিরিশচন্দ্র এও বিশ্বাস করেন, সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানবমানবীর ন্যায় অতখানি নীতিভ্রষ্ট নয় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলো।

চতুষ্পার্শ্বের জঘন্য দুর্নীতির রাজ্যে নৈতিক দৃঢ়তার ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন কালীকিংকর—আদর্শবাদী পুরুষ তিনি। কিন্তু ভারসাম্যের অভাবে কালীকিংকর উৎকেন্দ্রিক একটি চরিত্র, পৃথিবীতে কেবল দুঃখই ভোগ করে। ব্যবহারিক জগতের বুদ্ধি মোটেই তাঁর ছিল না। আপনার চরিত্রে ট্র্যাজেডির বীজ তিনি বহন করে চলেছেন।

এ নাটকে লেখক সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়, ঘোষণা করেছেন। রিয়্যালিস্টিক চরিত্রের দেখা এখানে বড়ো- একটা মেলে না। নারীচরিত্রগুলা নিঃসন্দেহে আইডিয়্যালিস্টিক। গোটা নাটকখানিও অনেকটা যেন তাই। সর্বত্র ধর্মকথা ও নীতিবাক্যের প্রগল্‌ভ আত্মপ্রকাশ—দীর্ঘায়ত নাট্যোক্তির মাধ্যমে। এ জিনিস দর্শকসাধারণের কাছে বিরক্তিকর না হয়ে পারে না। প্রেক্ষাগৃহে প্রমোদ আর সৎশিক্ষা যাঁদের অভিলষিত, 'মায়াবসান'-এর অভিনয় দেখে তাঁরা অবশ্য খুশি হবেন। রচনাটির সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য : নাটকীয় উৎকর্ষ কিছুই এতে নেই।

কন্যাদায়সমস্যা নিয়ে **'বলিদান'**-নাটকখানি [১৯০৫] রচিত। বাঙালি-সমাজে এ সর্বকালীন একটি সমস্যা। কন্যাকে বিবাহ দিয়ে অনেক পিতা পথে বসেছেন। এদেশের মেয়েদের মন্দভাগ্য—পিতৃগৃহে ও শ্বশুরালয়ে তাদের অনিঃশেষ অশান্তি, প্রতিনিয়ত বহুতর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। দুর্দশা কেবল কন্যার নয়—পিতারও। বিবাহযোগ্যা কন্যার সমস্যাটি অদ্যাপি সমাধানহীন ; কোন্ পথে এর প্রতিকার, কেউ বলতে পারেননি। 'বলিদান'-এ নাট্যকারের প্রগতিমুখী মনোভাবের পরিচয় মেলে। পিতা করুণাময়ের চরিত্র ভালো ফুটেছে। নারীচরিত্র-অঙ্কনে লেখক দক্ষতা দেখিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে শাস্ত্রকথিত সতীধর্মের মহিমা সর্বদা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত, বর্তমান নাট্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সমস্যার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে নাটকলেখক ঘটনাধারাকে ট্র্যাজেডির খাতে চালিত করেছেন। কিন্তু খাঁটি ট্র্যাজেডির রস পরিবেশন করতে তিনি পারেননি।

'শাস্তি কি শান্তি' [১৯০৮] সমস্যামূলক নাটক। বাঙালিঘরের বিধবাসমস্যা এর উপজীব্য। আমাদের দুরদৃষ্টলাঞ্ছিতা বিধবা নারীকে গিরিশ সহানুভূতিসম্পন্ন মানবিক দৃষ্টিতে দেখেননি। বিধবাদের বুকের বেদনাকে তিনি বুঝতে চাননি, তাদের হৃদয়দৌর্বল্যকে ক্ষমা করেননি, পুনর্বিবাহকে সমর্থন জানাতে পারেননি। এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল, মানবিকতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন শাস্ত্রের অকরুণ বিধানকে—এখানে মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের মহৎ প্রয়াসের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন, দেখতে পাই। 'বলিদান'-এর লেখক উচ্চতর মানবনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু একই ব্যক্তি 'শাস্তি কি শান্তি'-তে মমতাবর্জিত নীতিশাস্ত্রের প্রচারক হয়ে উঠেছেন, বিধবা রমণীকুলের সমক্ষে তুলে ধরেছেন কৃচ্ছ্রতা ও ব্রহ্মচর্য-সাধনের নির্দয় আদর্শ। বিধবার চিত্তদুর্বলতা নাট্যকারের চোখে ক্ষমার অযোগ্য একটি অপরাধ, এবং এজন্যে তিনি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ নাটকের বিষাদান্ত পরিণতি ঘটানো হয়েছে, আর্টের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। আর্টিস্ট নীতিপ্রচারণার দিকে ঝুঁকলে সাহিত্যকর্মে শিল্প-সৌন্দর্য ফুটতে পারে না, অস্বাভাবিকতা মাথা তুলে অনিবার্যতার পথরোধ করে দাঁড়ায়।

গিরিশের আরো দুয়েকটি সামাজিক নাটক আছে, যেমন—'হারানিধি', 'গৃহলক্ষ্মী', ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য নাট্যবৈশিষ্ট্য এগুলিতে তেমন কিছু নেই। তাঁর রচিত সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল' এবং 'বলিদান'-ই প্রসিদ্ধ।

ঐতিহাসিক নাটকেরও স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র। ইতঃপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এই শ্রেণীর নাটকের মাধ্যমে দেশবাসীর চিত্তে জাতীয় ভাব জাগিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন। এরপর সনাতন হিন্দুধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দুর প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি লোকসাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াতে জাতীয়তার উদ্দীপনায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে, ধর্মাদর্শকে নিয়ে লোক মেতে থাকে। এহেন পরিবেশে ঐতিহাসিক নাটক নির্মিত হতে পারে না। কিন্তু বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অকস্মাৎ হাওয়া বদল হলো, বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের সর্বত্র স্বাদেশিকতার উত্তেজনা-উন্মাদনার ঢেউ খেলে গেলো। তখন, বাঙালি নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটক-রচনার নতুন প্রেরণা পেলেন। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যনির্মাতার উজ্জ্বলন্ত আবির্ভাব। এ দেখে গিরিশচন্দ্রও আর উদাসীন থাকতে পারলেন না, পুরাণপরিক্রমা ও সমাজভাবনা ছেড়ে অদূর অতীতের তরঙ্গসংকুল ইতিহাসের স্রোতে গা ভাসালেন, ইতিবৃত্তমূলক নাট্যপ্রণয়নে উৎসাহী হলেন।

ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশ ভাবগম্ভীর, এতে বর্ণাঢ্য ঘটনার শোভাযাত্রার উদাত্ত একটি মহিমা লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরের নাটকে বীরসসের বড়ো একটি স্থান আছে, বস্তুনিষ্ঠার প্রশ্নটিও এখানে স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের নির্মিত ঐতিহাসিক নাট্যকৃতির সম্পর্কে মোটামুটি প্রশংসার কথা হলো, ইতিহাসের সাবধানী পাঠক ছিলেন তিনি ; যে-বিষয়ে লিখতেন সে-বিষয়ের যা-কিছু জ্ঞাতব্য, তা সম্পূর্ণ জেনে নিয়ে হাতে কলম তুলে নিতেন—স্বকৃত নাট্যে পরিচিত ঘটনা বা চরিত্রের তেমন বিকৃতি কোথাও ঘটাননি। আর, বীররস তিনি সুন্দর ফোটাতে জানতেন, এর উপযুক্ত শক্তিশালী ভাষা তাঁর লেখনীমুখে বিনা-প্রচেষ্টায় এসে যেতো যেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে নাট্যোক্তি কখনো গদ্যবাহিত, কখনো পদ্যবাহিত। পাঁচ-ছয়খানা ঐতিহাসিক নাটক তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে সর্বাধিক জনসংবর্ধনা লাভ করেছে 'সিরাজদ্দৌলা'। এরপর উল্লেখ্য নাম হলো 'মীরকাশিম' এবং 'ছত্রপতি শিবাজী'।

গিরিশের রচিত সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটকের নাম—'আনন্দরহো'। এ উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম নয়। এর সম্পর্কে আলোচনা করবার মতো কিছু নেই। ঐতিহাসিক নাটক-হিসেবে 'চণ্ড'কে সার্থক রচনা বলা যেতে পারে। টড্-এর লেখা

বিখ্যাত 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত মেবারের ইতিবৃত্ত থেকে এর কাহিনীটি সংগৃহীত। এ কাহিনী মেবার এবং রাঠোরের বিরোধ-সম্পর্কিত। চণ্ড ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোর-অধীশ্বর রণমল্লের বীর্যদীপ্ত চরিত্র চিত্তাকর্ষক। সংহত ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাত-চিত্রণে লেখক কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। হৃদয়বৃত্তির লীলার সঙ্গে বীররসের স্ফুরণ দর্শনীয় নাট্যবস্তু হয়ে উঠেছে। ইতিবৃত্তের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে 'ভ্রান্তি' নাটকখানি রচিত। তুচ্ছ সামান্য ভ্রান্তিকে ঘটনাবৃত্তের নিয়ামক-রূপে গ্রহণ করে নাট্যকার ট্র্যাজেডি নির্মাণ করতে গিয়েছেন। অতি-সাধারণ ভুল কিন্তু ট্র্যাজেডি-জাতের রচনার উপযুক্ত বিষয় নয়। কাজেই, রচয়িতার প্রয়াস সার্থক হয়নি। ঘটনা-সংস্থাপনে, চরিত্র-রূপায়ণে লেখকের দক্ষতার মোটেই স্বাক্ষর মেলে না। গিরিশের নিকৃষ্ট সৃষ্টি 'ভ্রান্তি'। 'সংনাম' [১৯০৪]-নাটকের বর্ণনীয় সংনামী-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ—মুসলমানসম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে। এই নাটকে একদিকে প্রবল দেশানুরাগ, অন্যদিকে, প্রবৃত্তিশাসিত মানুষের হৃদয়দুর্বলতার শোচনীয় সংঘাতে দেখানো হয়েছে। চিত্তবৃত্তির তাড়নায় মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে মোহের হাতে ধরা দেয়; মোহ আত্মবিস্মৃতি ঘটায়, তখন ব্রতধারীরও ব্রতভঙ্গ হয়, পরিণাম—সংকল্পচ্যুতিজনিত নিদারুণ ব্যর্থতা। স্বাধীনতার স্বপ্ন, দেশ-প্রীতি, প্রণয়াকৃতি, প্রতিহিংসা, ভিন্নমুখী শক্তির দ্বন্দ্ব 'সংনাম'-এর ঘটনাধারাকে তরঙ্গিত করে তুলেছে। নাটকটির বড়ো একটি ত্রুটি মৃত্যু-দৃশ্যের বাহুল্য। পাত্রপাত্রীকে মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করলেই ট্র্যাজেডির মহিমা বাড়ে, নাট্যকার বোধ করি এরূপ একটি ধারণা পোষণ করতেন। ধারণাটি কিন্তু ভুল। ট্র্যাজেডি-নাট্যের শিল্পকলা গিরিশচন্দ্র আয়ত্ত করতে পারেন নি। নাট্যরচনায় তাঁর আদর্শ ছিল শেক্‌স্‌পীয়র, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রে প্রাপ্তব্য উচ্চতর কবিশক্তি ও শিল্পবোধ তাঁর ছিল না।

ঐতিহাসিক নাটক 'অশোক'-এ [১৯১১] ইতিবৃত্তকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হলেও ইতিহাসের ঘটনা ধর্মভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। ধর্মভাবুকতা নাটকটির ইতিহাসরস বেশ-কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে, ফলে 'অশোক' ধর্মমূলক নাট্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই নাটকের একটি ত্রুটি সকলের চোখে পড়বে—বহুতর ঘটনার একত্র সমাবেশ। এতে ঘটনাধারার ঐক্য বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে অশোক-চরিত্রের পূর্ণায়ত রূপটি উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি। ঐতিহাসিক নাটকেও গিরিশচন্দ্র নিজেকে ধর্মভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি।

গিরিশের প্রণীত লোকখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' [১৯০৬]। 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি নাটক তাঁর নাট্যজীবনের শেষের দিকে, স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে, রচিত। সমালোচ্য নাটকটির রচনামূলে প্রেরণারূপে কাজ করেছে লেখকের

দেশবাৎসল্য ও জাতীয়তাবোধ। মিথ্যা ভাষণে পটু বিদেশি ঐতিহাসিকেরা সিরাজ সম্পর্কিত ইতিবৃত্তকে বিকৃত করেছে। অধুনা দুয়েকজন বাঙালি ইতিহাসকার এই হতভাগ্য নবাবের জীবনকথার ওপরে নতুন আলোকপাত করেছেন। এঁদের গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যই গিরিশচন্দ্রকে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক-রচনায় প্রণোদিত করেছে। গিরিশের চোখে সিরাজ দেশপ্রেমিক—প্রজাহিতৈষণা ও ইংরেজবিদ্বেষ তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে যে কুটিল চক্রান্ত, তা বাঙলার ইতিহাসের এক কলঙ্ককালিমালিপ্ত অধ্যায়। প্রজাপালক নবাব দুরদৃষ্টলাঞ্ছিত সিরাজদ্দৌলার যথার্থ চরিত্র-স্বরূপ-উন্মোচনই নাট্যকারের লক্ষ্য। সিংহাসনে বসার সময় থেকে পলাশীর রণক্ষেত্রে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ও মর্মান্তিক মৃত্যু, মীরজাফরের মসনদলাভ, ক্লাইভ প্রমুখ পররাজ্যলোভী ইংরেজের বৃত্তান্ত প্রভৃতি ঘটনা বর্তমান নাটকের বর্ণনীয়। 'সিরাজদ্দৌলা'-র প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহার করে লেখক সিরাজ-চরিত্রের মহত্ত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হয়েছেন।

জাতীয় দৃষ্টিতে সিরাজের জীবনকাহিনী অতীব করুণ ও শোকাবহ। এই কারুণ্য ফোটাতে গিয়ে, এবং স্বদেশীভাবের বশবর্তী হয়ে, নাট্যকার সিরাজদ্দৌলা-সংক্রান্ত কিছু কিছু অপ্রীতিকর সত্য ঘটনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন, এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। ফলে, নাটকে আমরা সিরাজের আদর্শায়িত মূর্তি দেখি, ইতিবৃত্তে কথিত বাস্তবের সিরাজকে পাই না। প্রধান পার্শ্ব চরিত্র করিম-চাচা অনৈতিহাসিক ব্যক্তি আরেকটি প্রধান চরিত্র—এক প্রলয়ংকরী নারী-শক্তি জহরা, সেও অনৈতিহাসিক। জহরা যে-ভাবে নাটকের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে শোকাবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাতে ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়নি। করিমচাচার চরিত্রটি মোটামুটি সুন্দর। নাটকটি অধিকতর শিল্পোৎকর্ষ লাভ করতো যদি-না লেখক ঘটনা ও চরিত্রের বাহুল্যের দিকে ঝুঁকতেন। অতিরিক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তির ও উপাদানের ভিড়ে 'সিরাজদ্দৌলা' শেষ পর্যন্ত সার্থক নাট্য হয়ে উঠতে পারেনি।

কয়েকখানা প্রহসন যদিচ গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, তাঁর এ জাতের রচনায় দক্ষতার পরিচয় মেলে না। এই প্রহসনগুলি 'পঞ্চরঙ্' নামে পরিচিত। এগুলিতে লেখকের ব্যঙ্গ-পরিহাসের লক্ষ্য হলো ইংরেজিশিক্ষাভিমানী, বিকৃতবুদ্ধি, ব্যসনাসক্ত বাবুসমাজ, কদর্যতার পঙ্কে যারা নিমজ্জমান। এরা সকলেই উচ্ছৃঙ্খল, তাদের আচরণে, কথাবার্তায় চূড়ান্ত ইতরামি প্রকাশ পেয়েছে। এসব প্রহসনে ব্যঙ্গের তীব্র আঘাত আছে, স্নিগ্ধ হাস্যের স্পর্শ নেই। গিরিশের কৃত কয়েকটি প্রহসনের নাম: বেল্লিকবাজার, বড়দিনের

বখশিস, সপ্তমীতে বিসর্জন, ইত্যাদি। তাঁর লেখা গীতিনাট্যগুলির মধ্যে 'আবুহোসেন' সর্বাধিক সমাদৃত।

গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে বাঙলার নাট্যান্দোলনের একটি বড়ো অধ্যায় শেষ হলো। তাঁর নাট্যরচনা ভারে যত অধিক, উৎকর্ষে সেরূপ নয়। সমগ্রভাবে দেখলে পৌরাণিক নাটকনির্মাণেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। গিরিশ-বিরচিত পৌরাণিক নাট্যগুলি ভাবুক বাঙালিকে একদা খুবই আকর্ষণ করেছিল, এবং সেকালে আমাদের রঙ্গমঞ্চগুলকে মাতিয়ে রেখেছিল।

নাট্যসংলাপের বাহন-হিসেবে অমিত্রাক্ষরের চরণ ভেঙে 'গৈরিশ ছন্দ'-এর সৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের একটি দান। ভাবের সৌষম্য রেখে প্রায়োজনে গৈরিশ ছন্দের ব্যবহার বাঙলা নাটককে শক্তিশালী করেছে।

॥ ব্যঙ্গ-রঙ্গরসিক অমৃতলাল বসু ॥

ব্যঙ্গরচয়িতা অমৃতলাল বসুর [১৮৫৩-১৯২৯] নামের সঙ্গে নাট্যামোদীদের সকলেই পরিচিত। অমৃতলালকে 'রসরাজ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। প্রচুর ব্যঙ্গ-রঙ্গরস পরিবেশন করেছেন তিনি। প্রহসন-রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্বস্বীকৃত। যে-বইগুলো অমৃতলাল লিখেছেন, তার অধিকাংশ বেশ আনন্দে পড়ে যাওয়া যায়, কোনো-কোনোটাতে চিন্তার খোরাকও মেলে। তবে একথাও সত্য, সমসাময়িক সমাজ-আবেষ্টনী থেকে উপকরণ আহৃত বলে অমৃতলালের নির্মিত প্রহসনগুলিতে চিরন্তন রসের স্ফুরণ লক্ষিত হয় না। সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লেখা বলে তাদের আবেদনও সাময়িক। একারণে ওইসব রচনা সার্থক সাহিত্যিক নির্মিতি হয়ে উঠতে পারেনি। কোনো বিশেষ কালের বিষয়বস্তু আশ্রয় করেও যে-লেখা চিরন্তনের পর্যায়ে উন্নীত, তা-ই যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য।

আর, মোটা ধরণের রসিকতার উর্ধ্বে উঠতে না পারলে ব্যঙ্গকৌতুকাত্মক রচনা সূক্ষ্মহাস্যরসাভিলাষী দর্শক-পাঠকের কাছে সমাদর তেমন পায় না, তার আবেদন সার্বজনীন হতে পারে না। রসিকতার ক্ষেত্রে অমৃতলাল সূক্ষ্মতার এলাকায় বড়ো-একটা পদক্ষেপ করেননি, যদিও পূর্ববর্তী লেখকদের রচনার তুলনায় তাঁর রচনা অধিকতর মার্জিত রুচির পরিচয়বাহী।

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, অমৃতলাল বসুর কৌতুক-ব্যঙ্গের বাচিক রঙ্গ

বেশ চিত্তাকর্ষক, বাগ্‌বিন্যাসের সরসতা উপভোগ্য। ভাষার ওপর এই প্রহসনকারের আশ্চর্য অধিকার দেখে আমরা বিস্মিত হই। তাঁর রচনা অজস্র রসাল কথার রঙ্গরসে সিক্ত। এবং মানবচরিত্রের উদ্ভটপনাকে ফুটিয়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল অমৃতলালের।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিলেন অমৃতলাল, নিজের অভিনেতৃ-জীবনে গিরিশকে তিনি গুরু মেনেছিলেন। কিন্তু নাট্যকারজীবনে গুরুর বিচরিত পথে তাঁর পরিক্রমণ নয়। মনুষ্যজীবনের গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরেছিলেন গিরিশচন্দ্র, মনকে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত রাখতেন। অমৃতলাল ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, তাঁর মনটি ছিল কৌতুকপ্রবণ। তাই, সাধারণ জীবনযাত্রার ঘটনাবৈচিত্র্য নিয়ে মৃদুতর রহস্যসম্ভোগের নাটকই তিনি লিখেছেন, নাট্যানুরাগীদের লঘুচপল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। গিরিশ মুখ্যত গম্ভীর রসের নাট্যকার; অমৃতলালের সহজাত ক্ষমতা প্রহসনকারের, সিরীয়াস নাটক প্রণয়নের মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। হাস্যরসই তাঁর নাটক-নির্মাণের প্রধান প্রেরণা।

প্রসঙ্গত, দীনবন্ধু মিত্রের কথা মনে পড়ে—হাস্যরসের বড়ো শিল্পী দীনবন্ধু। অমৃতলাল-দীনবন্ধু দুজনেই হাস্যরসাত্মক নাটক-নাটিকা লিখেছেন। কিন্তু উভয়ের হাস্যরস একজাতের সামগ্রী নয়। দীনবন্ধু মিত্র স্নিগ্ধকোমল হাস্যচ্ছটায়-উদ্ভাসিত প্রহসনের স্রষ্টা; পক্ষান্তরে, অমৃতলাল ব্যঙ্গবিদ্রূপকণ্টকিত প্রহসনপ্রণেতা। একজনের হাসির মর্মকেন্দ্রে রয়েছে 'হিউমার'; অন্যজনের হাসি বিদ্রূপাত্মক বা স্যাটায়ারধর্মী। হিউমার-সমুত্থ বিশুদ্ধ প্রহসন অমৃতলাল বসু দু-একটার বেশি লিখেছেন বলে মনে হয় না। লেখক যেখানে নির্মমভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাত হানেন, সেখানে পাঠক কিংবা দর্শকের মুখে অমালিন হাসি ফুটতে পারে না, উদ্দেশ্যমূলক ব্যঙ্গের আঘাতে তাদের চিত্তের সহানুভূতিও সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, বাইরে তার প্রকাশে বাধা ঘটে। স্যাটায়ারে উচ্ছ্বসিত নির্দোষ হাসির ঔজ্জ্বল্য নেই, এর ফলশ্রুতি—নির্মমতাপ্রদর্শনজনিত বেদনাময় একটা গ্লানিবোধ। এইজন্যে, বিশুদ্ধ প্রহসনের তুলনায় ব্যঙ্গাত্মক রচনা নিকৃষ্ট, কমেডির জগতে এর স্থান নীচুতেই নির্দেশিত হয়েছে।

প্রহসনরচয়িতা অমৃতলাল বসু খাঁটি বাঙালি, কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রাচীনপন্থী। রক্ষণশীলতার পোষকতা করেন, প্রগতিমুখী মনোভঙ্গিকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। সমাজের যুগবাহিত নীতি-ধর্ম-আদর্শের প্রতি তাঁর অকম্পিত আস্থা। এক্ষেত্রে তাঁর মানসিকতা অনেকটা গিরিশচন্দ্রের সদৃশ। বলিষ্ঠ নতুনকে সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানাতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, সমাজব্যবস্থা যতই জীর্ণ হোক, পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকার পক্ষপাতী। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি নিন্দাবাদ-উচ্চারণে তিনি

অনিচ্ছুক, বিপরীতপক্ষে, তার সমর্থনেই উৎসাহী। প্রাচীনের প্রতি অমৃতলালের এই যুক্তিহীন আনুগত্য কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে; বিদ্যাসাগরের কালের মানুষ হয়েও কোথাও তিনি সংস্কারকের মনোভাবের পরিচয় প্রতিফলিত করতে পারেন নি। বিধবার পাণিগ্রহণ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলন, ব্রাহ্মদের বিবিধ সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টা—এ সমস্তকিছুকে অমৃতলাল ঘোরতর অনাচার বলেই বুঝেছিলেন। বিষয়গুলি তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে, এগুলার অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কন করে তিনি রঙ্গচরিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নব্যতন্ত্র তাঁর কাছে উপহাসের বস্তু, আর প্রাচীনতন্ত্র প্রশংসার্হ তথা আদরণীয়। প্রগতিমূলক মতবাদ তাঁর লেখায় কুত্রাপি চোখে পড়ে না। প্রাচীন প্রথার অনিষ্টকারিকতার কথা তিনি ভাবেন না। প্রকৃত হাস্যরসিকদের মধ্যে যে-উদার সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়, অমৃতলালে তার নিতান্ত অভাব। তাঁর এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গি আমাদের ভালো লাগেনি। যে-মূঢ় জাতিভেদপ্রথা হিন্দুর সমাজদেহে দুষ্ট-ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, যা হিন্দুসমাজের উন্নতির পথে প্রবল বাধাস্বরূপ, তাকেও নির্বিকার চিত্তে সমর্থন জানিয়েছেন অমৃতলাল। এহেন মনোভাব নিয়ে যে-প্রহসনগুলো তিনি রচনা করেছেন, এযুগে তা অচল। অমৃতলাল যুগের ধর্ম ও যুগবাণীর মর্ম একেবারেই বুঝতে চাননি।

তবে তিনি যখন আচার-আচরণগত যা কিছু অসংগত, বিসদৃশ, আর ভণ্ডামি, ন্যাকামিকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেন, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধ-বস্তুর ওপরে উপহাসের আঘাত হানেন, স্বধর্মচ্যুতিকে উপহাস্য করে তোলেন, সমাজদ্রোহীকে নাজেহাল করে ছাড়েন, সেখানে তাঁর নাট্যকর্ম নিঃসন্দেহে উপভোগের সামগ্রী। মাঝে-মধ্যে ব্যঙ্গ ছেড়ে তিনি রঙ্গকৌতুকে মেতে ওঠেন। ওইসব ক্ষেত্রে নাট্যনিহিত রঙ্গরসের উপভোগ্যতা অবশ্যস্বীকার্য।

বিভিন্ন উপায়ে তিনি কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন। বিষয় অনুযায়ী তাঁর উপহাস-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাত্রা কখনো তীব্র, কখনো মৃদু। বিজাতীয় ভাবাপন্ন, ইংরেজিয়ানার ভক্ত বাঙালিসন্তান, সদাচারভ্রষ্ট ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুমহিলা, স্বার্থসন্ধানী রাজনৈতিক দেশনেতা, কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী ভণ্ড ব্যক্তি, আন্তরিকতাশূন্য, নামযশের কাঙাল তথাকথিত সমাজসংস্কারকের দল, স্ত্রীর আঁচলধরা পুরুষ, অল্পশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অপদার্থ দেশসেবকের ভোটযুদ্ধ, বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বুদ্ধির বিকৃতি, ইত্যাদি বিষয়বস্তু অমৃতলালের প্রহসনগুলোতে ব্যঙ্গরসিকতার উপকরণ। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে প্রধানত নাগরিক সমাজ, কলকাতা শহরের চতুঃসীমার বাইরে যে-বৃহত্তর দেশ পড়ে আছে, সেদিকে তাকাবার অবকাশ তাঁর হয়নি। ইংরেজি ভাষার

ওপর মোটামুটি দখল না থাকলে অমৃতলালের রচিত কয়েকটি প্রহসনের রস আস্বাদন করার পক্ষে অসুবিধেই হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির প্রয়োজন। অল্প-শিক্ষিতের কাছে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথার মারপ্যাচ রুচিকর হবে বলে মনে হয় না।

যে-কয়টি প্রহসন অমৃতলাল লিখেছেন, তাদের অনেকগুলোতেই ঘটনাগত চমৎকারিত্ব কিংবা কাহিনীর কোনো জটিল বৈচিত্র্য প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায় না। কল্পিত কিছু দৃশ্যপরম্পরা ও স্বল্পসংখ্যক চরিত্র সামনে এনে ওইসকল চরিত্রের কারো কারো কথাবার্তা ও কার্যকলাপের হাস্যকর দিকটি সর্বসমক্ষে তিনি তুলে ধরেন। ইঙ্গিতে না দেখিয়ে, পাত্রপাত্রীর দোষ বা বাক্যালাপ, আচরণ, ইত্যাদির অসংগতি, বিশেষ চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। নাট্যকলার দিক থেকে দেখলে, প্রহসন-লেখকের এভাবে আত্মপ্রকাশ দোষাবহ, সন্দেহ নেই। প্রহসননির্মাতার নীতিনির্ধারক হয়ে ওঠার ব্যাপারটি সমালোচকের চোখে বিসদৃশ না ঠেকে পারে না। বড়ো আর্টিস্ট গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ্যে কদাপি ধরা দেন না। এ বিষয়ে অমৃতলাল মোটেই সচেতন ছিলেন না।

বাঙালি অভিনয়দর্শকের রুচির দিকে তাকিয়ে অমৃতলাল স্বকৃত প্রহসনে অনেক গান ঢুকিয়েছেন। গানগুলি স্বরচিত, অদ্ভুত-সব মিল কৌতুক-উদ্দীপক। অনেকের জানা নেই, শিল্পী-কবি ছিলেন তিনি, সুযোগ পেলেই কবিত্বের চাতুর্য দেখাতেন; আর, পূর্বেই বলেছি, তাঁর বাগ্‌বিন্যাসকৌশল দেখবার মতো জিনিস।

প্রায় পনেরো-ষোলখানা প্রহসনের লেখক অমৃতলাল। অন্তঃপ্রকৃতির দিক থেকে এগুলোর বেশির ভাগ বিদ্রূপাত্মক; বিশুদ্ধ প্রহসন বলতে যা বোঝায়, সে জাতের রচনার সংখ্যা স্বল্পই, বলতে হবে।

স্যাটায়ার-জাতীয় রচনার মধ্যে 'বিবাহবিভ্রাট' [১৮৮৪] সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এ বইখানা লিখে রচয়িতা প্রহসনকাররূপে খ্যাতি লাভ করেন। প্রহসনটি জটিলতা-মুক্ত, ব্যঙ্গপ্রধান। সেকালের নাগরিক সমাজে পণপ্রথার কুফল এতে দেখানো হয়েছে; এখানে পণমূলক বিবাহের একটি চিত্র উন্মোচিত। নতুন শিক্ষাদীক্ষার যুগে পিতা-পুত্র—আদর্শের ক্ষেত্রে—একে অন্যের কাছ থেকে ধীরে ধীরে কীভাবে দূরে সরে যাচ্ছে, তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন লেখক। বিদ্রূপের লক্ষ্য তদানীন্তন নব্যসমাজ। 'বাবু' প্রহসনে [১৮৯৪] কৌতুক-ব্যঙ্গ-পরিহাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে নাট্যকারের সমকার শিক্ষিতসমাজ, এদের আচরণের অসংগতির ওপরে পরিহাস-ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে দাঁড় করিয়ে কয়েকটি চরিত্রকে প্রহসননির্মাতা ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্র আঘাত হেনেছেন। রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তথাকথিত দেশপ্রেমী নেতাদের আসল স্বরূপ উন্মোচন করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন, তাদের বক্তৃতা দেশের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি ডেকে আনছে। 'একাকার' প্রহসনখানিতে [১৮৯৫] লেখক হিন্দুসমাজের জাতিবৈষম্যকে সমর্থন জানিয়েছেন, বর্তমান যুগেও জাতিভেদপ্রথাকে ক্ষতিকর বলে তাঁর মনে হয়নি। লেখকের মতে যার যা বৃত্তি তার অনুসরণই শ্রেয়, জাত-ব্যবসায়কে ছেড়ে অন্যক্ষেত্রে কারো পদক্ষেপ মোটেই কল্যাণপ্রসূ নয়। কোনোরূপ সামাজিক ভেদাভেদ থাকবে না, সমাজ-অন্তর্বর্তী সকল বর্ণের মানুষ মিলেমিশে সাম্যের ভিত্তিতে একাকার হয়ে যাবে, এরূপ একটি অবস্থা প্রহসনরচয়িতার কাছে অভাবনীয়। ব্রাহ্মধর্ম ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে উপহাস করা হয়েছে 'বৌমা'-তে [১৮৯৭]। লেখক, বোধ করি, বোঝাতে চেয়েছেন, বঙ্গের আধুনিক বধূরা 'কিশোরী'-র মতো যদি রোম্যান্স-স্বপ্নে বিভোর থাকে, এবং প্রণয়াকুতিকেই জীবনের একতম বস্তু বলে জানে, তাহলে সমাজ বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। নভেল-পড়া মেয়ে এবং স্বামীস্ত্রীর বহিরঙ্গসর্বস্ব প্রণয়কে নাট্যকার ভালো চোখে দেখেননি। নাটুকে প্রেমকে তিনি তিরস্কারযোগ্য মনে করেন।

নবযুগের সমাজকে ব্যঙ্গ করে, এবং এ ছাড়া, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, আরো কতিপয় প্রহসন লিখেছেন তিনি। যেমন—'কালাপানি', 'সম্মতিসংকট', 'সাবাস্ আটাশ', 'গ্রাম্য-বিভ্রাট', 'অবতার', 'রাজাবাহাদুর', 'তিলতর্পণ', ইত্যাদি। পাশ্চাত্ত্যানুরাগী বাঙালি তরুণদের বিলাত যাওয়ার অদ্ভুত নেশা, কচিবয়সে পাত্রস্থ না করে পরিণত বয়সে এদেশের মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার আন্দোলন, মিউনিসিপাল-শাসন, অর্থলোভী ভোজনলুব্ধ কপট স্বামীজি, সস্তায় বাহবা কুড়োবার অভিপ্রায়ে সুলভ উপকরণ নিয়ে নাটকনির্মাণের প্রয়াস, ইংরেজি খেতাবলাভের জন্যে গ্রাম্যজমিদারের মূর্খতা, প্রভৃতি বস্তু প্রহসনগুলোতে উপহসিত। এসকল রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ আছে, রঙ্গরসের কিছু উপাদান আছে; কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসের চমৎকারিত্ব নেই, উল্লেখনীয় নাট্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর মেলে না।

কৌতুক-উদ্দীপক হাস্যরসের অবতারণা দেখতে পাওয়া যায় 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিস্‌মিস্', 'কৃপণের ধন' প্রভৃতি রচনায়। লেখক স্ত্রীস্বাধীনতাকে নিয়ে রঙ্গ করেছেন 'তাজ্জব ব্যাপার'-এ। 'ডিস্‌মিস্' বইখানিতে স্বামীস্ত্রীর ভিত্তিহীন সন্দেহ এবং ওই সন্দেহ-নিরসনের কৌতুকাবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের-এর 'The Miser' নামক প্রহসনের দ্বারা প্রভাবিত 'কৃপণের ধন'-এর নাট্যবস্তু কার্পণ্য ও নারী-আসক্তি-দোষ। দুজন ব্যক্তির একই বিধবাকে বিবাহ করতে চাওয়ার সরস কাহিনীকে লেখক নাটকাকারে

গ্রথিত করেছেন 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' প্রহসনখানাতে। এর কাহিনীটির পরিকল্পনায় দুখানা ইংরেজি প্রহসনের প্রভাব রয়েছে। ভদ্রঘরের কোনো রমণীকে হাত করবার চেষ্টা করতে গিয়ে এক চরিত্রহীন ব্যক্তি কী ভাবে নিজের স্ত্রীকে প্রায়-হারাতে বসে জব্দ হ'লো, তার কৌতুকপূর্ণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ খোঁচা না-থাকাতে এসকল প্রহসনের অভিনয় দেখে দর্শকগোষ্ঠী বেশ আমোদ উপভোগ করে।

অমৃতলাল বসুর খ্যাতি প্রহসনকারের, নাট্যকারের প্রতিভা তাঁর নয়। তথাপি, দেখতে পাই, প্রহসনের গণ্ডি অতিক্রম করে নাটক-প্রণয়নে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই এলাকাটিতে তাঁর নাট্যসিদ্ধি অকিঞ্চিৎকর। অমৃতলালের প্রণীত দুখানা কমেডি—'খাসদখল' [১৯১২] ও 'নবযৌবন' [১৯১৪]—সুখপাঠ্য। প্রথমটিতে কিছু সামাজিক সমস্যা উঁকি দিয়েছে, বিদ্রূপের মৃদু আঘাত আছে। বিদ্রূপ থাকলেও হাস্যরসের স্নিগ্ধ স্পর্শ এ প্রহসনকে উপভোগ্য করে তুলেছে। 'নবযৌবন'-এ চিত্রিত রোম্যান্টিক পরিবেশে হাস্যসিক্ত মধুময় প্রণয়লীলার দৃশ্য, এবং এতে সন্নিবেশিত শ্রুতি-সুখকর গীতনিচয়, নিশ্চয়ই সকলের ভালো লাগবে। কৌতুকোজ্জ্বল এর কাহিনী। সামাজিক নাটক 'তরুবালা' পড়তে মন্দ লাগে না। একে উপাদেয় করে তুলেছে কৌতুকরসের উদ্বেলন। এখানে কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপও লক্ষ্য করা যায়। বুঝতে পারি, লেখক বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে গিয়েছেন; পুরুষের বহুবিবাহ তাঁর কাছে নিন্দার্হ মনে হয়নি। 'হীরকচূর্ণ' ইতিহাসমূলক নাটক, 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'যাজ্ঞসেনী' পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক নাটক দুখানা গিরিশপ্রভাবিত। এ দুটি নাট্যে রচয়িতার কৃতিত্বের কোনো ছাপ লক্ষ্য করা যায় না। গিরিশচন্দ্রের পর উল্লেখ্য পৌরাণিক নাটক কেউ লেখেননি। 'হরিশ্চন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী'-র মতো নাট্যের রঙ্গমঞ্চে অধিক সাফল্যলাভের কথা নয়। 'যাজ্ঞসেনী'-তে দৃশ্যকাব্যের মতো ভাষা প্রযুক্ত হয়নি, শ্রব্যকাব্যের ভাষাই ব্যবহার করেছেন লেখক। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বাঙ্‌লা নাট্যে বহু-পরিচিত। এখানে মৌলিকতা দেখাবার সুযোগ খুবই কম, আর, অমৃতলালের সেরূপ ক্ষমতাও ছিল না।

অমৃতলাল বসুর যা-কিছু বৈশিষ্ট্য, প্রহসনেই প্রাপ্তব্য। তাঁর অপরবিধ রচনা নাট্যকারের শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে না। সীরিয়াস নাটকে হাত দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করলে এরূপ ভুল হতে বাধ্য।

॥ আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥

বাঙলা নাটকের তৃতীয় পর্বের প্রখ্যাত একজন নাট্যরচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩]—সাধারণ্যে ডি. এল. রায় নামেই সমধিক পরিচিত। গীতিকবিতার লেখকরূপেও তাঁর খ্যাতি কম নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মনটি আসলে কবির—এই কবি-মনের প্রতিফলন তাঁর নাটকগুলোতে অতিশয় স্পষ্ট। হাসির গানের কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে কদাপ আমরা ভুলব না। এ জাতের গান লিখে একদা বাঙালিকে তিনি বিস্তর আমোদ পরিবেশন করেছেন।

সরস রঙ্গ-কৌতুকে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে দ্বিজেন্দ্র যখন একের পর এক হাসির গান লিখে চলছিলেন, সেই সময়ে হাস্যরসোচ্ছল প্রহসন-রচনার দিকে তাঁর ঝোঁক যায়, ঝোঁকের বশে কয়েকখানা প্রহসন লেখেন। প্রথমে প্রহসন-রচনা নিয়েই নাট্যক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হন। কিন্তু লঘু রচনায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে পৌরাণিক, এবং ক্রমে ঐতিহাসিক, রোম্যান্টিক ও সামাজিক নাটকনির্মাণে হস্তক্ষেপ করেন। হাসির গানে হাত ভালো খুললেও উৎকৃষ্ট প্রহসন তাঁর লেখনী থেকে বেরোয়নি। প্রহসননির্মাতার সহজাত প্রতিভা তাঁর ছিল না। এক্ষেত্রে মধুসূদন-দীনবন্ধু-অমৃতলালের পাশে তিনি দাঁড়াতে পারেন না। প্রহসন-জাতের রচনায় বিশেষ ধরণের ঘটনা-সমাবেশ, চরিত্র-রূপায়ণ, বাণীবিন্যাস, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রের নির্মিত প্রহসনে ঘটনার জটিলতা ও রহস্যময়তা তেমন দেখতে পাওয়া যায় না, স্মরণীয় কমিক চরিত্র তিনি আঁকেননি, নির্মল হাস্য-উদ্দীপক বাক্যনির্মাণেও তিনি খুব-একটা দক্ষ ছিলেন না। এইজন্যে, প্রহসনের এলাকায় তাঁর নাম উল্লেখ্য কিছু নয়।

অতঃপর কবিত্বের আকর্ষণে দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকাব্যনির্মাণে উৎসাহী হন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু নিজেই তিনি বুঝতে পারেন, পদ্যে নাট্যোক্তি স্বাভাবিক হয় না, আধুনিক যুগে ছন্দে গ্রথিত সংলাপ শ্রোতার কানে অস্বাভাবিকই ঠেকবে। তাই, যুগরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে, নাটক লিখতে বসে, পদ্য ছেড়ে গদ্যের ভূমিতে পদক্ষেপ করলেন তিনি। ঐতিহাসিক নাটকে কৃত্রিম পদ্যসংলাপ বর্জন করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল—বাঙলা নাট্যের আঙ্গিকে আধুনিকতার একটি লক্ষণ যুক্ত হলো। নাট্যকাব্যের পথে দ্বিজেন্দ্র বেশিদূর অগ্রসর হননি, এখানেও তিনি নাট্যসিদ্ধি লাভ করেননি। নিজের প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্রটি খুঁজে পেতে আরো কিছুকাল তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তাঁর স্বক্ষেত্র হলো ঐতিহাসিক নাটক। কবিতায়-লেখা নাটক সমাদর না পাওয়ায় পরবর্তী নাটকগুলির অধিকাংশ তিনি গদ্যে রচনা করেন।

বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব তখনো বেশ সক্রিয় রয়েছে, নাট্যকার গিরিশের প্রদর্শিত পথে বাঙালি নাটকলেখকদের চলাচলের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—পৌরাণিক নাটক তখনো জনগণের সমাদৃত। গিরিশবিরচিত নাট্যের প্রভাব দ্বিজেন্দ্র সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন নি। বোধ করি, এই প্রভাববশেই বঙ্গনাট্যসাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রলাল গোটা দুই-তিন পুরাণাশ্রয়ী নাটক লিখলেন,—তৎকালীন প্রেক্ষাগৃহের দর্শকবৃন্দের চাহিদাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারলেন না। কিন্তু ভক্তিভাবপ্রবণ ছিল না দ্বিজেন্দ্রের চিত্ত, অলৌকিক দেবলীলাকে সহজ-বিশ্বাসে কখনো তিনি স্বীকৃতি জানাননি, ধর্মপ্রাণতাসঞ্জাত আধ্যাত্মিকতা তাঁর ধাতুপ্রকৃতির বিরুদ্ধ-বস্তু ছিল। এ কারণে পৌরাণিক নাট্যের জগতে দ্বিজেন্দ্রলালের বিহরণ কখনো লাবলীল হতে পারেনি। যথার্থ ভক্তিবিশ্বাসের দ্বারা প্রাণিত নয় বলে, পুরাণের কথাবস্তু নিয়ে যে-দু একটি নাটক তিনি প্রণয়ন করেছেন, তাদের ঠিক পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যায় না। স্বরচিত পৌরাণিক নাটকে পুরাণবর্ণিত চরিত্রগত আদর্শকে তিনি বিপর্যস্ত করে ছেড়েছেন। লক্ষণীয়, এই শ্রেণীর নাটকে পদ্য-ছন্দ আমন্ত্রিত ; অথচ দ্বিজেন্দ্রের মতে 'পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।' গিরিশচন্দ্রের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রাচীনকে আধুনিক পরিচ্ছদ পরালে নাট্যকারের মৌলিকতা হয়তো কিছুটা প্রকাশ পায়, কিন্তু তা ভক্তিপ্রাণ দর্শকের কতখানি চিত্তাকর্ষক হবে, সে-কথাটিও ভেবে দেখবার মতো। বুঝতে পারি, গিরিশচন্দ্রের পর ভক্তিভাবাত্মক পৌরাণিক নাট্যের বিকাশের ধারাটি একরূপ রুদ্ধ হয়ে গেছে, এর নতুন পরিণতি কোথাও আর দেখা গেলো না।

দ্বিজেন্দ্রলালের উজ্জ্বল কৃতিত্বের পরিচয় ফুটেছে ঐতিহাসিক নাটকে। গিরিশচন্দ্রের যুগে ইতিহাসের ভিত্তিতে নাটক লিখে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। বিংশ শতকের প্রথমের দিকে বাংলাদেশ জাতীয়-ভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিল, বাঙালিচিত্তে স্বাদেশিকতার উন্মাদনা জেগেছিল—সেদিনকার বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা। কেবল রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার অগ্নিবর্ণ প্রকাশ ঘটলো না, বাঙলার রঙ্গমঞ্চও সেই উদ্দীপনা-উন্মাদনাকে অনির্বাণ রেখেছিল। সেদিন বাঙালি নাট্যকার জাতীয় ইতিহাসের দিকে তাকালেন, জাতির বীর্যদীপ্ত পুরুষদের অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও শৌর্যবিভাসিত আত্মোৎসর্জনের কাহিনীকে নাট্যে রূপায়িত করলেন, বন্ধন অসহিষ্ণু স্বাধীনতাকামী দেশের সংগ্রামী মানুষের অন্তরে বহ্নিময়ী প্রেরণা জোগাতে

থাকলেন—গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকার চারণের ভূমিকায় নামলেন। কয়েকটি নাটকের মাধ্যমে স্বদেশবৎসল দ্বিজেন্দ্র উদাত্ত কণ্ঠে দেশাত্মবোধ প্রচার করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে যার সূচনা, দ্বিজেন্দ্রলালে তার পূর্ণ-প্রস্ফুটন। দ্বিজেন্দ্রের হাতেই বাঙ্‌লা ঐতিহাসিক নাটক গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাস্বর মহিমাশ্রী লাভ করে। অন্যকোনো বাঙালি লেখক এমন প্রাণোন্মাদকর নাট্য নির্মাণ করেননি। এসকল নাটক বীররসে স্পন্দিত, মনুষ্যত্বের জয়সংগীতে মুখরিত। বলিষ্ঠ আশার বাণী এগুলোতে উচ্চারিত বলে অশেষদুর্গতিলাঞ্ছিত জাতির চিত্তের সমস্ত অবসাদ ও দুর্বলতার নাশক। বীর্যবত্তার আলেখ্য-চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রের প্রাণসত্তার সে কী উল্লাস! অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রপ্রণীত ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক রোম্যান্সে পরিণত হয়েছে; বলতে হবে, ইতিবৃত্তমূলক রোম্যাণ্টিক নাটক লিখেছেন তিনি। তথাপি, এ সত্যটিও অনস্বীকার্য, ঐতিহাসিক নাটক তার পূর্ণতালাভের জন্যে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভারই অপেক্ষা করছিল যেন। এই স্তরের নাটকে দ্বিজেন্দ্রের সাফল্য সর্বস্বীকৃত।

মাত্র দুখানা সামাজিক নাটক লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। যেমন পৌরাণিক নাটকে, তেমনি, সামাজিক নাটকে, বর্তমান নাট্যকার, মনে হয়, মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন নি। উভয় ক্ষেত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে এসেছেন, বিশেষ করে দ্বিতীয়োক্ত ধরণের নাট্যে। ইতিহাসের দূরবিস্তার পটভূমিতে, উত্থানপতনময় ঘটনারাজির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার রাজ্যে দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকল্পনার যে-লীলায়িত ভঙ্গি, যে-অনায়াস পক্ষবিস্তার লক্ষ্য করা যায়, বাঙালির স্তিমিত-মন্থর সামাজিক জীবনের সীমিত পরিধির মধ্যে তার অনুরূপ কিছু চোখে পড়ে না। তাঁর লেখা সামাজিক নাটক গতানুগতিক, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। কথাবস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াসী হলেও, তাঁর বৈচিত্র্যপিপাসা চরিতার্থতা লাভ করেনি। গিরিশপ্রতিভার সার্থক সৃষ্টি পৌরাণিক নাটক, দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার—ঐতিহাসিক নাটক। ভিন্নতর ক্ষেত্রে দুজনারই লেখনী যেন দ্বিধাকম্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উদ্দীপ্ত নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল মানসিকতায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক—গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল-আদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী নাট্যকারের সঙ্গে এখানে তাঁর পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো। স্বদেশ-চেতনা অমৃতলালে লক্ষিত হয় না, মানবতার মহৎ গৌরবের কথা তাঁর মুখে বড়ো-একটা শোনা যায়নি। জীবনের হাল্‌কা দিকটাকেই নাটকে তিনি প্রতিফলিত করেছেন, নারী-জাতির প্রতি অবজ্ঞা ও হতাদর দেখিয়ে এসেছেন। উনবিংশ-বিংশ শতকের বাঙ্‌লার নবজাগরণের বাণীবাহক নন অমৃতলাল। গিরিশচন্দ্রে স্বদেশচিন্তার পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধে গভীরতা ও তীব্রতা নেই। আমাদের ধারণা, কর্তব্যবোধের তাগিদেই

তিনি 'সিরাজদ্দৌলা'-র মতো ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। আসলে, তাঁর প্রাণ সৃষ্টির আবেগস্পন্দন অনুভব করতো পৌরাণিক নাট্যপ্রণয়নের মুহূর্তে। লৌকিক সংসারের মানবলীলা অপেক্ষা এক অলৌকিক জগতের দেবদেবীর রহস্যময় লীলাই তাঁর চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট করেছে। নিজের লেখা নাটকে গিরিশ ভক্তিব্যাকুলতা দেখিয়েছেন, ধর্মভাবুকতাকে বড়ো করে তুলেছেন, আধ্যাত্মিকতা ও তত্ত্বভাবনার দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকেছেন। বাস্তব পৃথিবীর ধুলোমাটির স্পর্শ এড়িয়ে চলাই যেন তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। গিরিশের নির্মিত নাট্যজগতে দেবতা আর মহাপুরুষের ভিড়ে এই পরিদৃশ্যমান সংসারের মানবমানবী কোথায় হারিয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, সামাজিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্বের স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যাবলী এই ভক্তিবিলাস ও অধ্যাত্মচিন্তার প্রবল প্রতিবাদ যেন। ঈশ্বর, স্বর্গলোক, দেবদেবী, বাস্তবাতীত ঘটনা, প্রভৃতি বস্তুর স্থান দ্বিজেন্দ্রের নাট্যরচনাবলীতে অত্যন্ত সংকীর্ণ। এখানে সবার ওপরে মানুষই সত্য, তার ওপরে কিছু নেই। দেবতাপ্রীতির নয়, মানবপ্রীতিরই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেছেন তিনি, সকলকে মনুষ্যত্বের মহাগীত শুনিয়েছেন, স্বদেশকে প্রোজ্জ্বল মহিমায় সমুদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছেন, দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন : 'আবার তোরা মানুষ হ'। তাঁর নীতি উচ্চতর মানবনীতি, তাঁর প্রেম বিশ্বপ্রীতির অভিমুখে প্রসারিত উদার দেশপ্রেম। নারীর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, পক্ষান্তরে, পুরুষের পৌরুষভ্রষ্টতার প্রতি, তেমনি, অনিঃশেষ ঘৃণা। সাম্যনীতির অধিকারে বীর্যবান পুরুষের পাশে ব্যক্তিত্বশালিনী নারী এসে দাঁড়াক, এই ছিল দ্বিজেন্দ্রের অভিলষিত। তাঁর আধুনিক মানসিকতাকে প্রশংসা জানাতেই হয়।

বাঙ্‌লা নাটকের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, শব্দশিল্পী-হিসেবে দ্বিজেন্দ্রের জুড়ি নেই বললেই চলে। ভাষার ওপরে কতখানি তাঁর দখল, কত বিচিত্র শব্দগুচ্ছ তিনি তৈরি করেছেন। অলংকৃত গদ্যের ঐশ্বর্যে তাঁর নাটক ঝলমল করছে। ভাষার প্রকাশশক্তিকে তিনি যে বাড়িয়ে দিয়েছেন, এ সকলেই স্বীকার করবেন। ভাষাবিন্যাসের কৌশলে তাঁর নাট্যসংলাপ আবেগকম্পিত গতিশীলতা লাভ করেছে, ভাষার বাতায়নপথে নাট্যে বর্ণিত চরিত্রগুলার মর্মস্থল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অন্তরের পরস্পরবিরোধী ভাব-ভাবনাকে সহজে চিনে নিতে পারা যায়।

এমন প্রাণবন্ত নাটকীয় ভাষা খুব কম লেখকই প্রয়োগ করেছেন। শব্দশিল্পে দ্বিজেন্দ্র অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তবে, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষারীতি দোষমুক্ত নয়। ধ্বনিময়, বেগবান সংলাপ-রচনায় দক্ষতা তিনি দেখালেও তাঁর ভাষায় বৈচিত্র্যের অভাব, ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য এ তেমন ফুটিয়ে তুলতে পারে না। সব ক'টি চরিত্র যেন একই বাণীভঙ্গিতে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে—সকলের মুখেই কবিত্বের উচ্ছ্বাস। তখন বুঝে নিতে বাধ্য হই, পাত্রপাত্রীদের অভিভূত করে কবি-নাট্যকার নিজেই বুঝি কথা বলছেন, সংলাপের মধ্য দিয়ে কবির ব্যক্তি-রূপটিই, তাই, ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী নাটকীয় সংলাপনির্মাণে যে বিভিন্ন ধরণের ভাষা-ব্যবহারের প্রয়োজন, এ নাট্যকারের মনে থাকে না। অলংকারে-মণ্ডিত-বাণীর চতুর শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রয়োজনে আটপৌরে ভাষা তাঁর কলমে আসে না। তা ছাড়া, ভাষাগত অভিনবতা-প্রদর্শনের মোহ তাঁকে একপ্রকার ম্যানারিজমের ফাঁদে ফেলে প্রায়শ। ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক নাটকের পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে অবাস্তবতা বা রোম্যান্টিক ভাববিলাসিতা দোষাবহ বলে মনে হয় না। কিন্তু সামাজিক নাটকেও যদি তার অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে কিছুতেই তাকে বরদাস্ত করা যায় না। কারণ, নাট্যাঙ্গিকের পক্ষে তা ক্ষতিকর।

দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কে প্রশংসার কথা, পূর্ববর্তী নাট্যকারদের রচনার তুলনায়, তাঁর নাট্যকর্মে পরস্পর-বিরোধী ভাব ও চিত্তবৃত্তির সংঘাতের রূপায়ণ সমধিক, অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলোকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মানসি[illegible] সংস্থানের বৈষম্যহেতু যে-দ্বন্দ্বের উদ্ভব, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে ভালো ফোটাতে পারেন। অন্তর্মুখী দৃষ্টি তাঁর রচনাকে অগভীর ও অমনস্তাত্ত্বিক হয়ে পড়তে দেয়নি। কিন্তু নাট্যকার-হিসেবে দ্বিজেন্দ্রের বিপদ হলো, নিজের ব্যক্তিত্বকে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখতে পারতেন না, নাটকীয় আত্মসংকোচন তাঁর আয়ত্তের বাইরে থেকে গেছে; কবি দ্বিজেন্দ্রলালের লিরিক মন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রায়শ স্বধর্মচ্যুত করেছে। এইজন্যে, সত্যিকারের উচ্চশ্রেণীর নাটক-নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। নাট্য-তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা সত্ত্বেও নাটকস্রষ্টারূপে অবিমিশ্র সাফল্য লাভ করতে পারেননি তিনি।

সে যা হোক, দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্‌লা নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাট্যের প্রাণশক্তি সঞ্চার করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিলাতে তিনি বহু নাটকের অভিনয় দেখেছেন, য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ নাটকরচয়িতাদের নাট্যাদর্শের অনুসরণে নিজের নাম-করা

নাটকগুলো লেখেন। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূচনা হয় দ্বিজেন্দ্রের নাটকাবলীর মধ্য দিয়ে, একথা বললে, বোধ করি, ভুল করা হয় না। এদেশে নাটকলেখক-হিসেবে গিরিশচন্দ্র খ্যাতির উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিত। গিরিশের পাশেই দ্বিজেন্দ্রের স্থান নির্দেশ করতে হয়। কারো কারো মতে দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অনেক বড়ো লেখক। এই মন্তব্যটি বিচার্য। অতখানি অবকাশ আমাদের হাতে নেই।

* *

দ্বিজেন্দ্রনাট্যাবলী বলতে গোটা পাঁচ-ছয় প্রহসনসহ, কয়েকটি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক।

প্রহসনগুলোকে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলে আমরা মনে করি না, এক্ষেত্রে তাঁর নাট্যশিল্পসিদ্ধি তেমন উল্লেখ্য কিছু নয়। কৌতুকোজ্জ্বল হাসির গানে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, এ ঠিক। কিন্তু গানে আর প্রহসনে কিংবা নাট্যকল্প রচনায় বিস্তর প্রভেদ। ঘোরালো ঘটনা-সংবলিত রহস্যময় সরস কাহিনী-নির্মাণের ক্ষমতা ছিল না দ্বিজেন্দ্রলালের; হাস্যরসাত্মক বাক্যনির্মাণের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। যে-সব প্রহসন তিনি লিখেছেন, বস্তুত, তাদের উপাদেয় করে তুলেছে হাসির গানগুলি। এ জিনিসটাকে বাদ দিলে ওইসব প্রহসনের সরসতা অনেক কমে যায়। প্রসঙ্গত, বলতে বাধা নেই, তুলনায় উৎকৃষ্টতর প্রহসন লিখেছেন মধুসূদন-দীনবন্ধু-অমৃতলাল প্রমুখ পূর্ববর্তী নাটকরচয়িতা।

দ্বিজেন্দ্রকৃত প্রহসননিচয়ের নাম হলো: কল্কি-অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম, এবং আনন্দবিদায়—১৮৯০ থেকে ১৯১২ ইংরেজি সালের মধ্যে রচিত। **'কল্কি-অবতার'**-এ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের মানুষ লেখকের পরিহাসের পাত্র হয়েছে। পরিহাস করার উদ্দেশ্য, দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে মানুষগুলার চরিত্র-সংশোধন। 'অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যরস-অংশটুকু দেখানো' **'বিরহ'**-তে প্রহসনকারের অভিপ্রায়। **'ত্র্যহস্পর্শ'**-এ হাস্যরস ভালো জমেনি। পাশ্চাত্ত্য-মনোভাবাপন্ন, আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত পুরুষরমণী, এবং তৎকালীন হিঁদুয়ানিগর্বিত ব্যক্তিদের উপহাস করা হয়েছে **'প্রায়শ্চিত্ত'** নামে প্রহসনখানাতে। মৃত্যুর পর যা যা ঘটবে তার অভিনয় চাক্ষুষ করলো যাদব চক্রবর্তী—ঘটনাচক্রে যে প্রায় মরতে বসেছিল। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই জ্ঞানটি সে লাভ করলো যে, যথার্থ সুখ-শান্তি আত্মাদরে নেই, নেই পরকে বঞ্চনা করে অর্থবিত্ত সঞ্চয়ের মধ্যে; মানুষের বিনির্মল

আনন্দ-আহরণের একমাত্র পথ হলো আত্মতৃপ্তি নয়, আত্মব্যাপ্তি। এরূপ একটি বোধ যাদব চক্রবর্তীর জন্মান্তর ঘটালো যেন! **'আনন্দবিদায়'**-এ দ্বিজেন্দ্রের রবীন্দ্রবিদ্বেষ সুপ্রকট। লেখকের দুর্ভাগ্য, রবীন্দ্রকবির সঙ্গে নিজের বিরোধকে তিনি নাট্য-সংসারেও টেনে আনলেন।

এসকল প্রহসনের ওপরে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার-খ্যাতি নির্ভর করে না।

পৌরাণিক নাটক: পাষাণী, সীতা, ভীষ্ম—এ তিনখানা। দ্বিজেন্দ্রের মনের গঠন এই জাতের নাটক-রচনার উপযোগী ছিল না। পাশ্চাত্ত্য মানসিকতা পুরাণাশ্রয়ী ভক্তিমূলক নাট্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। পৌরাণিক নাট্য দেবতা-অধ্যুষিত ভক্তি ও বিশ্বাসের জগৎ, আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় পরিবেস্টিত, লৌকিক আর আলৌকিক এখানে মিলেমিশে একাকার। দ্বিজেন্দ্রলালের সতত বিহরণ বাস্তবলোকে, ধর্মজিজ্ঞাসা কিংবা অধ্যাত্মচিন্তা তাঁর চিত্তকে বড়ো-একটা নাড়া দেয়নি। কাজেই, ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটক তাঁর লিখবার কথা নয়।

তথাপি, পুরাণের রাজ্যে তিনি পদক্ষেপ করেছেন, পুরাণকথিত চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে নাটক লিখেছেন। লিখলেও, এদের পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, তা ভেবে দেখবার বিষয়। এগুলোতে আধুনিক ভাব ও ভাবনার রঙ্‌ লেগেছে, স্বপ্নসুন্দর পৌরাণিক জগৎ পরিদৃশ্যমান বাস্তব মানবসংসারের রূপ-পরিগ্রহ করেছে। দ্বিজেন্দ্রের রচনায় পুরাণের ভাবাদর্শ বিপর্যস্ত। **'পাষাণী'** [১৯০০] নাটকে অহল্যা, দেবরাজ ইন্দ্র, প্রভৃতি চরিত্র একেবারে ধুলামাটির জগতের সাধারণ মানবমানবীতে পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যর্থযৌবনা চরিত্রভ্রষ্টা অহল্যাকে লেখক কিছুটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার পতনের মূলে পুরুষকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী করেছেন। এখানে পৌরাণিক আখ্যানের নতুন ব্যাখ্যান নাট্যপ্রণেতার কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। রামায়ণ ও 'উত্তররামচরিত'-কে ভিত্তি করে **'সীতা'** [১৯০৮] নাটক রচিত। কয়েকটি দৃশ্যে নাট্যকারের স্বকীয় কল্পনার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বিনম্র শ্রদ্ধাসংকারে তিনি সীতা-চরিত্র নির্মাণ করেছেন। পাতিব্রত্যে, হৃদয়ের সৌকুমার্যে সীতা অতিশয় প্রেক্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। এহেন সীতাকে ভোগ করতে হলো নির্বাসনজনিত কত-না ক্লেশ। এই নাটকের রচয়িতা জানকীকে বিসর্জনের পেছনে বশিষ্ঠের প্ররোচনার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে শ্রীরামকে দর্শকের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত রেখেছেন। উন্নতশ্রেণীর নাটক নয় সীতা; সংলাপে নাটকীয় সৌন্দর্য তেমন ফোটেনি; পদ্যছন্দে লেখা এই নাটকে ছন্দগত চারুতার অভাব লক্ষিত হয়।

'ভীষ্ম' [১৯১৪] অপেক্ষাকৃত সুলিখিত নাটক। ভীষ্মের চরিত্রালেখ্য সুন্দর ফুটেছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব এ চরিত্রকে অতীব মনোজ্ঞ করে তুলেছে—একদিকে অকম্পিত অঙ্গীকার, অন্যদিকে, নারীর প্রেম—প্রণয়বাসনার অনিরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। শেষাবধি নিজের প্রতিজ্ঞাকে অক্ষত রেখেছেন যুবক দেবব্রত। প্রত্যাখ্যাত অম্বার জন্যে আমরা অন্তরে বেদনা অনুভব করি। এই নাটকে পৌরাণিক ভারতবর্ষ তার সৌন্দর্য ও মহিমায় প্রতিফলিত। নাটকখানিতে লেখকের পরিণত প্রতিভার স্পর্শ মেলে।

নাট্যনির্মাতা দ্বিজেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঐতিহাসিক নাটকগুলো। প্রহসনে তিনি খুব দক্ষতা দেখাতে পারেননি, পৌরাণিক নাটক-রচনায় তেমন উৎসাহ বোধ করেননি, সামাজিক নাটকে তাঁর প্রতিভার পরিচয়বাহী কোনো বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়েনি। ঐতিহাসিক নাটকের ভূমিতে পদক্ষেপ করে দ্বিজেন্দ্রলাল যথার্থ স্বক্ষেত্রটি পেলেন। ঘটনার পটভূমি যেখানে বিস্তীর্ণ, যেখানে রাজনীতিক পটপরিবর্তনের কল্লোলিত সমারোহ, ইতিহাসের দ্রুতধাবমান রথচক্রের গম্ভীর নির্ঘোষ, কুটিল চক্রান্ত, পিতৃদ্রোহ-ভ্রাতৃদ্রোহ, রক্তমুখী জিগীষা ও জিঘাংসা, যেখানে প্রবৃত্তির বহ্নিময় সংক্ষোভ, রহস্যময় হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলা, নারী-সুরা-সৌন্দর্যের ফেনিল উন্মত্ততা, সেখানে নাট্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রের সৃজনীকল্পনার অবারিত স্ফূর্তি। ইতিবৃত্তকথার মোটামুটি অনুগত থেকেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, বিশেষ কোনো ভাবাদর্শের প্রয়োজনে ইতিহাসে বর্ণিত কোনো ঘটনা কিংবা চরিত্রের রূপান্তর-সাধন করেননি। তবে, ইতিহাস যেখানে নীরব, নিজের স্বাধীন কল্পনাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে কল্পনার অতিরেক লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস সেখানে রোম্যান্সে পরিণত হয়েছে ; ফলে ঐতিহাসিক নাটক রোম্যান্টিক নাটকের চেহারা পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রের জাতীয়-ভাবে অনুপ্রাণিত নাটকগুলো স্বদেশি-আন্দোলনের যুগে রচিত—তাঁর চিত্তে ছিল স্বাদেশিকতার প্রেরণা। দেশাত্মবোধমূলক এসকল নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, বাঙালিসন্তানকে সেদিন জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল —'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন' এই শ্রেণীর নাটক। এখানে লেখক রাজপুতজাতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেছেন, রাজপুত-মোগলের সংঘাত-সংঘর্ষের আলেখ্য এঁকেছেন। মোগল-আমলে রাজসিংহাসনকে কেন্দ্র করে ক্রূর ষড়যন্ত্র, গৃহযুদ্ধ, রক্তপাতন, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের শোচনীয় আত্মবিনাশের যে-ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার কিছু কিছু ঘটনা

'নূরজাহান', 'সাজাহান' নাটকে আমন্ত্রিত। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের কথাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে হিন্দুযুগের ইতিবৃত্ত থেকে। এগুলি ১৯০৪-১৯১১ ইংরেজি সালের মধ্যে লিখিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রকৃত• ঐতিহাসিক নাট্যগুলিকে অনেকে ঠিক ঐতিহাসিক বলতে সংকুচিত হবেন ; আর, অতিনাটকীয়তার ভাগ [বিশেষত, পরিণামের দিকে] বেশি আছে বলে, দোষদর্শী সমালোচক এগুলিকে নাটক বলতেও দ্বিধা করতে পারেন। তবু একথা বলা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজি নাট্যাদর্শ সম্মুখে রেখে, আধুনিক মনের উপযোগী করে, এদের যথাসাধ্য সাহিত্যিক ও শিক্ষিত-জনপ্রিয় নাটকরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই পর্যায়ের নাট্যকর্মে প্লটনির্মাণ, চরিত্র-সংঘাত-বর্ণন, প্রভৃতির দিক থেকে শেক্‌স্‌পীয়রের অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায়। সংলাপগুলি কোনো কোনো স্থলে ভাবময় ও অলংকারবহুল ভাষায় নিবদ্ধ হয়েছে, এবং অনর্থক দীর্ঘ হয়ে নাটকীয় সংঘাতের বাধা জন্মিয়েছে, একথা স্বীকার করতে হবে। সংগীত তাঁর নাটকগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে ও জনপ্রিয় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এদের ভাব, ভাষা ও সুর উত্তম।'

'**তারাবাই**' [১৯০৩] দ্বিজেন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। এতে নাট্যকলা-সৌন্দর্যের নিতান্ত অভাব। নাটকখানা লেখকের অপরিণত প্রতিভার সৃষ্টি। এর ঘটনাবৃত্ত রাজস্থানের ইতিহাসকে আশ্রয় করেছে। ইতিবৃত্তের বিক্ষিপ্ত বিবরণকে নাট্যকার সংহত রূপ দিতে পারেন নি। তাই, নাটকীয় রস জমেনি। 'তারাবাই' কবিতার ছন্দে লিখিত। এর ছন্দিত সংলাপ লালিত্যবর্জিত। পরবর্তী নাট্যকৃতি '**প্রতাপসিংহ**' [১৯০৫], নাটক-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেলো। জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে এ নাটক লিখেছেন তিনি, তাঁর দেশবাৎসল্য সংশয়াতীত। রাজপুতবীরকুলশ্রেষ্ঠ রাণা প্রতাপের অনবচ্ছিন্ন কঠিন সংগ্রাম, অতুলনীয় বীর্যবত্তা, দেশের স্বাধীনতারক্ষাকল্পে তাঁর অনমনীয় সংকল্প ও মহান আত্মোৎসর্জনের সুদীপ্ত আলেখ্য এ নাটকে চিত্রিত। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল চারণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশাত্মবোধের উদ্দীপন '**দুর্গাদাস**'-এও [১৯০৬] লক্ষিত হয়। এখানেও মোগল-বাদশাহের সঙ্গে রাজপুতজাতির সংঘর্ষের আলেখ্য উন্মোচিত। রাজপুতদের বীরত্বের কাহিনী নাট্যাকারে গ্রথিত করেছেন লেখক, এই জাতির জাতীয় জীবনের ট্র্যাজেডি-অঙ্কনই, বোধকরি, এ নাটকে লেখকের অভিপ্রেত—দুর্গাদাসকেই তিনি ট্রাজিক

চরিত্র বলে বোঝাতে চেয়েছেন। একটি উক্তি ঘুরে-ফিরে বারংবার কানে বাজে: 'ব্যর্থ হয়েছে, পারলাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে।' নাটকখানিতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলনের কথাও উচ্চারিত হয়েছে। ঘটনাবাহুল্য 'দুর্গাদাস'-এর কাহিনীকে একমুখী হয়ে উঠতে দেয়নি। ভিন্নতর কিছু-কিছু দোষত্রুটি সমালোচক এতে দেখতে পাবেন। **'মেবারপতন'** [১৯০৮] নামটিতেই নাটকে বর্ণিত মূল ঘটনার পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে। দুর্বার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে গোবিন্দসিংহ, অমরসিংহ প্রভৃতি লড়েছেন, কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। নাটকখানিতে জাতীয় প্রেমের ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে বিশ্বপ্রেমকে। নাটকরচয়িতা নিজেই বলেছেন: 'এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি—সে-নীতি বিশ্বপ্রেম··· বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।' বুঝতে অসুবিধে হয় না, 'মেবারপতন' উদ্দেশ্যমূলক নাটক।

ওপরে কথিত নাটক-তিনখানির তুলনায় **'নুরজাহান'** [১৯০৮] নাট্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রের অনেক বেশি কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। এ রচনা য়ুরোপীয় ধরণের ট্র্যাজেডি। এখানে এক আশ্চর্য ট্র্যাজিক নারী-চরিত্র রূপায়িত হয়েছে: সে—নূরজাহান—প্রবৃত্তির বশীভূত, প্রতিহিংসাপরায়ণা, ক্ষমতালোলুপ, অন্তঃসংঘাতে দীর্ণচিত্ত, অপ্রকৃতিস্থ, অসহায়, অন্তিম দৃশ্যে সর্বরিক্ত। দ্বিজেন্দ্রলালের নির্মিত নাটকগুলোর মধ্যে 'নূরজাহান'-এ ট্র্যাজেডির তীব্রতা সর্বাধিক। একদিকে নিহত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে, ভোগক্লিন্ন জিগীষা; একদিকে রাজ্যব্যাপী ধ্বংসের আগুন ছড়ানো; অন্যদিকে, বিবেকের দংশন—আতঙ্ক ও কারুণ্যের এক অদ্ভুত দৃশ্য। পরিশেষে সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে নূরজাহানের বিধ্বস্ত নারীসত্তার মর্মন্তুদ হাহাকার। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'নূরজাহান'।

লেখকের নাট্যরচনক্ষমতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন **'সাজাহান'** [১৯০৯]। এই নাটক প্রভূত জনসংবর্ধনা লাভ করেছে, এবং বহু-অভিনীত। ইতিহাসের কাহিনীকে অবিকৃত রেখে, বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রকে ঐক্যের সূত্রে গেঁথে, চমৎকারজনক নাটকীয় রস সৃষ্টি করেছেন লেখক। ঘটনাধারা সর্বত্র সংঘাত-দ্বন্দ্বে আলোড়িত। স্নেহদুর্বলহৃদয়, পুত্রহস্তে বন্দী, অসহায় রাজেশ্বর শাজাহানের ক্ষোভ-আক্রোশ-গর্জন-ক্রন্দন-মর্মজ্বালার চিত্তস্পর্শী আলেখ্য এঁকেছেন নাট্যকার। ক্ষমতালোভী, শঠতা ও ক্রূরতার জীবন্ত মূর্তি ঔরঙ্গজেবের নাট্যে-প্রতিফলিত রূপ-মূর্তিটি দেখবার মতো। তার সুপ্ত মনুষ্যত্বের ক্ষণজীবী চকিত উদ্বোধন তাকে একেবারে নরপশুতে পরিণত হতে দেয়নি। এ নাটকে ট্র্যাজেডি যেমন সম্রাট

শাজাহানের, তেমনি, সিংহাসনলোভে-অন্ধদৃষ্টি ঔরঙ্‌জীবের। নাটকখানির 'শাজাহান' নাম রাখা হলেও, এখানে ঔরঙ্‌জীব-চরিত্রেরই প্রাধান্য।

বহুসমাদৃত, সর্বজনপরিচিত নাটক **'চন্দ্রগুপ্ত'** [১৯১১], ভারতের হিন্দুযুগের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে লিখিত। এই নাটকেও দ্বিজেন্দ্র কুত্রাপি ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা চরিত্রের বিকৃতিসাধন করেননি, কল্পনাকে কোথাও অবন্ধন করে তোলেন নি। নাটকের প্রধান ঘটনা কূটনীতিবিশারদ ব্রাহ্মণ-চাণক্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনলাভ। চাণক্যের দীপ্তির পাশে চন্দ্রগুপ্ত-চরিত্র নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সেলুকাস-এন্টিগোনাস্-হেলেনকে নিয়ে যে-উপকাহিনীটি এতে গড়ে উঠেছে, তা কম মনোজ্ঞ নয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' ট্র্যাজি-কমেডি পর্যায়ের রচনা। রঙ্গমঞ্চে অভিনন্দিত হলেও, নাটকীয় উৎকর্ষের দিক থেকে দেখলে,'নূরজাহান'-'শাজাহান'-এর তুলনায় এ হেয়। ঘটনা-সংস্থানগত ও চরিত্রকল্পনাগত এর নানান্ ত্রুটি সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় না। কিছু অসংলগ্নত প্রকাশ পেলেও চাণক্য দ্বিজেন্দ্রের নির্মিত এক স্মরণসুন্দর নাট্যচরিত্র।

সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে বর্তমান লেখকের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর। **'পরপারে'** [১৯১২] বৈশিষ্ট্যবর্জিত। অতিনাটকীয়তা একে ত্রুটিযুক্ত করেছে। নাট্যে বর্ণিত কাহিনীর পরিণতি স্বাভাবিক হয়নি। রচনা-হিসেবে এ বড়ো দুর্বল। **'বঙ্গনারী'** [১৯১৬] গিরিশের প্রণীত 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' নাটক-দুটিকে মনে পড়িয়ে দেয়। কাহিনীপরিকল্পনায় নতুনতা কিছু নেই। 'বঙ্গনারী'-র লেখক পাঠক-দর্শকের প্রশংসা দাবি করতে পারেন না।

দ্বিজেন্দ্র-নাট্যের পরিচিতি এই পর্যন্ত।

॥ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ॥

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ [১৮৬৭-১৯২৭] দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন লেখক। অনেকগুলি নাটক লিখেছেন তিনি, আমাদের নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতিভার বিচারে গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রের সমকক্ষ না হলেও, এঁদের দেশজোড়া খ্যাতির দিনেই, এদেশের রঙ্গালয়ের দর্শকগোষ্ঠী কৌতূহলী দৃষ্টিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের দিকে তাকিয়েছে। তাদের প্রত্যাশা অচরিতার্থ থেকে যায়নি। নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে নাট্যানুরাগীদের তৃপ্তিবিধানে ক্ষীরোদপ্রসাদ সচেষ্ট

হয়েছেন, বিভিন্ন ধরণের নাটক-রচনায় হাত দিয়েছেন। এ সকল নাটকের অভিনয় দেখে দর্শকসাধারণ কম আমোদপ্রমোদ উপভোগ করেনি। আলিবাবা-কিন্নরী-নরনারায়ণ-আলমগীর-প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বইয়ের লেখকের নামের সঙ্গে কমবেশি সকলেই পরিচিত। বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চে সর্বাধিক অভিনীত বইয়ের অন্যতম হলো 'আলিবাবা'—মনোরম গীতিনাট্য। স্বগত শিশিরকুমার ভাদুড়ির আশ্চর্য অভিনয়-নৈপুণ্যে 'আলমগীর' উচ্চখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'প্রতাপাদিত্য' মঞ্চস্থ হচ্ছে শুনলে দেশভক্ত বাঙালি একদা উৎকণ্ঠাতুর প্রতীক্ষায় থাকতো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাঙ্‌লার ইতিহাস নিয়ে লেখা দেশানুরাগরঞ্জিত প্রথম নাটক 'প্রতাপাদিত্য'।

স্বদেশপ্রীতিমূলক নাট্যের সর্বাদি লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় যে-দেশবাৎসল্যের সুরটি ধ্বনিত হলো, অল্পকালমধ্যে তা ধর্মভাবুকতা ও ভক্তি-ব্যাকুলতার নীচে চাপা পড়ে যায়—তখন গিরিশচন্দ্রের প্রণীত ভক্তিরসাত্মক নাটকই জনচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিংশ শতকে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের প্রাক্‌কালে সদ্য-কথিত দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটককে পুনরুজ্জীবিত করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এইসময়ে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের অভ্যুদয়। তাঁর কণ্ঠেও উদ্‌গীত হলো স্বদেশমন্ত্র। স্বরচিত কয়েকটি নাটকের মাধ্যমে সেদিনকার মুক্তিসাধক বাঙালি জাতিকে তিনি প্রবল দেশপ্রীতির বাণী শুনিয়েছেন। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, তেমনি, ক্ষীরোদপ্রসাদ, উভয়েরই খ্যাতি ইতিহাসমূলক নাট্যের জন্যে। তাঁদের কালটিকে বাঙ্‌লা ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।

রসায়ণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি জড়িত ছিলেন না। একারণে রঙ্গালয়ের পোষকতালাভ তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। প্রেক্ষাগৃহে কোন্ বস্তু পেলে দর্শকরা খুশি হয়, কোন্ সামগ্রী তাদের রুচির তৃপ্তিবিধায়ক, এ তাঁর জানা ছিল। থিয়েটারে সাধারণ বাঙালি দর্শকের প্রত্যাশিত সামগ্রী হলো নাচ, গান, রূপসজ্জা, যন্ত্রসংগীত, কৌতুক-রঙ্গ, সস্তা রোম্যান্স, স্বপ্নমধুর সম্ভব-অসম্ভব বিচিত্র ঘটনা, ইত্যাদি। এহেন রুচির দিকে দৃষ্টি রেখে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন নৃত্যগীতবহুল 'আলিবাবা' নাটকখানি। বইখানা রঙ্গালয়জগতে সাড়া জাগালো, এবং সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে লেখকের খ্যাতি ছড়ালো। এর সাফল্য তাঁকে উৎসাহিত করলো, একের পর এক নাটক লেখা হতে থাকলো। বঙ্গরঙ্গালয়ে সমাদৃত হলেন তিনি, তাঁর বহু নাটক অভিনীত হলো।

লক্ষ্য করতে হবে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ গীতিনাট্য লিখেছেন, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। কিন্তু তিনি প্রহসনের দিকে ঘেঁষেননি, সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেননি। ধরে নিতে হবে, এদিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না। প্রহসনকারের মেজাজ তাঁর নয়, আর, বোধকরি, চতুষ্পার্শ্বের অতি-পরিচিত সংসারে বিচরণ করতে তাঁর ভালো লাগতো না। অবাস্তব-মনোহর রূপকথার রূপলোকে তাঁর স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ; বাস্তব-অবাস্তবের সীমান্তবর্তী পৌরাণিক কাহিনীর জগতে ঘুরে বেড়াতে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি তিনি; ধর্মলীলাকে নাট্যবাণীতে রূপ দিতে তিনি উৎসাহ বোধ করেছেন। তাঁর চিত্তকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছে ইতিহাসের ঘটনারাজি, যদিচ ইতিবৃত্তমূলক ঘটনার বিশ্বস্ত প্রতিফলন তাঁর রচিত নাট্যে লক্ষিত হয় না।

ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে এসেছেন, সমসাময়িক লেখক দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রভাব এড়াতে পারেননি। কিন্তু বলতে বাধা নেই, গিরিশের ভক্তি-বিশ্বাস তাঁর মধ্যে অপ্রাপ্তব্য; দ্বিজেন্দ্রের কবিত্ব, শিল্পবুদ্ধি ও ভাষাশিল্প তাঁর আয়ত্তের বাইরে। এইজন্যে, গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রের নাট্যাদর্শ কোথাও কোথাও অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েও তিনি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেননি। তবে, দ্বিজেন্দ্রনাট্যসুলভ ভাবদ্বন্দ্ব তাঁর লেখা দু-একটি নাটকে লক্ষ্য করা যায়। ক্ষীরোদ-প্রসাদের নির্মিত নাট্যের বড়ো ত্রুটি—কল্পনার অতিচারহেতু 'এ্যাকশন' এখানে একরূপ আচ্ছন্ন, অনেক চরিত্রের ক্রিয়া ও আচরণ প্রায়শ সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়; এবং বুঝতে পারি, ঘটনা-সংস্থিতি-বিষয়ে তাঁর বোধ নিতান্ত অস্পষ্ট; একরূপ নিছক 'আইডিয়ালিজম্' কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নাট্য-কর্মকে রীতিমতো রোম্যান্সে পরিণত করেছে। তাঁর রচনায় ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি, কল্পনাকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। যথার্থ উত্তম নাটক বলতে যা বোঝায়, সেরূপ কোনো জিনিস ক্ষীরোদপ্রসাদ আমাদের উপহার দেননি। গোটা দুই-তিন মোটামুটি ভালো নাটক আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

ক্ষীরোদ-নাট্যাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয়:

এক ধরণের গীতিনাট্য রচনা করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ, যেগুলিতে ক্ষণে ক্ষণে রূপকথার রূপলোকের ছায়াসম্পাত হয়, উপকথার অসম্ভব ঘটনা ও চরিত্র এসে ভিড় জমায়, মাঝে মাঝে হিন্দুপুরাণের কাহিনীও উঁকি দেয়। এখানে লঘু কল্পনারই অবাধ লীলা, কাল্পনিকতার সহজ প্রবেশাধিকার, এবং এর সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে প্রচুর নাচগান—নয়নাভিরাম, শ্রুতিবিনোদন। এ জাতীয় রচনায় প্রকৃত নাটকীয় রসের স্ফুরণ কেউ প্রত্যাশা করে না, চরিত্রে কিংবা ঘটনায় সংঘাতও অপেক্ষিত নয়; স্বপ্নাবেশজড়িত রোমান্সরসে সিক্ত হতে পারাতেই দর্শকদলের আনন্দ। এইসকল গীতিনাট্যে লেখক কৌতূহল-উদ্দীপক গল্পকেই সংলাপে গেঁথেছেন, মায়াময় এক রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে তুলে বাস্তববিস্মৃতি ঘটিয়ে দর্শকদের অসম্ভবের—অভাবনীয়ের—মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। কাহিনীর রহস্যময়তা, রঙ্গরস, কৌতুক, রোমাঞ্চকর ঘটনা, নৃত্যগীত, ইত্যাদির সমাবেশে এসব গীতিনাট্য মনোহারী হয়েছে, সন্দেহ নেই।

এগুলির মধ্যে সব চাইতে উল্লেখ্য হলো **'আলিবাবা'** এবং **'কিন্নরী'**। ক্ষীরোদপ্রসাদের এ দুটি বইয়ের আদর খুব বেশি, রঙ্গমঞ্চে কতবার যে অভিনীত হয়েছে তার হিসেব নেই। এ ছাড়া আছে আলাদিন, বেদৌরা, বরুণা, ভূতের বেগার, জুলিয়া, রূপের ডালি, দৌলতে দুনিয়া, মিডিয়া, ইত্যাদি। এদের কয়েকটির কথাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে আরব-পারশ্য প্রভৃতি দেশের কাহিনী থেকে। এই শ্রেণীর গীতিনাট্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখতে হবে, গিরিশের প্রণীত 'আবুহোসেন' নাটকের কাঠামো সামনে রেখে তিনি 'আলিবাবা' প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করেন।

কয়েকটি পৌরাণিক নাটক: সাবিত্রী, ভীষ্ম, মন্দাকিনী, নরনারায়ণ। 'ভীষ্ম' ও 'নরনারায়ণ'-এর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। **'ভীষ্ম'** নাটকখানি একদা খুব প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু মঞ্চসাফল্য—জনসমাদর—নাটকের উৎকর্ষের একতম মাপকাঠি নয়। দেখা গেছে, বহুতর নিকৃষ্ট নাটক ভালো অভিনেতার অভিনয়-গুণে এবং ভিন্নতর কয়েকটি কারণে দর্শকসাধারণের করতালি পেয়েছে। 'ভীষ্ম' নাট্য শিথিলবন্ধ, হৃদয়াবেগের অভাবে কেমন যেন নিরুত্তাপ, মনোলোকের দ্বন্দ্ববিরহিত; কোনো কোনো জায়গায় সংলাপে যথোচিত গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়নি। **'নরনারায়ণ'**-এ দৈবশক্তির অলঙ্ঘ্য বিধানের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে—এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবল পুরুষকার পরাভূত। নিয়তির চক্রান্তে নায়ক-পুরুষ মহাবীর কর্ণকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হলো, ব্রহ্মশাপে তার অস্ত্রশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেলো। নাটকখানিতে কর্ণ-চরিত্রই আকর্ষণের বস্তু। কর্ণের চরিত্রচিত্রে রবীন্দ্রের একটি সংলাপ-কবিতার কথঞ্চিৎ ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। নাট্যের কাহিনী অতিদীর্ঘ হয়ে পড়েছে, অবান্তর দৃশ্য ও চরিত্রের সংযোজনে ঘটনাধারার কেন্দ্রমুখিতা বিচলিত হয়েছে। নাট্যকায়া-নির্মাণে ক্ষীরোদপ্রসাদ অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন;

ভক্তিমূলক নাটক **'রঞ্জাবতী'**-কে ভালো নাট্যের পর্যায়ে বিন্যস্ত করা চলে না। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নাটকখানি রচিত।

ঐতিহাসিক নাটকের নির্মাতা-হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম উল্লেখনীয়। তাঁর লেখা কয়েকখানি ইতিবৃত্তাশ্রয়ী নাট্যের নাম: প্রতাপাদিত্য, আলমগীর, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বঙ্গে রাঠোর, পদ্মিনী, চাঁদবিবি, ইত্যাদি। **'প্রতাপাদিত্য'** [১৯০৩] বহুশ্রুত একখানি নাটক, তেমনি, **'আলমগীর'** [১৯২১]— বহু-অভিনীত। স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তার উদ্বোধক 'প্রতাপাদিত্য'—উনিশের শতকের প্রথম দশকে, সেই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে, বঙ্গভূমিতে স্বাদেশিকতার উত্তাপ ছড়িয়েছে। সেইজন্যে বইটির এত নাম। প্রতাপ রায়কে লেখক স্বাধীনতা-ব্রতী, সংগ্রামী বীরপুরুষরূপে নাট্যে উপস্থাপিত করেছেন—দেশানুরাগের বাণী-প্রচারের সুযোগ মিলেছে লেখকের। প্রতাপাদিত্য বীর্যদীপ্ত একটি চরিত্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চরিত্রে সমুন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকাশ দেখানো হয়নি। ফলে প্রতাপের জীবনের বিষাদময় পরিণতি দর্শকচিত্তের সমবেদনা আকর্ষণ করে না। নাট্যকর্ম-হিসেবে 'প্রতাপাদিত্য' উচ্চশ্রেণীর নয়।

তুলনায়, 'আলমগীর' উৎকৃষ্টতর নাটক, ঔরঙ্‌জীবের চরিত্রালেখ্য রচয়িতার শিল্পকুশলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রতাপান্বিত বাদ্‌শাহ্‌ আলমগীর, কিন্তু তার অন্তঃপ্রকৃতিশায়ী দুর্বলতা তাঁকে নিশ্চিত পরাভবের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ এক প্রেক্ষণীয় দ্বন্দ্বময় নাটকীয় চরিত্র, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই আপনার ট্র্যাজেডিকে ডেকে আনছে। সংঘাতসংকুল কয়েকটি ঘটনা সুন্দর চিত্রিত। বড়ো রকমের কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও, 'আলমগীর' চিত্তাকর্ষক নাট্যকৃতি—ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বোত্তম রচনা।

চাঁদবিবি, পদ্মিনী, বঙ্গে রাঠোর, প্রভৃতি রচনায় নাট্যসৌন্দর্যের স্পর্শ তেমন চোখে পড়ে না। ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র আশ্রয় করে যে-দুয়েকটি নাটক লেখা হয়েছে সেগুলি বৈশিষ্ট্যহীন।

আধুনিক বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়কথন এখানে শেষ হলো। রবীন্দ্রনাট্যের পরিচিতি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে প্রাপ্তব্য।

॥ খাঁটি আধুনিক পর্বের বাঙলা কাব্য-কবিতা ॥

—নবযুগের প্রথম নতুন কবি মধুসূদন দত্ত—

খাঁটি আধুনিক পর্বের বাঙলা কাব্য-কবিতার কথা বলছি। প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু [১৭৬০] প্রাচীনতন্ত্রী বাঙলা কাব্যের একরূপ অবসান ঘোষণা করলো, বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পরবর্তী কবিওয়ালা, পাঁচালিকার ও টপ্পাসংগীত-নির্মাতারা অবশ্য আরো কিছুকাল আমাদের পুরাতন কাব্যঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এঁদের রচনায় মধ্যে সত্যিকার সাহিত্যোৎকর্ষ তেমন কিছু ছিল না, এসব গীতিকারদের মধ্যে কেউ কাব্যের শিল্পকলার রসান্তঃপুরে যথার্থ প্রবেশাধিকার পাননি, স্থূল আনন্দ বিলিয়ে—ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য-উত্তেজনা সৃষ্টি করে—এঁরা কবিতা ও গানের আসর থেকে যথাকালে বিদায় নিয়েছেন। প্রাচীন যুগের শেষ সীমান্তের কবিদল এঁরা।

তারপর নতুন যুগের শুরু হলো। ইংরেজ-আমলে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আধুনিকতার প্রথম সূত্রপাত। নবযুগের পূর্ণ-জাগরণের সমস্ত লক্ষণ তাঁর রচনাবলীতে অবশ্যই অনুপস্থিত। তিনি ছিলেন কিছুটা জাগ্রত, কিছুটা সুপ্ত —এক আলোআঁধারি জগতের মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, আধুনিক সাহিত্যাদর্শের ভিত্ তৈরি করলেন তিনি। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙলা কবিতায় অনেকগুলো নতুন জিনিস আনলেন। কাব্যের বিষয়বস্তু-নির্বাচনে তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। কবির আত্মভাবনার তথা সমাজচেতনার প্রথম প্রকাশ দেখলাম তাঁর লেখায়। তাঁর রচনায় প্রথম ধ্বনিত হলো নাগরিকতার সুর। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যে তিনিই প্রথম আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁকে নিঃসংশয়ে বঙ্গভূমিতে দেশবাৎসল্যের প্রথম উদ্‌গাতা বলা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত আবিলতামুক্ত হাস্যরস আমাদের প্রথম পরিবেশন করলেন তিনি। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাঙলা কবিতার শৈশবদিনের বিশিষ্ট কবি এই ঈশ্বরগুপ্ত। কাব্যের রূপরীতির বিচারে তিনি প্রাচীনপন্থী, কিন্তু মনোভঙ্গির দিক থেকে তাঁকে মোটামুটি একালের কবি বলতে কোনো বাধা নেই।

ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক কাব্যের বিগ্রহ গড়লেন, কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না; য়ুরোপীয় সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে তাঁর ভালোরকম পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। যথার্থ আধুনিক কাব্য এখনো দূরবর্তী—মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয়ের

পূর্বে এ জিনিসটা আমরা পাইনি। একালের কবিতার আসল ইতিহাস শুরু হলো মধুসূদনকে নিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এই যে অন্তর্বর্তী কালটি, এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কবি—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যনির্মাণের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈশিষ্ট্য তিনি দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মতো ধর্ম-উপধর্মের আঙিনায় তাঁর পদচারণা নয়, সাহিত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপনে তিনি মোটেই উৎসাহবোধ করেন নি। কবিতা লিখতে বসে, পুরনো রাস্তা না মাড়িয়ে, ইংরেজি আদর্শের দিকেই ঝুঁকলেন। তাঁর নির্মিত কাব্যের উপাদান প্রধানত সমাহৃত হয়েছে ভারত-ইতিহাসের পাতা থেকে। স্বদেশপ্রীতির প্রেরণায় অতীতের মুখে তিনি ভাষা দিলেন, দেশের ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসী হলেন। রঙ্গলালের কবিকণ্ঠে দেশাত্মবোধের সুরটি প্রবল হয়ে উঠলো। কাব্যে দেশানুরাগ-প্রচারে, ঈশ্বরগুপ্তের তুলনায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চকণ্ঠ। তাঁর কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্যও কিছু আছে। কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও রঙ্গলালকে খাঁটি আধুনিক কবি বলা চলে না। ঈশ্বর গুপ্তকে ছাড়িয়ে বেশিদূর তিনি অগ্রসর হতে পারেন নি। যথার্থ আধুনিক মানসিকতার স্পর্শে রঙ্গলালের কবি-আত্মার পূর্ণ জাগরণ হয়নি।

বাঙ্‌লা কবিতাকে চেহারায় ও অন্তঃপ্রকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক করে তুললেন মধুসূদন দত্ত। আমাদের দেশে এতবড়ো শক্তিমান কবি এর আগে আর জন্মাননি। মাতৃভাষায় য়ুরোপীয় আদর্শের উত্তম কাব্য রচনা করা যে সম্ভব, তিনিই তা আমাদের দেখালেন—ঈশ্বর গুপ্ত আর রঙ্গলালের যুগে তিনি একরূপ অসাধ্যসাধন করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্য মধুসূদনের হাতের মুঠোয় ছিল; পাশ্চাত্ত্য মহাকবিকুলের ভাবকল্পনাকে তিনি বাঙ্‌লা ভাষার খাতে বইয়ে দিলেন, এক আশ্চর্য অভিনব ছন্দ [মিল্টনী ছন্দ অমিত্রাক্ষর] প্রবর্তন করলেন। রূপাবয়ব ও ভাবধর্মে তাঁর লেখা কাব্যকবিতা [যেমন, মহাকাব্য, নাট্যধর্মী খণ্ডকাব্য, পাশ্চাত্ত্য 'ওড্'-জাতীয় কবিতা, 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতা, ইত্যাদি] এতখানি দুর্ধর্ষ স্বতন্ত্রতার পরিচয়বাহী যে, তাকে প্রথমে কেউ সহজ স্বীকৃতি জানাতে পারেনি—সেকালে এই কবিবিদ্রোহীকে বরদাস্ত করা কঠিনই ছিল। তাঁর কাব্যভাবনা, তাঁর ছন্দোরীতি-ভাষাভঙ্গি-অলংকারবিন্যাস—সবকিছুই অভিনব। যেখানে আগে জলতরঙ্গ বাজতো, সেখানে তিনি আমাদের অর্গান-বাজনা শোনালেন। মাইকেলের পর বাঙ্‌লা কাব্যকবিতা আর প্রাদেশিক সামগ্রী রইল না, তার পরিধি প্রসারিত

হয়ে, ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে, বড়ো পৃথিবীকে আলিঙ্গন জানালো। সাহিত্যের এই বিশ্বমুখী প্রসার আধুনিকতার খুব বড়ো একটি লক্ষণ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ ঘোষণায় আর স্বানুভূতির প্রকাশেও মাইকেল নিঃসন্দেহে আধুনিক। মধুসূদন দত্ত বাঙ্‌লা কাব্যে খাঁটি আধুনিকতার পথিকৃৎ।

পশ্চিমারীতির মহাকাব্যের প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করলেন তিনি, সেই পথে শোনা গেলো হেম-নবীনের পদসঞ্চার। তারপর, এই রাস্তা স্বাভাবিক কারণে রুদ্ধ হলো, কৃত্রিম মহাকাব্যের যুগ তখন অবসিত। তার স্থানটি অধিকার করে নিল একদিকে গদ্যে-লেখা উপন্যাস, অন্যদিকে, আধুনিক-প্রকৃতির 'লিরিক' বা গীতি-কবিতা। একালের গীতিকবিতার আসল পথপ্রদর্শক হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিহারীলালে যে-নতুন কাব্যধারার শুরু, রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পূর্ণতা। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র কিছু কিছু লিরিক অবশ্য লিখে গেছেন, যাঁদের ব্যক্তিক অনুভূতির —সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার—প্রকাশক গীতিধর্মী রচনা কিঞ্চিৎ আমাদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু যথার্থ লিরিকের প্রাণধর্মের উজ্জ্বল পরিচয় তাতে সর্বথা ফোটেনি, ফুটেছে বিহারীলালের রচনায়। বাঙ্‌লা কবিতার মোড় তিনি ঘুরিয়ে দিলেন, সেই পথ ধরেই আধুনিক গীতিকাব্যের সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার রসোচ্ছল যে-মূর্তি গড়লেন, ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা নেই। এতবড়ো গীতিকবি য়ুরোপেও খুব বেশি জন্মান নি।

রবীন্দ্রযুগে কয়েকজন কবি গীতিকবিতা লিখেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের স্বকীয়তাও দেখিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কাব্যলোকের নির্মাতা তাঁরা কেউ নন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কিছুসংখ্যক কাব্যকার রবীন্দ্রঐতিহ্যের পাশ কাটিয়ে ভিন্ন সুরের কবিতা লিখবার প্রয়াসী। এঁদেরই আমরা সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠি নামে চিহ্নিত করেছি। সাম্প্রতিক কবিতার সম্ভাবনা ও স্থায়িত্বের বিচার করবে ভাবীকাল।

* *

এবার যুগপ্রবর্তক শ্রীমধুসূদনের কথা। আমরা এতাবৎকাল বাঙ্‌লাকাব্যের কুঁড়েঘরখানিতেই বাস করছিলাম যেন। মধুসূদন দত্তের [১৮২৪-১৮৭৩] কবি-প্রতিভার যাদুশক্তিতে এই কুঁড়েঘর রাতারাতি বিশাল এক অট্টালিকায় পরিণত হলো। মধুসূদনের কাব্যরচনক্ষমতা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। মাত্র চার বৎসরকালের [১৮৫৯-৬২] সারস্বত সাধনায় তাঁর হাতে বাঙ্‌লা কাব্যের জন্মান্তর হলো। এরূপ আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীর আর কোনো দেশের সাহিত্যে ঘটেছে কিনা, আমাদের জানা

নেই। একেই বলে প্রতিভার অসাধ্যসাধন। কেবল কবিশক্তির প্রবলতার দিক থেকে দেখলে, বলতে হবে, মাইকেল অতুল্য। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব সত্যই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক একটি ঘটনা। মনীষী বঙ্কিম বলেছেন :

> এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর-মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী।...জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী।...সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ—'শ্রীমধুসূদন'।

বঙ্কিমের উক্তিটি তাৎপর্যমণ্ডিত। 'কবি' বলতে বঙ্কিম এখানে যুগপ্রবর্তক কাব্যস্রষ্টাকেই বুঝিয়েছেন। এহেন একজন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের শক্তিমান পথিকৃৎ তিনি। তাঁর হাতে যে-ধরণের সাহিত্য জন্মলাভ করলো, আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণ অভিনব। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিকর্মের সঙ্গে মাইকেলের রচনাসম্ভারের কোনোই মিল নেই। একদিকে, বহুবিধ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবগীতি, শাক্তগীতি, অন্যদিকে, মধুসূদনের কৃত তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ইত্যাদি। এদের মধ্যে যে-পার্থক্য তা সামান্য নয়—একেবারে দিন ও রাত্রির পার্থক্য। দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে মধুসূদন কাব্যরচনে প্রবৃত্ত হননি, কোনো ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন করতে তিনি হাতে লেখনী তুলে নেননি—কাব্যলক্ষ্মীর নিগূঢ় নির্দেশেই সাহিত্যের আসরে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের অঙ্গনে এই প্রতিভা-শিশুর উদ্দাম লীলা বিস্ময়কর।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের আসরে মধুসূদনের প্রথম আত্মপ্রকাশ নাট্যকারের ভূমিকায়। নাটক-রচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কাব্যরচনায়ও উৎসাহী হলেন, সম্পূর্ণ অভিনব একটি ছন্দ সৃষ্টি করলেন—অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই নবপ্রবর্তিত ছন্দে রচিত হলো তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' [১৮৬০]। মাইকেলের কাব্যপ্রতিভার আকস্মিক জাগরণ সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিল। এরপর তিনি আরো উচ্চাঙ্গ কাব্যপ্রণয়নে ব্রতী হলেন, অল্প-সময়ের মধ্যেই লিখে শেষ করলেন 'মেঘনাদবধ'। এটিই মধুসূদনের মৃত্যুঞ্জিৎ কবিকীর্তি। 'মেঘনাদবধ' মাইকেলকে 'মহাকবি'-র প্রতিষ্ঠা এনে দিল, বাঙ্‌লা-সাহিত্যেও যুগান্তর আনলো। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ'-এর প্রকাশকাল ১৮৬০ সাল। স্বল্পসময়ের ব্যবধানে আরো দুটি উৎকৃষ্ট কাব্য প্রকাশিত হলো—'ব্রজাঙ্গনা' [১৮৬১] এবং 'বীরাঙ্গনা' [১৮৬২]। ধরতে গেলে এখানেই মধুসূদন দত্তের কবিজীবনের সমাপ্তি।

'বীরাঙ্গনা' লেখার পর তিনি ইংলণ্ডে চলে গেলেন। ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরলেন ১৮৬৭ সালে। য়ুরোপবাসকালে তিনি কতকগুলি 'সনেট' রচনা করেছিলেন। এগুলিই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে ১৮৬৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যিনি ছিলেন কবি, ভাগ্যের পরিহাসে তিনি হলেন ব্যারিস্টার। অর্থাগমও হতে থাকলো। কিন্তু উদ্দাম অমিতাচার ও অদূরদর্শিতার জন্যে মাইকেল ঋণজালে জড়িয়ে পড়লেন, ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যটি হারালেন, এবং ব্যাধিকবলিত হয়ে অতিশয় শোচনীয় অবস্থায়, ১৮৭৩ সালে আলিপুরের চিকিৎসালয়ে, শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন—কবির বিয়োগান্ত জীবননাট্যের ওপর যবনিকাপতন হলো।

মধুসূদনের কবিজীবনের প্রারম্ভ যেমন অদ্ভুত, তেমনি, অদ্ভুত এর সমাপ্তি। এ যেন রাতের আকাশের বহ্নিমান এক প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড—দুরন্ত গতি আর তীব্রতম রশ্মিমালা নিয়ে চকিতে আবির্ভাব ও ক্ষণপরে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাওয়া। যতক্ষণ আকাশে বিরাজমান থাকে ততক্ষণ জ্বলন্ত উল্কার অস্তিত্বের স্বরূপটি ঠিক বুঝতে পারা যায় না, নিভে-গেলে-পর উপলব্ধি করতে পারি তার সত্যকার পরিচয়। বাঙ্‌লাসাহিত্যে মধুসূদন যে-আলোকশিখা ছড়িয়ে গেলেন, এতদিনে তার উজ্জ্বলতা হয়তো কিছুটা কমেছে, কিন্তু নির্বাপিত হয়নি। পরবর্তী কবিদলের কবিকৃতির মধ্য দিয়ে ওই শিখার দীপ্তি এখনো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

* *

*

পাঁচখানি কাব্যের নির্মাতা মধুসূদন—তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

'তিলোত্তমাসম্ভব' মাইকেলের প্রথম কবিকর্ম। কাব্যখানি চারটিমাত্র সর্গে সমাপ্ত। এর আখ্যানবস্তু অতিশয় সামান্য। উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ কোনো পরিচয় এতে নেই। ভাষা, ছন্দ ও অবন্ধন কল্পনা নিয়ে মধুসূদন এখানে যেন অভিনব এক কাব্যখেলায় মেতেছেন। ভবিষ্যতে যে-কবি মহাকাব্য সংরচনে নামবেন, 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এ তারই প্রস্তুতি চলছে যেন, কবি বুঝি তৈরি করলেন পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের একটি খসড়া! বর্তমান ছন্দিত রচনাটিতে মাইকেল দেশীয় কাব্য-পুরাণ ও দেশীয় কাব্যরীতির ওপরে য়ুরোপীয় ভাবকল্পনার কিঞ্চিৎ বর্ণসম্পাত করেছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর রূপলোকটিকে এক অবাস্তব স্বপ্নের অরণ্য বলা যেতে পারে—মধুসূদনের অপটু হাতের চিহ্ন কাব্যখানির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তথাপি, কবিকৃতিহিসেবে এর নতুনতা সকল কাব্যামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—১৫

বাস্তবিকপক্ষে, ১৮৬০ সালে 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর আত্মপ্রকাশ বাঙলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই বইখানিতে প্রথম আমরা শুনলাম রোম্যান্টিক ভাবধারার প্রথম কলধ্বনি, এবং বুঝতে পারা গেলো, নবীন কবি মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবে বঙ্গীয় কাব্যসংসারে ভারতচন্দ্রীয় যুগের অবসান ঘোষিত হলো। পুস্তকখানির কাব্যমূল্যের চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। সমালোচ্য কাব্যে দেবতাদৈত্যের জয়পরাজয়ের একটি ক্ষীণ কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। কাহিনীটি এই :

সুন্দ-উপসুন্দ প্রবলপরাক্রম দুই দৈত্যভ্রাতা। এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকের অধিকার হারিয়েছেন। হৃতস্বর্গ কী উপায়ে পুনরুদ্ধার করা যায় তা জানবার জন্যে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ব্রহ্মলোকে গিয়ে বিশ্বনিয়ন্তা ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের কথা শুনে বললেন, বরপুষ্ট দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় সংগ্রামে অজেয়, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই তাদের উচ্ছেদসাধন সম্ভব। আবার এক নতুন সমস্যা—বিচ্ছেদ ঘটানো যায় কী করে। এমন সময় দৈববাণী শুনতে পেলেন দেবতারা, বিশ্বকর্মাকে দিয়ে অপরূপা এক সুন্দরী সৃষ্টি করা হোক, এই নারীই দৈত্যভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনবে। দেববৃন্দের অনুরোধে শিল্পী বিশ্বকর্মা জগতের সমুদয় বস্তু থেকে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে নির্মাণ করলেন এক পরমাশ্চর্য রমণীমূর্তি—সৌন্দর্যে অনুপমা। মূর্তিটিতে যথাসময়ে প্রাণসঞ্চার করা হলো। এই অপূর্বশোভনা নারীরই নাম 'তিলোত্তমা'। দেবতা মদন তিলোত্তমাকে নিয়ে দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করলেন। সুন্দ-উপসুন্দ তার রূপে উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠলো, উভয়ে চাইলো তাকে নিজের অধিকারে আনতে। এতকালের পারস্পরিক প্রীতি তারা একমুহূর্তে ভুলে গেলো, দুভাইয়ে শুরু হলো সাংঘাতিক সংঘর্ষ, এবং এতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দুজনেই প্রাণ হারালো। অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ অপরাপর দৈত্যদের যুদ্ধে অনায়াসে পরাজিত করে হারানো স্বর্গরাজ্য নিজেদের অধিকারে ফিরিয়ে আনলেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব' নারীর মোহিনীশক্তির জয়গাথা, লিরিকের দীপ জ্বালিয়ে কবি মনোমদ সৌন্দর্যের আরতি-বন্দনা করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীরবীন্দ্র নারীর এই বিশ্ববিজয়িনী মূর্তির উদাত্ত সংগীত আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর অবিস্মরণীয় লিরিক 'উর্বশী'র মাধ্যমে। রবীন্দ্রের কল্পিতা 'উর্বশী' মধুসূদনের কল্পিতা 'তিলোত্তমা'-র কথা মনে করিয়ে দেয়।

'তিলোত্তমাসম্ভব' আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষরে রচিত। পয়ার-লাচাড়ি-প্লাবিত বাঙলা কাব্যসাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। পয়ার-লাচাড়ি,

ইত্যাদি ছন্দ এতকালযাবৎ আমাদের শুনিয়েছে অনুত্তরঙ্গ স্রোতস্বিনীর কুলুকুলুধ্বনি ; মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দই প্রথম আমাদের শোনালো উত্তাল মহাসমুদ্রের কলমন্দ্র। আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যে এই ছন্দটির প্রভাব গভীরচারী। তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়।

মধুসূদনের সর্বোত্তম কবিনির্মিতি **'মেঘনাদবধ'**—১৮৬১ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থখানি মধুসূদনকে মহাকবির দুর্লভ গৌরব ও অমরতা দান করেছে। এতে কবির যুগান্তকারী প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। 'মেঘনাদবধ'-এ বিষয়বস্তুর অসামান্যতা কিছু নেই, আছে সামান্য উপকরণে অসাধারণ রূপসৃষ্টির কুশলতার পরিচয়। ক্ষুদ্র একটি ঘটনাকে শক্তিধর মাইকেল মহাকাব্যোচিত উদাত্ততায় [sublimity] মণ্ডিত করেছেন। বহুবিচিত্র ভাবানুভূতিকে গভীর-গম্ভীর সংগীতে ফোটাবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা বাঙ্‌লা ভাষার রয়েছে, এই কাব্যে মধুসূদন তা আমাদের দেখালেন। শিল্পকৃতিহিসেবে 'মেঘনাদবধ'-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোনো কাব্য অপর কোনো বাঙালি কবি লেখেন নি।

'মেঘনাদবধ' নামটিই গ্রন্থখানিতে বর্ণিত কথাবস্তুর ইঙ্গিতবাহী। রামানুজ লক্ষ্মণের হাতে লঙ্কেশ্বর রাবণের বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদের নিধন-ঘটনাই বর্তমান কাব্যের বর্ণনীয়। এর মূল আখ্যান বাল্মীকির রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও, সংস্কৃত কিংবা বাঙ্‌লা রামায়ণ পড়ে মধুসূদন এ কাব্যরচনায় প্রাণিত হননি। আলোচ্যমান কাব্যে মানবের পৌরুষদৃপ্ত মূর্তির যে-আলেখ্য রূপায়িত ও নিয়তিকবলিত মানুষের মর্মান্তিক পরাজয়ের যে-কাহিনী বাণীবদ্ধ হয়েছে, তার আদর্শের জন্যে মাইকেল প্রধানত গ্রীককবি হোমারের কাছেই ঋণী। অবশ্য হোমারই শুধু আমাদের কবির একমাত্র ঋণদাতা নন, কাব্যখানি লিখতে বসে মধুসূদন, বস্তুত, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানা কবির কাব্যভাণ্ডার থেকে উপাদান আহরণ করেছেন। মাইকেল একদিকে যেমন ভারতীয় সাহিত্যের বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির দ্বারস্থ হয়েছেন, অন্যদিকে, তেমনি, পশ্চিমা সাহিত্যের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, টাসো, মিল্‌টন ও বায়রনের দিকে তাকিয়েছেন। 'মেঘনাদবধ' য়ুরোপীয় শিল্পাদর্শেই রচিত। এক্ষেত্রে গ্রীকপুরাণ তাঁর মস্তবড়ো সহায়ক হয়েছে। কাব্যখানির প্রসঙ্গে একটি পত্রে মধুসূদন লিখছেন :

> আমার ইচ্ছা, গ্রীকদেবতাপুরাণের সৌন্দর্য আমাদের প্রাচীন পৌরাণিকতার সঙ্গে মিলাইয়া দিব। মেঘনাদবধ-কাব্যে কল্পনা-শক্তিকে আমি অবাধে ছুটাইতে চাই, এবং বাল্মীকির সাহায্যও,

যতদূর পারি, পরিহার করিতে চাই। তবে ভয় নাই—একেবারে অহিন্দু কাব্য হওয়ার মতো তেমন কিছুই করা হইবে না। আমি গ্রীকপুরাণের গল্পগুলির অবস্থা ও উদ্দেশ্যটুকুই ধার করিব, এবং একজন গ্রীক—প্রকৃত গ্রীক—যে-ভাবে লিখিতে পাবে, তাহারই অনুসরণ-চেষ্টা করিব।

—কথাগুলিতে 'মেঘনাদবধ'-এর স্রষ্টার মনোভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রতিফলন সকলে লক্ষ্য করবেন। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই কাব্যের কায়াগঠনে মধুসূদন যদিও মাধুকবীর আশ্রয় নিয়েছেন, তথাপি, আমরা দেখতে পাব, এতে তাঁর মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ, কঙ্কাল যেখান থেকেই সমাহৃত হোক, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে কবির সৃজনীপ্রতিভা। এর ছত্রে ছত্রে আমরা মধুসূদন দত্তের কবি-আত্মার স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আর, এতে মাইকেলের পুরুষ-কণ্ঠস্বরটি যে-কোনো পাঠক চিনে নিতে ভুল করবেন না।

নয়টি সর্গযুক্ত মেঘনাদবধ-কাব্যে কবি সুকৌশলে লঙ্কাযুদ্ধের তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা গ্রথিত করেছেন।

প্রথম সর্গের নাম—'অভিষেক'। বাগ্দেবী বীণাপাণির আহ্বান ও বন্দনাগানে কাব্যের আরম্ভ। তারপর বস্তুনির্দেশ। রাজসভায় সমাসীন লঙ্কাধিপতি রাবণ দূতের মুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর নিধনবার্তা শুনলেন। এতে দুঃসহ হৃদয়যন্ত্রণা অনুভব করলেন তিনি। সহসা রাণী চিত্রাঙ্গদা সভাস্থলে প্রবেশ করে অনুযোগের সুরে বললেন, তাঁর বীরসন্তান বীরবাহু প্রাণ হারালো পিতারই [অর্থাৎ রাবণের] দোষে। রাবণ পত্নীকে প্রবোধবাক্য শুনিয়ে, রাক্ষসসেনাকে রণসাজে সজ্জিত হওয়ার আদেশ দিলেন। সৈন্যদলের পদভরে লঙ্কাপুরী কেঁপে উঠলো। এমন সময়ে পুরীর প্রাসাদ-উদ্যান থেকে পরাক্রান্ত পুত্র মেঘনাদ ছুটে এসে শোকাতুর পিতা রাবণের কাছে লঙ্কাযুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা করলেন। পুত্রের প্রার্থনা লঙ্কেশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত হলো। মেঘনাদের অভিষেকে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গের সকল ঘটনা ঘটেছে সুরলোকে—স্বর্ণভূমির অধিবাসী দেবদেবীগণ এর অভিনেতা। দেবরাজ ইন্দ্র রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মীর মুখে মেঘনাদের অভিষেক-সংবাদ শুনে বিচলিত হলেন। অতঃপর তিনি ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করলেন। দেবতাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎবধের অস্ত্র পেলেন। অজেয় মেঘনাদের মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠলো—রামানুজ এখন দৈববলে বলী। দ্বিতীয় সর্গটির নাম—'অস্ত্রলাভ'।

তৃতীয় সর্গ 'সমাগম' নামে চিহ্নিত। লঙ্কার প্রমোদউদ্যানে স্বামী মেঘনাদের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে বধূ প্রমীলা শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন। তাঁকে পুরীতে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী লঙ্কাবেষ্টন করে রয়েছে। এতে প্রমীলা অণুমাত্র ভয় পেলেন না। তিনি বড়বা নামে অশ্বে আরোহণ করে বীর-বিক্রমে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হলেন, রামচন্দ্র তাঁকে বাধা দিলেন না। পুরীতে পৌঁছে যথাকালে তিনি স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই বীরদম্পতীর মিলনে স্বর্গরাজ্যে উমা চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। বিজয়ার সঙ্গে উমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ-প্রমীলার মৃত্যুর পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলো।

চতুর্থ সর্গ, নাম—'অশোকবন'। অশোকবনে সীতা বন্দিনী। মেঘনাদ সেনাপতিপদে বৃত হয়েছেন, তাই, লঙ্কাপুরী আজ উৎসবে মেতেছে। চেড়ীদল সীতাকে ছেড়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছে। এই অবসরে বিভীষণের স্ত্রী সরমা সীতার কাছে এলেন ; রাবণ কিরূপে তাঁকে হরণ করলো, তাঁর মুখে তা শুনতে চাইলেন। সীতা রাবণের দুষ্কার্যের কথা ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন। সীতা-সরমা-সংবাদ মেঘনাদবধের শাখাকাহিনী—এর মাধ্যমে কবি সুকৌশলে অনেকগুলি অতীত ঘটনা ও ভাবী ঘটনার ওপর অলোকপাত করেছেন।

'উদ্যোগ' নাম রেখেছেন কবি পঞ্চম সর্গের। বহু বাধা, বহু প্রলোভন অতিক্রম করে, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রীদেবী মহামায়ার প্রসাদে লক্ষ্মণ আপনার অভীষ্ট বর লাভ করলেন। ধীরে প্রভাত-সমাগম হলো, প্রমীলা ও মেঘনাদ শয্যা ছেড়ে উঠলেন। মেঘনাদকে আজ যুদ্ধে নামতে হবে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর অনুমতি নিয়ে, মহারথী মেঘনাদ যজ্ঞশালার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রমীলা দেবী ভগবতীর কাছে স্বামীর কুশল প্রার্থনা করলেন। লক্ষ্মণ-কর্তৃক চণ্ডীর পূজা ও বরপ্রাপ্তি-ঘটনাই পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনীয়।

ষষ্ঠ সর্গের নাম রাখা হয়েছে—'বধ'। নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে মেঘনাদ আপন ইষ্টদেবতার আরাধনায় রত। এরূপ একটি অবস্থায় বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ তস্করের মতো সেই যজ্ঞগৃহে সহসা প্রবেশ করলেন। ইন্দ্রজিৎ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। দেবঅস্ত্রধারী লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হবার কোনো সুযোগ দিলেন না, একরূপ বিনাযুদ্ধে তাঁকে হত্যা করলেন। ইন্দ্রজিতের হত্যাকার্য সুসম্পন্ন করে লক্ষ্মণ শিবিরে রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন।

সপ্তম সর্গের নাম—'শক্তিনির্ভেদ'। রাত ভোর হতে-না-হতেই ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা লঙ্কানগরীতে ছড়িয়ে পড়লো। কৈলাসে মহাদেব রাক্ষসভরসা মেঘনাদের

শোচনীয় মৃত্যুতে বিষণ্ণ। ভক্ত রাবণকে রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে তিনি অনুচর বীরভদ্রকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দিলেন। অমিতপ্রতাপ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ভাগ্য তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে—তিনি নিজেই এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। রাবণ শক্তিশেলে লক্ষ্মণকে আহত করলেন, সংজ্ঞাহারা হয়ে রামানুজ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অষ্টম সর্গ—'প্রেতপুরী'। সেইদিনের যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য অস্ত গেলো। শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের পাশে শ্রীরাম রোরুদ্যমান অবস্থায় বসে আছেন। ভক্তবৎসলা পার্বতী রামচন্দ্রের মনোবেদনায় ব্যথিত। তাঁর অনুরোধে মায়াদেবী লঙ্কায় আবির্ভূতা হলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, শ্রীরাম প্রেতপুরীতে গেলেন, এবং প্রেতায়িত দশরথের কাছ থেকে লক্ষ্মণের পুনর্জীবনলাভের উপায় জেনে নিলেন।

নবম তথা শেষ সর্গের নাম—'সংস্ক্রিয়া'। মূর্ছাহত লক্ষ্মণ সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। রাত্রি প্রভাত হলো। রামচন্দ্রের শিবিরে আনন্দকোলাহল। রক্ষোরাজ রাবণের মুখে গভীর বিষাদের ছায়াপাত হয়েছে, বুঝলেন—তাঁর চূড়ান্ত পরাভব সমাসন্ন। পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্যে রামচন্দ্রের কাছে সপ্তাহকালের যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিলেন তিনি। শ্রীরাম তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। তারপর শ্মশানদৃশ্য। শ্মশানশয্যায় মৃত স্বামীর পাশে শোকাতুরা প্রমীলা উপবিষ্টা। সিন্ধুতীরে চিতা জ্বলে উঠলো, দেখতে দেখতে বীরদম্পতীর নশ্বর দেহ পুড়ে গেলো। চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে রাক্ষসদল অশ্রুসিক্ত চোখে শূন্য লঙ্কায় ফিরে এলো। পুরীর সর্বত্র শোকের মসীকৃষ্ণ ছায়া। অতঃপর—'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'।

অশ্রুতে মেঘনাদবধ-এর আরম্ভ, অশ্রুতেই এ কাব্য শেষ হয়েছে।

মেঘনাদবধ-কাব্যে মধুসূদন মানুষের পৌরুষবীর্যের মহিমা কীর্তন করেছেন। বাল্মীকির কল্পিত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কাব্যখানিতে রাবণ-মেঘনাদের পাশে একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। পুরুষকারের সাধক, আত্মপ্রত্যয়শীল রাবণ ও মেঘনাদই কবির চোখে শ্রদ্ধেয়—দেবতার কৃপাপ্রার্থী রামলক্ষ্মণকে তিনি কাপুরুষ বলেই জ্ঞান করেন। লঙ্কেশ্বর ও তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদ অশেষ শৌর্যের আধার, কিন্তু নিয়তির প্রতিকূলতায় তাঁদের পরাজয় মানতে হলো। এর চেয়ে শোকাবহ পরিণাম আর কী হতে পারে! মেঘনাদবধ দৈবাহত পুরুষের জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। ছন্দগরিমা, বাগ্‌বিভূতি, অলংকরণসজ্জা, চরিত্রচিত্রণকুশলতা, দূরাভিসারী কল্পনা,

ইত্যাদি বস্তু মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যকে এক উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। মেঘনাদবধ মধুসূদনকে বাঙ্‌লা কাব্যসংসারে অমরতা দিয়েছে।

অল্পকাল পরে ১৮৬১ সালে কবির 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা' বলতে কবি এখানে ব্রজনারী শ্রীরাধাকেই বুঝিয়েছেন। এই বইখানি লিখবার সময়, মনে হয়, মধুসূদন বিখ্যাত সংস্কৃতকাব্য 'পদাঙ্কদূত'-এ বর্ণিতা কৃষ্ণবিরহাতুরা শ্রীমতী রাধিকার কথা স্মরণ করেছিলেন। কাব্যটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বস্তু হলো এর লিরিক ভঙ্গি, রোমান্টিক কল্পনা। সর্বসমেত আঠারোটি পদ এতে রয়েছে, পদগুলির গীতঝংকার বাঙালি-পাঠকচিত্তকে সহজে আবিষ্ট করে। খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষা নিলেও মধুসূদন যে নিজের বাঙালিত্ব—বাঙ্‌লার বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রভাব—এড়াতে পারেননি, তার প্রমাণ এই 'ব্রজাঙ্গনা'। ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি, কবিজীবনেও, মাইকেল ছিলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী। তাই, অমিত্রাক্ষর-ছন্দ-নির্মাণে আশ্চর্য দক্ষতা দেখাবার পর মিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে নতুন ধরণের একটি গীতিকাব্য রচনা করলেন। তা ছাড়া, বীররস কিংবা করুণ-রসের পুনরাবৃত্তির দিকেও তিনি গেলেন না—আমাদের পরিবেশন করলেন প্রকৃতিরস।

'ব্রজাঙ্গনা'র পদনিচয়কে মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য 'ওড্'-জাতীয় কবিতার সমগোত্রীয় বলেছেন। এতে প্রযুক্ত ছন্দের পরিচয়ও কবি জানিয়েছেন; বন্ধু রাজনারায়ণকে একখানা চিঠিতে তিনি লিখছেন: 'আমি তোমাদের স্কন্ধে পয়ার বা ত্রিপদী চাপাইতে চাহিতেছি না—ইতালীয় মিশ্রছন্দকে বাঙ্‌লায় আনা যায় না কী?' যুগ-প্রাচীন পয়ার-লাচাড়ির মিশ্রণসাধন করেই মধুসূদন অভিনব ছন্দের রূপকল্প [pattern] নির্মাণ করলেন। 'ব্রজাঙ্গনা'-য় চরণ ও স্তবক-গঠনের ক্ষেত্রে কবি যে-বৈচিত্র্য ফুটিয়েছেন তা লক্ষ্য করবার মতো। মিত্রাক্ষর ছন্দের ক্ষেত্রেও মধুসূদনের দক্ষতার পরিচয় ফুটেছে।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে শ্রীরাধার কথা থাকলেও একে বৈষ্ণবপদগীতির পর্যায়ভুক্ত করা চলে না; কারণ, বৈষ্ণবকবির অধ্যাত্ম-অনুভবের প্রকাশ এতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, পদাবলীসাহিত্যের ভাবৈশ্বর্যও এখানে মেলে না। বৈষ্ণবকবিতা মুখ্যত গান; 'ব্রজাঙ্গনা' স্বরূপত লিরিকের সমষ্টি—পাঠ করবার জন্যে লেখা। বৈষ্ণবের পদাবলী ঈশ্বরীয় প্রেমের কবিতা, মধুসূদনের বিরচিত পদগুলি নিসর্গসংসারের পটভূমিতে মানবীয় প্রেমের কথা। মাইকেল বৃন্দাবনের রাধাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেননি, কবিচিত্তই এখানে রাধার স্থান অধিকার করেছে, আর, নিসর্গপ্রকৃতি যেন

কৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত। সে যা হোক, 'ব্রজাঙ্গনা' নিঃসন্দেহে সেকালে পাঠকের সমাদর পেয়েছিল।

১৮৬২ সালে কবির পত্রিকা-কাব্য '**বীরাঙ্গনা**' প্রকাশিত হয়। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ'-এর পর এই চতুর্থ কাব্যখানিতে মাইকেল পুনর্বার অমিত্রাক্ষর ছন্দের আশ্রয় নিলেন। বর্তমান পুস্তকখানিতে গ্রথিত হয়েছে এগার জন 'বীর' অর্থাৎ নায়িকা-আদর্শের 'অঙ্গনা'র [নারীর] বিরহভাবনাযুক্ত প্রেমানুভবমূলক পত্র। অবশ্য দুয়েকটি পত্রে ভিন্ন সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। রোমক কবি Ovid-এর 'Heroides' কাব্যখানি পত্রাকারে রচিত। এই আদর্শে ইংরেজ কবি Pope-এরও কিছু রচনা রয়েছে। অনুমান করা যায়, 'বীরাঙ্গনা'য় এ দুজন কবির কাব্য-রীতি কতকটা অনুসৃত হয়েছে। Ovid পুরাণকথিত বিভিন্ন নায়িকাকে নতুন মূর্তিতে গড়েছেন ; মধুসূদন ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত কয়েকজন নারীর হৃদয়ের আর্তি ব্যক্ত করেছেন। এসব নারী পৌরাণিক যুগের, কিন্তু 'বীরাঙ্গনা'-র কাব্যভাবনা আধুনিক কালের। কবির কল্পিত চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান, তাদের ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। এই কাব্যে পতিপ্রেমের উজ্জ্বল আলেখ্য যেমন আছে, তেমনি, সমাজ-অস্বীকৃত প্রেমের শিল্পসমৃদ্ধ রূপায়ণও স্থান পেয়েছে। দুঃশলা, ভানুমতী, শকুন্তলা, রুক্মিণী, শূর্পণখা, তারা, কৈকেয়ী, জনা, জাহ্নবী প্রমুখ নারীর কত বিচিত্র মনোভাবকে কবি নিপুণতাসহকারে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। 'ড্রামাটিক' ও 'লিরিক'-এর চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে, গম্ভীর ও ললিত দুটি সুর এখানে পাশাপাশি বেজেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণবিকশিত শিল্পরূপটি 'ব্রজাঙ্গনা'তেই মেলে। কাব্যখানিতে মধুসূদনের শিল্পসিদ্ধি অসংশয়িত।

১৮৬৬ সালে মাইকেলের '**চতুর্দশপদী কবিতাবলী**' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। ফরাসীদেশে অবস্থানকালে তিনি নতুন একশ্রেণীর কবিতা লিখলেন, এবং তার নাম রাখলেন—'চতুর্দশপদী কবিতা', ইংরেজিতে—'সনেট'। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক সনেট রচনা করে জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। মধুসূদন প্রত্যক্ষত এই কবিরই লেখা কবিতাগুলি পড়ে 'চতুর্দশপদী' রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। অবশ্য কেবল ইতালীয় সনেটের নয়, ইংরেজি সনেটের প্রভাবও মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে লক্ষ্য করা যায়। এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে, য়ুরোপযাত্রার পূর্বেই—১৮৬০ সালে—মধুসূদন প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা-রচনায় হাত দেন। এই সময়ে তিনি যে-কবিতাটি লেখেন তার নামপরিচয়—'কবি-মাতৃভাষা'। পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' শিরোনামায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

অপরবিধ কয়েকটি বস্তুর ন্যায়, সনেট-জাতীয় কবিতাও, বাঙ্‌লা সাহিত্যে মধুসূদনের দান।

কবি-মধুসূদনকে জানতে গেলে যেমন তাঁর 'মেঘনাদবধ' অবশ্যপঠনীয়; তেমনি, ব্যক্তিমানুষ মধুসূদনের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানতে চাইলে তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' একরূপ অপরিহার্য। এ বই কবির নিভৃত অন্তরলোকের বাতায়ন, এর ফাঁক দিয়ে মাইকেলের হৃদয়দেশটিকে চিনে নিতে পারা যায়। মধুসূদন দত্তের আত্মসম্পর্কের রসে চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ সঞ্জীবিত। এখানে কবি আত্মোন্মোচন করেছেন, নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনার মুখে ভাষা দিয়েছেন। 'চতুর্দশপদী'-পাঠে আমরা আরো জানতে পারি, খ্রিস্টান মাইকেল মনেপ্রাণে হিন্দু-বাঙালি ছিলেন,—বহুদূরবর্তী ফরাসীদেশের ভের্সাই-তে প্রবাসজীবন কাটাবার কালে বাঙ্‌লার কপোতাক্ষ নদ তাঁর মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়; কৈশোরের-দিন-গুলিতে-শোনা আগমনী ও বিজয়ার গান তিনি একমুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেন না; পৃথিবীর অগণন কবিদলের কাব্যসুধা তাঁকে তৃপ্তি দিলেও কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, এমন কি, ঈশ্বর গুপ্তের কবিমূর্তিও, তাঁর মানসদৃষ্টির সমক্ষে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করতে থাকে। এখন মাইকেলের অবস্থান সাত সাগর তেরো নদীর পারে বিদেশে, কিন্তু তাঁর মনটি পড়ে রয়েছে স্বদেশের আঙিনায়—চোখ বুজে মাতৃভূমির কথা ভাবতে প্রবাসী কবির কত-না সুখ।

মধুসূদনের লেখা বাঙ্‌লা সনেটগুলিতে আঙ্গিকগত ত্রুটি কিছু কিছু অবশ্যই রয়েছে। তথাপি, স্বীকার করতেই হয়, সনেটের আত্মার স্পন্দনটি তিনি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের সনেট কবিতার ইতিহাসে তাঁর নামটি স্মরণীয় হয়ে রইল। এখানে একটি কথা। সনেটের অতিক্ষুদ্র কায়া মধুসূদনের কবিপ্রতিভার উপযুক্ত বাহন যেন নয়, এ রচনাগুলিতে কবির আত্মপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলেই মনে হয়।

আখ্যানমূলক কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের কবিজীবনের আরম্ভ, অহংমুখ গীতাত্মক রচনা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে ওই জীবনের সমাপ্তি।

॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

মধুসূদনের সমকালে যে-কবিব্যক্তিটি বাঙালি জনসমাজের কাছে অজস্র সমাদর পেয়েছিলেন, তিনি—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩]। হেমচন্দ্রকে খুব ভাগ্যবান পুরুষ বলা যেতে পারে ; নিজের কবিশক্তির অনুপাতে তিনি অনেক বেশি কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন ; এমন কি, আশ্চর্যপ্রতিভাধর মাইকেলের কীর্তি হেমচন্দ্রের যশোরাশির তলায় একদা চাপা পড়েছিল। অবশ্য ইতিহাসের বিচার অন্যরূপ—তার পাতায় আজ মধুসূদনের নাম উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠেছে, হেমচন্দ্রের স্ফীতকায় খ্যাতি বিস্মরণের গোধূলিছায়ায় ক্রমবিলীয়মান। এতে এই সত্যটি প্রমাণিত হয় যে, লোকসাধারণের রুচি কবির যথার্থ বিচারক নয়, কবিকর্মের সত্যকার মূল্য-যাচাই হয় কালের কষ্টিপাথরে।

হেমচন্দ্রের রচনাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়, যেমন—মহাকাব্য, ক্ষুদ্রকায় আখ্যানকাব্য, দেশপ্রেম ও জাতীয়তামূলক কবিতা, সমাজ, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসাত্মক কবিতা, নিসর্গাশ্রয়ী কবিতা। কবি বিদেশি রচনার কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে চিন্তাতরঙ্গিণী, বীরবাহু, বৃত্রসংহার, আশাকানন, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা এবং 'কবিতাবলী' উল্লেখযোগ্য।

কবির লেখা প্রথম কাব্যখানির নাম **'চিন্তাতরঙ্গিণী'**। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এর অল্প কয়েক মাস পূর্বে মাইকেলের যুগান্তকারী রচনা 'মেঘনাদবধ' আত্মপ্রকাশ করেছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র দুজনার কাব্যরীতির মধ্যে কতখানি পার্থক্য। এখনো হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্র-রঙ্গলালের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি, এখনো তিনি ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহ্যের অনুসারী। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কবির কাঁচা হাতের লেখা। বিষয়বস্তু ছাড়া, লক্ষ্য করবার মতো, তেমন কিছুই এতে নেই। রীতির দিক দিয়ে এখানে প্রাচীন ধারার অনুসৃতিই চোখে পড়ে। হেমচন্দ্রের এক প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় ঘটনা কবিকে বিচলিত করেছিল, বেদনাতুর কবি লিখলেন 'চিন্তাতরঙ্গিণী'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থহিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় 'চিন্তাতরঙ্গিণী' হেমচন্দ্রকে কিছু কবিখ্যাতি এনে দিয়েছিল।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **'বীরবাহু'**, প্রকাশকাল ১৮৬৪ সাল। দেশানু-রাগের স্ফুরণ এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশপ্রীতি,

স্বদেশের ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং তজ্জনিত এক প্রবল উদ্দীপনা, তখনকার কবিসমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁরা জাতির অতীত গরিমা সন্ধান করে ফিরছিলেন। এই যুগাদর্শের প্রেরণা হেমচন্দ্রের রচনাতেও সক্রিয় রয়েছে, দেশবাৎসল্য তাঁকে স্বাজাত্যভিমানী করেছে।" বিদেশির শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ মাতৃভূমির হীনাবস্থা কবিকে ব্যথিত করেছিল, এর প্রতিক্রিয়ায় মুমূর্ষু জাতিকে তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন—'বীরবাহু কাব্য'-এ তাঁর দেশভক্তির প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম্।

কাব্যখানিতে একটি আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। আখ্যানটির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, এ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কবি নিজেই আমাদের জানিয়েছেন, 'পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।' পাঠানশক্তির কনোজ-আক্রমণ, এবং কনোজের যুবরাজ বীরবাহু কীভাবে ওই আক্রমণ প্রতিরোধ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসলো, তাকে নিয়ে কল্পিত কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। হিন্দুযুবক বীরবাহুর সুদীপ্ত দেশানুরাগ, তাঁর বীর্যবত্তা ও সাহসিকতা, তাঁর রণোন্মাদনা কবির লেখনীতে সুন্দর ফুটেছে। কথাবস্তুর বিচারে 'বীরবাহু' কাব্যহিসেবে আধুনিক, কিন্তু শিল্পাদর্শের বিচারে এ কাব্য প্রাচীনপন্থী। এর ছন্দ, ভাষা প্রভৃতি বস্তু রঙ্গলাল প্রমুখ কবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এর পর প্রকাশিত হলো সর্বাধিক উল্লেখ্য কবিকৃতি 'বৃত্রসংহার'। 'বৃত্র-সংহার' দুই খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে—প্রথম খণ্ড ১৮৭৫ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭ সালে। এটি দীর্ঘায়তন মহাকাব্য, চব্বিশটি সর্গে সমাপ্ত। কাব্যখানির বিষয়বস্তু ভারতীয় পুরাণকথা থেকে সমাহৃত। কাঠামোটি পুরাণশ্রয়ী হলেও এর রূপাদর্শে পাশ্চাত্ত্য এপিক-রীতির প্রভাব অনায়াসলক্ষ্য। এই কাব্যটিতে হেমচন্দ্র প্রত্যক্ষত মধুসূদনের প্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ করেছেন। মধুসূদন লিখলেন 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্র লিখলেন 'বৃত্রসংহার', উভয় কাব্যে দেবশক্তির সঙ্গে দানব-শক্তির সংঘাত বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া, একদিকে রাম-রাবণ, মেঘনাদ-প্রমীলা, সীতা-সরমা ; অন্যদিকে, ইন্দ্র-বৃত্র, রুদ্রপীড়-ঐন্দ্রিলা, শচী-ইন্দুবালা, ইত্যাদি চরিত্রগুলির সাদৃশ্য কারুর দৃষ্টি এড়ায় না। মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রভাবও 'বৃত্রসংহার'-এর ঘটনা আর চরিত্রপরিকল্পনায় সুপ্রকট। সমালোচ্য কাব্যখানিতে হেমচন্দ্র যে-অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তারো প্রবর্তয়িতা মধুসূদন দত্ত। সুতরাং মাইকেলের কাছে হেমচন্দ্রের কবিঋণ্ সামান্য নয়। সে

যা হোক, এতে হেমচন্দ্রের স্বকীয়কতার পরিচয়ও কিছু আছে। সে-যুগের পাঠকসমাজের কাছে 'বৃত্রসংহার' প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। তৎকালীন কয়েকজন খ্যাতনামা সমালোচক নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, মধুসূদনের চেয়ে অনেক বড়ো কবি হেমচন্দ্র। এরূপ একটি মন্তব্য একালের পাঠকের চিত্তে প্রতিবাদস্পৃহা জাগাবে, সন্দেহ নেই। কাব্যহিসেবে 'বৃত্রসংহার'-এর উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে দুচারটি কথা আমরা বলবো। কিন্তু তৎপূর্বে এতে বর্ণিত কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই :

বৃত্র ছিলেন অসুরদের প্রতাপান্বিত রাজা। ত্রিভুবনবিদিত তাঁব পরাক্রম। আবার, বৃত্রাসুরের ভক্তি ও তপস্যাশক্তি কম ছিল না। নিজ তপশ্চর্যার বলে মহাদেবকে পরিতুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে সে একটি ত্রিশূল ও সংগ্রামে অজেয়ত্ব-বর লাভ করে। দেবাদিদেবের বরপুষ্ট হয়ে দানবরাজ বৃত্র একদা স্বর্গরাজ্য অধিকার করলো। সুরধামের দেবতারা নিজেদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হলেন, তাঁরা আশ্রয় নিলেন পাতালপুরীতে। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচী সখী চপলার সঙ্গে নৈমিষারণ্যে অবস্থান করতে লাগলেন, এবং নিরুপায় ইন্দ্র কুমেরুপর্বতে গিয়ে নিয়তিদেবীর আরাধনায় রত হলেন।

দৈত্যপতি বৃত্রের স্ত্রী ঐন্দ্রিলা 'ছিল শচীব প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা। সে স্বামীকে অনুরোধ জানালো, শচীকে এনে তাঁর দাসীরূপে নিযুক্ত করতে। পত্নীকে ওই মনোবাঞ্ছা-পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃত্র সেনাপতি ভীষণকে পাঠালো নৈমিষারণ্যে—শচীকে ধরে নিয়ে আসুক। মর্তভূমিতে অসুবসেনাপতি ভীষণের আগমনবার্তা শুনে বিপন্না শচীদেবী পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করলেন। জয়ন্তের হাতে নিহত হলো ভীষণ। দৈত্যপক্ষীয় দূত স্বর্গবাজ্যে গিয়ে বৃত্রকে ভীষণের নিধনসংবাদ জানালে সে ক্রোধে জ্বলে উঠলো এবং তৎক্ষণাৎ পুত্র রুদ্রপীড়কে, শচীকে হরণ করে আনবার আদেশ দিলো। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত রুদ্রপীড়ের আক্রমণ ঠেকাতে পারলো না, নৈমিষারণ্য থেকে শচী অপহৃতা হলেন।

এদিকে, দেবরাজ ইন্দ্র কঠোব তপস্যায নিয়তিদেবীর তুষ্টিবিধান করলেন। নিয়তির আদেশে শিবের উদ্দেশে কৈলাসাভিমুখে ছুটে গেলেন তিনি। ইন্দ্রের মুখে দৈত্যপতির শক্তিমদমত্ততা আর শচীর অপহরণবৃত্তান্ত শুনলেন মহাদেব। আপন ভক্তের এই দুষ্কৃতি মহাদেবকে রোষাবিষ্ট করল। দধীচি-মুনির অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিয়ে ওই ভয়াল অস্ত্রে বৃত্রাসুরকে আক্রমণ ও সংহার করবার উপদেশ দিলেন তিনি বিপন্ন ইন্দ্রকে। অতঃপর দেবরাজ দধীচির শরণ নিলেন। দেবদলকে

সুরলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মহাপ্রাণ দধীচি তনুত্যাগ করলেন। তাঁর দেহাস্থি থেকে বিশ্বকর্মা-কর্তৃক 'বজ্র' নামে সংঘাতিক অস্ত্র নির্মিত হলো।

ওদিকে, শচীদেবী দৈত্যভবনে বন্দিনীরূপে অবস্থান করছেন। তাঁর দুঃসহ মর্মবেদনার দিনগুলিতে রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা তাঁকে প্রায়শ সঙ্গদান করতো, সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বস্ত করতে চাইতো। একদিন তা বুঝতে পেরে দৈত্যরাজমহিষী ঐন্দ্রিলা অত্যন্ত কুপিতা হয়ে উঠলো। সে পুত্রবধূকে শাস্তি দিতে ও শচীদেবীকে পদাঘাত করতে উদ্যতা হলে দেবতা অগ্নি আর জয়ন্ত এসে উভয়কে সুমেরুপর্বতে নিয়ে গেলেন। নিরপরাধা সতীনারীর ওপর অত্যাচারে বিশ্বনীতি আহত হলো, ঐন্দ্রিলার স্বামী বৃত্রাসুরের পতন আসন্ন হয়ে উঠলো—আরাধ্য দেবতা মহাদেব তাঁর প্রতি এখন সম্পূর্ণ বিমুখ।

অতঃপর ধর্মবলে বলীয়ান দেববৃন্দ পাপমতি দানবরাজকে আক্রমণ করলেন। দেবদৈত্যের এই সংগ্রামে প্রথমে রুদ্রপীড় প্রাণ হারালো। তারপর, বিশ্বকর্মার নির্মিত, ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত, বজ্রাস্ত্রের আঘাতে নিহত হলো দৈত্যপতি বৃত্র। বৃত্রাসুরের পতনে স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হলো। দেবতারা তাঁদের হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন।

ইন্দ্র-বৃত্রের কাহিনী খুবই প্রাচীন। ঋগ্বেদে ও পুরাণে এ ঘটনা বর্ণিত আছে। মহাভারতকার বনপর্বে দেবরাজ ইন্দ্র-কর্তৃক বৃত্রাসুরের যে-নিধনবৃত্তান্ত বাণীবদ্ধ করেছেন তাকে ভিত্তি করে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যখানি রচিত। অবশ্য ওই ঘটনাকে পল্লবিত করবার জন্যে কবিকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

এখন, গ্রন্থখানির কাব্যোৎকর্ষের কথা। 'বৃত্রসংহার' লিখে হেমচন্দ্র মহাকবি আখ্যা পেয়েছিলেন, যুগস্রষ্টা মধুসূদনের সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। 'বৃত্রসংহার'-এর আখ্যানবস্তু মহাকাব্যের উপযোগী একথা অবশ্যস্বীকার্য। এতে কাহিনী-পরিকল্পনার বিশালতা আছে, সমুচ্চ নৈতিক ভাবাদর্শের রূপায়ণ আছে, বর্ণনার গাম্ভীর্য আছে, বর্ণনীয় বিষয়ের [দেবশক্তির কাছে বলদৃপ্ত পশুশক্তির শোচনীয় পরাভব এর মূল বর্ণনীয়] চিত্তসমুন্নতিজনক মহিমা আছে। তথাপি, আমরা বলবো, শিল্পকৃতিহিসেবে এ কাব্যের মূল্য খুব বেশি নয়। একে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃত 'মেঘনাদবধ'-এর সঙ্গে তুলনার যোগ্য বলে বিবেচনা করি না। এ যেন মহাকাব্যের একখানি কঙ্কাল, এতে প্রাণের উত্তাপ নেই, গূঢ়সঞ্চারী রসাত্মার স্পন্দন এখানে অতিশয় ক্ষীণ। হেমচন্দ্র মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

কবির এতখানি ব্যর্থতার কারণ কী? উত্তরে বলা যায়, ক্লাসিক আদর্শের

মহাকাব্য হেমচন্দ্রের নিম্নতর প্রতিভার উপযোগী বিচরণক্ষেত্র নয়, খণ্ডকাব্য আর গীতিকবিতাই হলো তার উপযুক্ত বিহারভূমি। এক-এক কবির শিল্পসিদ্ধি এক-একটি বিশেষ এলাকায়, নিজস্ব এলাকা ছেড়ে ভিন্নতর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। অনুকরণের মোহে পড়ে হেমচন্দ্র মহাকাব্যের দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তাই, তাঁর সকল শ্রম পণ্ড হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, একটি বড়ো ঘটনাকে ছন্দে গাঁথতে পারলেই তা মহাকাব্যে দাঁড়িয়ে যায়। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে কেবল কাহিনীর বিশালতা আর বিষয়বস্তুর মহিমাই বড়ো কথা নয়, এর রসরূপ-নির্মাণের জন্যে যথোচিত ভাষা, ছন্দ, অলংকারসজ্জা, ইত্যাদি সামগ্রীর দিকেও কবিকে তাকাতে হয়। সার্থক কবিকর্ম ভাবের চিত্ররূপময়ী বাণী ছাড়া আর কী? ভাষার ওপরে হেমচন্দ্রের সত্যিকার আয়ত্তি ছিল না, ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা তিনি খুঁজে পাননি—প্রসাধনকলাবর্জিত, নীরস, বৈচিত্র্যহীন ভাষায় তিনি কাব্যের কায়াগঠন করেছিলেন। এর ফলে 'বৃত্রসংহার' কলাশ্রীসৌষ্ঠব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, শোভন পারিপাট্যের অভাবে চিত্তহারী শিল্পকর্ম হয়ে ওঠেনি। কাব্যের অন্তরঙ্গের রসধ্বনি বহিরঙ্গের সৌষ্ঠবের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আলোচ্যমান কাব্যে প্রকাশভঙ্গির চারুতা নেই, কারুকলার কোনো পরিচয় নেই। কবি সাধারণ পাঠকগোষ্ঠির দিকে তাকিয়ে বইখানি লিখেছেন, অনুশীলিতরুচি রসজ্ঞের কথা একেবারেই ভাবেননি।

'বৃত্রসংহার' কাব্যের আরো একটি বড়ো ত্রুটি হলো, যে-অমিত্রচ্ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে হেমচন্দ্রেন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, মধুসূদনের প্রভাবে এসে, সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই তিনি তাঁর কাব্যের প্রধান বাহনরূপে গ্রহণ করেছেন। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই, হেমচন্দ্রের হাতে অমিত্রচ্ছন্দ মিলহীন পয়ারে পর্যবসিত হয়েছে —মাইকেলের প্রবর্তিত এই অভিনব ছন্দটির কোনো বৈশিষ্ট্যই এতে ফোটেনি। ছন্দের যে-প্রবহমানতা, শব্দের যে-অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ মধুসূদনের প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষরকে অপূর্ব চারুত্বে মণ্ডিত করেছে, তা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় লক্ষিত হয় না। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ ভাবধর্মী, ভাবানুভূতির উচ্ছল প্রবাহে এ বেগবান। কবিকে এই একটিমাত্র ছন্দের মাধ্যমে বিচিত্র ভাব ও ভাবনাকে রূপায়িত করতে হয়েছে বলে বিবিধ কলাকৌশলে এ অতিশয় সমৃদ্ধ। হেমচন্দ্রের প্রযুক্ত ছন্দে এই কলাকৌশলের নিতান্ত অভাব। এতে অমিত্রচ্ছন্দের হিল্লোলিত গতিবেগ নেই, হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের নিপুণ সমাবেশজনিত গভীর-গম্ভীর ধ্বনিময়তা নেই, ভাষার প্রসাদ-গুণ, মাধুর্যগুণ, ইত্যাদি একেবারে অনুপস্থিত। বস্তুত, বিশিষ্ট কবিভাষা বলে কোনো

বস্তুই হেমচন্দ্রের ছিল না। পয়ার-লাচাড়ির সংস্কার বর্জন না করতে পারলে অমিত্রাক্ষরের নির্বিচার প্রয়োগ কাব্যে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে কতবড়ো ব্যর্থতা ডেকে আনে, হেমচন্দ্রের রচিত মহাকাব্যখানি তার দৃষ্টান্তস্থল। হেমচন্দ্র মাইকেল-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুবিধাটুকু [মিল না-দেওয়ার সুবিধা] গ্রহণ করেছেন, কিন্তু হিল্লোলসৃষ্টির [Rhythm] দায়িত্বটুকু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। মিল তুলে দিলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে ব্যবহৃত পয়ারের যে-চেহারাটি দাঁড়ায়, হেমচন্দ্রের নির্মিত ছন্দটি ঠিক তাই হয়েছে। অমিত্র পয়ারের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, মিল না-থাকার জন্যে পয়ারের মাধুর্যটুকুও এ হারিয়েছে। হেমচন্দ্র এই সত্যটি প্রমাণ করলেন যে, স্বধর্ম ছেড়ে পরোধর্মের আশ্রয় নিলে ব্যর্থমনোরথই হতে হয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো একটি দুর্বলতার কথা বলি। মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ আদ্যন্ত অমিত্রচ্ছন্দে রচিত। 'বৃত্রসংহার'-এ কিন্তু তা নয়, এখানে হেমচন্দ্র নির্দ্বিধায় মিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করেছেন। এ কৌশলটি তাঁর কাব্যের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছে, ছন্দোঘটিত বৈচিত্র্যবিলাস 'বৃত্রসংহার'-কে খোঁড়া করে দিয়েছে। অমিত্রাক্ষরের বিস্ময়কর প্রকাশশক্তিবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন বলেই হেমচন্দ্র নিজের এই কাব্যখানি একটিমাত্র ছন্দে লিখতে সাহস পাননি। যেখানে তিনি মধুসূদনকে অনুকরণ করতে গেছেন সেখানে তাঁর কবিকর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়েছে। হেমচন্দ্রের অপর একটি দোষ, মিত্রাক্ষর ছন্দে ক্রিয়াবিভক্তির মিল দিতেন তিনি—এ জাতের মিল ছন্দোনির্মাণে কবির শোচনীয় অক্ষমতারই পরিচয় বহন করে।

'বৃত্রসংহার' কাব্যহিসেবে সার্থক সৃষ্টি নয়, একে মহাকাব্যের ফাঁপা ফানুস বলা যেতে পারে—গদ্যাত্মক বক্তৃতার হাল্‌কা গ্যাসে পূর্ণ। কাব্যখানিতে ভালো মালমসলা কম ছিল না, কিন্তু কবির অক্ষমতার জন্যে এ রূপরসসমৃদ্ধ যথার্থ শিল্পকর্ম হয়ে ওঠেনি। তবে, বর্তমান কাব্যের দুয়েকটি জায়গায় হেমচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—এর প্রারম্ভ-অংশটি সুন্দর, বিশ্বকর্মার কর্মশালার বর্ণনাটি অবশ্যই প্রশংসার্হ—মিল্টন এবং দান্তের অনুকরণ সত্ত্বেও। সেকালে 'বৃত্রসংহার' আশাতীত সমাদর লাভ করেছিল, এবং কবিও তৎকালীন পাঠকগোষ্ঠির কাছে নগদবিদায়স্বরূপ বিস্তর খ্যাতি পেয়েছিলেন। একালের রসিকমণ্ডলী 'বৃত্রসংহার'-এর নামটি স্মরণ করে, কিন্তু এর পঠনে তার রুচি নেই। কৃত্রিম কাব্য যুগোত্তীর্ণ হয় না।

'আশাকানন'-এর প্রকাশকাল ১৮৭৬ সাল। এটি একখানি রূপক-কাব্য। বইটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে: "মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি-সকলকে

প্রত্যক্ষীভূত করাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরেজি ভাষায় এরূপ রচনাকে ‘এলিগরি’ কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিত্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যত সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি, কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্যবোধক।” স্বপ্নের রাজ্যে গিয়ে কবি আশাদেবীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে: কর্মক্ষেত্র, রত্নোদ্যান, যশঃশৈল, প্রণয়োদ্যান, শোকারণ্য, স্নেহ-উপবন, নৈরাশক্ষেত্র, ইত্যাদি। এসকল স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি-বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হলে স্বপ্নের কানন স্বপ্নবৎ শূন্যে মিলিয়ে যায়। এ কাব্য দশটি ‘কল্পনা’ বা সর্গে বিভক্ত এবং আগাগোড়া ত্রিপদীছন্দে লেখা। ইতঃপূর্বে রূপককাব্য বাঙ্‌লায় আর রচিত হয়নি, এই হিসেবে আমাদের সাহিত্যে একে নতুন জিনিস বলা যেতে পারে। অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত গদ্যবাহিত ‘স্বপ্নদর্শন’ অনেকটা এ জাতের রচনা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ রূপক-নাট্যে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ‘আশাকানন’-এ আশার কবি হেমচন্দ্র ভাবীকালের ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। তথাপি, উন্নত কাব্যের মর্যাদা একে দেওয়া যায় না। রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে এ বই যে লেখা হয়নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এর পরের রচনা **‘ছায়াময়ী’**—১৮৮০ সালে প্রকাশিত। এ কাব্যের ভাবকল্পনার জন্যে হেমচন্দ্র ইতালীয় কবি দান্তের কাছে ঋণী, এতে দান্তে-প্রণীত ‘ডিভাইনা কমেডিয়া’র ছায়াপাত হয়েছে। দান্তে তাঁর কাব্যে স্বর্গ, নরক, পরলোক, ইত্যাদির যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তা খ্রিস্টধর্মের অনুমোদিত, কবি বাইবেলের মতাবলম্বী। পক্ষান্তরে, হেমচন্দ্রের গ্রথিত স্বর্গ-নরকাদির বর্ণনা হিন্দুধর্মেরই অনুসারী। হেমচন্দ্রের কল্পনা যে লোকলোকান্তরে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতো এ কাব্যে তার পরিচয় আছে।

‘ছায়াময়ী’ কাব্য ‘পল্লব’ নামে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। শ্মশান-বর্ণনায় কাব্যখানি শুরু হয়েছে। এক ব্যক্তির স্নেহের দুলালী কন্যার মৃত্যু হয়েছে। ওই মৃত কন্যার শব কোলে নিয়ে তিনি শোকাতুর অবস্থায় শ্মশানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বিজন শ্মশানভূমিতে তাঁর মনে এই ভাবনার উদয় হলো—লোকান্তরিত কন্যাটি আজ কোথায় বিরাজ করছে? মৃত্যুতে কি জীবের সমস্ত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়? লোকটি যখন এরূপ চিন্তা করছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ রাত্রির আকাশের কোল থেকে এক দেবী পৃথিবীতে নেমে এলেন। তিনি শোকক্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে তাঁর কন্যার শবের দাহসংস্কার করতে বললে তাই করা হলো। দেবী

তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর বিদেহী দুহিতাকে দেখাবেন। এর পর দেবীর সঙ্গে তিনি উর্ধ্বে নক্ষত্রলোকে চলে গেলেন। সেখানে জীব-আত্মা নিজ নিজ কর্মফলভোগ করে। নরকের ভয়ংকর দৃশ্যসব তিনি দেখলেন। তারপর দেবীকে তাঁর অনুরোধ, তিনি এখন যেন নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করেন। নরক-প্রদর্শনান্তে বিশ্বকেন্দ্রস্থ ধর্মরাজের .বিচারপ্রণালী দেখিয়ে দেবী তাঁকে মর্তপৃথিবীতে নিয়ে এসে বললেন, তিনিই তাঁর কন্যা—'এবে অবিনাশী আত্মময় এ শরীর—ঘুচেছে স্বপন'। মানবাত্মার বিনাশ নেই এ-ই হলো দেবীর বক্তব্য। বলা বাহুল্য, এ বক্তব্য কবিরই। কবিকল্পনায় তেমন কোনো চমৎকারিত্ব, কাব্যভাবনায় লক্ষণীয় কোনো অভিনবতা, না থাকলেও 'ছায়াময়ী' সুখপাঠ্য একখানি গ্রন্থ।

পরবর্তী রচনা **'দশমহাবিদ্যা'**—১৮৮২ সালে প্রকাশিত। এখানে হেমচন্দ্রের কল্পনা তত্ত্বাশ্রয়ী এবং অধ্যাত্মমুখী। আমাদের তন্ত্রে ও পুরাণে দশমহাবিদ্যা [কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এরাই—the ten forms of Sakti] আদিশক্তিরই দশটি রূপাভিব্যক্তিমাত্র। হেমচন্দ্র তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে আধুনিক কল্পনা মিশিয়ে উক্ত দশ-মহাবিদ্যাকে কাব্যে প্রতিফলিত করেছেন। সতী দেহত্যাগ করলে অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে মহাদেব ব্যাকুল কান্নায় ফেটে পড়লেন। চরাচর শংকরের সঙ্গে কেঁদে আকুল। শোকাচ্ছন্ন কৈলাসে নারদ এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর হাতে বীণা ঝংকৃত হয়ে চলেছে। সেই বীণাধ্বনিতে অনন্ত জিজ্ঞাসা—কী করে এই জড়ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো? জড়বিশ্বে চেতনার সঞ্চার কী করে হলো? কোথা থেকে এলো অসংখ্য প্রাণীকুল? কোন্ মহাশক্তির কেন্দ্র থেকে জীবনধারা উৎসারিত?

মহাদেব সাময়িকভাবে মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন, নারদের বীণার ঝঙ্কারে তাঁর মোহ কেটে গেলো। ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি সতীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলেন—'সতী অনাদ্যারূপিণী ভবপ্রসবিনী'—বিশ্বসৃষ্টির কারণস্বরূপা অনাদিমহাশক্তি তিনি। মহাদেব বিশ্বচরাচরের ওপরকার মায়ার আবরণ সরিয়ে দিলেন। নারদ দেখতে পেলেন, মাটির ধূলি থেকে মহাকাশের সৌরমণ্ডল পর্যন্ত এক অনাদি শক্তির লীলা চলছে, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারটি এই শক্তিরই সৃষ্টি এবং এর দ্বারাই পরিচালিত—'অর্থহীন জড়ের নর্তন' বলে কিছুই এখানে নেই। শুধু তা নয়, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমবিবর্তনের ছন্দে বিধৃত, এ ধাবিত হচ্ছে এক মঙ্গলময় পরিণামের পথে। এই বিবর্তনের দশটি স্তরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের দশটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এ রূপ কিন্তু আসলে সেই আদ্যাশক্তি

মহামায়ার। উক্ত দশ ব্রহ্মাণ্ডের দশ অধিষ্ঠাত্রীদেবীই দশমহাবিদ্যা। মহাবিদ্যা দশমূর্তিতে প্রকাশমানা হলেও মূলে কিন্তু অদ্বৈতরূপিণী।

এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে কবি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, জগৎসংসারের আদিকারণ মহাশক্তির বিনাশ বা ক্ষয় নেই, শক্তি রূপান্তর গ্রহণ করে, কিন্তু কখনো ধ্বংস পায় না। এর প্রকাশ কখনো রুদ্র, কখনো শান্ত। নিষ্ক্রিয় শক্তিই জড়রূপে প্রতিভাত। এক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সকলই মানুষের শুভ কামনায় গ্রথিত। মানুষ যতক্ষণ মায়াচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ বস্তুর রূপান্তরগ্রহণকে তার বিনাশ বলেই মনে করে, এবং শোকে-মোহে কাতর হয়। কিন্তু যখন অবিদ্যাজাল ছিন্ন হয়ে যায় তখন মানুষ উপলব্ধি করে, জগৎসংসারে নতুন-কিছু আসে না, এখান থেকে কোনোকিছু চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়েও যায় না—মূলশক্তি তার রূপ বদলায় মাত্র।

কবিকথিত এই তত্ত্বের সঙ্গে ডারুইনের বিবর্তনবাদের [Theory of Evolution] মিল রয়েছে।' বিজ্ঞানের প্রচারিত 'Conservation and transformation of Energy'-র কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। স্পষ্টত বুঝতে পারা যায়, 'দশমহাবিদ্যা'-কাব্যে কবি দেবীর দশটি মূর্তির সঙ্গে মানবসভ্যতার দশ অবস্থাকে মেলাতে চেয়েছেন। একে পৌরাণিকী কল্পনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান বলা যেতে পারে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন দুরূহ একটি কাজ। কবি একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। একারণে কাব্যখানি অস্পষ্টতা-দোষে দুষ্ট হয়েছে। সে যা হোক, এতে হেমচন্দ্র কবিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'দশমহাবিদ্যা'-র কয়েকটি অংশ অতিশয় সুন্দর—রসের স্ফুরণে চিত্তাকর্ষক। সতীশূন্য কৈলাসের বর্ণনাটি উত্তম কবির লেখনীর উপযুক্ত। এ কাব্যে কল্পনার বিশালতার জন্যে কবি রসজ্ঞের প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

সর্বশেষে, হেমচন্দ্রের লেখা ছোট ছোট কবিতাগুলির কথা। দীর্ঘায়তন কাব্যে দক্ষতা দেখাতে না পারলেও, ক্ষুদ্রাকার গীতিকবিতাজাতীয় রচনাগুলিতে তিনি প্রশংসনীয় কুশলতা দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই। তাঁর এসকল রচনা সেকালে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে, একালেও উপেক্ষণীয় নয়। এগুলিকে খাঁটি 'লিরিক' বলা চলে না, এবং এরা সর্বাঙ্গসুন্দরও নয়। তবু এগুলি পড়তে খারাপ লাগে না। 'কবিতাবলী' নামীয় গ্রন্থের অশোকতরু, পদ্মের মৃণাল, লজ্জাবতী লতা, যমুনাতটে, হতাশের আক্ষেপ, ভারতসংগীত, গঙ্গা, পদ্মফুল, প্রভৃতি কবিতার কাব্যোৎকর্ষ অবশ্যস্বীকার্য। জাতীয়-ভাবের উদ্বোধক 'ভারতসংগীত' কবিতাটিতে হেমচন্দ্র চারণ-কবির ভূমিকায়

অবতীর্ণ। ব্যঙ্গকবিতা-রচনায় কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এজাতের কবিতায় তাঁর শক্তির মুদ্রাঙ্কন সুপ্রকট। কিন্তু 'বৃত্রসংহার'-এর নির্মাতা হেমচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি একরূপ উপেক্ষিতই হয়েছে। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কবি কয়েকটি উপভোগ্য কবিতা লিখেছিলেন, যেমন—'হায়, কি হলো','নেভার—নেভার','ইলবার্ট বিল', 'টেনেন্সি বিল', ইত্যাদি। অধুনা এগুলির কথা অনেকেই ভুলে গেছেন।

হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতায় ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক রয়েছে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, উনিশের শতকের শেষার্ধের প্রতিনিধি-কবি ছিলেন তিনি।

॥ নবীনচন্দ্র সেন ॥

আধুনিককালের শক্তিমান শেষ-মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন : মাইকেল মধুসূদন দত্ত নতুন যুগের মহাকাব্যের প্রথম-কবি। এঁদের মাঝখানে রয়েছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনজন কবিকে বিশেষ একটি কাব্যাদর্শের সূত্রে একত্র গ্রথিত করে 'ত্রয়ী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। হেম-নবীন মাইকেলের অনুগামী, কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট কাব্যমন্ত্রের যথার্থ উত্তরসাধক এঁরা কেউ নন। বিহারীলালের প্রবর্তিত অভিনব কাব্যধারা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেয়েছিল। এহেন উত্তরসূরী মাইকেল পান নি। এই হিসেবে মহাকাব্যের আসরে মধুসূদন দত্ত অসঙ্গ। কিছুটা যুগধর্মের প্রভাবে এবং কিছুটা সমগোত্রের কবির অভাবে মাইকেলি কাব্যরীতি ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রান্তরে হারিয়ে গেছে।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সমকালীন কবি। এঁদের কাব্যকীর্তি যত্নসহকারে আলোচনার যোগ্য। পূর্বে বলেছি, হেমচন্দ্র ভাগ্যবান কবি—উন্নত কবিপ্রতিভার অধিকারী না-হয়েও তিনি প্রথমশ্রেণীর কাব্যশিল্পীর সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, সেকালের সমালোচকরা তাঁর কবিকর্মের প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা দেখিয়েছেন—বিরূপ মন্তব্যই হয়েছিল তাঁর কবিবিদায়। মাইকেলের সম্পর্কেও অবিচার হয়েছে। কিন্তু এই অবিচার সেদিনকার সমালোচকের প্রকৃত কাব্যবোধের অভাবজনিত। নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না, তাঁর ক্ষেত্রে ভিন্নতর গূঢ় কারণ সক্রিয় ছিল। সেই কারণ-বিশ্লেষণের স্থান এ নয়। তৎকালীন সমালোচক-গোষ্ঠি হেমচন্দ্রের বহুনিম্নে নবীনচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু একালের কাব্যামোদীরা সেকালের বিচারকের রায় উল্টে দিয়েছেন—কালপ্রবাহে নবীন-কবি

ভেসে উঠেছেন, আর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় তলিয়ে গেছেন। সত্য কথাই বলি। প্রাক্‌রবীন্দ্র বাঙ্‌লা কাব্যে কবিপ্রাণতার দিক থেকে বিচারে নবীনচন্দ্রের জুড়ি নেই। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বিহারীলাল চক্রবর্তী—নবীন-বিহারী উভয়েই খুব প্রশস্ত কবিহৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন। উভয়ের মধ্যে আরো একটি সাদৃশ্য রয়েছে—এঁদের দুজনের কেউ নিজ নিজ প্রতিভার অনুপাতে সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পকৃতি রেখে যেতে পারেন নি। এঁরা যত বড়ো কবি ছিলেন, ততবড়ো শিল্পী ছিলেন না।

নবীনচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লার নবজাগৃতির ভাবধারায় লালিত, মধুসূদন-হেমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও যুগাদর্শের একজন বিশিষ্ট কবি। উনিশের শতকে য়ুরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালির চিত্তোন্মেষ ঘটেছে—সে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে, আত্মোন্নতির দিকে মন দিয়েছে ; দেশ ও জাতিকে চিনতে শিখেছে, জাতীয় দৈন্যস্মরণে তীব্র বেদনাবোধে নিজেকে সে পীড়িত বোধ করেছে, পরাধীনতার জ্বালা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। তার চিত্তে জেগেছে বিদেশি-শাসনের প্রতিরোধস্পৃহা, আর, জাতীয়-গৌরবের পুনরুজ্জীবনস্বপ্নে তখন সে বিভোর। এই ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত কয়েকজন বাঙালি মনীষী জাতিকে পূর্ণমনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করতে চাইলেন, বলিষ্ঠ মানবতার আদর্শ দেশের সম্মুখে তুলে ধরলেন। জাতির প্রাচীন কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর নতুন জীবনকে সাগ্রহে বরণ করে নেওয়া উভয়ই এই যুগটিতে সম্ভব হয়েছে।

এমন একটি যুগে এদেশের মাটিতে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। নবীনচন্দ্রের কাব্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনাবোধ ও আত্মগ্লানি, বহুবিচিত্র স্বপ্ন ও অভিলাষ ধ্বনিত হয়েছে। বলা যেতে পারে, যুগের কণ্ঠে তিনি ভাষা দিয়েছেন। যুগসমস্যায় তিনি উৎকণ্ঠিত, তার সমাধান সম্পর্কে অনুক্ষণ ভাবনা ও উদ্বেগে ক্লিস্ট। নানাবিধ দোষত্রুটি সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের রচনাবলী—তাঁর রঙ্গমতী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, ইত্যাদি রচনা—বিগত শতাব্দীর বাঙ্‌লার এক অভিনব সার্থক কাব্যপ্রচেষ্টা। বিপ্লবী মধুসূদন ও বিপ্লবী নবীনচন্দ্রের উজ্জ্বলন্ত নাম একসঙ্গেই স্মরণীয়। নবীনের কাব্যকবিতার প্রেরণা জুগিয়েছে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম। অথচ বিশ্বমানবতার সঙ্গে কবির এই দেশপ্রীতি, জাতিবাৎসল্য এবং স্বধর্মনিষ্ঠার কোনো বিরোধ নেই—কবির উদ্‌গীত মনুষ্যত্বধর্মের আদর্শ সকল বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে।

বাল্যকাল থেকেই নবীনচন্দ্র কাব্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর একেবারে প্রথম দিককার রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। কলেজে অধ্যয়নকালে প্যারীচরণ

সরকার-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এ তিনি প্রায়শ কবিতা লিখতেন। পরে যুগন্ধর কবি মাইকেলের প্রভাবে আসেন। তাঁর ওপরে হেমচন্দ্রের কোনো প্রভাব নেই, তবে রঙ্গলালের দিকে মাঝে-মধ্যে তিনি তাকিয়েছেন। ইংরেজ কবিদের মধ্যে একদা বায়রন তাঁর খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই বায়রনের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ ও গীতা নবীনচন্দ্র খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন —এইসব বইয়ের ওপরেই কবির ত্রয়ীকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, ইত্যাদির ভিত্তি রচিত। নবীনচন্দ্রের কবিকর্মের পরিমাণ কম নয়, তাঁর কাব্যসাধনা ছিল নিরলস।

কবি যে-বইখানি প্রথম প্রকাশিত করলেন, তার নাম—'অবকাশরঞ্জিনী'। এটি তাঁর প্রথমযৌবনের দিনে লেখা। এ গ্রন্থের নামটিতে বায়রনের 'Hours of Idleness' গ্রন্থখানির নামের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'অবকাশরঞ্জিনী' গীতি-কবিতার বই। এতে গ্রথিত কবিতাগুলি কবির রোম্যাণ্টিক মনের পরিচয় বহন করে। এগুলিতে লেখকের প্রণয়ানুভবের কথা আছে, স্বদেশানুরাগের প্রকাশ আছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাবনার প্রতিফলন আছে। ক্ষণস্থায়ী বিচিত্র ভাবানুভূতি কবির চিত্তকে আলোড়িত করেছে, কাব্যখানি তারই গীতিময় রূপায়ণ। কবিহৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শে এসব কবিতা উপভোগ্য। এদের আঙ্গিক-নির্মাণে অভিনবত্ব রয়েছে।

'অবকাশরঞ্জিনী' একখানি সুখপাঠ্য গীতিকবিতা-সংকলন পুস্তক, সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃদয়াবেগের অসংযত প্রকাশের জন্যে এতে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি অনিন্দ্য শিল্পরূপ পায়নি। কবি লেখনীকে সংযমে শাসিত করতে জানতেন না, অবল্গিত উচ্ছ্বাস তাঁর লেখা লিরিকের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করেছে। নবীনচন্দ্রকে একসময়ে 'বাঙলার বায়রন' বলা হতো। বায়রনের মতোই, বিপুল প্রাণশক্তি তাঁর ছিল; আবার, এই ইংরেজ-কবির শিল্পকলাগত অসংযম ও অমিতাচারও তাঁর কাব্যে প্রায়শ লক্ষিত হয়। কিছুটা মিতভাষী হতে পারলে নবীনচন্দ্র বড়ো একজন গীতিকবির মর্যাদা পেতেন। তাঁর লেখা উল্লেখ্য একটি গীতিকবিতা 'কীর্তিনাশা'। এর কাব্যোৎকর্ষ সর্বস্বীকৃত। কবিতাটি রবীন্দ্রের লিরিকের সঙ্গে একটি যোগসূত্র রচনা করেছে। গীতিধর্মী এমন সুন্দর কবিতা প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগে বিরলদৃষ্ট বললে অত্যুক্তি হয় না। বাঙলা লিরিকের ইতিহাসেও নবীনচন্দ্র নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

পরবর্তী কাব্য '**পলাশীর যুদ্ধ**' [১৮৭৭] লিখে নবীনচন্দ্র সেন বঙ্গীয় কাব্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলেন। একসময় এই ঐতিহাসিক গাথা-কাব্যখানি

শিক্ষিত বাঙালির খুবই আদরণীয় গ্রন্থ ছিল। বিস্তর ত্রুটি সত্ত্বেও এ বইতে নবীনচন্দ্রের শক্তিমত্তার স্বাক্ষর স্পষ্টরেখ। 'পলাশীর যুদ্ধ' নবীন-কবির জ্বলন্ত দেশপ্রেমের কাব্য। বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে পরাধীনতার-গ্লানিজর্জর কবির অন্তর্দাহ ও বেদনাবহ্নি এতে আবেগস্পন্দিত ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছে। এ বুঝি দেশবাৎসল্যের আগ্নেয়গিরির গৈরিক-নিঃস্রাব। পরাধীনতায়-রুদ্ধকণ্ঠ জাতির মর্মজ্বালার মুখে নবীনচন্দ্র অগ্নিস্রাবী ভাষাদান করেছেন। একদিকে, অকারণে দেশের স্বাধীনতালোপ, পররাজ্যলোভী বিদেশি শক্তির কাছে কলঙ্কিত আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে, দেশের মানুষের নীচতা, কাপুরুষতা, স্বার্থসর্বস্বতা ও ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা —উভয়ে কবির গভীর চিত্তক্ষোভের কারণ হয়েছে। কতিপয় হীনচেতা বাঙালি দেশদ্রোহিতা না করলে বাঙ্‌লার তথা গোটা ভারতের স্বাধীনতার ওপরে যবনিকাপাত হতো না। সেদিন বাঙালিসন্তান স্বেচ্ছায় দাসত্ববরণ করেছে, এই শোকাবহ ঘটনার সান্ত্বনা কোথায়! দেশানুরাগী কবির স্বাজাত্যভিমানে প্রচণ্ড আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের সৃষ্টি।

ইতঃপূর্বে বাঙ্‌লাসাহিত্যে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাব্যনাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু সেই ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গভূমির কোনো যোগ ছিল না, তা বহির্বাঙ্‌লার—বিশেষ করে, রাজপুতানার ইতিহাস। নবীনচন্দ্রই প্রথম বাঙালির ইতিহাসকে নিজ কাব্যের বিষয়বস্তু করলেন। একারণে 'পলাশীর যুদ্ধ' আত্মপ্রকাশ করলে গোটা বাঙ্‌লাদেশ বইখানিকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল। পুরাণকথার কিংবা দূরবর্তী ইতিহাসের কাহিনীর চেয়ে আমাদের একেবারে ঘরের কাছের পলাশী-প্রান্তরের কথা যে অধিকতর মর্মস্পর্শী হবে এতে সন্দেহ কী? সিরাজের ভাগ্যের সঙ্গে বাঙালিজাতির ভাগ্যও কি জড়িত নয়?

নবীনচন্দ্র ইতিহাসের সতর্ক পাঠক ছিলেন না। তা ছাড়া, ইংরেজরচিত অর্ধসত্য আর মিথ্যায় আকীর্ণ ইতিবৃত্তই ছিল তাঁর অবলম্বন। তাই, কাব্যখানিতে কোনো কোনো চরিত্র সঠিক রূপায়িত হয়নি, সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্ক স্পর্শ করেছে। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার দুর্ভাগ্যের প্রতি কবির দরদবোধের অভাব ছিল না, এবং এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রীতি। উভয়ে মিলে 'পলাশীর যুদ্ধ'-কে কারুণ্যসিক্ত করে তুলেছে। রানী ভবানীর তেজোদৃপ্ত বাণী, বীর মোহনলালের কাতরোক্তি স্মরণসুন্দর। রণশয্যায় শায়িত মৃত্যুমুখী মোহনলাল যে-খেদোক্তি আমাদের শুনিয়েছে, তা স্বদেশপ্রেমিক ও জাতিবৎসল বাঙালিমাত্রেরই আর্তনাদ:

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ রজনী।…
কী ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন!
কী ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শর্বরী;
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।

স্বার্থান্ধ বাঙালি-হিন্দুমুসলমানের হীন চরিত্র উন্মোচিত করতে গিয়ে কবি নিশ্চয়ই তীব্র মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। স্বজাতিনিন্দা রুচিকর কখনো হতে পারে না; কিন্তু আত্মকলহে মেতে যারা জাতীয়-জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে তারা কি ধিক্কারযোগ্য নয়? এদের উদ্দেশে নবীনচন্দ্রের উচ্চারিত ধিক্কারবাণী বাঙালিসন্তান আজো লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করে:

সাধে কি বাঙালি মোরা চিরপরাধীন?
সাধে কি বিদেশি আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে;
স্বর্গ মর্ত করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙালি নাহি হবে একমত;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়।
কার্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।

কথাগুলি চক্রান্তকারী কপট জগৎশেঠের, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালিচরিত্র সম্পর্কে অবশ্যই প্রযোজ্য। ক্ষুদ্রস্বার্থ-পরিচালিত হয়ে সেদিন মুষ্টিমেয় বাঙালি নিজ মাতৃভূমিকে নির্বিচারে বিদেশির হাতে তুলে দিয়েছে, জাতির এ কলঙ্ক কদাপি ঘুচবার নয়।

পাঁচটি সর্গে 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রথিত। সিরাজকে রাজ্যভ্রষ্ট করার চক্রান্তে কাব্যের আরম্ভ, মন্দভাগ্য সিরাজের হত্যাসাধন ও বিজয়ী ইংরেজের উৎসবের বর্ণনা দিয়ে এই কাব্যের সমাপ্তি। গ্রন্থখানি সুপরিণত রচনা নয়, কবির কাঁচা হাতের লেখা। এর ভাবে ও ভাষায় বায়রনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, এ বই পড়তে পড়তে পাঠকসাধারণ বায়রন-প্রণীত "Child Harold's Pilgrimage" অবশ্যই স্মরণ

করবেন। বায়রন যেমন অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের কবি, তেমনি, নবীনচন্দ্র। ভাবাবেগের অতিরেক 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর শিল্পকলাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তথাপি, কাব্যখানির স্থানে স্থানে যে বর্ণনসৌন্দর্য ফুটেছে তা প্রশংসার যোগ্য।

'ক্লিওপেট্রা' [১৮৭৭] প্রণয়ভাবকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রকায় রোম্যাণ্টিক কাব্য। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রা আপনার আশ্চর্য রূপশোভার মাদকতা ছড়িয়ে সিজার ও এ্যাণ্টনির হৃদয় জয় করেছিল, কিন্তু পরিণামে তাকে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে হয়েছে। এই প্রণয়তাপিতা নারীর হৃদয়যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী চিত্রাঙ্কন কাব্যখানিকে পাঠকের আকর্ষণের বস্তু করে তুলেছে। সংসারের মানুষ লালসাময়ী ক্লিওপেট্রাকে ঘৃণার চোখেই দেখবে। কিন্তু কলঙ্কিনী ক্লিওপেট্রার বিষাদময়ী মূর্তি, তার করুণ ব্যর্থতার আলেখ্য, আঁকতে গিয়ে কবি সমবেদনার অশ্রু বর্ষণ করেছেন। পাপীকে সহানুভূতি দেখানোর মনোভঙ্গিটি কবির মানবিকতাবোধের পরিচয়বাহী।

অতঃপর **'রঙ্গমতী'**। এটি একখানি আখ্যায়িকা-কাব্য। প্রকাশকাল ১৮৮০ ইংরেজি সাল। এর রূপাদর্শে স্কটের কাব্যরীতির অনুসৃতি আছে। এখানে কবি জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ, আর্যস্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর। এই স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী। এতে যে-আখ্যান বর্ণিত হয়েছে তা ইতিহাসের পাতা থেকে আহৃত নয়—পুরাপুরি কাল্পনিক। কাব্যের দেশভক্ত নায়ক বীরেন্দ্র কবি নবীনচন্দ্রেরই আত্মপ্রতিবিম্ব। নায়িকার নাম কুসুমিকা। নবীনচন্দ্রের জন্ম চট্টগ্রামে। কাব্যখানির নাম 'রঙ্গমতী' বা রাঙামাটি—পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি অঞ্চল। এই রাঙামাটির মনোরম নিসর্গসৌন্দর্য এতে চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র যে-সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই কালটিকে আর্য-জাগৃতি বা হিন্দুপুনরভ্যুত্থানের যুগ বলা যেতে পারে। সেকালের বাঙালি কবি দেশের গৌরবমণ্ডিত প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়েছেন, জাতির শৌর্যদীপ্ত অতীত কীর্তি তাঁদের অন্তরে স্বদেশের গ্লানি-অপনোদনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে—'রঙ্গমতী' এই আশা-আকাঙ্ক্ষারই কাব্যায়ন। আর্যজাতির পুরাকীর্তি বীরেন্দ্রকে মোগলবিদ্বেষী করে তুলেছে, স্বাধীনতাস্পৃহা তাকে মোগলের হাত থেকে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারসাধনব্রতে প্রাণিত করেছে ; শিবাজীর সংস্পর্শে এসে সে মুক্তিপাগল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পিতৃব্য মর্কটরায়ের চক্রান্তে তার মায়ের জীবন যেমন শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনি, তার নিজজীবনেও শোকাবহ ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। কুসুমিকা নামে একটি মেয়েকে বীরেন্দ্র ভালোবাসতো, তাকে সে পায়নি ; এবং তার স্বাধীনতাস্বপ্নও বাস্তবে সত্য হয়ে ওঠেনি। ভাগ্যের বিরোধিতায় বীরেন্দ্র ও

কুসুমিকাকে অকাল-মৃত্যুবরণ করতে হলো। নায়কনায়িকার মর্মান্তিক জীবনাবসানে কবি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেছেন :

ধীরে সন্ধ্যাগমে
নীরবে মুদিল দল যুগল কমল,
নিদ্রা গেলা কুসুমিকা। হায়, একবৃন্তে
ফুটেছিল দুটি ফুল সংসারকাননে,
একসঙ্গে দুটি ফুল পড়িল ঝরিয়া।

নবীনচন্দ্রের রোম্যান্টিক কবিকল্পনা এখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী, ভাষা আবেগোচ্ছল, বর্ণনা চিত্ররসে ও সংগীতরসে নিষিক্ত। মূর্ছিতা কুসুমিকার লিপিচিত্রটি কী সুন্দর :

পড়ে আছে কক্ষতলে—সুষমার ছবি—
অচেতন কুসুমিকা কৌমুদী প্রতিমা।
একটি বীণার তান নিশীথ বিপিনে
মূর্তিমতী যেন। একখণ্ড চন্দ্ররশ্মি
পড়ে আছে যেন কোন্ আঁধার কুটিরে।

পরবর্তী ত্রয়ীকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-এ নবীনচন্দ্র যে-একতাবদ্ধ অখণ্ড ভারতরাজ্যের স্বপ্নসুন্দর ছবি এঁকেছেন, তার পরিকল্পনা এই 'রঙ্গমতী'তেই সূচিত :

ভারতসন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষাপরে শিখিল না আজি
জাতিত্বের মহামন্ত্র, সর্বশক্তিমূল—
একতা

এইদিক থেকে দেখলে 'রঙ্গমতী'কে কবির নব্যযুগের মহাভারত-রচনার প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে। কাব্যখানি আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। অমিত্রচ্ছন্দের প্রয়োগে নবীনচন্দ্র মাইকেলের আদর্শানুসারী।

নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনা ও কাব্যনির্মাণশক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে **'রৈবতক'** [১৮৮৬], **'কুরুক্ষেত্র'** [১৮৯৩] এবং **'প্রভাস'** [১৮৯৬] নামের কাব্য তিনখানিতে। এদের মধ্যে আখ্যানগত যোগসূত্র রয়েছে বলে এগুলিকে একই মহাকাব্যের তিনটি পৃথক খণ্ড বলাই সংগত। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের ধারাবাহিক চিত্রণ এই Trilogy বা কাব্যত্রয়ীর অখণ্ডতা রক্ষা করেছে। মাইকেলের পরবর্তী ও রবীন্দ্রের পূর্ববর্তী বাঙ্‌লা কাব্যধারায় নবীন সেনের এই Trilogy এক আশ্চর্য গ্রন্থ—এর অপূর্বতা

সর্বজনস্বীকৃত। সরকারি কার্যোপলক্ষে নবীনচন্দ্র কিছুকাল প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিযুক্ত রাজগিরে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে তিনি আমাদের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত পাঠ করেন। মহাভারত পড়ে কবি এক অভিনব কাব্যরচনার প্রেরণা পান। এর ফলেই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যের সৃষ্টি। নিষ্কাম প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শে আর্য-অনার্যের মিলন, বিশাল ভারতবর্ষে বিভেদের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা, মহামানব শ্রীকৃষ্ণের এক মহাজাতি-গঠনের মহৎ স্বপ্ন ও ভারতজোড়া হিন্দুসংস্কৃতির পত্তন বর্তমান কাব্যত্রয়ীর মর্মকথা। জাতীয়তার প্রাণদ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে অখণ্ড ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের এই মহানায়কের সহায় ছিল অর্জুনের বাহুবল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জ্ঞানবল, সুভদ্রার প্রীতি ও শৈলজার প্রেমবল। শ্রীকৃষ্ণ যে-লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন তার প্রকাণ্ড বাধা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজাবাহী দুর্বাসার প্রতিহিংসা ও অনার্যবংশসম্ভূত বাসুকির সংশয়। কাব্যত্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনা হলো, যথাক্রমে—সুভদ্রাহরণ, অভিমন্যু-বধ, এবং যদুবংশধ্বংস। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের মহিমান্বিত জীবন আলোচ্যমান ত্রয়ী কাব্যের উপজীব্য। এক সুবিশাল দেশের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই 'ত্রয়ী'র সংযোগ রয়েছে। মহাভারতের বহু ঘটনার আধুনিক ব্যাখ্যান এতে যেমন মিলবে, তেমনি, আধুনিক যুগের বহু সমস্যাকে মহাভারতীয় যুগের পরিবেষ্টনীতে স্থাপন করা হয়েছে, তা পাঠক লক্ষ্য করবেন। যে-সকল দ্বন্দ্ব-সমস্যা রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-এর আখ্যান-অংশে স্থান পেয়েছে সেগুলি একদিকে যেমন সর্বভারতীয়, অন্যদিকে, তেমনি, সর্বস্থানিক, সর্বকালিক।

বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই পূর্ণবিকশিত মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান করেছিলেন। ইতিহাসে এ আদর্শ খুঁজে না পেয়ে তাঁরা মহাভারতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই দুজন মনীষীর চোখে মহাভারত-কাব্যের মূল নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ মানবতার বিগ্রহ। গভীর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করলেন ; আর, নবীনচন্দ্র নিজের কবিদৃষ্টি ও হৃদয়াবেগের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পদক্ষেপ জ্ঞানমার্গে, তাঁর অঙ্কিত কৃষ্ণচরিত্র ঐশ্বর্যময় ; নবীনচন্দ্র ভক্তিরসবিহ্বল, আবেগপ্রবণ—তাঁর নির্মিত কৃষ্ণচরিত্রে ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্য যুক্ত হয়েছে। দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের মানবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। নবীনচন্দ্র স্বকৃত 'ত্রয়ী'র মাধ্যমে সমগ্র মহাভারতকে আধুনিককালের উপযোগী করে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মহামানব শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে যে-উদার বাণী ঘোষিত হয়েছে, নবীনচন্দ্রের বিশ্বাস, তার মধ্যে কেবল পতিত ভারতবাসীর নয়—পতিত মানবজাতির উদ্ধারের সঙ্কেত নিহিত আছে। এহেন মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনকথাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যের প্রকাণ্ড সৌধ। কবির উদ্দেশ্য—স্বজাতির সমক্ষে পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শস্থাপন, অসাম্য-বৈষম্য-বিভেদে দুর্বল অধঃপতিত স্বদেশবাসীকে সাম্যমন্ত্রে উজ্জীবিত এক মহাধর্মসাম্রাজ্যের উচ্চভূমিতে তুলে ধরা। নবীনচন্দ্র মহাজাতিগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাই. তিনি ভারত-নাট্যের সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর মহৎ কাব্যের প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। কবির চোখে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়ক—মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান ত্রয়ী কাব্যে কৃষ্ণের মানবিকতাকে তাঁর জীবনকথার নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে স্তরে স্তরে বিকশিত করে তুলেছেন কবি। 'রৈবতক-কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র-কাব্য মধ্যলীলা, প্রভাসকাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।' মাধুর্যসিক্ত লীলা, কঠিন কর্মসংঘাত ও প্রশান্ত বৈরাগ্য—বাসুদেবের জীবনের এই তিন পর্যায়। এরই রূপায়ণ দেখি উক্ত ত্রয়ীতে। তিন খণ্ডে সমাপ্ত বর্তমান মহাকাব্যখানিতে গীতোক্ত জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষণীয়।

জাতিভেদ, ধর্মভেদ, রাজ্যভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ভারতবর্ষকে কোন্ সর্বনাশের পথে টানছে, তা উপলব্ধি করা স্বজাতি-ও-স্বদেশ বৎসল কবির পক্ষে কঠিন কিছু ছিল না। জাতির এই শোচনীয় অধোগতির প্রতিকার কোন্ পথে, কবি তারো নির্দেশ দিয়েছেন। দেবকীনন্দন বাসুদেব শৌর্যবীর্যের আধার অর্জুনকে বলছেন :

যতদিন খণ্ডরাজ্য রহিবে ভারতে, আর্য-
জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয় ;
রহিবে এ রাজ্যভেদ ধর্মভেদময়।

সুতরাং এমন একটি অখণ্ড মহারাজ্য গড়ে তুলতে হবে যেখানে মানুষের মধ্যে জাতিবর্ণের কোনো বৈষম্য থাকবে না, যার প্রতিষ্ঠাভূমি হবে সাম্য, প্রীতি, ন্যায় দয়া। এ 'বড়ই দুরূহ ব্রত', সন্দেহ নেই। কিন্তু মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়সংকল্প নব্যভারত রচনা করবেন তিনি। ভারতে তিনি নতুন সংস্কৃতি-পত্তনের অভিলাষী :

এক ধর্ম, এক জাতি,
একই সাম্রাজ্যনীতি,
সকলের এক ভিত্তি,—সর্বভূতহিত।

সাধনা নিষ্কাম কর্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম—
একমেবাদ্বিতীয়ম্, করিব নিশ্চিত,
ওই ধর্মরাজ্য, 'মহাভারত' স্থাপিত।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস এ যুগের নতুন মহাভারত। কাব্যের মাধ্যমে তাঁর এই নতুন ইতিহাসসৃষ্টিকে বঙ্কিম আখ্যা দিয়েছিলেন—'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'। কবি এক অভিনব 'Nationalism' দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন—মহাভারত, গীতা, ভাগবত আর আধুনিককালের মানবতাবাদের [বিশেষ করে ফরাসি দার্শনিক অগস্ত কোঁতের Humanitarianism-মতবাদের] সমন্বয়ে এর উদ্ভব ও পুষ্টি। 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ নবীন সেন Patriotism-এর কাব্যকার, আর, এখানে তিনি Nationalism-এর উদ্‌গাতা। 'ত্রয়ী' তাঁর মৌলিক রচনা। এর পরিকল্পনা বিরাট, ভাবাদর্শ মহত্ত্বব্যঞ্জক, ঘটনা-পরিধি বিস্তীর্ণ। পরিকল্পনার বিশালতায় নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' ও হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'কে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। উচ্চতর মানবিকতার বাণী বাঙ্‌লা কাব্যে এমন উদাত্ত কণ্ঠে নবীনচন্দ্রের মতো অন্য কোন্ কবি প্রচার করেছেন ? এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করি :

> 'আমরা নবীনচন্দ্রেই সর্বপ্রথম দেখলাম লাঞ্ছিত মানবতার বিদ্রোহ-অভিযান, তথাকথিত-বর্ণহিন্দুর সযত্নপ্রসারিত শাসন ও শোষণের বেড়াজাল কাটিয়ে তারা বেরিয়েছে তেড়েফুঁড়ে—প্রাচীরঘেরা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে ছুটেছে বিপ্লবারক্ত চোখে, যার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্যস্থাপনের পরিকল্পনা পর্যন্ত পর্যবসিত হল প্রভাসের প্রসন্ন সমাপ্তিতে। এই রসঘনতা রবীন্দ্রযুগেরই পূর্বাভাস সূচনা করে।'

নবীনের 'ত্রয়ী'তে উচ্চপ্রশংসার যোগ্য যেমন অনেককিছু রয়েছে, তেমনি, বহু দোষত্রুটিও এতে লক্ষিত হয়। আর্য-অনার্যের সংঘাত ও ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণশূদ্রের যে-মৈত্রীর কথা এতে বর্ণিত হয়েছে, তা সর্বথা ইতিহাসের সমর্থন পাবে না। পুরাণকথিত দুর্বাসা-চরিত্রের মহিমা এখানে খর্ব হয়েছে। সুভদ্রার ভূমিকা পৌরাণিকতার স্পর্শবর্জিত। কৃষ্ণার্জুনের ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সুলোচনার তরল রসিকতা ও চাপল্য কাব্যের গম্ভীর মর্যাদার পক্ষে হানিকর। মহাকাব্যে প্রত্যাশিত বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য এখানে বিচলিত।

রচনারীতিতে শৈথিল্য সুপ্রকট। গাম্ভীর্যের সঙ্গে তরলতা মিশে গিয়ে উদ্দিষ্ট রসের স্ফুরণকে ব্যাহত করেছে। বর্ণনার অতিবিস্তার ও পল্লবিত ভাষণ কাব্যখানিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিধর্মী করে তুলেছে। মহাকাব্যের গঠনরীতি অতিশয় দৃঢ়, এতটুকু শিথিলতা তার পক্ষে মারাত্মক। অতি-আত্যন্তিক আবেগোচ্ছলতার জন্যে কবি এদিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে পারেননি। এ-জাতীয় আরো বহুতর ত্রুটি দেখানো যেতে পারে। এককথায়, সংযমের অভাব নবীনের বিরচিত এই মহাকাব্যের শিল্পগত সৌন্দর্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছে। তা ছাড়া, নবীনচন্দ্রের শব্দভাণ্ডারের পরিধি সীমিত, অনেক সময়ে তাঁর ভাষা ভাবানুভূতির উপযুক্ত বাহন নয়। অমিত্রচ্ছন্দকেও কবি ঠিক স্ববশে আনতে পারেন নি। হেমচন্দ্রের মতো, নবীনচন্দ্রও, ছন্দোবৈচিত্র্যবিলাসী। কিন্তু মহাকাব্যের ক্ষেত্রে একে ক্ষতিকরই বলতে হবে। নবীনের প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেলের প্রবর্তিত ছন্দটির ওজঃগুণ ও গাম্ভীর্য তেমন চোখে পড়ে না। তবে, এও স্বীকার্য যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে, হেমচন্দ্রের তুলনায়, নবীনচন্দ্র অনেক বেশি দক্ষতা দেখিয়েছেন। আসল কথা হলো, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকবির, কিন্তু যুগের প্রভাবে তিনি নামলেন মহাকাব্য-সংরচনে। হেমচন্দ্রও এ ভুলটি করেছিলেন।

এতসব ত্রুটি সত্ত্বেও অকৃত্রিম কবিত্বের উৎসারে, পরিকল্পনার বিরাটত্বে, জাতীয়তার প্রাণদ স্পর্শে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস স্মরণযোগ্য কবিকৃতি। এ জাতের কাব্যপ্রয়াস বাঙ্‌লা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। এস্থলে আমাদের আরো একটি কথা বলবার আছে। যে-নিসর্গতন্ময়তা, নিসর্গসৌন্দর্যচেতনা ও রহস্যবোধ, যে-রোম্যাণ্টিক আর্তি পরবর্তী বাঙ্‌লা গীতিকবিতায় অতিশয় প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তার সর্বাধিক প্রকাশ আমরা দেখেছি নবীনচন্দ্রের রচনায়। তা ছাড়া, এও বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের পূর্বাভাস নবীন-কবির রচনাবলীতে প্রাপ্তব্য।

এরপর নবীনচন্দ্র তিনজন মহামানবের অমর জীবনকে কাব্যরূপ দান করলেন, লিখলেন—**'খ্রিস্ট'**, **'অমিতাভ'** ও **'অমৃতাভ'**—প্রথমটিতে যিশু খ্রিস্টের, দ্বিতীয়টিতে গৌতম বুদ্ধের, তৃতীয়টিতে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা গ্রথিত হয়েছে। এইসব দেবকল্প পুরুষের অর্চনার আসল উদ্দেশ্য হলো স্বদেশের মানুষের সমক্ষে পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শ উপস্থাপন। কবি এঁদের দেবতারূপে গড়েননি—এই মর্তপৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষহিসেবেই দেখেছেন। মানুষকে দেবতা বানিয়ে পূজা নিবেদন করবার এতটুকু অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তবে, মানুষ যে আত্মিক শক্তিতে দেবকল্প হয়ে উঠতে

পারে, সে-কথা কবি বিস্মৃত হননি। তথাপি, শ্রেষ্ঠ মানব বলেই এঁরা আমাদের নমস্য।

নবীনচন্দ্রের ধর্মীয় মতবাদ খুবই উদার ও সার্বভৌম ছিল। জগতের সকল ধর্মের মধ্যে তিনি মানবসত্যের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রিস্ট, মহম্মদ প্রমুখ ধর্মগুরুদিগের উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখেননি তিনি। এঁরা সকলেই প্রচার করে গেছেন মানবধর্ম, 'সত্য ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য, মনস্বী মানবমাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব-অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী।' কবির শেষজীবনের কাব্যে সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীই উদ্‌গীত। 'খ্রিস্ট' কাব্যে মহামানবতার স্বীকৃতি আছে, কিন্তু কবিহৃদয়ের উত্তাপ এখানে অনুপস্থিত। বুদ্ধচরিতের মাহাত্ম্য-খ্যাপনে কবিপ্রাণের সহজ স্ফূর্তি অনুভব কথা যায়। এজন্যে 'অমিতাভ' কাব্যগুণোপেত। নবীনচন্দ্রের প্রাণের উল্লাসের অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফুরণ ঘটেছে 'অমৃতাভ' কাব্যে। এর কারণ হলো বৈষ্ণবধর্মের প্রতি কবিচিত্তের সহজ প্রবণতা। 'অমিতাভ'তে শান্তরসের প্রাধান্য, 'অমৃতাভ'তে করুণ-রসের। সংসারজীবন থেকে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের বিদায়গ্রহণ বিষাদময় একটি ঘটনা ; 'অমৃতাভ' কাব্যখানিতে এই ঘটনাটি কারুণ্যের উৎস হয়েছে। আন্তরিকতার স্পর্শ এ কাব্যকে সজীব করে তুলেছে। 'অমৃতাভ' কবির শেষ ও অসম্পূর্ণ কাব্য। কবির সৃজনীক্ষমতা এখন ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে, প্রতিভা স্তিমিত হয়ে এসেছে। অধিকাংশ কবিই শেষপর্যন্ত প্রতিভার দীপ্তি হারিয়েছেন—নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে।

॥ নতুন গীতিকাব্যমন্ত্রের উদ্গাতা বিহারীলাল চক্রবর্তী ॥

এবার আমরা একজন খুবই উল্লেখযোগ্য কবির প্রসন্ন সান্নিধ্যে এলাম—বিহারীলাল চক্রবর্তী। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কবিকে আমাদের অনেকেই চেনেন না, তাঁর কাব্য-কবিতার পঠন একালে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, অধুনা তাঁকে আমরা নামে-মাত্র জানি। অসামান্য কবি-ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায়, বিহারীলাল অবশ্য তা ছিলেন না। কাব্যসংসারের যে-এলাকাটির মধ্যে তাঁর সঞ্চরণ, তার পরিধিও সংকীর্ণ। তথাপি, আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট একটি স্থানের অধিকারী তিনি, এবং ওই স্থানটিতে তাঁর অক্ষয় প্রতিষ্ঠা। সাধারণো স্বল্পপরিচিতি হলেও কবিব্যক্তি-হিসেবে বিহারীলাল চক্রবর্তী চিরস্মরণীয়। তাঁকে

আমরা ভুলতে পারি না এজন্যে যে, এঁকালের বাঙ্‌লা কাব্যের আসরে আমাদের তিনি এক নতুন সুরের গান শোনালেন। এই সুর এতই অভিনব, এমনই স্বতন্ত্র যে, রসিক কাব্যপাঠকদের তা সত্যিই চমকিত করলো। এঁরা যথার্থ অনুভব করলেন, বাঙ্‌লা কবিতায় হাওয়াবদল শুরু হয়েছে; মধুসূদন-হেম-নবীনের 'এপিক'-এর যুগ অবসিতপ্রায়—এবার কবিতার পাঠকমণ্ডলী উৎকর্ণ হয়ে শুনবে বিশুদ্ধ রোম্যাণ্টিক লিরিকের অশ্রুতপূর্ব ঝংকার। বিহারীলাল চক্রবর্তী যে-কাব্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন, বর্তমানের বাঙালি কবিদল সেই মন্ত্রেরই উত্তরসাধক। তাঁর প্রদর্শিত পথটিকে একালের কবিরা রাজপথ বলে জেনেছেন।

আমরা বলেছি, বিহারীলাল বাঙ্‌লা সাহিত্যে রোম্যাণ্টিক গীতকাব্যের পথপ্রদর্শক। কথাগুলি কারো কারো কাছে বিভ্রান্তিজনক বলে মনে হতে পারে। তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের মধ্যযুগের বৈষ্ণবকবিকুল অজস্র গীতিকবিতা লিখে গেছেন, বৈষ্ণবকাব্য তো স্বরূপত গীতপ্রাণ। এ যদি সত্য হয়, তাহলে বিহারীলালকে এদেশে গীতিকাব্যধারার প্রবর্তক বলা যায় কী করে? এর উত্তরে বলবো, বৈষ্ণবকাব্য লিরিকধর্মী এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আধুনিক লিরিকের সঙ্গে বৈষ্ণব-লিরিকের পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক গীতিকাব্য যতখানি ব্যক্তিনিষ্ঠ, বৈষ্ণবগীতি ততখানি নয়। গীতিকবিতার মধ্যে কবি আত্মগত বাসনাকামনাকে, নিজের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনাকে অকপটে প্রকাশ করেন, এখানে কবির ব্যক্তিপুরুষের নিঃশেষে আত্মনিবেদন আছে—এযুগের লিরিক একান্ত-ভাবে অহংমুখ। বৈষ্ণবের গান সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। বৈষ্ণবকবিতায় কবিদের অন্তরের কথা ধ্বনিত হলেও তাতে ব্যক্তিক ভাবনাকল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেনি। এখানে যে-অনুভূতি ছন্দে গ্রথিত হয়েছে তাকে ঠিক ব্যক্তিগত না বলে সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠিগত বলাই সংগত। কারণ, বৈষ্ণবভাবসাধনার সুচিহ্নিত একটি গণ্ডির মধ্যে থেকেই বৈষ্ণবকবিরা তাঁদের গান বেঁধেছেন। এই মর্তপৃথিবীতে বসে প্রেমের গান লিখলেও এতে আধ্যাত্মিকতার অনুলেপন আছে, তার উদ্দেশ্য আমাদের ধূলির ধরণীর মানবমানবীর প্রণয়তৃষ্ণার নিবৃত্তিসাধন নয়, উদ্দেশ্য—রাধামাধবের শ্রীচরণে গীতির মাধ্যমে ভক্তির অঞ্জলি-নিবেদন। ধর্মীয় ঐতিহ্য বৈষ্ণবকবিতাকে বর্তমান কালের লিরিক থেকে পৃথক করে রেখেছে। আসল কথা হলো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা না পেলে যথার্থ ব্যক্তিনিষ্ঠ গীতিকবিতা-বিরচন সম্ভব নয়। আমরা সকলেই জানি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মধ্যযুগের বস্তু নয়, বিশেষভাবে একালেরই সামগ্রী এটি। যে আত্মলীনতা—আত্মভাবসাধনা—লিরিক কবিতার

অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবকাব্যে তা লক্ষ্য করা যায় না। এ জিনিসটি বিহারীলালের কাব্যে সুপ্রকট। একারণে বিহারীলালকে আমরা বাঙ্‌লা কবিতার প্রথম লিরিক কবি বলতে চেয়েছি।

আধুনিক যুগে বিহারীলালের পূর্বে এবং তাঁর সমকালে দুয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি—যেমন, মধুসূদন-হেম-নবীন—গীতকবিতা-নির্মাণের প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু লিরিকের পূর্ণায়ত রূপটি এঁদের কারো রচনায় চোখে পড়ে না। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র গীতিকবি যদিও ছিলেন, আশ্চর্য রোম্যান্টিক কল্পনার ঐশ্বর্য তাঁদের ছিল না। মধুসূদনের প্রতিভাই ছিল ভিন্ন ধরণের, এবং তাঁর রচনায় স্থানে স্থানে অভিনব গীতিভাবুকতা লক্ষ্য করা গেলেও, সুদূরের অভিলাষ, সৌন্দর্যবেদনা, নিসর্গতন্ময়তা, জানার মধ্যে অজানার রহস্যদর্শন, বস্তুর অতীত মনোরাজ্যে স্বপ্নসঞ্চরণ, ইত্যাদি কোথাও তেমন সুপ্রস্ফুট নয়। মাইকেলের 'চতুর্দশপদী কবিতা' আত্মমুখী ভাবনার উদাহরণরূপে গণ্য হতে পারে; কিন্তু নির্বিষয় ও শুদ্ধ মনোগত ভাব নিয়ে, কল্পনার পক্ষবিস্তার করে, কাব্যলোকে যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে তিনি উপস্থিত করেননি—করেছেন রোম্যান্টিক কল্পনাকুশল বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিহারীলালে এসে আমরা দেখলাম, বস্তুজগৎ নয়, কবির মনোলোক কাব্যে প্রাধান্যলাভ করতে করতে সমস্ত কাব্যই মনোময় হয়ে উঠেছে। পূর্বোক্ত কবিদের তুলনায় বিহারীলাল অনেক বেশি অন্তর্মুখ। নবতন এই মনোময়তা আধুনিক আদর্শের গীতকবিতার খুব বড়ো একটি লক্ষণ।

মাইকেলের যুগে বিহারীলালের মতো আত্মসমাহিত গীতিকবির আবির্ভাব একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও অনেকটা আকস্মিক। উনিশের শতকের সেই নবজাগরণের দিনে, কিছুটা য়ুরোপীয় আদর্শের প্রভাবে, মধু-হেম-নবীন প্রমুখ কবিরা যখন মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য লিখছেন, পুরাণ-ইতিহাস থেকে তাঁদের কাব্যের উপাদান আহরণ করছেন, স্বর্গে-নরকে নিজেদের কল্পনাকে অবাধে ছুটিয়েছেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী তখন আপনার প্রাণসমুদ্রের বিচিত্র তরঙ্গলীলাকে সংগীতাত্মক কবিবাণীতে ফুটিয়ে তুললেন। আমরা যেন আড়ালে থেকে শুনে নিলাম তাঁর নিভৃত হৃদয়ের আলাপন। কবিকৃতি ও কবিপ্রকৃতির এই স্বতন্ত্রতার জন্যেই, গতানুগতিকতাকে পরিহার করে, নিজের সঙ্গে নিজে নিভৃতে আলাপ করতে বসলেন বলেই, ভাবনিমগ্ন বিহারীলালের দিকে সেকালের পাঠকসাধারণের দৃষ্টি বড়ো-একটা আকৃষ্ট হয়নি। তিনি যে সবারই অলক্ষ্যে নতুন যুগের প্রভাতী গাইছেন, তা সেদিনকার অধিকাংশ লোক একেবারেই বুঝতে পারেনি। একারণে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে

অর্ধালোকিত উষালোকের কবি বলেছেন : 'যে-প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই, সেই উষালোকে একটি ভোরের পাখী সুস্পস্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে-সুর তাহার নিজের।' বিহারী-কবির কাব্যের মর্মজ্ঞ রসিক সেদিনো যেমন সংখ্যায় ছিল অত্যল্প, আজিকার দিনেও তাই।

একহিসেবে বিহারীলাল কবির কবি। কবি ছাড়া তাঁর কাব্যকবিতার সন্ধান অপর কেউ রাখেন বলে মনে হয় না। এস্থলে রবীন্দ্রের উক্তি স্মর্তব্য : 'যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী কবির সংগীতকাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।' বিংশ শতকের 'নির্জনতম', স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত শক্তিমান কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ, আর, উনিশের শতকের এইরূপ একজন 'নির্জনতম' কাব্যকার হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। এঁরা কেউ খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক আর সমালোচকের দ্বারস্থ হননি। বাইরের দিকে না তাকিয়ে, কেবল নিজের হৃদয়কে প্রামাণ্য করে, নিজের ভাষায় নিজের ছন্দে গীতময় কবিতা লিখে গেছেন। নিজেদের জীবদ্দশায় 'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে' এঁরা আসন পাননি, কিন্তু মৃত্যুর পরে এঁদের সমাদর বেড়ে গেছে। পরবর্তী কবিদের রচনায় এ দুজন কবির প্রভাব সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে।

যথোচিত কবিযশ ভাগ্যে না জুটলেও একদিক থেকে দেখলে বিহারীলাল অতিশয় ভাগ্যবান। তিনি কয়েকজন প্রতিভাবান কবিকে তাঁর ভাবশিষ্যরূপে পেয়েছেন। পৃথিবীখ্যাত রবীন্দ্র তাঁকে নিজ গুরুর আসনে বসিয়ে ভক্তিমিশ্র বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিহারীলালের বিদ্যালয়েই তিনি কবিতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসমকালীন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, 'মহিলা' কাব্যের প্রসিদ্ধ লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, খ্যাতিমান কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, এবং আরো অনেকে, কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিজেদের ধন্য মেনেছেন। যিনি এতসব কবির গুরুস্থানীয়, কতখানি তাঁর গৌরবমহিমা! কবিগুরুর আসনে তিনি চিরকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায়, মহাকবি হয়তো নন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে যে এক নতুন কাব্যমন্ত্রের উদ্গাতা এতে সন্দেহ নেই।

জীবনের প্রথম দিকে তিনি দুই নিকটজনকে হারিয়েছেন—জননীকে ও জায়াকে। অন্তরঙ্গ-বন্ধুবিয়োগ-জনিত মনঃপীড়াও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। পরে

তিনি আবার বিবাহ করেছেন, সংসারে মন বসিয়েছেন, অপরূপ কাব্যলোক নির্মাণ করে গেছেন। কিন্তু জীবনের প্রথম পর্বে যে-বিয়োগবেদনা তাঁর অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, সেই ক্ষতযন্ত্রণা তিনি কদাপি ভুলতে পারেননি, তাঁর অন্তরে শূন্যতার হাহাকার কখনো সম্পূর্ণ ঘোচেনি। বোধ করি, এজন্যেই বিহারীলাল বিরহ-ভাবুকতার কবি—বিরহের ব্যথাবাষ্প দিয়ে তিনি রোদনভরা স্বপ্নের ভুবন রচনা করেছেন। এই রকমের আর-একজন চিরবিরহী শ্রীরবীন্দ্র—প্রথমযৌবনের নিদারুণ মৃত্যুশোক তাঁকে প্রেমানুভবের—বিরহীস্বভাবের—মহৎ কবি করে তুলেছে।

অল্পবয়স থেকেই বিহারীলাল কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর অপর এক নেশা ছিল সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনা। 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার [প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে] সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্রিকাতেই তাঁর অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়। কিন্তু 'পূর্ণিমা' বেশিদিন স্থায়ী হলো না, কাগজটি উঠে গেলো। এর পর তিনি 'সাহিত্য-সংক্রান্তি' নামে একখানি পত্রিকার [প্রকাশকাল ১৮৬৩] সংস্পর্শে আসেন। এতে তাঁর 'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্য আত্মপ্রকাশ করে। 'সাহিত্য-সংক্রান্তি'ও স্বল্পায়ু হলো। তৎপর যে-কাগজখানির মাধ্যমে বিহারীলালের যথার্থ কবিপরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, তার নাম 'অবোধবন্ধু'। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়লেন ১৮৬৭ সালে। কবির নিসর্গ-সন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী, বন্ধুবিয়োগ, সুরবালা কাব্য, প্রভৃতি রচনা 'অবোধবন্ধু'তেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই বালক-বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখা কবিতা পড়েন, এবং এক আলোআঁধারি মায়াকুহেলিকাঘেরা রূপজগতের সন্ধান পান। পত্রিকাটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইতে লিখছেন :

'ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাহার সেইসব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।'

বিহারী-কবির সর্বোত্তম কাব্যগ্রন্থের নাম 'সারদামঙ্গল', প্রকাশিত হয়েছিল 'আর্যদর্শন' পত্রিকায়। পরে তিনি আরো দুখানি কাব্য রচনা করেন, নাম—'বাউল-

বিংশতি' ও 'সাধের আসন'। এতদ্ব্যতীত মায়াদেবী ও শরৎকাল পরবর্তী সময়ে রচিত।

১৮৯৪ সালে, ৫৯ বছর বয়সে, বিহারীলাল লোকান্তরিত হন।

বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ **'সংগীতশতক'**, ১৮৬২ ইংরেজি সালে প্রকাশিত। কৈশোর ও প্রথমযৌবনের বিচিত্র ভাবানুভূতি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা এতে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। সেকালের পাঠকের কাছে বইটি সমাদর পায়নি। কিন্তু ভাবীকালে এ গ্রন্থের রচয়িতা যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দেবেন তার কিছু কিছু আভাস বইখানিতে মেলে : 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে দেখ তাই, পেলেও পেতেও পার লুকান রতন'—এমন আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি যাঁর লেখনীনিঃসৃত, তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকে না। কবির দৃষ্টি অন্তর্মুখী, ভাষা ও ছন্দ নতুন, কাব্যমন্ত্র অভিনব। এর ফল হয়েছে, তৎকালে সাধারণ পাঠক তাঁকে বুঝতে ও চিনতে পারেন নি।

'সংগীতশতক' রচনার পর ছ-সাত বছর বিহারীলালের কোনো কাব্য প্রকাশিত হয়নি। ১৮৭০ সালে পর পর চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো—বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ ও প্রেমপ্রবাহিণী। **'বন্ধুবিয়োগ'** কাব্যে কবি তাঁর প্রথমা পত্নী ও তিন বাল্যবন্ধুর বিয়োগজনিত বেদনা প্রকাশ করেছেন। এর ভাবানুভূতিতে আন্তরিকতার স্পর্শ আছে, রচনারীতিতে কিন্তু সর্বথা স্বাতন্ত্র্য ফোটেনি। মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুপ্তকে মনে পড়িয়ে দেয়। কবি যে স্বদেশের কথা ভাবেন, এবং বাঙ্‌লা সাহিত্য যে তাঁর অনুরাগের সামগ্রী, বইখানি তার সাক্ষ্য বহন করে। 'বন্ধুবিয়োগ' পয়ারে লেখা, চারটি সর্গে গ্রথিত।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য দশটি সর্গে সমাপ্ত। এতে নারীবন্দনা, কবিকল্পিত 'সুরবালা' এবং কয়েকটি ক্ষীণ আখ্যায়িকা অবলম্বনে চিরপরাধীনা, করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী, বিরহিণী, প্রিয়তমা প্রভৃতি নারীর বিভিন্ন চিত্র রূপায়িত হয়েছে এবং তৎসম্পর্কে কবির সহানুভূতিযুক্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত হয়েছে। বাঙালি নারীর চরিত্রমাধুর্য বিহারীলালকে মুগ্ধ করেছিল, বঙ্গললনা যে কত মহীয়সী, এই কাব্যটিতে লেখক তা-ই দেখিয়েছেন। 'বঙ্গসুন্দরী'তে বিধৃত কবির 'নারীবন্দনা' থেকে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার যে তাঁর 'মহিলা' কাব্য রচনায় প্রেরণা পেয়েছিলেন, এরূপ অনুমান বোধকরি অসংগত নয়। 'বঙ্গসুন্দরী'র প্রথম সর্গে কতকগুলি আশ্চর্যসুন্দর পঙ্‌ক্তি আছে, যাতে কবিচিত্তের রোম্যান্টিক অসন্তোষ [Romantic dissatisfac-

tion] প্রকাশ পেয়েছে। চতুষ্পার্শ্বের সমাজসংসারের সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয় না, তাই :

সর্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কী অনন্ত জ্বালা,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন !

এ কাব্যে বিহারীলাল পল্লীগ্রামের বর্ণনা দিয়ে একেবারে খাঁটি চাষী পল্লীবাসী হতে চেয়েছেন। কবির এই মনোভাবের ব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের সকলের মনে দৈবী অসন্তোষ [divine discontent] রয়েছে। ফলে, শহরবাসী কবি পল্লীর জন্যে ব্যাকুল, আবার, পল্লীবাসীর চিত্ত নাগরিক জীবনের স্বাদগ্রহণের জন্যে নিত্য উন্মুখ। বস্তুত, কোনো কবির কাব্যেই পরিপূর্ণ আত্মসন্তুষ্টি বা নির্বিরোধ সুখের কথা পাওয়া যায় না। সুখসন্তোষ যখন একরূপ দুষ্প্রাপ্য, তখন কবির ওই 'সর্বদাই হুহু করে মন' এরূপ উক্তির কারণ সহজে উপলব্ধি করা যায়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না বলে এই দেশ ছেড়ে, অন্যকোথাও গিয়ে, অবিক্ষুব্ধ মনের শান্তি আহরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন। দেখা যাচ্ছে, ওই কবিতাতেই 'কভু ভাবি ত্যজি এই দেশ' প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়ে অরণ্যবেষ্টিত বিষাদবায়ুবীজিত শ্মশান কবির নিকট ভালো লাগছে। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের উক্ত উপহার-অংশটি কখনো শস্পশ্যাম পল্লীতে, কখনো-বা ঝটিকাগর্জনক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে, আমাদের এই বন্ধন-অসহিষ্ণু ঘরছাড়া মনটাকে ঘুরিয়ে আনে।

সাতটি সর্গে **'নিসর্গসন্দর্শন'** সমাপ্ত হয়েছে। এতে কবি পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন, চার-চার চরণে স্তবক গড়ে উঠেছে, প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে মিল। এতে প্রধানত পাই কবির প্রকৃতিরসসম্ভোগের কথা। সমুদ্রদর্শন, নভোমণ্ডল, ঝটিকাসম্ভোগ, প্রভৃতি কবিতা এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিলোকের বিভিন্ন অবস্থা,—প্রভাতের বিহঙ্গকাকলীমুখর আনন্দোৎসব, সূর্যতাপিত মধ্যাহ্নের উদাস মূর্তি, অন্ধকারসমাবৃত সন্ধ্যার বৈরাগ্যসংগীত বিহারীলালের লেখনীতে মনোজ্ঞ বাণীরূপ পেয়েছে। নিসর্গপ্রকৃতির কোমলমধুর আলেখ্য-অঙ্কনে কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির সংসারে যা বিরাট, মহান, উদাত্তগম্ভীর, তার বর্ণনায় তিনি তেমন সিদ্ধিলাভ করেননি। 'সমুদ্রদর্শন'-এ সমুদ্রপ্রকৃতির কিছু-কিছু বর্ণনা

সত্যই চমৎকার, সহজ কবিত্বে অতিশয় চিত্তগ্রাহী। যেমন, মানসদৃষ্টিতে দ্বীপমালা দেখে কবি লিখছেন :

কোনোটি-বা ফলে-ফুলে অতি সুশোভন,
নন্দন-কানন যেন স্বর্গে শোভা পায় :
সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোকজন,
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায়।

উনিশের শতকের কবি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবির রচনায় যে-পরাধীনতার বেদনা আত্মপ্রকাশ করেছে, 'সমুদ্রদর্শন' কবিতার রচয়িতার মনেও সেই বেদনা জেগেছে :

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড-দ্বীপ,
হরেছে জগৎ-মন যাহার মাধুরী ;
শোভে যেন রক্ষকুল-উজ্জ্বল-প্রদীপ,
রাবণের মোহিনী কনক-লঙ্কাপুরী।
এদেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা ;
কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা।

চতুর্থ সর্গে 'নভোমণ্ডল'-এর বর্ণনায় মনোরম কবিকল্পনার স্পর্শ আছে :

হালিগাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত-উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত।

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলা বালা তব নৃত্যকরী ;
যেন মানসরোবর-লহরী-লীলায়
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

এজাতের নিসর্গচিত্রণ বিহারীলাল চক্রবর্তীর রোম্যাণ্টিক কাব্যভাবনার পরিচয়বাহী। তবু বলতে হয়, নিসর্গ যে এক বিশিষ্ট ভাবলোকে কবির চিত্তকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে, একটি অনির্বচনীয় মনোলোক নির্মাণ করতে পারে—যেখানে

প্রত্যক্ষ বস্তুর চিত্ররূপ ছাড়া অপর একটি আদর্শলোকের সৃজন হয়—'নিসর্গসন্দর্শন' কিন্তু তার পরিচয় দেয় না। কবির পূর্বকাব্যের এই কল্পলোকের অভাব 'সারদা-মঙ্গল'-এ অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে।

বিহারীলালের কবিপ্রাণের সত্যিকার জাগরণের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মেলে '**প্রেমপ্রবাহিণী**' কাব্যে। এখানে কবির রচনারীতির বৈশিষ্ট্যের মুদ্রাঙ্কন পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই কাব্যে বিষাদে নিমগ্ন কবি প্রণয়-বস্তুটির সন্ধানী। সংসারে প্রকৃত প্রণয়ের মর্যাদা নেই, এই সত্যটি উপলব্ধি করে যখন তিনি হতাশাগ্রস্ত হলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁর চিত্তে দৈবী আনন্দের স্পর্শ লাগলো। এভাবে সহসা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে কবি বলছেন :

আজি বিশ্ব আলো কার আনন্দনিকরে,
হৃদয় উথলে কার জয়ধ্বনি করে ;···
ক্রমে ক্রমে নিভিতেছে লোককোলাহল,
ললিত বাঁশরী-তান উঠিছে কেবল।
মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগরে,
দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ-ভরে।

মোহিনী কল্পনা এখন কবির হাত ধরে পৃথিবীব্যাপী প্রেমের জগৎটি তাঁকে দেখাচ্ছে. তাতে 'শান্তিসুখময় এক :রসে' কবির হৃদয়দেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাব্যটিতে পরবর্তী 'সারদামঙ্গল'-এর পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর সর্বোত্তম কবিকৃতি '**সারদামঙ্গল**'। নিবিড় প্রেমানুভব ও তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যচেতনা—এই যুগ্মপ্রেরণা কাব্যখানির রচনার মূলে সক্রিয় রয়েছে। বর্তমান প্রেমকাব্যে কবি তাঁর অন্তরবাসিনী প্রেয়সী বা কাব্যলক্ষ্মী বা 'আনন্দরূপিণী মানসমরালী'-কে বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যের শ্বেত শতদলের ওপরে দাঁড় করিয়ে এক অশ্রুতপূর্ব রাগিণীতে সুখদুঃখ, বিরহমিলনের শ্লোক উচ্চারণ করেছেন, রবীন্দ্রের ভাষায়—'সোনার শ্লোক'। সেকালের বঙ্গীয় কাব্যে এহেন প্রণয়গীতির তুলনা নেই। বিহারীলালের 'সারদা' কবির ধ্যানধৃতা মায়াময়ী এক আশ্চর্য নারীমূর্তি—নারী + প্রেম + প্রকৃতির সৌন্দর্যে গড়ে উঠেছে এর কল্পকায়া। এই রহস্যময়ী রমণীটির সম্পর্কে কবিমানসের বহুবিধ প্রতিক্রিয়া 'সারদামঙ্গল'-এ বর্ণিত হয়েছে। 'সারদা' কখনো কবিকে দেখা দিতেছেন, আবার, পরমুহূর্তেই তাঁকে তীব্র বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ করে অন্তর্হিত হচ্ছেন। চিরবিরহী বিহারীলাল সুকুমার কল্পনা দিয়ে সৌন্দর্যবিভাসিত যে-অপরূপ 'বিরহের স্বর্গলোক'—'কামনার মোক্ষধাম'

—নির্মাণ করেছেন, তারই নাম 'সারদামঙ্গল'। এ কাব্য পড়তে গেলে প্রথমে কবির বিরহভাবনাটি লক্ষ্য করতে হবে। কবি আমাদের জানিয়েছেন :

> মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি 'সারদামঙ্গল' রচনা করি।…সহসা বাল্মীকিমুনির পূর্ববর্তী কাল আমার মনে হইল, তৎপর বাল্মীকির কাল, তৎপর কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্তি রচনান্তর আমার চিরআনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট, কখনো-বা তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, বিষাদময়ী মূর্তির সহিত বিরহিত মৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুজনের অকালবিয়োগ, প্রিয়তমার আকস্মিক মৃত্যু, কবির অন্তরে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, তীব্র বিরহবেদনা জাগিয়েছে। এই বেদনার মুখে তিনি ভাষা দিতে চেয়েছেন। যার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মানুষের অন্তরবেদনা সুরময় বাণীতে প্রকাশিত হয়, কবি সেই বাগ্‌দেবীর সান্নিধ্যলাভের অভিলাষী। কিন্তু কল্পনার অধীশ্বরী বাগ্‌দেবী সরস্বতীর প্রসন্নতা থেকেও বুঝি তিনি বঞ্চিত। এই তিন রকমের বেদনা কবিকে উন্মত্তবৎ করে তুলেছিল—বেদনার সূত্রেই বন্ধু-প্রিয়া-সরস্বতী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। সদ্যোক্ত বেদনার প্রাণকেন্দ্রে কিন্তু কবির প্রিয়তমাই বিরাজমানা। যে-প্রেয়সীকে তিনি বাস্তবলোকে হারিয়েছেন, তাকে পেতে চেয়েছেন স্বপ্নসুন্দর কল্পনার ভূমিতে; বাস্তবে যে-নারী গৃহের সংকীর্ণ গণ্ডিতে সঞ্চরণ করে বেড়াতেন, মৃত্যুর পর সমস্ত ভুবনে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন। কবির অন্তরে তিনি প্রেমানন্দময়ী, বাইরে বিশ্ববিকাশিনী, সৌন্দর্যস্বরূপিণী—প্রেমের জগৎ থেকে সৌন্দর্যজগতে, সৌন্দর্যের জগৎ থেকে প্রেমজগতে কবির নির্বাধ আনাগোনা। নিজের একান্ত-প্রেয়সী কখন যে বিশ্বের সৌন্দর্যপ্রতিমায় পরিণত হয়েছেন, কবি নিজেও বুঝি তা জানেন না। বলা বাহুল্য, সৌন্দর্যপ্রতিমা বলেই, 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সারদা বা সরস্বতী আমাদের প্রচলিত ধারণার সরস্বতী থেকে বিভিন্ন। কবির ভাবদৃষ্টিতে মানবসংসারে তিনি কখনো জননী, কখনো ভগিনী, কখনো কন্যারূপে প্রতিভাত হন। ইংরেজ কবি শেলীর 'Spirit of Beauty'-র সঙ্গে বিহারীলালের আরাধ্যা সারদার সাদৃশ্য রয়েছে। যে-প্রেমময়ী, সৌন্দর্যময়ীর উদ্দেশে বিহারীলাল বলেছেন :

কে তুমি মানবদ্বন্দ্ব,
মূর্তিমান প্রেমানন্দ,
কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহরস-উদার-উচ্ছ্বাস—

—যেন সেই একই সৌন্দর্যপ্রতিমা—ছায়াশরীরী 'Spirit of Beauty'—সম্পর্কে শেলী—বলছেন :

In many mortal froms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought.

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শেলীর কামনার লক্ষ্মী—'idol of my thought'—আদর্শসৌন্দর্যপ্রতিমা—চির-অধরা ; কিন্তু যে-কল্পিতা প্রেমময়ী নারীর চরণে বিহারীলাল প্রেমিকের ভালোবাসা অর্পণ করেছেন, ছায়ামূর্তি হলেও, ইনি অন্তরে-বাইরে ক্ষণপ্রকাশের মধ্যে মাঝে মাঝে চকিতে ধরা দেন। শেলী বিষণ্ণতার কবি, বিহারীলাল—আনন্দমগ্নতার। ভাবময়ী সারদার হ্লাদিনী-রূপের সঙ্গে কবি প্রেমলীলায় তন্ময় হয়ে থাকেন, অন্তরে অগাধ রসের ও তৃপ্তির সন্ধান পান ; তাই. বিরহবেদনাও তাঁর কাছে চিরানন্দের উৎস হয়ে ওঠে :

তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা হারা হলে আমি প্রাণহারা হই,
করুণা কটাক্ষে তব প্রাণ পাই অভিনব—
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে-কদিন আছে প্রাণ করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণতলে ॥

এ হলো আত্মসর্বস্ব এক কবির কথা, যাঁর কাছে—'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'। এ জাতের কবি Objective Reality-কে তেমন মূল্য দিতে চান না। বিহারীলালের ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ গুরুর এই আত্মভাবপরায়ণতা বা subjectivity পুরোমাত্রায় পেয়েছেন—রবীন্দ্রের মানসসুন্দরী, জীবনদেবতা, প্রভৃতির কল্পনায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর স্বপ্নধৃতা 'সারদা'-র ভাববিগ্রহের ছায়াপাত হয়েছে। বিরহমূলক সৌন্দর্যভাবনাকে বিহারীলাল যেমন 'সারদা'-র মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন, তেমনি. রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসসুন্দরীর মধ্যে নিজের বিরহভাবুকতাকে

ছড়িয়ে দিয়েছেন। যে-নারীর মূল রয়েছে বাস্তবে, সেই নারীই উভয় কবির কল্পনালোকে স্বপ্নের ফুল হয়ে ফুটেছে।

'সারদামঙ্গল'-এর প্রারম্ভে কবি করুণাময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বন্দনা করেছেন। পরে বাল্মীকির তপোবনে তাঁর আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে। সেই হিমাদ্রিশিখর আলো করে দেবীর সহসা আত্মপ্রকাশ, সেই তমসাতীরে প্রভাতাগমে ক্রৌঞ্চদম্পতীর মিলনছবি, ব্যাধের নিষ্ঠুরতা ও বাল্মীকির ললাটে জ্যোতির্ময়ী 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে'র কায়ারূপগ্রহণ ও বাল্মীকির করুণাবিহ্বলতা—এসকলের অনুপম চিত্র কবি অতিশয় নিপুণতাসহকারে এঁকেছেন। সারদাদেবীর এই করুণা-মূর্তির বর্ণনার পর তাঁর সুবর্ণপদ্মাসীন সৌন্দর্যমূর্তি চিত্রিত হয়েছে, এবং পরিশেষে কবি সারদার নিকটে মনপ্রাণ সমর্পণ করে একান্ত ভক্তের ন্যায় তাঁর সেবায় ধন্য হতে চেয়েছেন।

এর পরবর্তী সর্গগুলিতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। দেবী প্রণয়াস্পদারূপে আবিভূ'তা হয়ে বিচিত্র সুখদুঃখের সংগীতে কবির হৃদয় পূর্ণ করে তুলছেন। কবি 'কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা, কখনো ভর্ৎসনা, কখনো স্তবে' নিজের কাব্যকুঞ্জ মুখর করে তুলছেন। তিনি কখনো সারদার বিষাদমূর্তি কল্পনা করে অন্তরে অশেষ বেদনা অনুভব করছেন, কখনো এই অভিমানিনীকে সম্বোধন করে অশ্রুসিক্ত হচ্ছেন। সহসা কবির সন্দেহ হয়েছে, তাঁর এই প্রেমের বস্তুর অন্বেষণ মনের ভ্রান্তিভ্রান্ত। কিন্তু কবি নিজ হৃদয়ের গভীরে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, এ তাঁর কাছে অত্যন্ত সত্য একটি বস্তু :

তবে কি সকলি ভুল ? নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র গগনফুল কল্পনালতার ?
মন কেন রসে ভাসে, প্রাণ কেন ভালোবাসে
আদরে পরিতে গেলে সেই ফুলহার ?
শত শত নরনারী দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারানিধি পায়, না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি।

এইভাবে কবি সকল দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে ওঠেন এবং আবেগবশে তাঁর সারদার সঙ্গে মধুর প্রণয় বর্ণনা করেন, এবং তাঁর নিজ রসস্ফূর্তি অপূর্ব ভাষায় বিবৃত করেন।

কবি গ্রন্থখানি শেষ করেছেন হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী সারদার সঙ্গে মিলনানন্দের চিত্র এঁকে। প্রণয়াস্পদাকে বিশ্বের মধ্যে স্থাপন করে তিনি তার মানবীয় ভাববিলাস বর্ণনা করেছেন এবং আপনার বিমল আনন্দ স্বর্গে-মর্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রেমসৌন্দর্যের সাধক বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর 'সোনার শ্লোকগুলি' একদা রবীন্দ্রকবিচিত্তে গভীর দাগ কেটেছিল। রবীন্দ্রের প্রণয় ও সৌন্দর্যভাবনামূলক কিছু কিছু কবিতার কয়েকটি ভাববীজ এই প্রেমকাব্যখানি থেকে সমাহৃত।

অতঃপর **'সাধের আসন'**। এতে কবি তাঁর কল্পিতা নারীমূর্তি সারদার স্বরূপ স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন। এ একখানি খণ্ডকাব্য। কাব্যখানির জন্মকথা কবি নিজেই আমাদের শুনিয়েছেন :

"কোনো সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী 'সারদামঙ্গল'-পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম— 'সাধের আসন'। সাধের আসনে 'সারদামঙ্গল' হইতে—'হে যোগেন্দ্র, যোগাসনে ঢুলু ঢুলু ঢু-নয়নে বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও'— ইত্যাদি শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করিয়া আসনপ্রদানকালে আসনদাত্রী উক্ত শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন।"

এই প্রশ্নের উত্তরেই কবির 'সাধের আসন' কাব্যখানি রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। উক্ত আসনদাত্রী সীমন্তিনী হলেন রবীন্দ্রের 'বৌঠাকুরানী'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী, অকালে লোকান্তরিতা কাদম্বরী দেবী।

'সাধের আসন'-কে 'সারদামঙ্গল'-এর পরিশিষ্ট-হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে ওই সারদাকে কবি দার্শনিক ভঙ্গিতে বিশ্বের ঐক্যতত্ত্বরূপে দেখবার অভিলাষী। স্থানে স্থানে উভয় গ্রন্থের ভাবসাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করবেন। দশটি সর্গ, উপসংহার ও কয়েকটি গানে সম্পূর্ণ এই কাব্যের প্রথম সর্গে কবি লিখছেন :

আহা, বিশ্ব-পরকাশি
উদার সৌন্দর্যরাশি
জলে-স্থলে-আকাশে সদাই বিরাজিত ;
যেদিকে ফিরিয়া চাই,
সৌন্দর্যে ডুবিয়া যাই ;

অত্যুল্লাসকরী, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!
কে তুমি, মা, কান্তিরূপে সর্বরূপে বিভাসিত।

'সারদামঙ্গল' বস্তুত এই আনন্দলক্ষ্মীরই গান। বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দের উপলব্ধি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিচেতনাকে অভিভূত করেছিল, এবং আনন্দসমুদ্রে অবগাহন করে, ভাবখোলা মনে, যে-প্রেমসৌন্দর্যের গান তিনি গাইলেন, তাতে, বাঙ্‌লা কাব্যের ধারায় একটি নতুন সুর যোজিত হলো। 'সাধের আসন'-এ বিহারীলাল যে-আনন্দলক্ষ্মীর কথা বলেছেন, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাঁকে বিশ্বাত্মা বা বিশ্বদেবী বলা যেতে পারে—এক মহাশক্তি তিনি। এই বিশ্বদেবীর কল্পনার মূলে তন্ত্রোক্ত চণ্ডিকাদেবী, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বেদান্তের অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া যেন আত্মগোপন করে রয়েছে। ইনি একাধারে জ্ঞানরূপিণী, চৈতন্যরূপিণী এবং কান্তিরূপিণী অর্থাৎ সৌন্দর্যময়ী। সারদা একদিকে যেমন যোগীর ধ্যেয়, তেমনি, অন্যদিকে, কবির আরাধ্যা:

কবিরা দেখেছে তারে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তারে যোগের আসনে।

'যোগীন্দ্রের ধ্যানধন'ই বিহারীলালের 'হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী'র রূপে প্রতিভাত হয়েছে। সারদা কবির কাছে রহস্যময়ী হলেও এঁর সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট:

প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা:
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানবমনের তুমি উদার সুষমা।

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে প্রেমের রহস্যবাদী কবি [love-mystic] বলা যেতে পারে। সর্বদা তিনি প্রেমধ্যানে তন্ময় ও সৌন্দর্যধ্যানে বিভোর হয়ে থাকতেন। চিত্তের এরূপ ভাববিভোর অবস্থায় তাঁর কণ্ঠ থেকে গান উৎসারিত হতো। এই সংগীতের যে শ্রোতা আছে একথা তিনি প্রায়শ ভুলে যেতেন। পাঠকের দিকে দৃষ্টি রেখে কাব্য-কবিতা লিখতেন না বলে তাঁর রচনা সর্বথা ভাবের উৎকৃষ্ট রূপনির্মিতি হয়ে ওঠেনি। উত্তম কবিতা কেবল গূঢ়ভাবব্যঞ্জক নয়, তার বাণীদেহ থেকে বিচিত্র-কলাকৌশল-সমুদ্ভূত চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যের দ্যুতিও বিচ্ছুরিত হয়। অর্থাৎ

কবিকে শুধু ভাবুক হলে চলে না, তাঁকে কারুকৃৎ বা শিল্পীও হতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিহারীলাল কিন্তু শিল্পী নন। একারণে বড়ো একজন ভাবসাধক হয়েও মহৎ কাব্যশিল্প আমাদের হাতে তিনি তুলে দিতে পারেননি। নিরতিশয় ভাবমগ্নতা এবং শ্রোতার বিষয়ে উদাসীনতা উত্তম কাব্যসৃষ্টির পথে তাঁর বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যসুন্দরী গুণ্ঠনবতী, মুখ থেকে ঘোমটা অপসারণে তার যেন অত্যন্ত সঙ্কোচ। তবু, মাঝে মাঝে কখনো যখন গুণ্ঠন উন্মোচিত হয়, তখন তার মুখের আশ্চর্য রূপশোভা দেখে আমরা বিস্মিত বোধ করি।

সে যা হোক, কবির কাছ থেকে যা আমরা পেয়েছি তার মূল্য সামান্য নয়। 'সারদামঙ্গল' কবিকে অমর করে রেখেছে। কাব্যখানি বস্তুত আধুনিক গীতিকবিতার গঙ্গোত্রী। 'সারদামঙ্গল' ও 'সারদামঙ্গল'-এর রচয়িতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত উক্তি উদ্ধার করে আমরা আমাদের আলোচনার উপসংহার টানছি :

> একথা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত-সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

॥ উপন্যাস ও ছোটগল্প ॥

কাহিনী বা গল্প শুনতে কে-না ভালবাসে ? সে কোন্ আদিম যুগ থেকে মনের জাগ্রত কৌতূহল নিয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ বিচিত্র আখ্যান-উপাখ্যান, রূপকথা-উপকথা শুনে আসছে। মানুষের জীবন নানান ঘটনার আন্দোলনে নিত্য আন্দোলিত, এদের মধ্যে তার সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, আশা-নৈরাশ্য প্রতিফলিত। বাস্তবে যা ঘটছে তার ওপরে মানুষ কিছুটা নিজের কল্পনা যোগ করে দিচ্ছে—উভয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হচ্ছে মনোজ্ঞ কাহিনী। এসব কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখে চলে এসেছে ; আবার, এর কিছু কিছু ছাপার অক্ষরে গ্রথিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানবমানবীর মধ্যে কাহিনী শোনার বাসনাটি অত্যন্ত প্রবল।

কিন্তু আধুনিককালে যাকে আমরা 'উপন্যাস' আর 'ছোটগল্প' [ইংরেজিতে Novel ও Short Story] বলি, আড়াই-শ তিনশ বছর আগে তার কোনো

অস্তিত্ব ছিল না। বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের উদ্ভব হয়েছে সকলের পরে। সাহিত্যের এলাকায় ছোটগল্প সর্বকনিষ্ঠ আগন্তুক। একালের বিজ্ঞানবুদ্ধি, বাস্তব মনোভঙ্গি, তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, যুগসমস্যা, বর্তমানের যন্ত্রপ্রভাবিত জটিল জীবনধারা, শক্তিশালী গদ্যের প্রসার, ইত্যাদির সঙ্গে খাঁটি উপন্যাস ও ছোটগল্পের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এ সমস্ত বস্তুর সমবায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হলো, তখনই জন্ম হলো উপন্যাসের, আবির্ভাব হলো ছোটগল্পের। য়ুরোপীয় সাহিত্যে উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র আঠারোর শতকে, এবং এর অল্পকাল পরে দেখা দিয়েছে ছোটগল্প। উভয়ে একেবারে আধুনিক কালের সৃষ্টি।

গল্প-উপন্যাসকে আমরা বলে থাকি কথাসাহিত্য। কাহিনীবর্ণন উভয়ের লক্ষ্য বলে সাহিত্যকর্ম-হিসেবে এদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু পার্থক্যও কম নয়। এ পার্থক্য আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত। উপন্যাসের কাহিনী দীর্ঘায়ত; এতে ঘটনার ঘনঘটা, বহুসংখ্যক পাত্রপাত্রীর সমাবেশ। ছোটগল্পে কাহিনীর পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, পাত্রপাত্রী সংখ্যায় কম। উপন্যাসে কাহিনী প্রায়শ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে শ্লথগতিতে পরিণামের দিকে এগোয়। আখ্যানের এই ব্যাপ্তি ছোটগল্পের নেই. কাহিনী এখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। উপন্যাস জীবনবৃত্তের ওপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করে, বিস্তৃত পরিসরে সূক্ষ্মজটিল মনোবিশ্লেষণ এখানে সম্ভব। কিন্তু ছোটগল্পে মানবজীবনের একটি খণ্ডাংশকে রূপায়িত করা হয়। তাই, অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্র, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এখানে যথাসম্ভব পরিহার্য। কোনো ভাব বা ঘটনার একমুখিতা, বাক্যের ব্যঞ্জনাময়তা এবং উপসংহারের নাটকীয়তা ছোটগল্পের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। এজাতের সাহিত্যকর্মের কলাকৌশল অতিশয় সূক্ষ্ম। ছোটগল্পকে আয়তনে বাড়ালে উপন্যাসের রূপ পাবে না, উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত করলে ছোটগল্পে পর্যবসিত হবে না—আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয়ে এতখানি পৃথক।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা ভাষার সত্যিকার প্রথম ঔপন্যাসিক, আর, রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছোটগল্পনির্মাতা। বঙ্কিমের আগে আমাদের কোনো লেখক খাঁটি উপন্যাস রচনা করেন নি। তাঁদের হাত দিয়ে বেরিয়েছে সামাজিক নক্‌শা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে প্রকৃত ছোটগল্প লেখার দিকে কেউ দৃষ্টি দেননি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের এই কীর্তি অবশ্যস্মরণীয়।

॥ মহাপ্রতিভাবান উপন্যাসনির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

বাঙ্‌লা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিম [১৮৩৮—১৮৯৪] তাঁর কৈশোরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যখন প্রথম অবতীর্ণ হলেন, তখন কবি ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন নবীন লেখক-সম্প্রদায়ের খুববড়ো একজন উৎসাহদাতা। এই ঈশ্বরগুপ্ত এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যকবিতা বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন কবির ভূমিকা। তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম : 'ললিতা ও মানস' —একটি কবিতা-পুস্তক। গ্রন্থখানিতে ভারতচন্দ্র ও গুপ্তকবির প্রভাব সুপ্রকট। প্রাচীন কাব্যপন্থার অলংকারবাহুল্য ও রুচির দীনতা 'ললিতা ও মানস'-এ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের এই সময়কার গদ্যরচনাতেও প্রাচীনের অনুসারিতা চোখে পড়ে।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রতিভাধর ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্কিম পূর্ববর্তী সাহিত্যনায়কদের প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন। তিনি যেন আপনা থেকেই বুঝতে পারলেন, কাব্যের এলাকাটি তাঁর মানসধর্মের অনুকূল নয়। তাই, তাঁকে সাহিত্যে গদ্যপন্থাকেই আশ্রয় করতে হলো। এ সময়ের আরো একটি উল্লেখ্য ঘটনা হলো, তদানীন্তন পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন বাঙালি লেখকের মতো, বঙ্কিমও. প্রথমে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যনির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফলে, আমরা পেলাম তাঁর 'The Adventures of a Young Hindu', 'Rajmohan's Wife' প্রভৃতি রচনা। কিন্তু বঙ্কিমের এ ভুল ভাঙতে দেরি হলো না, তাঁর অন্তঃপ্রেরণা ও দূরদৃষ্টি এ পথ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনলো—মাতৃভাষাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বাহন করে নিলেন। গদ্যে নিজস্ব একটি স্টাইলও দাঁড় করালেন তিনি। এই গদ্যভঙ্গি বঙ্কিমী-রীতি নামে পরিচিত। তখন দেশে ইংরেজিশিক্ষার প্রসার ঘটেছে, হিন্দুকলেজে যাঁরা পাঠ নিয়েছেন তাঁরা ইংরেজি উপন্যাসাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু বিদেশি সাহিত্য পড়ে কি রসপিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়? তাঁদের চিত্তে পিপাসার উদ্রেক হয়েছে, অথচ য়ুরোপীয় আদর্শের—বাঙালিজীবনভিত্তিক—কোনো আখ্যায়িকা হাতের কাছে নেই বলে ওই পিপাসা তাঁরা নিবৃত্ত করতে পারছিলেন না।

মাতৃভাষার এই অভাব দূর করতে এগিয়ে এলেন সাহিত্যসাধক বঙ্কিমচন্দ্র।

সে এক দৈবী প্রেরণার অলঙ্ঘ্য নির্দেশ যেন, ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে-আসা রহস্যময় একটি বস্তু—বঙ্কিমচন্দ্র সহসা একদিন বাঙ্‌লা গদ্যবাণীর খাতে আপন

প্রতিভাকে পরিচালিত করলেন। এরূপ ঘটনা যে-লগ্নে ঘটে, সে মাহেন্দ্রক্ষণ বটে। ইংরেজি ভাষার মোহ কাটিয়ে উঠে, বিলাতি বিদ্যার অভিমান বর্জন করে দীনা মাতৃভাষার চরণে শরণ নেবেন বঙ্কিম, এ কি নিজেও কদাপি তিনি ভেবে ছিলেন? আর, সেকালের শিক্ষিত বাঙালিও কি ভেবেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামধারী ইংরেজিনবিশ নবীন যুবকটি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখে তাদের চমকিত করবেন, বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেবেন? প্রতিভার জাগরণ যখন হয়, এমনিভাবেই হয়, দিনক্ষণের কোনো খবর পূর্ব থেকেই দেয় না। কোনো নিয়ম মেনে চলা বুঝি তার স্বভাব নয়। একদা বঙ্কিমের সুপ্ত প্রতিভা জেগে উঠলো, সৃষ্টির অধীর আবেগ অনুভব করলেন তিনি, তাঁর কলম থেকে বেরুলো 'দুর্গেশনন্দিনী'।

গ্রন্থখানি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বের প্রথম উপন্যাস, প্রকাশকাল ১৮৬৫ ইংরেজি সাল—এর বয়স একশ বছর পেরিয়ে গেছে। অপরিণত প্রতিভার চিহ্ন ও প্রথম সৃষ্টিকর্মের দুর্বলতা এর মধ্যে আছে। সেইকালে যে-খ্যাতি এ উপন্যাসখানি পেয়েছিল অদ্যাপি তা নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। কারণ, আজকের দিনে এর রস যতই কাঁচা বলে মনে হোক, 'দুর্গেশনন্দিনী' যে বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছিল—এই ঘটনা অবিস্মরণীয়। ইতঃপূর্বে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' প্রকাশিত হয়েছে, মধুসূদন দত্ত একটি বড়ো আর্টের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু মানব-জীবন ও নরনারী-চরিত্রের যে-বৃত্তে তাঁর কবিকল্পনার সঞ্চরণ, তার পরিধি সংকীর্ণ, এতে সংসার-রস-পিপাসা তেমন নিবৃত্ত হয় না। পক্ষান্তরে, 'দুর্গেশনন্দিনী', শিল্পসৃষ্টি-হিসেবে, মেঘনাদবধের ন্যায় উচ্চপর্যায়ের সামগ্রী না হলেও, এর মধ্যে জীবন-রস-তৃষ্ণা-নিবৃত্তির উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশিই লক্ষিত হয়। এই আখ্যায়িকার অন্তর্গূঢ় মানবিকতা, এতে প্রতিফলিত মানুষের প্রবৃত্তিবেগের আলোছায়ার খেলা, হৃদয়বৃত্তির প্রবলতা—স্নেহ-প্রেম-আশা-নৈরাশ্য-ঈর্ষা-প্রতিহিংসা-শঙ্কা-উৎকণ্ঠার বর্ণাঢ্য বাণীচিত্রণ—সেকালের ইংরেজিজানা পাঠকগোষ্ঠির চিত্তচমৎকারের কারণ হয়েছিল, এর রসের অভিনবতায় সকলে মুগ্ধ হয়েছিল।

গোত্রপরিচয়ে 'দুর্গেশনন্দিনী' বিলাতি সাহিত্যের রোম্যান্স-পর্যায়ের রচনা, অর্থাৎ রোম্যান্স-জাতীয় নভেল। রোম্যান্স-এ কল্পনার প্রাধান্য—ঘটনাগুলো চমক-প্রদ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী সীমারেখাটি প্রায়শ উল্লঙ্ঘন করে যেতে চায়, সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্নটিকে ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিত করে দেয়। রোম্যান্স বাস্তব-জীবনের একেবারে গা ঘেঁষে চলে না; তথাপি, বাস্তবের দায়িত্ব তাকে কিছুটা মেনে চলতে হয়। য়ুরোপীয় রোম্যান্স-নির্মাণের শাস্ত্রবিধি হুবহু অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র

আমাদের কাব্যসুরভিত একটি গল্প শুনিয়েছেন, নিজের যৌবনস্বপ্নাবেশসঞ্জাত মনোরম একটি কাহিনী রচনা করেছেন। এ কাহিনীরই নাম—'দুর্গেশনন্দিনী'।

অধুনা যে-শ্রেণীর আখ্যানকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলা হয়ে থাকে, দুর্গেশনন্দিনীকে সেই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় না—বঙ্কিমের কালে ঠিক এজাতের আখ্যায়িকার জন্ম হয়নি। বর্তমান গ্রন্থের কিছু কিছু ঘটনায় ও দুয়েকটি চরিত্রে ইতিহাসের স্পর্শ অবশ্য আছে, কিন্তু ইতিহাসের যথার্থ ভাবনা বলতে যা বোঝায়, তা অপ্রাপ্তব্য। যে-বস্তুটি এখানে লক্ষিত হয় তাকে কল্পনার ইতিহাস বলা যেতে পারে—ঐতিহাসিক কল্পনার বিশুদ্ধিরক্ষার দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি লেখক। কাজেই, ঐতিহাসিক তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখবার তেমন দরকার হয় না। এই গ্রন্থকে একখানি ইতিহাসগন্ধী আখ্যায়িকা বললেই যথেষ্ট। অতীতচারী কল্পনার সাহায্যে রোম্যান্স-রসের পুষ্টিবিধানের জন্যই উপন্যাসকার এখানে ইতিহাসের আলো-আঁধারি কক্ষের দুয়ার খুলেছেন।

ঘটনারই প্রাধান্য দুর্গেশনন্দিনী-তে। ঘটনাকে ফোটাবার উদ্দেশ্যেই যেন চরিত্রগুলি কল্পিত। গ্রন্থখানিতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটনা-সব ঘটে যাচ্ছে, মুহূর্তে মুহূর্তে অভাবনীয়ের চমক সৃষ্টি করছে; রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল নিয়ে অভিভূত পাঠক কোথাও ঘটনারাজি চোখের সামনে দেখছে, কোথাও তার বৃত্তান্ত শুনছে। কাহিনী-নির্মাণের অসাধারণ ক্ষমতা লেখকের, ঘটনাউদ্ভাবনেব আশ্চর্য শক্তির যাদুতে পাঠকের প্রতীতিকে নিয়ে খেলা করছেন তিনি, আপাত-অসম্ভবকেও সম্ভাব্য বলে তাদের বিশ্বাস করাতে চাইছেন। এভাবে গল্প শোনাতে পারাটা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের খুব বড়ো একটি শক্তি। এ ক্ষমতা তরুণ-বয়সেই তিনি অর্জন করেছিলেন। এই অখ্যায়িকায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টিরও পরিচয় আছে—নারীর হৃদয়রহস্যের গভীরে মাঝে-মধ্যে তিনি উঁকি দিয়েছেন, মনুষ্যের চরিত্রগত নিয়তিকে, খুব স্পষ্টরূপে না হলেও, ধরতে পেরেছেন। চরিত্রচিত্রণে তাঁর শিল্পকুশলতার সাক্ষ্য বহন করছে বিমলা—প্রাণবন্ত ও প্রেক্ষণীয় একটি চরিত্র। বঙ্কিমের কবিস্বপ্নের সুরভি দিয়ে নির্মিত হয়েছে আয়েষা-চরিত্র—দুর্গেশনন্দিনীতে অঙ্কিত চরিত্রসমুচ্চয়ের মধ্যমণি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যপ্রেরণার মূলে রয়েছে নারীর প্রেম—নারীপ্রেমের মহিমারই অতিবড়ো একজন কাব্যকার তিনি। তাঁর এই প্রেমের ধ্যানের শুরু 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে, পরবর্তী আখ্যায়িকাগুলিতে ক্রমশ তা গভীরতর হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে বঙ্কিম-প্রতিভার অঙ্কুরোদ্‌গম লক্ষ্য করা গেলো। এতে বহুবিধ ত্রুটি সূক্ষ্মদৃষ্টি পাঠকের চোখে পড়বে। তথাপি, পাঠকমাত্রেই এর অভিনব স্টাইলের

ভাষা আর কাহিনীর যাদুতে মুগ্ধ হবেনই। বঙ্কিম এখানে শুধু গল্পই বলেছেন, জীবনজিজ্ঞাসার আর্তির প্রকাশ এতে নেই। তবে অচিরকালমধ্যে এ আমরা দেখতে পাবো, দুর্গেশনন্দিনী-তে তার সম্ভাবনার সূচনা আছে। আখ্যায়িকাখানি সম্বন্ধে কথা একটু বেশি বলা হলো যেন—বোধ করি, প্রথমসৃষ্টির গৌরব এর দেহে লেগে আছে, এসত্যটি ভোলবার নয় বলে।

দ্বিতীয় আখ্যায়িকা '**কপালকুণ্ডলা**' [১৮৬৬]—কথাকাব্যকার বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। দুর্গেশনন্দিনী-তে বঙ্কিমচন্দ্র নিজ স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার দুঃসাহস দেখিয়েছেন—ডানা দুর্বল থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো পাখি ঊর্ধ্ব আকাশে যেরূপ ধাবিত হতে চায়, সেরকমের দুঃসাহস। প্রতিভা-শিশু এভাবে খেলা করতে, মনে হয়, ডরায় না। দুর্গেশনন্দিনী-আখ্যায়িকায় লেখনীর যে-দুর্বলতার চিহ্ন সুপ্রকট, 'কপালকুণ্ডলা'-য় তা একেবারেই লক্ষিত হয় না। এই দ্বিতীয় উপন্যাস-খানির নির্মাণকালে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পরচনশক্তি সহসা পূর্ণ-বিকাশলাভ করেছে। ঘটনাটি আকস্মিক বলেই বিস্ময় জাগায়, প্রতিভার এত দ্রুত প্রস্ফুরণ সচরাচর চোখে পড়ে না। এবার, আপন ক্ষমতা-বিষয়ে ঔপন্যাসিক নিজেও নিঃসংশয় হলেন—তাঁর অবন্ধন রোম্যান্টিক কল্পনা অবলীলাক্রমে দূরদিক্‌বলয় স্পর্শ করলো। এখন থেকে বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি সৃষ্টির ঊর্ধ্বদেশ ও তলদেশের রহস্য-যবনিকা-উন্মোচনে প্রবৃত্ত হবে। রূপে ও রসে 'কপালকুণ্ডলা' এমন এক কবিবাঙ্‌নির্মিতি, যার সদৃশ সামগ্রী বাঙ্‌লা সাহিত্যে নেই, পৃথিবীর সাহিত্যেও আছে কিনা, সন্দেহ। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ গ্রন্থ অসঙ্গ, একক।

'কপালকুণ্ডলা'-কে ঠিক উপন্যাস-নামে আখ্যাত করা যাবে না, এতে গল্পের আধারে কাব্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। বালক-বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র কবিতার চর্চা করতেন, কিন্তু ওই ক্ষেত্রটিতে তাঁর ভাগ্যে সাফল্য জোটেনি। তখন যে-কবিসত্তার কণ্ঠরোধ করা হলো, পরবর্তী গল্প-রোম্যান্সের ফাঁকে ফাঁকে সেই অবদমিত হতমান সত্তারই সোচ্চার আত্মঘোষণা শুনতে পাওয়া গেলো। অবশ্য বিশুদ্ধ কাব্যরসই কপালকুণ্ডলা-য় একতম আস্বাদনের বস্তু নয়, জীবন-কাব্যের রসের স্বাদও এখানে মিলবে। এই গ্রন্থে মনুষ্য-নিয়তির দুর্জ্ঞেয়তার সম্মুখীন হয়ে পাঠক নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অভিভূত হবেন, প্রকৃতিরূপা মহামায়ার মহাশক্তির রহস্যসমাচ্ছন্ন লীলা দেখে—তার কাছে নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, নিরতিশয় তুচ্ছ ও শক্তিহীন বুঝে—অত্যন্ত বিমূঢ় বোধ করবেন। ওই মহামায়ারই প্রতীক যেন এই উপন্যাসের নায়িকা-নারী ষোড়শী কপালকুণ্ডলা। নিজের কল্পিত অপর কোনো

নারীচরিত্রে আখ্যায়িকাকার বঙ্কিম এভাবে মূলা-প্রকৃতির রহস্যকে ধরবার প্রয়াস করেন নি।

ধর্মমোহাভিভূত, নিরাসক্ত, তান্ত্রিকদুহিতা আরণ্যক কপালকুণ্ডলার অন্তঃপ্রকৃতির ওপর আলোকপাতন—এহেন বন্যানারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য-উদ্‌ঘাটনই—এই উপন্যাসে লেখকের মনোগত অভিপ্রায়। বনবিহঙ্গী সমাজপিঞ্জরে আবদ্ধ হলো। কিন্তু আমরা দেখলাম, লোকালয়ের সোনার খাঁচায় তার মন বসে না, মুক্ত অরণ্যে উড়ে বেড়াবার দুর্মর বাসনা তাকে বন্ধনঅসহিষ্ণু করে তোলে ; উচ্ছ্বসিত প্রেমের স্পর্শেও তার চিত্তের নিস্পৃহতার রঙ্‌ এতটুকু বদলাতে পারে না ; প্রণয়-ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ। করুণা-সমবেদনা সে দেখায়, কিন্তু পুরুষের প্রেমপাশে কিছুতেই ধরা দেবে না। একদিকে আসক্তিবিজড়িত প্রণয়াকুতি, অন্যদিকে, নির্মম নিরাসক্তি ; একদিকে পুরুষ বলে—থাকো থাকো, অন্যদিকে, নারী বলে—যাই, যাই ; চরিত্রগত এই বৈষম্যই বর্তমান আখ্যায়িকায় ট্র্যাজেডিকে অনিবার্য করে তুলেছে। ভবিতব্য অপ্রতিবিধেয়। নায়কনায়িকা এখানে 'অদৃষ্ট' নামক মনুষ্যজ্ঞানাতীত এক দুর্জ্ঞেয় শক্তির অধীন—দুজনেই নিয়তির দুশ্ছেদ্য নাগপাশে আবদ্ধ।

'কপালকুণ্ডলা'-আখ্যায়িকায় ট্র্যাজেডির নায়ক নবকুমার বঙ্কিমের উপন্যাসের একটা বিশেষ ভাব-সত্যের দিকে এই প্রথম অঙ্গুলিসংকেত করলো যেন। সে হলো—পুরুষের রূপমোহ, যার ফলে প্রকৃতিশাসিত পুরুষজীবনের ট্র্যাজিক পরিণাম অপ্রতিরোধনীয় হয়ে ওঠে। এইরূপ রূপমোহ আর প্রেমানুভবের মধ্যে সত্যকার পার্থক্যের সীমারেখা কোথায়, বঙ্কিম নিজেও কি তা সঠিক ধরতে পেরেছিলেন ! সে যা হোক, এই সূত্রেই পুরুষের ভাগ্যে ট্র্যাজেডির পতন ঘনিয়ে আসে, এরূপ উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ নবকুমারে ; পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে এর বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এ আখ্যায়িকায় ইতিহাস একটুখানি স্থান পেয়েছে, উপনায়িকা মতিবিবির চরিত্র-আলেখ্য-চিত্রণের কাজে লেগেছে। মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের ভূমিকা এখানে একেবারেই গৌণ। অবশ্য স্বীকার করতে হয়, ইতিহাসের স্পর্শটুকু রোম্যান্স-রসকে ঘনীভূত করে তুলেছে—সপ্তগ্রামের স্থির-শান্ত জীবনে ইতিহাস অশান্ত তরঙ্গবিক্ষোভ জাগিয়েছে। কাব্যসৌন্দর্যের অপূর্বতায়, ভাবকল্পনার অভিনবত্বে, সর্ব-অঙ্গ-ব্যাপী গঠনসুষমায়, ট্র্যাজেডি-ভাবনার চমৎকারিত্বে 'কপালকুণ্ডলা' এক আশ্চর্য গ্রন্থ।

এর পর বঙ্কিম লিখলেন—'মৃণালিনী' [১৮৬৯], পাঠককে রোম্যান্সের গল্প শোনালেন। কবিকর্মের দিক থেকে দেখলে এই আখ্যায়িকা 'কপালকুণ্ডলা'-র পাশে স্থান পেতেই পারে না; এমন কি, গল্পকথনের সৌন্দর্যবিচারে 'দুর্গেশনন্দিনী' এর চেয়ে বহুগুণে উৎকৃষ্ট রচনা। এখানে গঠনশিল্পে পারিপাট্যের নিতান্ত অভাব, লিখনভঙ্গির শৈথিল্য সর্বত্র সুপ্রকট। আখ্যায়িকাখানিতে ইতিহাস আমন্ত্রিত, কিন্তু ইতিহাসের তথ্য অপেক্ষা কল্পনার ইতিহাসই বেশি জায়গা জুড়ে বসেছে। চরিত্র-গুলার অধিকাংশই ঐতিহাসিক মানবমানবী নয়। পটভূমিনির্মাণের জন্যে ইতিহাস 'মৃণালিনী'-তে অবশ্য প্রয়োজন। ঔপন্যাসিক কিন্তু এদিকে তেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন নি।

'মৃণালিনী'-কে ন্যাশনাল ট্রাজেডি বা জাতীয় জীবনের ট্র্যাজেডি বলা যেতে পারে। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হলো, বহিরাগত মুষ্টিমেয় মুসলমান অকস্মাৎ একদিন বাঙালির মাতৃভূমি অধিকার করে বসলো, এর চেয়ে কলঙ্ককালিমালিপ্ত ঘটনা জাতির জীবনে আর কী হতে পারে! বঙ্গের এই গ্লানিময় ইতিহাসের ওপরে স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম নতুন আলোকপাত করতে চেয়েছেন। সতেরো জন অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়-কাহিনীকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না,—এ অলীক একটি গল্প নয়তো কী! বাঙালি জাতি শৌর্যে কোনো জাতি অপেক্ষা হেয় ছিল না। তবে কেন দেশ বিধর্মী বিজেতার হাতে চলে গেলো? এর উত্তর—বাঙালিসন্তানের স্বদেশপ্রীতির অভাব, অসংহতির জন্যে হিন্দু-বাঙলার মারাত্মক দুর্বলতা; দেশের পরাধীনতার অশেষ দুর্গতি-লাঞ্ছনার মূলে রয়েছে দেশবাসীর চারিত্রিক হীনতা, আত্মঘাতি দুর্মতি। বঙ্কিম বোঝাতে চেয়েছেন, গৌড়দেশ অধিকৃত হওয়ার যে কিংবদন্তী, তার পেছনে নিশ্চয় ছিল কোনো ষড়যন্ত্র—অত্যন্ত হীন চক্রান্ত—ছিল বিশ্বাসঘাতকতার আত্মবিনাশী অস্ত্রক্ষেপণ। পশুপতির চরিত্র এই সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করে। 'মৃণালিনী' লিখতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র জাতিবাৎসল্যের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন। আখ্যায়িকা-খানিতে লেখকের দেশপ্রীতির সুর বেজেছে। 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্ত'-গ্রন্থের প্রণেতা বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর 'মৃণালিনী'-তে প্রথম শুনতে পেলাম আমরা। এর পটভূমি রাজনীতিক, ইতিহাসতথ্যের স্বল্পতা ও অস্বচ্ছতাকে কল্পনার দ্বারা পূরণ করে নিয়েছেন গ্রন্থকার।

উপন্যাসটিতে দুটি প্রেমের কাহিনী বর্ণিত—হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর ও পশুপতি-মনোরমার। প্রথমোক্ত প্রণয়ী-প্রণয়াস্পদার প্রেমে গভীর জীবনসত্যের কোনো

পরিচয় নেই, বড়ো তরল এই প্রেম। চরিত্রচিত্রণেও কবিদৃষ্টির স্বাক্ষর চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়োক্ত প্রেমকাহিনীতে ঔপন্যাসিকের জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় ফুটেছে। 'মৃণালিনী'-উপন্যাসে মনোরমার চরিত্রে যেমন প্রকৃতিশক্তির রসস্যজটিল ভূমিকা রূপায়িত হয়েছে, তেমনি, অন্যদিকে, পুরুষের রূপমোহ ও তজ্জাত ট্র্যাজেডি পশুপতির চরিত্রকে আশ্রয় করেছে।) বঙ্কিম পুরুষ-প্রকৃতি-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, মনোরমার মধ্যে মূল-নারী-প্রকৃতির চকিত স্ফুরণ চাক্ষুষ করেছেন। এই সমস্যা পূর্ব আখ্যায়িকা 'কপালকুণ্ডলা'-তেও গাঢ় ছায়াপাত করেছে। সেখানে আখ্যানটি সরল, পুরুষ-চরিত্রে জটিলতা খুবই কম। (এখানে পুরুষ-চরিত্রের জটিলতা ও প্রবৃত্তির আক্ষেপ-বিক্ষোভ জীবনের বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চে উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসশিল্পের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন, ক্রমেই জীবন-কাব্যের যথার্থ শিল্পী হয়ে উঠছেন, মনোরমার রহস্যময় নারীমূর্তি-গঠনে তার অভ্রান্ত পরিচয় মুদ্রিত।)

'মৃণালিনী'-তে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রথম পর্বের ছেদ পড়লো।

এবার আমরা দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করছি। এই দ্বিতীয় পর্ব বঙ্কিমের শিল্পীজীবনের যৌবনকাল, কিংবা বলা যাক্, বঙ্কিম-প্রতিভার মধ্যাহ্ন। এসময়কার অতিশয় বিশিষ্ট রচনা—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়দেশে প্রাণবন্ত কাব্যকল্পনার এমন বসন্তোৎসবের দিন পরে আর কখনো আসেনি, হৃদয়ের শোণিতধারায় সিক্ত মানবজীবনের এমন চিত্তস্পর্শী আলেখ্য আর কখনো আঁকেননি তিনি। উক্ত চারখানি আখ্যায়িকাই ট্র্যাজেডি—অতল অশ্রুর লীলা।

লক্ষ্য করতে হবে, ওপরে-কথিত আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে তিনটিই সামাজিক উপন্যাস,—কাব্যরসপ্রধান নিছক রোম্যান্স নয়। সমাজজিজ্ঞাসা, এই পর্বের ন্যায়, বঙ্কিমের উপন্যাসের অপর কোনো পর্বে, এতখানি তীব্র হয়ে ওঠেনি। এর পর তিনি আবার ইতিহাসাশ্রয়ী রোম্যান্সের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সমাজসমস্যার তুলনায়, তাঁর শেষজীবনের উপন্যাসে, প্রাধান্য পেয়েছে দুটি আদর্শের সমস্যা: এক, প্রাচীন বাঙালি তথা হিন্দুর বাহুবল সম্পর্কিত চেতনার পুনরুজ্জীবন-সাধন এবং নব্যজাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা; দুই, গীতোক্ত নিষ্কামকর্মের আদর্শে ব্রতী হয়ে জীবনে শ্রেয়োতপস্যার পন্থানুসরণ—এই পথে অতৃপ্য প্রণয়পিপাসা, রূপমোহ, ইত্যাদিকে জয় করা যায় কিনা, তার পরীক্ষানিরীক্ষা। 'রাজসিংহ'-এ প্রথমটি, এবং 'আনন্দমঠ'-'দেবীচৌধুরানী'-'সীতারাম'-এ সদ্য-কথিত

দুটি সমস্যাই রূপায়িত হয়েছে। কাজেই, বলা যেতে পারে, দুটি প্রান্তে দুই রোম্যান্সের রাজ্য ; মধ্যে সামাজিক উপন্যাসের এই লোকালয় বঙ্কিমমানসের বিশেষ ভাব-চিন্তা-উৎকণ্ঠারই পরিচয় বহন করে।) এখানে স্মর্তব্য, বাঙ্‌লাদেশের সমাজ-সংস্কার ও বাঙালির চিত্তপ্রসারের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি যখন প্রবন্ধ লিখছিলেন, তাঁর প্রথম সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' তখনই রচিত। এই আখ্যায়িকাটিতে, এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী'-তে, পটভূমিই কেবল সামাজিক নয়, সমস্যাও মুখ্যত সামাজিক। 'চন্দ্রশেখর'-এ ইতিহাস পটভূমিনির্মাণে নিযুক্ত হলেও, এতে রোম্যান্সের রমণীয় একটি মায়ালোক গড়ে উঠলেও, এর কেন্দ্রীয় সমস্যাটি একান্তভাবেই সমাজনীতিঘটিত। অবশ্য, 'রজনী'-তে মনস্তত্ত্ব উল্লেখ্য একটি স্থান অধিকার করেছে। একজন খুব বড়ো সমালোচক বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখর-কৃষ্ণকান্তের উইল-কে বাঙালির 'পরিবারতন্ত্রের ত্রিগাথা' বলেছেন। উক্তিটি অনুধাবনযোগ্য। এগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের দাম্পত্যধর্মের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কেন বঙ্কিম বাঙালির পারিবারিক জীবনের দিকে তাকালেন, কেন তিনি পর পর কয়েকটি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখলেন, এর উত্তর বোধ করি এই : 'পারিবারিক জীবন-ভিন্ন জাতীয় জীবন গঠিত হতে পারে না'। জাতির মানসগঠনের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জীবনের কথা না-ভাববেন তো এ ভাবনা কার ?

বঙ্কিমের '**বিষবৃক্ষ**' [১৮৭৩]। বহুপঠিত, বহুআলোচিত, বহুখ্যাত একখানি আখ্যায়িকা। এ বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত করলো—সামাজিক উপন্যাস রচিত হলো। রোম্যান্স এখানে আমাদের ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখকে আশ্রয় করেছে, সমাজসংসারের বাস্তবের নিকটবর্তী হয়েছে। প্রায়-সাধারণ মানবমানবীর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—প্রণয়লীলার সংঘর্ষ—এতে চিত্রিত। পূর্বে এজাতের আখ্যান বাঙ্‌লা সাহিত্যে ছিল না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'বঙ্গদর্শন-এ যে-জিনিসটা সেদিন ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী—ইংরেজিতে যাকে বলে—রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা—সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এলো তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।' বিষবৃক্ষ-উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তে যে-সব পাত্রপাত্রীর সঞ্চরণ, তারা আমাদের সকলেরই পরিচিত, এবং এর অ-সাধারণ কেউ নয়।

দাম্পত্যনীতির প্রতি ব্যক্তিমানুষ বঙ্কিমের পক্ষপাত বরাবরই ছিল। দম্পতি-আদর্শের শুচিতা অক্ষত থাকুক, দাম্পত্যপ্রেমে কোনোরূপ আবিলতার স্পর্শ যেন না লাগে, এ-ই বঙ্কিম চেয়েছিলেন। কারণ, ওই শুচিতা নষ্ট হলে, ওই প্রেমে ভাঙন ধরলে, কী ব্যক্তিজীবনে, কী সমাজজীবনে, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী—ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিষবৃক্ষ-আখ্যায়িকায় বঙ্কিমচন্দ্র এই দাম্পত্যপ্রেমকে মহীয়ান করতে চেয়েছেন, মনে মনে তার গৌরব-কীর্তনের বাসনা পোষণ করেছেন। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিহৃদয়ের পক্ষপাত বর্তমান আখ্যায়িকায় একেবারে গোপন থাকেনি, তা সূক্ষ্মদৃষ্টি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

এই যে দম্পতি-আদর্শ, এর ওপরে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত হেনেছে আখ্যায়িকার নায়ক নগেন্দ্রনাথ। হৃদয়দুর্বল পুরুষ নগেন্দ্রনাথ দত্ত নিজের বিবাহিত সহধর্মিণীর শুভ্রভাস, একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি, আরেক রূপবতী নারী তাকে কামনার জালে জড়িয়েছে। যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নগেন্দ্র দত্ত রূপমোহে আবিষ্ট হয়েছে, প্রবল প্রবৃত্তির হাতে অবশে ধরা দিয়েছে—বালবিধবা কুন্দকে সমাজবিধিনিন্দিত প্রণয় নিবেদন করেছে। নারীরূপা প্রকৃতির পারবশ্য—রূপমোহ—পুরুষ নগেন্দ্রের পৌরুষের দারুণ দুর্গতি ডেকে আনলো, তার জীবনে ট্র্যাজেডি অনিবার্য হয়ে উঠলো। প্রবৃত্তির বিক্ষোভের ঝড়োবাতাস বহন করে এনেছে সাংঘাতিক একটি বীজ, তা নিক্ষিপ্ত হলো সংসারভূমিতে—জন্মালো বিষবৃক্ষ। পতিব্রতা, প্রেমময়ী সূর্যমুখীর প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস নগেন্দ্র-কুন্দের আত্মবিস্মৃত প্রণয়-পিপাসার ওপরে অনুচ্চারিত অভিশাপের অগ্নিবর্ষণ করলো যেন। এতে কুন্দনন্দিনীর জীবন পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, নগেন্দ্রনাথ মরতে মরতে কোনোরকমে রক্ষা পেলো। তার গায়েও আগুনের আঁচ লেগেছে—অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে পতঙ্গের পাখা না পুড়ে কি পারে! নগেন্দ্রনাথ অন্তিমে আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে কুন্দের আত্মোৎসর্জনে আর সূর্যমুখীর অভিমানবর্জনে।

বঙ্কিমের ট্র্যাজেডিগুলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে নারী-প্রেম-নিয়তি—এ তিন বস্তু। নারীশক্তির দুর্বার আকর্ষণ, প্রেমের মৃত্যুনীল বিষামৃত, আর নিয়তির রহস্যকুটিল লীলা বঙ্কিমপ্রণীত ট্র্যাজেডির দেহে বিচিত্র বর্ণসম্পাত করেছে, এগুলি প্রেমতত্ত্বের কাব্যময় রসভাষ্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসকারের ভাবদৃষ্টিতে নারীর স্নেহ পুরুষের আধ্যাত্মিক সংকটের মুহূর্তে যেন স্বস্ত্যয়ন-মন্ত্র। আবার, পুরুষজীবনে নারীর শাসন দুর্লঙ্ঘ্য। নারীকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমে মহিয়সী করেছেন, তুলনায় পুরুষ-চরিত্র দুর্বল, যেমন—বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ। বঙ্কিমের আখ্যায়িকায় নারী

ও প্রেম সমার্থক হয়ে উঠেছে। প্রেমবশে নারী আত্মবিসর্জনে এতটুকু দ্বিধান্বিত নয়। বিষপানে কুন্দের আত্মবিনাশের সেই শোককরুণ দৃশ্যটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।) তার নিয়তিনিহত মূর্তির দিকে তাকালে অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আত্মহারা প্রেমের সে এক স্মরণসুন্দর আশ্চর্য আলেখ্য। (হৃদয়ের সমস্ত মমতা ঢেলে দিয়ে বঙ্কিম কুন্দের চিত্রটি এঁকেছেন। সূর্যমুখীর প্রতি তাঁর অগাধ সহানুভূতি। বঙ্কিমের গভীর কবিদৃষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন হীরা-চরিত্র।) নারীর অসংবৃত কামনার এমন নগ্নমূর্তি, নারীর অপমানিত প্রেমের, প্রতিহত বাসনার এমন সর্ববিধ্বংসী বিদ্রোহ কথাসাহিত্যে বড়ো-একটা দেখা যায় না। (হীরার চরিত্র-চিত্র-অঙ্কনে উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় ফুটেছে।) এই ট্র্যাজিক চরিত্রটি কদাপি ভুলবার নয়। (বর্তমান উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত-রচনা নিখুঁত, চরিত্রগুলি জীবন্ত, এবং এদের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, ঘটনার গ্রন্থিবন্ধন নিশ্ছিদ্র। আখ্যানবস্তুর সুডৌল রূপ 'বিষবৃক্ষ'-কে বঙ্কিমচন্দ্রেব সর্বোত্তম উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছে।) আমাদের বিবেচনায়, এর সঙ্গে তুলনা করলে, রূপসৃষ্টি-হিসেবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নিম্নাসনে স্থান পাবে। অবশ্য বঙ্কিমের নিজের মতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা।

এর পর **'চন্দ্রশেখর'** [১৮৭৫]—রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি। এখানেও সেই নারী, সেই প্রেম, সেই নিয়তি—নিষিদ্ধ প্রেমের বহ্নিবলয়—সর্বগ্রাসী, ভীষণ-সুন্দর। অসামাজিক প্রণয়াকূতির শোচনীয় পরিণাম, আর, ইন্দ্রিয়জয়ের মহিমা-ঘোষণা, এবং অবিক্ষুব্ধ সাত্ত্বিক প্রেমের গৌরব-প্রতিষ্ঠা ও দুরদৃষ্টের মর্মবিদারক আলেখ্য-অঙ্কন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের লক্ষণীয় বস্তু। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর, মীরকাশেম-দলনী এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ গ্রন্থেও নারীশক্তি প্রত্যক্ষত প্রাধান্য পেয়েছে। তথাপি, জয়মাল্য অর্পণ করা হয়েছে পুরুষকেই—প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের দীপ্যমান পৌরুষ পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতাপ নায়িকা-নারী শৈবলিনীর প্রণয়াস্পদ; চন্দ্রশেখর এই অন্যপূর্বা নারীর স্বামী। আখ্যায়িকাখানিতে নায়িকার প্রণয়ী-ই যেন নায়কের স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে। এহেন রোম্যান্সচিত্র আমাদের সেকালের কথাসাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। এদেশে চিত্তোন্মাদকর রোম্যান্সের আদিস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তবে, একথাও আমরা মনে রাখবো, কাব্যের রোম্যান্স এ নয়, মানবজীবনেরই রোম্যান্স—নরনারীর জীবনরহস্যই রোম্যান্সের মনোমদ মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। 'চন্দ্রশেখর'-এ পুরুষ-ভাগ্যের যে-ট্র্যাজেডি চিত্রিত হয়েছে, তা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী উপন্যাসে রূপায়িত

নবকুমার-নগেন্দ্রনাথ-আদির বেদনাময় জীবন-পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে, এখানে প্রণয়ার্তির সঙ্গে একটি নতুন বস্তু যুক্ত হয়েছে—নৈতিক আদর্শ—যেমনটি দেখতে পাই 'বিষবৃক্ষ'-এ। শৈবলিনীর প্রাণের দুর্বার পিপাসা ও সমাজবিধি বা সমাজনীতির দ্বন্দ্ব 'চন্দ্রশেখর'-আখ্যায়িকার প্রধান উপজীব্য। এতে সর্বাধিক উল্লেখ্য ঘটনা হলো শৈবলিনীর অপহরণ। গৃহ থেকে শৈবলিনীকে হরণ করে নিয়ে এলো লরেন্স ফস্টর। কিন্তু উদ্ধারলাভের সুযোগ পেয়েও শৈবলিনী ঘরে ফেরেনি। কাজেই, কেবল ঘটনার দিক থেকে নয়, হৃদয়ের দিক থেকেও, এ গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। একজন কুলনারীকে জনৈক কুঠিয়াল সাহেব গৃহের আশ্রয়চ্যুত করলো; প্রতাপ প্রভৃতি শুভানুধ্যায়ীর সাহায্যে সে উদ্ধার পেলো। তার দেহগত ও জাতিগত পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিচারাদির পর সমাজে সে পুনর্বার গৃহীত হলো। ঘটনাগত এরূপ একটি বৃত্ত এই কাহিনীর বাইরের দিকের বস্তু বা সূত্র।

এর সঙ্গে পাকে পাকে বিজড়িত হয়েছে শৈবলিনীর মুক্ত-প্রেমের আকূতি, তার ব্যর্থতা। দাম্পত্যজীবনের যে-নিষ্প্রাণ শূন্যতা থেকে সে অবন্ধন প্রাণলীলার উদার আকাশে ডানাবিস্তারের চেষ্টা করেছিল, সেই বিস্বাদ জীবনে আবার ফিরে এলো। রুদ্ধগৃহের এই শূন্যতাকেই বাস্তব, আর, নীল আকাশ, চতুষ্পার্শ্বের সরস সবুজ প্রাণবন্ত পৃথিবীকে স্বপ্নচ্ছবি বলে তাকে বিশ্বাস করতে হলো। নিয়তির কী কঠিন বন্ধন, অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! বাহিরে সমাজবিধিই শৈবলিনীর নিয়তি, অন্তরলোকে তার প্রতিকারহীন নিয়তি প্রবল প্রবৃত্তিবেগ—প্রাণের দুর্মর পিপাসা। স্বামী চন্দ্রশেখর তাকে ওই পিপাসায় পানীয় জোগায়নি, তাই, আরেক প্রবল পিপাসাপরায়ণ পুরুষ প্রতাপের দিকে সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। কিন্তু প্রতাপ-শৈবলিনীর চিরবিচ্ছেদ অনিবার্য,—উভয়ের জীবনের ট্র্যাজেডিকে ঠেকানো গেলো না।

সমাজবিধিবিড়ম্বিত, প্রেমতৃষ্ণাতুরা শৈবলিনীর কাহিনীটিকে ঘটনাসজ্জার দিক থেকে একটা বৃত্তের সঙ্গে উপমিত করা যায়। যে-বিন্দুতে এর সূচনা, দূর পথ-পরিক্রমার পর সেই বিন্দুতেই এর সমাপ্তি ঘটেছে। ফস্টর শৈবলিনীকে হরণ করলো। বহির্বিশ্বে ছাড়া পাবার এই সুযোগকে শৈবলিনী শ্বাসরুদ্ধকর গৃহবন্ধন থেকে মুক্তি বলেই ভেবেছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ফস্টরের নৌকায় তাকে বাস করতে হয়েছে, প্রিয়মিলনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে সে দিনাতিপাত করেছে। এর জন্যে কম সংগ্রাম করতে হয়নি তাকে। অবশেষে তার স্বপ্নসাধ বুঝি চরিতার্থ হতে

চললো, কামনার ধন যেন ধরা দেবার জন্যে নাগালের মধ্যে এলো। বঙ্কিম নাটকীয় রীতিতে প্রতাপ-শৈবলিনীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু সহসা প্রতাপ বন্দী হলো। বৃহত্তর রাজনীতিক সংঘর্ষের সঙ্গে শৈবলিনীর কাহিনী যুক্ত হয়ে পড়লো। ঘটনা ক্রমশ তীব্রতা লাভ করছে, সংঘাতবহুল হচ্ছে, ধমনীর রক্ত অধিকতর উষ্ণ হয়ে উঠছে। এর পর শৈবলিনী-কর্তৃক প্রতাপের উদ্ধারসাধন, নদীবক্ষে উভয়ের সন্তরণ, এবং জীবনের মূল সমস্যার উত্তর খোঁজবার প্রাণান্ত প্রয়াস। পশ্চাতে মারণাস্ত্রের শব্দ, মৃত্যুর শঙ্কা; ঊর্ধ্ব-আকাশে চাঁদের আলো; নিম্নে নদীবক্ষে তরঙ্গের বিচিত্র সৌন্দর্যলীলা। এই অংশে আখ্যায়িকা ভাবানুভূতির গভীরতায় ও কেন্দ্রীয় সমস্যার পরিণতি-বিষয়ে চরম ইঙ্গিতদানে, কাব্যোচ্ছ্বাসে ও কাব্যকলার উৎকর্ষে, এবং ঘটনাগতির তীব্রতায়, বৃত্তপথে দূরতম প্রান্তে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাটকের পরিভাষায় এরূপ অংশকেই বলে 'ক্লাইমেক্স' বা চূড়ান্ত মুহূর্ত। কোথায় সেই নিস্তরঙ্গ বেদগ্রামের পর্ণকুটির ও ক্ষীণ দীপালোক, আর, কোথায় সেই জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ—পিছনে মৃত্যুর কৃষ্ণচ্ছায়াকে তুচ্ছ করে ঊর্ধ্বলোকের নির্দ্বন্দ্ব নীলাকাশে মহামুক্তির স্বপ্নদর্শন। আরম্ভের বিন্দু থেকে এ যেমন দূরতম, তেমনি, এখান থেকেই সেই বিন্দুতে ফেরার পালা আরম্ভ।

প্রতাপ যখন প্রথমদর্শনে শৈবলিনীর প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখনো শৈবলিনী আশা ছাড়েনি, আর, তারই ফলে তরঙ্গিত নদীপ্রবাহমধ্যে প্রণয়ীযুগলের এই মধুমাখা মিলন। কিন্তু এবার আশা ছাড়তে হলো। প্রতাপ শৈবলিনীকে দিয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল—অতীত-বিস্মরণের প্রতিজ্ঞা। হায়, বিহঙ্গের ডানা ভেঙে গেলো বুঝি। অতঃপর অবসাদকবলিত দেহে সীমিত নীড়ের আশ্রয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়া। শৈবলিনীর মর্মান্তিক এই শেষ পতনটিকে আখ্যায়িকা-রচয়িতা বড়ো সহজে হতে দেননি। তিনি নরকের বিভীষিকা দেখিয়েছেন প্রখর পিপাসাক্লিষ্টা এই নারীকে, তার জন্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থা করেছেন—যৌগিক প্রক্রিয়ায় দুর্ভাগিনী শৈবলিনীর সমাজদ্রোহী অভিযানকে প্রতিহত করতে হয়েছে।

অতঃপর অন্তিম পরিণতি। প্রতাপকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। প্রতাপের মৃত্যুর মুখে ছুটে-যাওয়া শৈবলিনীরই প্ররোচনায়। প্রণয়াস্পদের এহেন মৃত্যুর মসীবর্ণ ছায়া শৈবলিনীর গ্রামগৃহের চারপাশে প্রসারিত হয়ে তার বিদীর্ণ অস্তিত্বের আলোকহীনতা, নিষ্প্রাণতা ও মরুময় শূন্যতাকে ভীষণ করে তুলেছে। বৃত্তটি সমাপ্তঃ

হলো। আরম্ভ ও সমাপ্তির বিন্দুটি একই—বেদগ্রামে চন্দ্রশেখরের বধূরূপে শৈবলিনীর অবস্থান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কী বিরাট পার্থক্য!

নবাব মীরকাশেমের পত্নী দলনীর জীবনও অদৃষ্টলাঞ্ছিত। ইতিহাসের দ্রুতধাবমান রথচক্রের তলে নবাবের বেগম দলিত-পিষ্ট হয়েছে। শৈবলিনীর ভাগ্যও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করেছে রাজনীতিক ইতিহাস। সুতরাং বলা যায়, 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান একেবারে গৌণ নয়। অশান্ত রাজনীতির ঘূর্ণীহাওয়া দলনীকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করলো। এক দুর্বৃত্তের স্বার্থসিদ্ধির কুটিল অভিসন্ধিতেই তার দুর্ভাগ্যের সূচনা। তারপর এক-একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে ওই দুর্ভাগ্যের অন্ধকারকে নীরন্ধ্র করে তুলেছে। এর পরিণাম অতিশয় শোক-করুণ।

ট্র্যাজেডির ঘনঘটা আখ্যায়িকাখানিকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এই ট্র্যাজেডি শৈবলিনীর, প্রতাপের, চন্দ্রশেখরের—তিনজনের, তিনরকমের। প্রতাপ মহৎ, মহৎ চন্দ্রশেখর; শৈবলিনী দুর্দমনীয় কামনাবাসনার বহ্নিমান বিগ্রহ। নৈতিক শক্তির বলে প্রতাপ অবৈধ প্রেমের কণ্ঠরোধ করেছে, বীরের ন্যায় মৃত্যুর কোলে শেষ আশ্রয় নিয়েছে। মন্দভাগ্য চন্দ্রশেখর প্রণয়বিরহিত দাম্পত্যজীবনের কূলে দাঁড়িয়ে অপার করুণা বা দুঃখকাতরতা-বস্তুটিকে আঁকড়ে ধরে ভীষণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে একরূপ বৈরাগ্যসাধনায় রত হয়েছে। আর, সর্বআশাশূন্য শৈবলিনী মর্মঘাতী মৌন দিয়ে নিজ আত্মার আর্তনাদকে ঢেকে রেখেছে। বেঁচে থেকেও সে মৃতপ্রায়।

'চন্দ্রশেখর'-এ ঐতিহাসিকতা আছে—ইংরেজরাজত্বের গোড়াপত্তনের সময়ে নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরেজবণিকের সংঘর্ষ ইতিহাসেরই কাহিনী। এতে বর্ণিত কয়েকটি চরিত্র ঐতিহাসিক। ইতিহাসের ঝঞ্ঝাবাত্যা শৈবলিনীর রুদ্ধগৃহের আগল ভেঙেছে, দলনীকে মরণের দেশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

পরবর্তী আখ্যায়িকা '**রজনী**' [১৮৭৭]। এর রচনারীতিগত বা কাব্য-রূপগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানে আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর আত্মকাহিনীকথনের মাধ্যমে। গল্পবলার এই রীতিটি আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রবর্তন করলেন। এরূপ কাহিনীনির্মাণরীতি কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যে অপরিচিত নয়। 'রজনী' লিখবার সময়ে বঙ্কিম নিশ্চয়ই উইল্‌কি কলিন্স-কৃত 'A Woman in White'-নামে আখ্যায়িকাটি স্মরণ করেছিলেন। এই উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্র-কল্পনার ক্ষেত্রে লিটনের কল্পিত Nydia-চরিত্রের কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে বলে মনে হয়। 'রজনী'-র সঙ্গে উইল্‌কি কলিন্‌স-এর 'Poor Miss Finch' এবং রিচার্ডসন-এর 'Pamela'-র কিছু কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য ঔপন্যাসিকের

নিকট ঋণী হলেও 'রজনী'-তে কথাশিল্পী বঙ্কিমের কাব্যভাবনার মৌলিকতার স্পষ্টরেখ স্বাক্ষর অনায়াসলক্ষ্য। নিজের ক্ষমতা-বিষয়ে নিঃসংশয় তিনি।

'রজনী'কে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের পর্যায়ে বিন্যস্ত করাই বিধেয়। জন্মান্ধ নারী ভালোবাসতে পারে কিনা, প্রেমানুরাগ তার হৃদয়দেশে কতখানি সক্রিয়, কোন্ পথে তার প্রণয়ানুভূতির উন্মীলন—আখ্যায়িকাটিতে লেখক এরূপ একটি কৌতূহলের বশবর্তী হয়েছেন, দেখা যায়। রজনীর প্রেমের আশ্চর্য জন্মকথায়, এর বিচিত্র বিকাশে, কাব্যের সুরভি ঢেলে দিয়েছেন কবিপ্রাণ বঙ্কিম, পাঠককে লিরিক মাধুর্য পরিবেশন করেছেন—কানা ফুলওয়ালীর প্রেমরসসিক্ত মূর্তিটি বড়োই সুন্দর। দৃষ্টিশক্তিহীনা এই রমণীর প্রণয়পারবশ্যের কাহিনী বঙ্কিমের এক অভিনব সৃষ্টি। উপন্যাসটির মধ্যে কিছুটা অলৌকিকের ছায়াপাত হয়েছে, রজনী-শচীন্দ্রের আখ্যানে একজন তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাস্তবের কায়া আর আলৌকিকতার ছায়া একত্র মিশে গিয়ে উপন্যাসের মূল আখ্যানকে এক মায়ালোকের কাছাকাছি টেনে এনেছে। এক্ষেত্রে উপন্যাসরচয়িতা তাঁর কল্পনাবিলাসকে একটুখানি বাস্তবের বন্ধনমুক্ত করেছেন যেন। এ অবশ্য 'রজনী' সম্পর্কে আসল কথা নয়।

'রজনী' আখ্যায়িকায় আসল লক্ষ্য করার বস্তুটি হলো অমরনাথ-লবঙ্গলতার কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সেই নারীপুরুষের সম্পর্কের সমস্যাটি ঘুরেফিরে বারংবার দেখা দিয়েছে। নারীর রহস্যময় শক্তি ও পুরুষের ভাগ্যকে কতবার কতদিক থেকে দেখেছেন বঙ্কিম। প্রেমের সুখ অমরনাথের অভিলষিত ছিল, নারীপ্রেমের অমৃতস্পর্শও সে পেয়েছিল। কিন্তু শেষে দেখা গেলো, এই অমৃতপাত্রে-ধৃত রস-আস্বাদনের সৌভাগ্য থেকে চিরকালের জন্যে সে বঞ্চিত হয়েছে, অদৃষ্টের প্রতিকূলতায় তার জীবন বিড়ম্বিত। কেন এরূপ হয়? অমরনাথের প্রকৃতিতে তেমন কোনো খুঁত লক্ষিত হয় না। তার অনেক গুণ—পুরুষের চরিত্রে সাধারণত যা প্রত্যাশিত। তথাপি নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে অপার শূন্যতার নিতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দেয়, নিঃসঙ্গ জীবন বরণ করতে বাধ্য করে, সংসারের দোকান-পাট তুলে দিতে কঠোর আদেশ জানায়। এ দুর্বোধ্য ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিহাস নয় তো কী! নিয়তিলাঞ্ছিত অমরনাথের দীর্ঘশ্বাসশ্বসিত হাহাকারধ্বনি সর্বরিক্ত পুরুষ গোবিন্দলালের কাতরশ্বাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অমরনাথ ট্র্যাজিক চরিত্র। ট্র্যাজেডির অশ্রু লুকিয়ে আছে লবঙ্গলতার অন্তরতর প্রাণের গোপন গভীরে। এই নাটকীয় ট্র্যাজেডির রস বঙ্কিমের 'রজনী'-উপন্যাসটিকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের গৌরবে মণ্ডিত করেছে।

পূর্বে আমরা বঙ্কিমের 'পরিবারতন্ত্রের ত্রিগাথা'র নামোল্লেখ করেছি। এ ত্রিগাথার শেষ 'গাথা' **'কৃষ্ণকান্তের উইল'** [১৮৭৮]। গ্রন্থখানি একদা প্রভূত প্রশংসা পেয়েছে; আবার, এর প্রতি অজস্র নিন্দাবাক্যও বর্ষিত হয়েছে—বিধবা প্রৌঢ়-যুবতীর লালসার লোলতার মনোরম চিত্র এতে মেলে বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ধারণা নাকি, এই উপন্যাসই তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি। সে যা হোক, বঙ্কিমবিরচিত তাবৎ উপন্যাসের মধ্যে একসময়ে এইটিই যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়েছিল, এ তথ্যটি জানবার মতো।

যে-দাম্পত্যধর্মের গৌরবকথনের শুরু 'বিষবৃক্ষ'-এ, তার শেষ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ। বাঙালির সমাজ-ও-পরিবারকেন্দ্রিক রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি বঙ্কিম এর পরে আর লেখেননি তখন, অন্যদিকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। 'বিষবৃক্ষ'-আখ্যায়িকাটির কাহিনীর সঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-আখ্যায়িকায় বর্ণিত কাহিনীর সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাঠকের চোখে না পড়ে পারে না। উভয় উপন্যাসের ভাবগ্রন্থি একই, যা-কিছু পার্থক্য চরিত্রগত জটিলতায়। একদিকে, সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনী; অন্যদিকে, ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণী। বিধবা কুন্দ কিশোরী; বিধবা রোহিণী পূর্ণযৌবনা। সূর্যমুখী ও ভ্রমর দুজনেরই একনিষ্ঠ প্রেম। তথাপি, এ দুটি চরিত্রে প্রভেদ কম নয়। সূর্যমুখীর প্রেমে সমবেদনা আছে, সহনশীলতা আছে; প্রখর আত্মঅধিকার-চেতনা ও দুর্নিবার আত্মাভিমান তার মধ্যে তেমন লক্ষিত হয় না। সে আত্মত্যাগ করতে জানে, তার চরিত্রধর্মে উগ্র কঠোরতা নেই। পক্ষান্তরে, ভ্রমরের প্রবল স্বাধিকার-চেতনা। তার স্ফীতকায় অভিমানকে অসংগত বলতে ইচ্ছা করে। বড়ো কঠোর তার প্রকৃতি, স্বামীর কল্যাণের কথাও সে ভুলে বসে। নগেন্দ্রনাথের তুলনায় গোবিন্দলাল অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, তার হৃদয়বৃত্তিও প্রবলতর। নগেন্দ্র দত্তের রূপমোহকে একরূপ ভাববিলাস বলা যায়। গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণা স্থূল প্রবৃত্তির ভোগস্পৃহারই প্রকাশ মাত্র। উদ্দাম ইন্দ্রিয়বিক্ষোভই গোবিন্দলালের পুরুষ-ভাগ্যের অশেষ দুর্গতির কারণ হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ'-এর বিষক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণাম 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ।

আখ্যায়িকাখানিতে সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে দেহকামনাক্লিষ্টা প্রস্ফুটযৌবনা রোহিণী। গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীকে বিবাহ করেনি, তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে—দাম্পত্যধর্মের শুচিতা ও মর্যাদার দিকে তাকায়নি। এহেন রিপুপারবশ্যের পরিণাম কী হতে পারে? দারুণ আত্মবিস্মৃতি, ভীষণ বুদ্ধিভ্রংশ—ভোগমুখী প্রেম চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। অভিমানের প্রতিক্রিয়ায়

গোবিন্দলাল পতঙ্গের মতোই রোহিণীর রূপবহ্নির দিকে ছুটে গেলো। ভ্রমর প্রবৃত্তিতাড়িত স্বামীকে সহানুভূতির স্পর্শে কাছে না টেনে, আত্মাভিমানের প্রচণ্ড ধাক্কায়, দূরে—বহুদূরে—ঠেলে দিল। মোহ যে-প্রকারেরই হোক-না-কেন—স্বল্পায়ু। গোবিন্দলালের মোহ ভাঙতেও দেরি হলো না। একদিন রোহিণীর মোহপাশ সে ছিন্ন করলো, তার হাতেই রোহিণী প্রাণ হারালো। এই হতভাগ্য নারীর হত্যাসাধন অতি-নাটকীয় একটি ঘটনা, গোবিন্দলালকে এর কলঙ্ক স্পর্শ করেছে—গোবিন্দলাল কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে। রোহিণীর বন্ধনজাল কাটালো গোবিন্দলাল, কিন্তু ভ্রমরকে ফিরে পেলো কি? না। বিশ্বাসঘাতী স্বামীকে ভ্রমর ক্ষমা কখনো করবে না, তার প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখাবে না। ভ্রমরের প্রেমের আদর্শ এত উচ্চ যে, বাস্তবে তা কখনো সত্য হয়ে ওঠার নয়। তার জিজ্ঞাসা, স্বামী দেবতার ন্যায় নিষ্কলুষ হবে না কেন? কাজেই, গোবিন্দলাল এখন আশ্রয়চ্যুত, সর্বহারা—নিষ্ফলতার মর্মবিদারক আর্তনাদই তার সম্বল। 'বিষবৃক্ষ'-এর ট্র্যাজেডি এখানে ভীষণতর হয়ে উঠেছে। ভ্রমরের হৃদয়যন্ত্রণার অবসান হলো তার মৃত্যুতে। আর, সর্বস্বান্ত গোবিন্দলাল আত্মার অবিক্ষুব্ধ শান্তি খুঁজলো সন্ন্যাসজীবনের মধ্যে। বৈরাগী সেজে সে বলেছে—'ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছি।' এ কি প্রকাণ্ড আত্মপ্রতারণা নয়? যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন প্রেমের ব্যর্থতার হাহাকার কি তার ঘুচবে?

রোহিণী-হত্যার ঘটনাটি বহুনিন্দিত। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, সংসারের রঙ্গভূমি থেকে সহসা রোহিণীকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া গোবিন্দলালের পক্ষে কাপুরুষের কাজ হয়েছে। এ ঘটনা ট্র্যাজিক নয়—মেলোড্রামাটিক। কিন্তু রোহিণীর পরিণাম অপমৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে? বেঁচে থাকলে, মনে হয়, হীরা-র জাতের রমণীর সংখ্যাবৃদ্ধি করতো সে। ইন্দ্রিয়ের বহ্ন্যুৎসবে যে মাতে, তার দৈহিক অথবা আত্মিক অপমৃত্যু অনিবার্য। আত্মদ্রোহীকে শাস্তি পেতেই হবে, এ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের বিধান নয়—বিশ্ববিধান। তাছাড়া, তৎকালীন হিন্দুসমাজে কুলত্যাগিনী বিধবার স্থান কোথায়? এ সমাজে কামনার প্রমত্ততাবশে যাবার পথটি হয়তো খোলা আছে, কিন্তু ফেরার পথটি চিরতরে রুদ্ধ। কুন্দ বিষ খেয়ে মরেছে, ভালোই করেছে। এ না হলে তার নারীআত্মার লাঞ্ছনার কি অবধি থাকতো? কোন্ ধর্মবলে সূর্যমুখীকে তার স্বাধিকার থেকে সে বঞ্চিত করবে? রোহিণীর সম্পর্কেও সেই একই প্রশ্ন। আত্মহারা প্রেমে কুন্দ আত্মবিসর্জন দিয়েছে। প্রগাঢ় প্রেমানুভবের এ-হেন স্ফূর্তি রোহিণীতে অপ্রাপ্তব্য। রোহিণী কামনার শতমুখী শিখা জ্বালিয়ে

গোবিন্দলালের মুখ নিরীক্ষণ করেছে। সে মোহিনী, মোহবিস্তার করতেই জানে। কিন্তু—'এ মোহ কদিন থাকে? এ মায়া মিলায়।' একারণে অচিরকালমধ্যে মোহমুক্ত গোবিন্দলালের সহসা-জাগ্রত নিদারুণ বিতৃষ্ণাই মোহিনী নারী রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যুর কারণ হয়েছে। না মরলে হয়তো আরো কুশ্রীতার পঙ্কে ধীরে ধীরে সে তলিয়ে যেতো; কিংবা নিজ ধিক্কৃত জীবনের গ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার বাসনায় আত্মহনন করে বসতো; কিংবা অবদমিত প্রবৃত্তির তীব্র পীড়নে উন্মাদের দলে গিয়ে ভিড়তো। কাজেই, কাহিনীর অর্ধপথে রোহিণীর হত্যাসাধনের জন্যে ব্যক্তিমানুষ বঙ্কিমকে দায়ী করা সংগত বলে মনে হয় না। এতে শিল্পগত ত্রুটি ঘটতে পারে, জীবনতথ্যগত কোনো ত্রুটি ঘটেনি, এই আমাদের বিশ্বাস। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের শেষ রচনা।

তৃতীয় পর্ব। এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানসে স্পষ্টত একটা ভাবান্তর লক্ষিত হয়। সাহিত্যিক-রূপকর্মের প্রতি পূর্বের সেই একাগ্র নিষ্ঠা এখন যেন আর নেই, গভীর-গম্ভীর জীবনজিজ্ঞাসা তাঁর অতিসংবেদনশীল হৃদয়ে পূর্ববৎ প্রবল উৎকণ্ঠা বুঝি জাগায় না।) একদা বঙ্কিম নরনারীর ব্যক্তিহৃদয়ের রহস্যসন্ধানে কীরূপ আকুলতা দেখিয়েছেন! নারীপুরুষের দ্বন্দ্ব, মনুষ্যজীবনের নিয়তি, সংসার-রঙ্গমঞ্চে মানবমানবীর হাসিঅশ্রুর লীলা তখন তাঁর কাব্যভাবনার বস্তু ছিল। আগেকার সেই আশ্চর্য জীবনরসরসিকতা বর্তমান পর্বের অন্তর্ভূ'ত উপন্যাসগুলিতে তেমন চোখে পড়ে না, তাঁর বিস্ময়কর কবিশক্তির প্রাণোদ্বেল স্ফুরণবেগ স্তিমিত হয়ে এসেছে বলে মনে হয়। এরূপ কেন হলো, তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া একটু কঠিনই বটে। (বোধ করি, নারীপুরুষের আত্মসুখপিপাসার মধ্যে—ব্যক্তিক কামনাবাসনার বিক্ষোভের মধ্যে—মানুষের জীবনের শাশ্বত সুখের সন্ধান পাননি বঙ্কিম। সেইজন্যে একটা তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে মানবজীবনকে তিনি চরিতার্থতাদানের প্রয়াসী হয়েছেন, গীতার বাণীর মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজেছেন।) গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী সেজেছে, অমরনাথ জীবনের প্রতি সমস্ত আসক্তি বিসর্জন দিয়ে একা-র পথে যাত্রা করেছে, চন্দ্রশেখর দাম্পত্যের বেনামীতে একরূপ বৈরাগ্যসাধনায় ব্রতী হয়েছে। এবার, এসকল চরিত্রের স্রষ্টা স্বয়ং বঙ্কিমও বুঝি বৈরাগী সেজে বসলেন—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে সমন্বিত করতে পারা যায় কিনা, তার পরীক্ষানিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। ফলে কাব্যকল্পনার সঙ্গে তত্ত্বভাবনা এসে মিশলো, হৃদয়ানুভূতি চিন্তাকে বেশ-কিছুটা স্থান ছেড়ে দিল, জীবনকাব্যের প্রৌঢ় কবি হিন্দুর তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারস্থ হলেন—আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরানী-সীতারাম আখ্যায়িকায় এর ছাপ অতিশয় স্পষ্ট। এসময়ে বঙ্কিম

ব্যক্তিকে ছেড়ে সমাজ ও দেশের কথা ভেবেছেন—লোককল্যাণ ও জাতির কল্যাণের দিকে আপনার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। যে-নতুন পথে এবার তাঁর যাত্রা, সেই পথটি হিন্দুভারতের মহাগ্রন্থ গীতায় প্রদর্শিত। দার্শনিক কোঁৎ-এর প্রচারিত প্রত্যক্ষ-মানবধর্মবাদ [Positivism] তরুণ-বয়সে বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছিল। ওই প্রভাব এখানে সক্রিয়, দেখতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের '**আনন্দমঠ**' [১৮৮২] দেশপ্রেম—দেশভক্তির—মহাগীত, উদাত্ত সুরে উদ্গীত। 'মৃণালিনী'-র স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস এতে কাব্যরসসিক্ত সংহত রূপ-ধারণ করেছে। দেশের প্রতি অপার অগাধ অবোধ ভালোবাসা আর জাতিবাৎসল্য বঙ্কিমের প্রাণসত্তাকে আলোড়িত মথিত করেছিল, অপূর্ব এক মহাভাবে বঙ্কিম আবিষ্ট হলেন। এই ভাবাবেশ অদ্ভুত আবেগস্পন্দন জাগালো তাঁর কবিপ্রাণে। রচিত হলো 'আনন্দমঠ', ভক্তিসাধনের—স্বদেশজননীর পূজার—সামগাথা। অনেকে একে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারমূলক, শিল্পসৌন্দর্যরিক্ত একখানি আখ্যায়িকা-রূপে গ্রহণ করেছেন। আমাদের মতে, ঔপন্যাসিকের প্রগাঢ় অনুভূতির আশ্চর্য কবিত্বমণ্ডিত প্রকাশে 'আনন্দমঠ' শ্রেষ্ঠ কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এতে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা, সমস্ত চরিত্রকে এক সমুন্নত ভাব-কল্পার সুসংগতি অন্তর্গূঢ় ঐক্যের সূত্রে গেঁথেছে ; বাস্তব ও কল্পিত আদর্শের মধ্যে সমস্ত বিরোধ মুছে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে দেশপ্রেম আত্মার ক্ষুধা, একে তিনি ধর্ম বলে জেনেছিলেন। বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এই ধর্মাচরণে ব্রতী হতে হবে। বঙ্কিম এখানে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকে মিলিয়েছেন, কর্মের গীতোক্ত সন্ন্যাসআদর্শটিকে আনন্দমঠ-এর সন্তানদলের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আনন্দমঠ-প্রতিষ্ঠার অতিগুরুভার দায়িত্ব নিয়েছে যে-সন্তানসম্প্রদায়, তাদের মহামন্ত্র হলো : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের, জাতীয় জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্র ও ধর্মের, সমন্বয়সাধনের প্রয়াসী। কোঁৎ-এর 'পজিটিভিজম'-নামে ধর্মতত্ত্বের মধ্যে প্রথমে তিনি এই সামঞ্জস্য-সূত্রটির সন্ধান পেয়েছিলেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, ইতিহাসেরই ঘটনা। বর্তমান আখ্যা-য়িকার পটভূমিতে এর চিত্র আছে। সেদিন বিদ্রোহী জনসঙ্ঘ 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার' খোলবার স্বপ্ন দেখেছিল, নতুন জীবনযাত্রাকে বাস্তবে সত্য করে তুলতে অভিলাষী হয়েছিল। সেই বিদ্রোহী অতীতকে ভিত্তি করে জাতীয় জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কি গড়ে তোলা যায় না—ভাবলেন বঙ্কিম। আনন্দমঠ-আখ্যায়িকাখানি

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাবনাপ্রসূত। এর চরিত্রগুলিকে কোথাও কোথাও ভাববিগ্রহের মতো মনে হলেও, বঙ্কিমের দীপ্ত কবিকল্পনা এদের বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করতে দেয়নি। অবশ্য চরিত্রগুলিতে উজ্জ্বল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ অভাব লক্ষ্য করা যায়। শান্তি-চরিত্রটি কিন্তু চমৎকার ফুটেছে। মহেন্দ্র-কল্যাণীর ব্যক্তিত্বের উত্তাপ সকলেই অনুভব করবেন। ভবানন্দকে কেউ ভুলবেন না। এই উপন্যাসে গ্রথিত 'বন্দেমাতরম্'-সংগীত অবিস্মরণীয়।

শেষজীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পরচনপ্রেরণায় ভাঁটার টান লক্ষ্য করা যায়, তাঁর কবিপ্রাণের উল্লাস ক্রমেই যেন নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে, জীবনের রহস্যান্ধকারের আবরণ ছিন্ন করার অশেষ উৎকণ্ঠা তিনি আর যেন অনুভব করছেন না। উপন্যাস এখনো লিখছেন বঙ্কিম, কিন্তু সময়ের ব্যবধান বেড়ে গেছে। তাঁর বেশি ভালো লাগছে তত্ত্বচিন্তায় ডুব দিতে। প্রসঙ্গত, স্মরণ করা যেতে পারে, একালে বঙ্কিম 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর ধ্যান করছেন; 'অনুশীলন', 'ধর্মতত্ত্ব', ইত্যাদি নিয়ে রীতিমতো মাথা ঘামাচ্ছেন। এখন জাতি-জীবন, সমাজজীবন তাঁর কাছে খুব বড়ো হয়ে উঠেছে। মানবপ্রীতি বা মানবসেবার সমুচ্চ আদর্শ তাঁকে প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানাচ্ছে। বঙ্কিমের এই মনোভূমিতেই **'দেবীচৌধুরানী'** [১৮৮৪] আখ্যায়িকার উদ্ভব।

'দেবীচৌধুরানী'। বাঙ্‌লাদেশে ইংরেজের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথমের দিকের ইতিহাসের সঙ্গে এই উপন্যাসের কাহিনীটি জড়িত। দেশময় সেদিন যে-শাসনবিশৃঙ্খলা, যে-অরাজকতা দেখা গিয়েছিল, দেশের সেই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে এক অপহৃতা বাঙালি গৃহবধূ দস্যুদলের নেত্রী হলেন। সাহসিকা দেবীচৌধুরানী যুদ্ধ করলেন, প্রভূত বিত্ত আর ব্যাপক কর্তৃত্বের অধিকারিণী হলেন। কিন্তু সর্বফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করার শিক্ষা পেয়েছেন তিনি,—তাঁর আহৃত সকল ধন ব্যয়িত হলো লোকহিতার্থে। লোকহিতকেই তিনি মানবের পরমার্থ বলে জেনেছেন, লোক-মঙ্গলের জন্যে আত্মত্যাগকে সর্বোচ্চ ধর্ম বলে বুঝেছেন। 'দেবী'-কে বঙ্কিম অনুশীলনতত্ত্ব ও গীতার নিষ্কাম-কর্মবাদের জীবন্ত বিগ্রহরূপে গড়েছেন—তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শাবতার বলেই মনে হয়। এই উপন্যাসে অনুশীলনের দ্বারা এক মানবী দেবীর মহিমা লাভ করেছে। আখ্যায়িকাখানিতে বঙ্কিম বাঙালির গার্হস্থ্য-জীবনকে গীতাকথিত নিষ্কাম-কর্মের সাধনভূমির মর্যাদা দিয়েছেন—গার্হস্থ্যজীবনের সীমিত গণ্ডীতে থেকেও গীতোক্ত ধর্ম পালন করা যায়, বলেছেন। দেবী-চরিত্র নির্মাণ করে বঙ্কিমচন্দ্র, বোধ করি, বোঝাতে চেয়েছেন, নারীর সুখশান্তি, নারীজীবনের

চরম সার্থকতা, স্বামী-পুত্র-কন্যা-স্বজন-পরিবেষ্টিত সংসারের মধ্যে। তাই বুঝি দেবীচৌধুরানীকে আবার আমরা দেখলাম বাঙালি-বধূবেশে—পত্নীরূপে সেই প্রফুল্লের মধ্যে—স্বামী ব্রজেশ্বরের খিড়কিপুকুরে সোৎসাহে বাসন মাজতে তাঁর একটুকু দ্বিধা-সংকোচ নেই। 'দেবী'-র কার্যকলাপে অসাধারণত্বের মুদ্রাঙ্কন যতই থাক না কেন, বীরত্বপূর্ণ কর্মানুষ্ঠানের নায়িকা-হিসেবে যতই তিনি কৃতিত্ব দেখান না কেন, তিনি যে চিরকালের বাঙালি নারী—কুলবধূ 'প্রফুল্ল'—লেখক এই সত্যটি আমাদের ভুলতে দেননি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো উপন্যাসে শিল্পধর্মের দুর্বলতা যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা এই 'দেবীচৌধুরানী'-তে। ঔপন্যাসিক এখানে শিল্পকে তত্ত্বের বাহন করে তুলেছেন, শাস্ত্রোপদেশের ভারে শিল্পের আত্মা পীড়িত হয়েছে, আখ্যানের সঙ্গে তত্ত্ব পুরোপুরি মিশে যায়নি—উভয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণের অভাব সুপ্রকট। তথাপি, এর কাহিনী-রচনায় বঙ্কিমপ্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত, মাঝে-মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ চমক লাগায়। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মাচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাঁর কবিসত্তার কণ্ঠস্বরটি উপন্যাসখানিতে একেবারে চাপা পড়েনি।

ধর্মতত্ত্ব-প্রচারক বঙ্কিমের বিরুদ্ধে জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সোচ্চার বিদ্রোহ-ঘোষণা শোনা গেলো পরবর্তী উপন্যাস **'সীতারাম'**-এ [১৮৮৭]। এরপর বঙ্কিম আর নতুন কোনো অখ্যায়িকা লেখেননি। সামন্তরাজ্যের অধিপতি সীতারামের ব্যক্তিগত জীবনে একদা যে-ঘোরতর ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এলো, যে-নিদারুণ বিপর্যয় ও বেদনাবহ্নির মধ্যে তিনি নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁর নিভৃত প্রাণের যে-আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হলো, তার তরঙ্গাভিঘাতে এই আখ্যায়িকায় ধৃত সকল ধর্মদেশনা, সকল শাস্ত্রবাণী, কোন্ শূন্যতায় ভেসে গেছে। গীতার তত্ত্বের বাঁধ বেঁধে মানুষের কল্লোলিত প্রবৃত্তিবেগের স্রোতকে কি রুদ্ধ করা যায়! মানবজীবন নিয়ে নিয়তির খেলা যেমন রহস্যময়, তেমনি নিষ্ঠুর। মানুষের ভাগ্য চিরকাল পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের প্রস্তরকঠিন প্রাকারে প্রতিহত হচ্ছে; তার সম্মুখে আলো নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই—দিকে দিকে মহাশূন্যতার করাল মুখব্যাদান। এই উপন্যাসেও নারীপুরুষের দ্বন্দ্ব, সীতারাম ও শ্রী-র পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের চিত্র, সংসার ও সন্ন্যাসের সংঘাত। নারীই এখানে সীতারামের সাক্ষাৎ নিয়তিরূপে দেখা দিয়েছে, তাঁর শোচনীয় পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্যোতিষ-গণনার হেঁয়ালি। স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় সহধর্মিণী শ্রী স্বামীকে [সীতারামকে] ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। পরমবাঞ্ছিতা নারীকে হারালেন সীতারাম। অতঃপর

অতৃপ্ত-পিপাসা-সঞ্জাত তাঁর উন্মত্ত আচরণ, সর্বনাশা আত্মদ্রোহ। ফলে সীতারামের চরিত্রের নৈতিক অধঃপতন এবং তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিনষ্টি। অদ্ভুত নিয়তি, অভাবনীয় ট্র্যাজেডি। মানবজীবনের এহেন যে ব্যর্থ-পরিণাম, এর সংগত কোনো ব্যাখ্যা মেলে না।

সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু এ নামে চিহ্নিত আখ্যায়িকাখানি ঐতিহাসিক নয়। বঙ্কিম নিজেই বলেছেন: 'এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই, গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক নহে।' গ্রন্থটিতে পরিবার-জীবনের সমস্যা-সংকট প্রাধান্য পেয়েছে—দুর্জ্ঞেয় নিয়তিলীলাই ঔপন্যাসিককে অভিভূত করেছে। 'সীতারাম' পড়তে বসলে বারবার শেক্‌স্‌পীয়রের লেখা ট্র্যাজেডি-নাটকের কথা মনে পড়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীতে **'রাজসিংহ'** উপন্যাসটির [পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশ-কাল—১৮৯৩] স্থান একটুখানি স্বতন্ত্র। এ-ই বঙ্কিমপ্রণীত একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং বৃহত্তমও বটে। গল্পরস ও ইতিহাস-রসের অপূর্ব সমন্বয় উপন্যাসটিকে লক্ষণীয় বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। এর নায়ক-প্রতিনায়ক—রাজসিংহ এবং ঔরঙ্‌জেব—ঐতিহাসিক চরিত্র। এ উপন্যাসে বর্ণিত স্থূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল ইতিহাস-তথ্যের বিরুদ্ধতা করেনি, এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের কল্পনা বেশি প্রশ্রয় পায়নি। তবে উপন্যাস উপন্যাসই, সর্বাংশে বাস্তব ঘটনার প্রতিলিপি নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসবহির্ভূত ঘটনা আর চরিত্রকেও কিছুটা স্থান ছেড়ে দিতে হয়—এটিই হলো ইতিবৃত্তমূলক আখ্যায়িকায় কল্পনার অংশ। কল্পনার সত্য ও ইতিহাসগত বাস্তবের তথ্য উভয়ে মিলে গিয়ে এ জাতের আখ্যায়িকাকে এমন একটা স্বাদযুক্ত করে, অপর শ্রেণীর আখ্যায়িকায় যা পাওয়া যায় না।

'মৃণালিনী'-তে আমরা দেখেছি, জাতিবৎসল বঙ্কিম গৌড়েশ্বরের পরাজয়ের গ্লানিতে মর্মাহত—তুর্কী-কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ইতিহাস বাঙালির দুরপনেয় কলঙ্কের কথাই ঘোষণা করছে। তাহলে, হিন্দুজাতির বাহুবল কি কম ছিল? অবশ্যই নয়। গৌড়ের পতনের পেছনে ভিন্নতর কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে। সে যাক্। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগের হিন্দুর বীর্যদীপ্ত কীর্তির দিকে তাকিয়েছেন; তাঁর নিজের ভাষায়: 'ইংরেজসাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পূর্বে কখনো লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুর বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।' উপন্যাসটির উদ্দেশ্যমূলকতা গোপন নেই, এতদ্‌সত্ত্বেও গল্পরসের অসামান্য মনোহারিতা একে

সর্বজনের আস্বাদনের সামগ্রী করে তুলেছে। এর ঐতিহাসিক-পরিবেশ-চিত্রণ বঙ্কিমের অসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচয়বাহী।

'রাজসিংহ'-এ সর্বাধিক লক্ষণীয় বস্তু হলো মবারক-জেবউন্নিসার প্রণয়-আলেখ্য। ইতিহাসের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব, দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, যুদ্ধসজ্জা, অস্ত্রঝনৎকার, রণাঙ্গনে জীবনমৃত্যুর খেলা—এসমস্ত-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে ওই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার দুর্ভাগ্যের-দারুণ-ক্ষতচিহ্নে-আঁকা প্রেমের আর্তধ্বনি, দুজনের ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের অশ্রুআকুল ক্রন্দন। এই শেষ রোম্যান্সখানি লিখে বঙ্কিম তাঁর শিল্পীকৃত্য সমাপ্ত করেছেন। 'রাজসিংহ' নিঃসন্দেহে অতি-উত্তম উপন্যাসের মর্যাদা দাবি করতে পারে।

॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ॥

প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের রাজপথ খুলে দিলেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে খ্যাতির উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বঙ্কিমের এই সাহিত্যচর্যা সেকালের বহু লেখককে উপন্যাস-রচনায় প্রাণিত করলো। আবার, অনেক অযোগ্য লেখক যশোলাভের প্রলোভন এড়াতে না পেরে হাতে কলম তুলে নিলেন। বঙ্কিমের সময়ে এইভাবে কিছুসংখ্যক ইতিহাসভিত্তিক আখ্যায়িকা একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকলো। কিন্তু সাহিত্যনির্মাণকর্মটি অক্ষমের জন্যে নয়, বঙ্কিম-পর্বে উক্তসব লেখকের হাতে উপন্যাস-নামীয় যে-সমস্ত নিকৃষ্ট রচনা বেরুলো সেগুলি বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। বঙ্কিম-অনুকারী লেখকদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা শক্তিমান ছিলেন, বঙ্কিমের ন্যায় উচ্চতর কবিকল্পনার অধিকারী কেউ তাঁরা নন, বাঙ্‌লা উপন্যাসের ধারাটিকে তাঁরা পুষ্ট করতে পারেননি। এই সময়কারই একজন লেখক উল্লেখযোগ্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি হলেন—রমেশচন্দ্র দত্ত [১৮৪৮-১৯০৯]।

সেদিন 'বঙ্গদর্শন'-কে ঘিরে যে-বঙ্কিমগোষ্ঠির লেখকচক্র গড়ে উঠেছিল, রমেশচন্দ্র তাঁর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু সাহিত্যনায়ক বঙ্কিমের উৎসাহবাক্যে আখ্যায়িকা-রচনায় তিনি মনোযোগী হন। ইতঃপূর্বে তিনি মননসাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন—ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, এদেশীয় ধর্মগ্রন্থ এবং কাব্য, ইত্যাদি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গবেষণাপুস্তক তাঁর অসাধারণ মনীষার পরিচয় বহন করছে। এগুলির অধিকাংশ

ইংরেজিতে রচিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তাঁর খুব দখল ছিল। বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে তিনি উদ্বুদ্ধ হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে। বঙ্কিমের কাছে রমেশচন্দ্রের ঋণ সামান্য নয়। এই ঋণের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। এখানে স্মর্তব্য, রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তাঁকে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকও বলা যেতে পারে। ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রবল দেশানুরাগ। উভয়েরই প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসাবলীতে সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

রমেশচন্দ্রের লিখিত উপন্যাস সংখ্যায় বেশি নয়—মাত্র ছয়খানি। সংখ্যায় অল্প হলেও এদের মধ্যে তাঁর প্রতিভার মুদ্রাঙ্কন স্পষ্টরেখ, এবং এগুলি অনুধাবন করলে তাঁর শিল্পিমানসের বিবর্তনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র যে-ছয়খানি উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে চারখানি কমবেশি ইতিহাসের ঘটনাকে পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছে, বাকি দুখানিতে বাঙ্‌লার সামাজিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র আর সমাজের স্বল্পপরিসর ভূমি উভয়ত্র রমেশচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ বিহরণ। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনাতেই তাঁর অধিকতর কৃতিত্ব।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের প্রথম দান **'বঙ্গবিজেতা'**—প্রকাশকাল ইংরেজি •১৮৭৪ সাল। আখ্যায়িকাখানি ইতিহাসের ক্ষীণ একটি সূত্রকে আশ্রয় করে নির্মিত। এখানে ইতিবৃত্তমূলক ঘটনার চেয়ে লেখকের কল্পনারই আধিক্য। 'বঙ্গবিজেতা'কে রোম্যান্টিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। এতে যে-ঘটনা রূপায়িত তা সংঘটিত হয়েছে মোগলসম্রাট আকবরের সময়ে। টোডরমলের শাসনকালে বাঙ্‌লাদেশে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু অচিরে টোডরমল এ বিদ্রোহ দমন করেন। সেইসময় ইন্দ্রনাথ নামে এক বাঙালি যুবক রাজার সপক্ষে থেকে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেয়। 'বঙ্গবিজেতা'র নায়ক এই ইন্দ্রনাথ। নায়িকা সরলা—ইন্দ্রনাথের প্রণয়িনী। শকুনি নামে এক খলস্বভাব ব্যক্তির প্ররোচনায় বিশ্বাসঘাতক সতীশচন্দ্র কৌশলে সরলার পিতাকে হত্যা করে। এতে সরলার মাতা মহাশ্বেতা অত্যন্ত জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ইন্দ্রনাথ উক্ত সতীশচন্দ্রকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে এগিয়ে যায়। শয়তান শকুনির চরের হাতে সতীশচন্দ্র প্রাণ হারায়, শকুনি আত্মহত্যা করে মরে। অবশেষে সরলার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হয়।

শিল্পকর্মহিসেবে 'বঙ্গবিজেতা' সার্থক হয়ে ওঠেনি, উপন্যাসশিল্পার কলাকৌশল এখনো রমেশচন্দ্রের অনায়ত্ত। ইতিহাস এখানে নিরুত্তাপ। উপন্যাসটিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ মাঝেমধ্যে দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাচক্র যেমন এতে প্রাধান্য পায়নি, তেমনি, ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ইন্দ্রনাথ-সরলার প্রণয়জীবন উন্মথিত হয়নি। আখ্যায়িকায় বর্ণিত চরিত্রগুলিকেও লেখক সজীব করে তুলতে পারেননি। আখ্যায়িকাখানিতে প্রণয়কথাবর্ণন গতানুগতিক, চরিত্রচিত্রণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত, যুগের আলখ্যে অস্পষ্ট। তবে, যুদ্ধাদির বর্ণনায় উপন্যাসকার কথঞ্চিৎ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস '**মাধবীকঙ্কণ**', ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত। মোগল-আমলে ভারত-ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ এই আখ্যায়িকার পটভূমি, তখন শাহ্‌জাহান ভারতবর্ষের সম্রাট। 'মাধবীকঙ্কণ' মূলত প্রেমকাহিনী, মুখ্য চরিত্রগুলি কাল্পনিক—এদের ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এর নায়ক নরেন্দ্রনাথ, নায়িকা হেমলতা। জমিদারপুত্র নরেন্দ্র তাদের নায়েবের হাতে সর্বস্বান্ত হয়েছে। আবার, এই নায়েবেরই কন্যা হেমলতাকে সে ভালোবেসেছে। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নায়েব নরেন্দ্র-হেমলতার প্রণয়মিলনের বিরোধিতা করলেন। ভাগ্যের প্রতিকূলতায় নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী হলো, সুদূর রাজমহলে গিয়ে শুজার সৈন্যদলে নাম লেখালে। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে তার প্রেমের চিহ্নস্বরূপ মাধবীলতার কঙ্কণ প্রণয়াস্পদ হেমলতার হাতে সে পরিয়ে দেয়। পরে শ্রীশের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ হয়। এর মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। কাহিনীর শেষাংশে দেখি, মথুরার এক মন্দিরে নরেন্দ্রের সঙ্গে হেমলতার সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন হেমলতা পূর্বপ্রণয়ী নরেন্দ্রকে বললো, অতীতের প্রণয়ানুরাগের কথা সে যেন ভুলে যায়, আর, নরেন্দ্রের দেওয়া মাধবীর সেই কঙ্কণ তাকে ফিরিয়ে দিল। বেদনাবিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ কঙ্কণজোড়া নিক্ষেপ করলো যমুনার জলে। তারপর থেকে সে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—গৃহজীবনের মায়ামুক্ত।

পূর্ববর্তী উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'র তুলনায় 'মাধবীকঙ্কণ' অনেক বেশি সার্থক রচনা। এখানে রমেশচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত পরিণত শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান আখ্যায়িকায় নরেন্দ্র-হেমের প্রণয়চিত্রটি খুব চমৎকার ফুটেছে। উভয়ের বাল্যপ্রীতি কীভাবে ধীরে ধীরে গভীর প্রেমে পরিণত হলো, নরেন্দ্রের উগ্র-চঞ্চল ও তেজস্বী স্বভাব এবং হেমলতার শান্ত চাপা প্রকৃতি কীভাবে আখ্যায়িকাখানিকে ট্রাজিক পরিণামের দিকে এগিয়ে নিল, কর্মচারীর চক্রান্তে কীরূপে নাবালক

উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হলো, এসব বিষয়ের বর্ণনে উপন্যাসকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মোগলপ্রাসাদের ও দরবারের আলেখ্যঅঙ্কনে, ঐতিহাসিক পরিবেশনির্মাণে লেখকের কম দক্ষতা প্রকাশ পায়নি।

ইতিহাসের ঘটনা বিবৃত হলেও 'মাধবীকঙ্কণ'কে আমরা যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলবো না। একে ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্স বলাই সংগত। ঐতিহাসিক কাহিনী ও নরেন্দ্র-হেমের প্রণয়কথার অন্তরঙ্গ গ্রন্থন এ আখ্যায়িকায় চোখে পড়ে না, ইতিহাসের ঘটনাস্রোত উক্ত প্রণয়ীযুগলের প্রেমের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। মনে হয়, লেখক জোর করেই স্বতন্ত্র দুটি কাহিনীকে একত্র জুড়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিকের আশ্রয় লওয়াতে আখ্যায়িকাখানিতে ঘটনাপুঞ্জ সংহত হয়ে উঠতে পারেনি, ফলে শিল্পসৌন্দর্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যা হোক, একটি বিষাদকরুণ প্রণয়কাহিনী-হিসেবে 'মাধবীকঙ্কণ' অবশ্যই উপভোগ্য। 'মাধবীকঙ্কণ' এই সত্যটির প্রতিই ইঙ্গিত করছে যে, ঐতিহাসিক ও পারিবারিক উভয় শ্রেণীর আখ্যায়িকা রচনার ক্ষমতা রমেশচন্দ্র দত্তের ছিল।

অতঃপর রমেশচন্দ্র খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস আমাদের উপহার দিলেন। তাঁর **'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত'** প্রকাশিত হলো ১৮৭৮ সালে। এই আখ্যায়িকা-খানিকে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির যে-স্বাধীনতাস্পৃহা বিগত দিনের ইতিহাসে হিন্দুর লুপ্ত গৌরবের সন্ধান করেছিল, 'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত' তারই প্রেরণায় রচিত বলে মনে হয়। ভারতেতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায় ঔপন্যাসিক তাঁর গ্রন্থে পাঠকের সম্মুখে খুলে ধরেছেন। এখানে নায়ক—মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী ; প্রতিনায়ক—অমিতপ্রতাপ আওরঙ্‌জেব। মারাঠাশক্তির উত্থান ও মোগলমারাঠার প্রচণ্ড সংঘর্ষের কাহিনীই বর্তমান উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র কী উজ্জ্বল বর্ণে এঁকেছেন মারাঠাদের জলন্ত দেশপ্রেম ও অমেয় শৌর্যের রক্তরাঙা কাহিনী। শিবাজী আর আওরঙ্‌জেবের চরিত্রচিত্র লেখকের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়বাহী। শিবাজীর দেশপ্রাণতা, রণচাতুর্য, দুঃসাহসিক অভিযান, লোকচরিত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা, তাঁর 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'-নীতি ও মারাঠাজাতির বিজয়কেতন ঊর্ধ্বে ওড়াবার অটল প্রতিজ্ঞা লেখক যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন, শক্তিস্পর্ধিত মোগলসম্রাট আওরঙ্‌জেবের প্রতিকৃতিকেও, তেমনি, জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর অন্তরের কুটিলতা, বাইরে বৈরাগ্য ও ধার্মিকতা, তাঁর শাঠ্য ও সন্দেহপরায়ণ আচরণ, ইত্যাদির ওপরে উপন্যাসকার প্রচুর আলোকপাত করেছেন। শিবাজী দোষেগুণে

রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে, আওরঙ্‌জেবকে চিনে নিতে কেউ ভুল করবে না। এ দুই ঐতিহাসিক-চরিত্রনির্মাণ রমেশচন্দ্রের অক্ষয় শিল্পকীর্তি। রঘুনাথ ও সরযূবালার প্রেমের উপকাহিনীটি উপন্যাসে সুপরিস্ফুট হতে পারেনি ইতিবৃত্তগত ঘটনার বহুলতার জন্যে। এই ত্রুটিকে বাদ দিলে, উপন্যাসখানিতে রমেশচন্দ্রের ইতিহাসনিষ্ঠা ও বর্ণনকুশলতার যোগে জাতীয় ইতিবৃত্তের বিশেষ একটি পর্বের এক সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

রমেশচন্দ্রের চতুর্থ ও আর-একটি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস '**রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা**'—প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৭৯ সন। এই আখ্যায়িকা অস্তমিতগৌরব রাজপুতজাতির বীরত্বের প্রাণোন্মাদকর কাহিনী। রাণা প্রতাপসিংহকে উপন্যাসের নায়ক বলা চলে। আকবরের রাজত্বকালে মোগলশক্তির সঙ্গে প্রতাপের অনবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম এ উপন্যাসটিতে বাণীরূপ পেয়েছে। স্বাধীনতারক্ষার জন্যে দেশবৎসল রাজপুতজাতি আত্মাহুতি দিয়ে যেভাবে যুদ্ধ করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা অতি বিরল। সমগ্র একটি যুগের অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত পরিচয় 'জীবনসন্ধ্যা'র পাতায় পাতায় প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার দিকে উপন্যাসকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে হৃদয়বিশ্লেষণের চিত্র এখানে সামান্যই, চরিত্রগুলির ব্যক্তিপরিচয় কোথাও তেমন মেলে না। এতে তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রণয়ের একটি কাহিনী আছে। কিন্তু ইতিহাসের তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই, এবং ঘটনাবাহুল্যে তা সুস্পষ্ট রূপ পায়নি। এরকমের কিছু-কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হয়, এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমের এই শ্রেণীর আখ্যায়িকাগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র যে বঙ্কিমের প্রভাবে এসেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি কথা। যে-ঐতিহাসিক কল্পনার স্পর্শে ইতিহাসের পটভূমিতে মানবমনের বিচিত্র রহস্য আত্মোন্মোচন করে, রমেশচন্দ্রের সেই কল্পনা ছিল না। তিনি ইতিহাসের প্রতি অনুগত থেকেছেন, ইতিহাসকে যতদূরসম্ভব অপরিবর্তিত রেখেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের নির্মাতা-হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মর্যাদা দাবি করতে পারেন না। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের শিল্পোৎকর্ষ রমেশচন্দ্রের 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা'য় লক্ষিত হয় কী?

এবার, রমেশচন্দ্রের লেখা সামাজিক উপন্যাসের কথা। এ-জাতের দুখানি উপন্যাস তিনি লিখেছেন—'**সংসার**' ও '**সমাজ**'—প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে খ্রিস্টীয় ১৮৮৬ ও ১৮৯৪ অব্দে। এ দুটি আখ্যায়িকার উপাদান সমাহৃত হয়েছে উনবিংশ

শতকের উত্তরার্ধের বাঙ্‌লার সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবনের স্বল্পবর্ণে-রঞ্জিত ছোট সুখ ছোট দুঃখের চিত্রশালা থেকে। ইতিহাসের উত্তেজনা-উন্মাদনা-পূর্ণ কলরব মুখরিত বিশাল ক্ষেত্র লেখকের কল্পনাদৃষ্টি থেকে দূরে সরে গেছে, এখন বাঙ্‌লাপল্লীর অবিক্ষুব্ধ গৃহাঙ্গনের দিকে তাঁর মমতাজড়িত দৃষ্টি প্রসারিত। 'সংসার' ও 'সমাজ'-এ আখ্যায়িকাকার রমেশচন্দ্রের শিল্পরচনশক্তির নতুন একটি দিকের পরিচয় পাওয়া গেলো। এখানে প্রকাণ্ড ঘটনার সংঘাত-সংঘর্ষের তীব্র আন্দোলন নেই, উদ্দাম আবেগ-উচ্ছ্বাসের ফেনিল আবর্ত নেই, ইতিহাসের রথচক্রের গম্ভীর নির্ঘোষ নেই, আছে সহজ সরল গ্রাম্যনরনারীর আশা-অভিলাষের মৃদু কম্পন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাত্যহিক ঘটনার ক্ষীণ স্রোত, পল্লীবাসী বাঙালিসাধারণের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্রণ। কোনো গুরুতর সমস্যার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের গভীরতায় ডুব না দিয়ে, স্বল্পসংখ্যক পাত্রপাত্রী নিয়ে, চঞ্চলতাবিরহিত সুন্দর পরিবেশে আমাদের সাংসারিক জীবনকে রমেশচন্দ্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিত্তশালী অভিজাতপরিবারের ছবি এঁকেছেন; রমেশচন্দ্র আরো একধাপ নীচে নেমে এসে সাধারণ জীবনের আলেখ্য আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা সূক্ষ্ম, পল্লীর মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতি গভীর, তাঁর আঁকা ছবিগুলি আন্তরিকতার স্পর্শে চিত্ত-গ্রাহী। পল্লীবাঙ্‌লার পথঘাট, পুকুরবাগান, জোতজমা, নিম্নমধ্যবিত্তপরিবার, গোয়ালা-কৈবর্ত, সাধারণ চাষাভুষা-শ্রেণীর মানুষ, সমস্তই রমেশচন্দ্রের বর্ণনকৌশলে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। সেকালের উপন্যাসসাহিত্যে এসব-কিছুর লিপিচিত্র তেমন সুলভ ছিল না। এক্ষেত্রে বর্তমান উপন্যাসকারের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার্হ।

কিন্তু, এও স্বীকার্য যে, রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে উন্নত কারুকলা-চাতুর্যের তেমন কোনো পরিচয় ফোটেনি। যথার্থ ঔপন্যাসিকের পক্ষে কেবল চিত্রাঙ্কনক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণশক্তিই যথেষ্ট নয়। তাঁর কাছে পাঠক আরো বেশিকিছু দাবি করে—তিনি হবেন জীবনরহস্যের ভাষ্যকার, মানবহৃদয়ের অন্তস্তলের সংবাদ পাঠককে তিনি নিবেদন করবেন, বিরুদ্ধশক্তির সংঘাতকে আখ্যায়িকায় রূপ দেবেন, আখ্যানে বর্ণিত চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশ দেখাবেন, তাদের ক্রিয়াকলাপের মনস্তত্ত্বসংগত কারণ দর্শাবেন, ঘটনাধারার বিবর্তনকে কার্যকারণের সম্পর্কসূত্রে গাঁথবেন। পাঠকসমাজের এসব দাবি রমেশচন্দ্র প্রায়শ পূরণ করেন না—ঔপন্যাসিকের দায়িত্ববিষয়ে তাঁকে খুব সচেতন বলে মনে হয় না। 'সমাজ'-'সংসার'-এ বর্ণনা আছে প্রচুর, এর তুলনায় ঘটনার সংঘাত-সংক্ষোভ খুবই কম, বলতে হবে। একারণে

রমেশচন্দ্রের নির্মিত চরিত্রনিচয়ের মধ্যে কোনোরূপ অন্তর্বিপ্লব দেখা যায় না, তারা সর্বপ্রকার জটিলতা এড়িয়ে চলে। এরা লেখকের বাস্তবভীরুতা ও জীবন-পর্যালোচনের অগভীরতার দিকেই ইঙ্গিত করে। 'সংসার'-এ রমেশচন্দ্র অতিসহজেই বিধবাবিবাহকার্যটি সম্পন্ন করেছেন ; 'সমাজ'-এ প্রতিষ্ঠিত করেছেন অসবর্ণ-বিবাহ। এতে উপন্যাসলেখকের সমাজসংস্কারে উৎসাহ যতখানি প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যাসে প্রত্যাশিত কলানৈপুণ্যের পরিচয় ততখানি নেই। পল্লীসমাজ নামক যে-বৃহৎ বস্তুটির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা শরৎচন্দ্র অতিক্রম করতে পারেননি, নিছক শাস্ত্রীয় যুক্তির প্রমাণের জোরে রমেশচন্দ্র বিনা সংঘর্ষে তা ডিঙিয়ে গেলেন। বলতে হবে, শিল্পের মর্যাদাহানি ঘটিয়েই তিনি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। 'সংসার'-এ শরৎ ও সুধা পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করে। একারণে তাদের বিবাহমিলনকে ততখানি শিল্প-বিরোধা বলে মনে হয় না। কিন্তু 'সমাজ'-এ দেবাপ্রসাদ ও সুশীলার অসবর্ণ-বিবাহ অবশ্যই শিল্পসম্মত নয়। দ্বিতীয়োক্ত উপন্যাস শিল্পকর্ম হয়নি, নিছক প্রচারে পর্যবসিত হয়েছে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর কলাবিদ্ রমেশচন্দ্র নন। তথাপি, রমেশচন্দ্রের কৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভালো লাগে তাঁর সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধারের অভিলাষ। সামাজিক উপন্যাসে ভালো লাগে তাঁর সরল আন্তরিকতা, সমাজের তৎকালীন দুর্বলতাবিদূরণের মহৎ সংকল্প ও দুর্বার উৎসাহ। সাহিত্যের মাধ্যমে রমেশচন্দ্র দত্ত দেশসেবাই করে গেছেন, তাঁর সাহিত্যসেবা স্বদেশের নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার দান অবশ্যই স্মরণীয়।

॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের [১৮৭৩-১৯৩২] উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা আছে। একদিকে, রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণবিকাশ, অন্যদিকে, শক্তিমান শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ, এই অন্তর্বর্তী কালখণ্ডের মধ্যে যে-কয়জন জনপ্রিয় সাহিত্যনির্মাতার অভ্যুদয় হয়েছে, প্রভাতকুমার তাঁদের অন্যতম। তাঁকে স্বকীয়তায় দীপ্তিমান বিশিষ্ট একজন লেখকরূপে চিহ্নিত করা যায়। তিনি চৌদ্দখানি উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁর লেখা গল্পসংকলন-গ্রন্থের সংখ্যা বারো, এগুলিতে একশ আঠারটি গল্প স্থান পেয়েছে। প্রভাতকুমারের সৃষ্টির প্রাচুর্য লক্ষ্য

করবার মতো। অবশ্য, আমাদের কাছে বর্তমান লেখকের বড়ো পরিচয় তিনি একজন নিপুণ ছোটগল্পকার। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার বাঙালির মনোলোকে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এই আসনের অধিকারী কথাকোবিদ শরৎচন্দ্র।

প্রথমে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস-রচনাবলী সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলি। একটু আগে উল্লেখ করেছি, প্রভাতকুমারের উপন্যাস সংখ্যায় বহু। এজাতীয় রচনার কতকগুলির নাম—'রমাসুন্দরী' [১৯০৭], 'নবীন সন্ন্যাসী' [১৯১২], 'জীবনের মূল্য' [১৯১৬], 'রত্নদ্বীপ' [১৯১৭], 'সিন্দুরকৌটা' [১৯১৯], 'মনের মানুষ' [১৯২২], 'সত্যবালা' [১৯২৪], ইত্যাদি। তাঁর লেখা যে-সব উপন্যাস সমধিক খ্যাতি পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হলো 'রত্নদ্বীপ' ও 'সিন্দুরকৌটা'—এদুটির রচনাকাল ১৯১৭-১৯১৯—তখনো শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার পূর্ণপরিচয় এদেশের পাঠকসমাজ পায়নি। অল্পকাল পরেই শরৎচন্দ্র বাঙ্‌লা উপন্যাসের ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যুদয়ের পর প্রভাতকুমারের ঔপন্যাসিক-খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়। স্বীকার করে নেওয়াই ভালো, উচ্চকোটির উপন্যাসকার প্রভাতকুমার নন। শিল্পকর্মহিসেবে উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—সুবিস্তৃত একটি কাহিনী, বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ, ঘটনাগুলির ঐক্যে-ধৃত গ্রন্থন, পাত্রপাত্রীর হৃদয়বিশ্লেষণ, জীবনরহস্যে অবগাহন, বাস্তবসমস্যার ওপর আলোকপাতন, পূর্ণায়ত চরিত্রনির্মাণ, ইত্যাদি বস্তু খাঁটি উপন্যাসে প্রত্যাশিত। উপন্যাস লিখতে বসে প্রভাতকুমার এসকল বস্তুর প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখেন না। তাঁর কাহিনীগ্রন্থনে শৈথিল্য প্রকাশ পায়, ঘটনাগুলি ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়ে না বলে তাতে সংহতির অভাব লক্ষিত হয়। জীবনের উপরিভাগের উর্মিলীলার চিত্র আঁকেন তিনি, গভীরতায় ডুবে যেতে পারেন না। তাঁর আঁকা চরিত্র-সব পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাত তাঁর উপন্যাসসাহিত্যে তেমন-একটা চোখে পড়ে না, চমকপ্রদ ঘটনাবর্ণনের দিকেই তাঁর ঝোঁক সমধিক। লঘু কল্পনা ও কৌতুকপ্রবণতার জন্যে মানবজীবনের ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন। তা ছাড়া, সীমিত একটি গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ—বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ। লেখকের কল্পনার বিচরণক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ বলে তাঁর বর্ণিত আখ্যানে ও চরিত্রগুলিতে বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায় না। এসব কারণে প্রভাতকুমারের লেখা অধিকাংশ উপন্যাস উৎকৃষ্ট শিল্পনির্মিতি হয়ে ওঠেনি।

অবশ্য, দুয়েকটি উপন্যাসে প্রভাতকুমার কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'রত্নদ্বীপ'-এ ঘটনার চমকপ্রদ অভিনবতা, কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতি, রাখালের চরিত্রচিত্র, বৌরানীর কারুণ্যসিক্ত হৃদয়াকৃতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সিন্দূরকৌটা'তে বিজয় ও সুশীর প্রণয়োন্মেষের আলেখ্য, মাদ্রাজী খ্রিস্টান পল সাহেবের ইতরতা ও আত্মসম্মানবোধের অভাব, স্বামীর ইচ্ছার কাছে বকুরানীর নিরভিমান আত্মসমর্পণ, কাহিনীর সুখময় পরিণতি—সমস্ত-কিছুই সুচিত্রিত। এখানে প্লটের শৈথিল্য নেই, অবান্তর ঘটনার অনধিকার-প্রবেশ নেই, চরিত্রাঙ্কন বেশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। এ দুটি উপন্যাস সুখপাঠ্য এবং মনোজ্ঞ। 'নবীন সন্ন্যাসী'-র পাষণ্ড-চরিত্র গদাই পালকে বাঙালি পাঠক কখনো ভুলবে না। তথাপি আমরা বলবো, তাঁর ছোটগল্পের শিল্পচাতুর্য তাঁর বড়ো গল্প বা উপন্যাসে অনুপস্থিত।

* * *

প্রভাতকুমার পাকা গল্প-বলিয়ে, ছোটগল্প-রচনায় তিনি অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পসংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নবকথা' [১৮৯৯], 'ষোড়শী' [১৯০৬], 'দেশি ও বিলাতী' [১৯০৯], 'গল্পাঞ্জলি' [১৯১৩], 'গল্পবীথি' [১৯১৬], 'গহনার বাক্স' [১৯২১], 'হতাশপ্রেমিক' [১৯২৩], 'জামাতা বাবাজী' [১৯৩১], ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রচুর গল্প লিখে তিনি বাঙালির মনোহরণ করেছেন। এককালে জনপ্রিয়তায় প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। খুব কম গল্পকারই তাঁর মতো এতখানি লোককান্ত হতে পেরেছেন। গল্পের সংসারে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুগামী, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর নিজত্ব সর্বজনস্বীকৃত। গল্পরচনায় প্রভাতকুমারকে উৎসাহিত করেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রের সস্নেহ সাহচর্য তিনি পেয়েছেন। তাঁর প্রথমের দিকের কয়েকটি গল্পে রবীন্দ্রানুসারিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে তিনি উজ্জ্বল স্বকীয়তার পরিচয় দিলেন, ছোটগল্পের আশ্চর্যসুন্দর একটি জগৎ নির্মাণ করলেন। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও গল্পকার প্রভাতকুমার দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। রবীন্দ্রের ছোটগল্প কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ ; প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বাস্তবের স্পর্শে হৃদ্য। রবীন্দ্রনাথ দূরযানী কল্পনার পাখায় ভর করে প্রায়শ ভাবজগতে বিহার করেন, প্রভাতকুমার তাঁর বাস্তবনিষ্ঠা নিয়ে আমাদের পরিচিত সংসারেই ঘুরে বেড়ান। গল্প লিখতে বসেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের অতিসূক্ষ্ম ভাবানুভূতির কাব্যকার ; প্রভাতকুমার মানবমানবীর দৈনন্দিন

জীবনের ছোটখাটো হাসিকান্নাগুলির সুদক্ষ রূপকার। এই দুজন কলাবিদের লেখা গল্পের স্বাদের মধ্যে পার্থক্য সামান্য নয়।

ছোটগল্পের খুব বড়ো একজন শিল্পী প্রভাতকুমার। ক্ষুদ্রতর আয়োজন ও স্বল্পতম উপাদানে প্রভূত গল্পরস পরিবেশন করতে পারেন তিনি। গল্পবানানোর সহজ ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। বর্তমান গল্পকার যে-কাহিনীটি বলতে শুরু করেন, তার বিষয়ে পাঠকচিত্তের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, এবং কাহিনীর সমাপ্তিতে পৌঁছে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। গল্পের উপসংহার অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অনিবার্য এবং স্বাভাবিক। কাহিনীর অন্তঃপ্রবাহী নির্মল কৌতুকরসধারা প্রভাতকুমারের অধিকাংশ গল্পকে স্নিগ্ধ সরসতা দান করেছে। এই কৌতুকসঞ্জাত হাসি শুচিশুভ্র। প্রভাতকুমার অনুশীলিত রুচির লেখক, কোথাও শালীনতাকে লঙ্ঘন করেন না, কোনোপ্রকার অসংযমকে প্রশ্রয় দেন না, ভাঁড়ামি কাকে বলে তা তিনি জানেন না।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদের ও বিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশকের মধ্যবিত্ত ভদ্র-বাঙালি-জীবনকে প্রভাতকুমার তাঁর গল্পে রূপায়িত করেছেন। বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও তিনি রোমান্সের সন্ধানী। প্রধানত, জীবনের লঘু অংশের দিকেই তিনি আপন দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন, সহজ সুরে সহজ কথাই বলেছেন—গভীরতায় তলিয়ে যাওয়া, তাত্ত্বিক মননে ডুব দেওয়া, তাঁর শিল্পীমনের বিরুদ্ধবস্তু। তিনি হাল্কা হাসির যে-গল্প আমাদের শুনিয়েছেন তা বেশ উপভোগের সামগ্রী, মনকে খুশি করে। প্রাণসত্তার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করে যে-গল্প, এগুলি সে-জাতের লেখা অবশ্য নয়। তাঁর গল্পের কোথাও কোথাও শ্লেষ আছে, ঈষৎ ব্যঙ্গও রয়েছে, কিন্তু তীব্র নয় বলে তাতে জ্বালা নেই। আবার, প্রভাতকুমারের কৌতুকের হাসি কোথাও কোথাও কারুণ্যের অশ্রুতে সিক্ত—যেন রৌদ্রঝল্‌মল্‌ সবুজ তৃণদলের ওপরে সকালবেলার শিশিরবিন্দু। প্রশ্নকণ্টকিত কোনো সমস্যা তাঁকে ভাবায় না, সমাজের কাছে তাঁর কোনো নালিশ নেই, সামাজিক বিধিবিধানের বিরোধিতা করতে তিনি অস্বীকৃত। একটা শান্তি, একটা তৃপ্তি তাঁর চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছে, এবং এই প্রসন্নতা তাঁর গল্পগুলির সর্বাঙ্গে বিকীর্ণ।

এবার, প্রভাতকুমারের দুয়েকটি নামকরা গল্পের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। পূর্বে বলেছি, কৌতুক ও রঙ্গরসাশ্রয়ী রচনায় তিনি সিদ্ধশিল্পী। ঘটনাবিন্যাসকৌশলে কীরূপ হাস্যমধুর গল্পের সৃষ্টি হতে পারে তার স্মরণীয় একটি নিদর্শন 'বলবান জামাতা'। রমণীসুলভ কোমল দেহের জন্যে নলিনীকান্তকে তার শ্যালিকা বাসরঘরে বিদ্রূপবাক্য

শোনাতে নিজের চেহারাটিকে পুরুষালি করে তুলবার জন্যে নলিনী নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা সুরু করে দিল। দুবছরের প্রাণপণ চেষ্টায় সে রীতিমতো একজন পালোয়ান হয়ে উঠলো। তারপর, একদিন এলাহাবাদে শ্বশুরগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো সে। সঙ্গে রয়েছে একটি মোটা লাঠি ও একটি বন্দুক। এলাহাবাদে পৌঁছে শ্বশুরের নামগত বিভ্রান্তির ফলে নলিনী অন্যের বাড়িতে গিয়ে উঠলো। লাঠি-বন্দুক আর তার গুণ্ডামার্কা চেহারা দেখে বাড়ির লোকেরা ভাবলো, বুঝি ডাকাত পড়েছে। তাড়া খেয়ে এবার নলিনী আপন শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজির হলো। এখানেও বিড়ম্বনার শেষ নেই। শ্বশুরমশাই 'বলবান জামাতা' অর্থাৎ পালোয়ান নলিনীকে দেখে চিনতেই পারলেন না, দিলেন তাড়িয়ে। পরিশেষে অট্টহাসিতে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। একই নামের দুজন ব্যক্তি থাকায় নলিনীকান্তের এহেন দুর্গতি ভোগ করতে হলো। আর, নলিনীর দেহগত কোমলতার কলঙ্কক্ষালনের দুরূহ প্রয়াস কি কম কৌতুকাবহ ?

অনুরূপ কৌতুক-রঙ্গের অপর একটি উৎকৃষ্ট গল্প 'রসময়ীর'রসিকতা'। স্ত্রী রসময়ী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে অনবরত স্বামী ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে ঝগড়ায় নামেন। বিবাহিত জীবনের আঠারো বছর এভাবে অতিক্রান্ত হলে কটুভাষিণী রসময়ী একদিন স্বর্গতা হলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহন পুনর্বিবাহের আয়োজন করলেন। কিন্তু বিবাহের কথাবার্তা শুরু হতে-না-হতেই রসময়ীর-হস্তাক্ষরে-লিখিত পত্র আসতে লাগলো, এবং তাতে ক্ষেত্রমোহনকে বেশ শাসানো হচ্ছে। এই ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা হলো, বিবাহ স্থগিত রইল। পরে আবিষ্কৃত হলো যে, রসময়ী তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই চিঠিগুলি রেখে গিয়েছিলেন। এই গল্পে লেখকের কৌতুকসৃষ্টির উপাদান হচ্ছে, মৃত্যুর পরেও স্বামীর ওপর রসময়ীর নিজ অধিকার অটুট রাখার হাস্যকর অভিলাষ। ঘটনাসন্নিবেশচাতুর্যে হাস্যরসের উৎসার বিখ্যাত 'মাস্টার মহাশয়' গল্পটিতেও লক্ষিত হয়। 'প্রণয়-পরিণাম' গল্পে প্রভাতকুমার অকালপক্ক এক কিশোরের অবাস্তব প্রনয়স্বপ্নের ওপর একঝলক সস্নেহ কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পোস্টআপিসের ডাকবাবু বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলির বিকৃত রোম্যান্সপ্রবণতা লেখকের কৌতুকের বক্রহাসি আকর্ষণ করেছে। 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পে অবস্থাপন্ন যুবক রাম আওতের রোম্যান্টিক অভিযান ও গুণ্ডার কবলে পড়ে তার হৃতসর্বস্ব'হওয়ার ঘটনাটি লেখকের রসিকতা-বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তৎকলীন রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের অসংগত আচরণের মধ্যেও তিনি হাস্যরসের উপাদান খুঁজে

পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'উকিলের বুদ্ধি', 'হাতে-হাতে ফল' গল্প-দুটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'খোকার কাণ্ড' স্বামীস্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসের বিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত হাস্যরসাত্মক সুন্দর একটি গল্প। কৌতুকরসোচ্ছল এরকমের আরো বহু গল্প প্রভাতকুমার লিখেছেন।

প্রভাতকুমারের লেখনী থেকে গভীর রসের গল্পও আমরা পেয়েছি। সার্বজনীন মানবসত্যের দিকেও প্রভাতকুকার মাঝেমধ্যে নিজ দৃষ্টিকে প্রসারিত করে ধরেছেন। যে স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা সর্বস্থানিক ও সর্বকালিক তার রূপায়ণেও তিনি উৎসাহী। 'দেশি ও বিলাতী' গল্পসংগ্রহ-পুস্তকটিতে গ্রথিত 'ফুলের মূল্য' আর 'মাতৃহীন' গল্প-দুটিতে মানুষের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির যে প্রকাশ আমরা দেখি, তা দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের উর্ধ্বচারী—ইরেজ-বাঙালির সমস্ত ব্যবধান সেখানে সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

'কাশীবাসিনী', 'আদরিণী' ও 'দেবী' এই তিনটি গল্প করুণরসাত্মক। ছোট-গল্পহিসেবে এগুলি যে প্রথমশ্রেণীর রচনা, সমালোচকরা এবিষয়ে একমত। প্রথমোক্ত গল্পটিতে এক পদস্খলিতা মাতার দুহিতৃস্নেহের মর্মস্পর্শী আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। যে-হৃদয়যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই বিপথগামিনী জননী নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন তার বর্ণনা পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে ফেলে। দ্বিতীয়োক্ত গল্পে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে [প্রাণীটি হলো একটি হাতী, আদর করে তার নাম রাখা হয়েছে 'আদরিণী'] মানুষ হৃদয়প্রীতির সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে। রসুলগঞ্জের হাটে বাধ্য হয়ে এই 'আদরিণী'কে পাঠিয়ে দিলে তার আঘাত 'আদরিণী'র পক্ষে যেমন মর্মান্তিক হয়েছে, তেমনি, হাতীর মালিক মোক্তার জয়রাম মুখুজ্জের পক্ষে—একের মৃত্যু অপরের মৃতুকে ডেকে এনেছে। শেষোক্ত 'দেবী'-গল্পের পরিণতি শোককরুণ। শক্তিসাধক শ্বশুর কালীকিঙ্কর একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, জগজ্জননী কালী কৃপা করে তাঁর পুত্রবধূ দয়াময়ীর মূর্তিতে তাঁর গৃহে অবতীর্ণা হয়েছেন। সেদিন থেকে মানবী দয়াময়ী দেবীর পদে অভিষিক্তা হলেন। দয়াময়ী কিন্তু দেবী হতে চায় না, চায় মানবীরূপে বাঁচতে। কিন্তু অপরের ধর্মসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস তার সেই অভিলাষ চরিতার্থ হতে দিল না। ঘটনার ঘূর্ণীচক্রে পড়ে ক্রমে দয়াময়ীর নিজেরই বিশ্বাস হতে লাগলো যে,সে প্রকৃতই বুঝি দেবী। কিন্তু একদা নিদারুণ এক আঘাতে নিজের দেবীত্বে অদৃষ্টবিড়ম্বিতা দয়াময়ী বিশ্বাস হারালো, এবং আপনার অসহনীয় দেবীমহিমা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো। অন্ধধর্মসংস্কারের বিপাকে পড়ে তার এই আত্মবলিদান কারুণ্যে মর্মবিদারী। এমন

উচ্চশ্রেণীর ছোটগল্প প্রভাতকুমার খুব কমই লিখেছেন। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের শ্রেষ্ঠগল্পের পাশে এর স্থান।

ছোটগল্প লিখে প্রভাতকুমার বাঙালির চিত্ত জয় করেছেন, অশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। গল্পরস পরিবেশন করে এতখানি জনপ্রিয়তা-অর্জনের সৌভাগ্য তাঁর পরবর্তী অন্যকোনো লেখকের হয়নি। সাম্প্রতিককালের অনেক ছোটগল্পকার উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন, কিন্তু সর্বস্তরের পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করতে তাঁরা পারছেন না। কারণ, সুস্থ জীবনের প্রসন্নতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন, যুগের যন্ত্রণায় জীবন তাঁদের কাছে তিক্ততায় পূর্ণ, বিস্বাদ। এরূপ অবস্থায় তাঁদের রচনা কী করে মধুস্বাদী হবে? প্রভাতকুমার সমস্যাকণ্টকিত জীবনের রূপকার নন। তাঁর দৃষ্টি উদার প্রসন্ন, তাঁর সৃষ্টি অনাবিল হাসির লাবণ্যে সিক্ত। একারণে পাঠকসাধারণ প্রভাতকুমারকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি জানায়। যে-কোনো লেখকের সাহিত্যকর্মের খুব বড়ো একটি পুরস্কার হলো পাঠকের নিবেদিত এই প্রীতি। প্রভাতকুমার সর্বজনের প্রীতিধন্য ভাগ্যবান একজন সাহিত্যিক।

॥ সর্বাধিক লোককান্ত উপন্যাসকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

একদা বাঙ্‌লা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের [১৮৭৬ - ১৯৩৮] চকিত আবির্ভাব সকলকে সচকিত করেছিল। তাঁর প্রথম-প্রকাশিত গল্পে প্রতিভার মৌলিকতার এমন একটি ছাপ ছিল যা কোনো সাহিত্যরসিকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। অত্যল্প-কালের মধ্যে পাঠকসমাজের কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে-সমাদর পেলেন, সত্যিই তার তুলনা অতি-বিরল। সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এতখানি সমাদর বোধ করি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জোটেনি। খুব অল্পবয়সেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যনির্মাণে হাত দেন। তাঁর বয়স যখন বছর চৌদ্দ, তখন কাশীনাথ' উপন্যাসখানি রচিত হয়। শরৎচন্দ্রের প্রথমমুদ্রিত গল্পটির নাম 'মন্দির' —এর জন্যে তিনি 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেয়েছিলেন [১৯০২ ইংরেজি সালে]। চৌদ্দ থেকে বাইশ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচনা করেন। ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশিত হলে [১৯০৭] লেখকের খ্যাতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 'যমুনা' নামে সাহিত্য-পত্রিকায় তিনি অনেকগুলি গল্প লেখেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বর্মা মুলুকে কেরানির কাজ নিলেন তিনি।

১৯১৬ সালে রেঙ্গুন ত্যাগ করে বাঙ্‌লাদেশে চলে আসেন। এখানে এসেই শরৎচন্দ্র পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। বাঙ্‌লা উপন্যাসসাহিত্যকে তিনি কী পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন, তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের পর এতবড়ো শক্তিমান উপন্যাসলেখক আর জন্মান নি।

শরৎচন্দ্রের রূপসৃষ্টির মৌলিকতা ও রম্যতা সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের লালিত বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের পরিধি তিনি কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন, এর মধ্যে কতখানি বৈচিত্র্য এনেছেন, সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পরিচয়কথন একরূপ অসম্ভব। আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি নতুন পথ ধরে এগিয়ে গেছেন। সংবেদনশীল হৃদয়, জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষমতা, আর সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা সাহিত্যসংসারে তাঁকে নতুন রসধারার উৎসের সন্ধান দিয়েছে। রবীন্দ্রের পরবর্তী বাঙ্‌লা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি তিনিই যে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছেন এতে কোনো সংশয় নেই।

বাঙ্‌লার মধ্যবিত্তশ্রেণীকে কেন্দ্র করেই শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের ধারা আবর্তিত হয়েছে। তাঁর নির্মিত সাহিত্য বাঙালির সমাজ সম্পর্কে বিরাট একটি জিজ্ঞাসা। ক্ষমাহীন, নিষ্করুণ, মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, আত্মপীড়ননিরত বাঙালি-সমাজের বিশ্বস্ত আলেখ্য তিনি পাঠকগোষ্ঠির সমক্ষে উন্মোচিত করে ধরেছেন। আমাদের বৈষম্যকণ্টকিত সমাজব্যবস্থা ও হৃদয়হীন সমাজনীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ তাঁর প্রতিবাদ। শরৎচন্দ্র বলছেন :

> 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই—যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত—মানুষ যাদের চোখের জলের কোনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠাল আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।'

কথাগুলি মানবদরদী শরৎচন্দ্রের অন্তরতর হৃদয়ের তলদেশটি পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত করছে।

শরৎসাহিত্য নির্যাতিত মানবমানবীর জীবনবেদ। সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর শাসনে-লাঞ্ছিত নরনারীর বেদনাময় জীবনকথা অবলম্বনে তিনি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি নির্মাণ করেছেন। মধ্যবিত্তসমাজের বিচিত্র দুর্গতিদুঃখের এতবড়ো কাব্যকার বাঙ্‌লা দেশে ইতঃপূর্বে আমরা দেখিনি। তিনি যে আমাদের মমতাহীন সমাজের বাইরের

মুখোসটিই শুধু খুলে ধরেছেন তা নয়, এর অন্তরালবর্তী অন্ধগহ্বরের নির্বারিত করেছেন। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে প্রখর আলোকের মধ্যে ছুটে এসেছে শত শত ছায়ামূর্তি—যারা প্রীতি চায়, চায় সহমর্মিতার মধুময় স্পর্শ। সমাজের চোখে কিন্তু এরা মূর্তিমান অমঙ্গল। প্রাচীনপন্থী সমাজনেতারা শরৎচন্দ্রের এই বস্তুতন্ত্রী সাহিত্যাদর্শকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাঁদের মতে এ দুর্নীতিরই প্রশ্রয়দান—আর্টের নামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নগ্ন কুশ্রীতার বেসাতি করছেন।

শরৎসাহিত্যে যে-প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, তা আর্থনীতিক নয়, রাজনীতিক নয়—সমাজনীতিক। যে-অবিবেকী সমাজনীতি মানুষের আত্মাকে প্রতিনিয়ত বিবর্ণ, নীরক্ত করে তুলছে, তাতে আছে কোন্ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ? রমা-পার্বতী-রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর মতো নারী এত দুঃখ যে পেল, তার জন্যে দায়ী কে? নারীর সতীত্ব কোথায়? দেহে, না, মনে? সতীত্ব বড়ো, না, নারীত্ব?—এধরনের নানান্ প্রশ্ন তাঁর সাহিত্যে উঁকি দিয়েছে। তবে, লক্ষ্য করতে হবে, শরৎচন্দ্র বহুতর সমস্যা তাঁর গল্পে-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, কিন্তু তার সমাধানের প্রতি কোনো ইঙ্গিত করেননি। শরৎচন্দ্রকে আমরা সমাজসংস্কারকরূপে পাইনি, পেয়েছি রূপকারহিসেবে। নিজের উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসার ভার পাঠকের ওপরই অর্পণ করেছেন তিনি। আপনার শিল্পিসত্তাটিকে শরৎচন্দ্র কদাপি বিস্মৃত হননি। তাঁর মুখেই আমরা শুনেছি:

> 'সমাজসংস্কারের কোনো দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই, বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও আছে—কিন্তু সমাধান নেই। ও-কাজটি অপরের। আমি শুধু গল্পলেখক, তা ছাড়া আর-কিছুই নই।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীচরিত্রচিত্রণে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নারীজীবনের অনুচ্চারিত বেদনার উপলব্ধি তাঁর সাহিত্যকে একটা উজ্জ্বল অপূর্বতা দান করেছে। নারীর অবচেতন প্রবৃত্তি এবং সজ্ঞান সংস্কার—এ দুয়ের বিচিত্র দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের রচনায় অদ্ভুত লিপিকুশলতাসহকারে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উত্তম ট্র্যাজেডিগুলিতে নারীর প্রাধান্য কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। নারীজাতিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। আমাদের নারীসমাজের কথাই তিনি সবচেয়ে বেশি বলেছেন—সমাজে নারীর মূল্যনিরূপণই যেন তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের পুণ্য একটি ব্রত ছিল। এতখানি নিবিড় সহানুভূতি-

যোগে, এমন প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ভাষায়, নারীর কথা আর কোন্‌ বাঙালি লেখক বাণীবদ্ধ করেছেন ?

মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের যে-ধারাটি রবীন্দ্রনাথে প্রথম সূচিত হলো, তাকে ব্যাপ্তি দান করলেন বাঙ্‌লার সর্বাধিক লোককান্ত উপন্যাসকার শরৎচন্দ্র। মানব-মানবীর মনোলোকের দ্বার তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সমক্ষে অবারিত ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর কবিপ্রাণের সংবেদনশীলতা। শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে খুববড়ো একজন কবি ছিলেন। লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে তাদের বেদনার মুখে ভাষাদান, সমাজপতিদের অকরুণ অবিচারের বিরুদ্ধে অবিরল প্রতিবাদ-উচ্চারণ, মানবিক সত্যকেই সকল সত্যের সেরা সত্য বলে সোচ্চার ঘোষণা, ইত্যাদি বস্তু তাঁর উপন্যাসনিচয় আর গল্পমালাকে সকলের আদরের সামগ্রী করে তুলেছে। কোথায় আমাদের 'পল্লীসমাজ'-এ পঙ্গু বিকারগ্রস্ত জীবনের বিষ ফেনিয়ে উঠছে, কোথায় 'অরক্ষণীয়া' জ্ঞানদার চোখের জল অপরের দৃষ্টির অগোচরে নীরবে ঝরে পড়ছে, কোথায় বিরহী 'দেবদাস' তিলে তিলে ব্যর্থতার অপমৃত্যু বরণ করে নিচ্ছে, কোথায় সাবিত্রীর ন্যায় হৃদয়বতী নারীকে আমরা 'চরিত্রহীন' বলে সমাজ থেকে নির্বাসিত করছি, ক্ষণিকের প্রবৃত্তির বিক্ষোভ-প্রকাশের জন্যে কিরণময়ীর মতো মন্দভাগ্য নারীকে কলঙ্কিনী বলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, কোথায় নারায়ণী ও বিন্দুর মাতৃস্নেহ স্বর্গের অমৃতধারার মতো পাত্রাপাত্র বিচার না করে শতমুখে উৎসারিত হচ্ছে—শরৎচন্দ্রের রচনায় তার স্পষ্টরেখ পরিচয় মুদ্রিত। লীলাচঞ্চল নদীপ্রবাহের ন্যায় গতিশীল ও আবেগস্পন্দিত ভাষা তাঁর রচনাকে যেমন চিত্তগ্রাহী, তেমনি, রসঘন করেছে।

শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ বাস্তবের দিকে তাকিয়েছেন, আমাদের পরিচিত সংসার থেকে উপকরণ কুড়িয়ে নিয়ে সাহিত্যের সৌন্দর্যলোক নির্মাণ করেছেন। এই হিসেবে তাঁকে আমরা 'রিয়ালিস্ট' অর্থাৎ বাস্তবতন্ত্রী বলতে পারি। কিন্তু নগ্নতা, নিরাবরণ কুশ্রীতা, বিকৃত রুচি, ইত্যাদি নিয়ে যে একরকম 'রিয়ালিজম্‌' সাহিত্যে দেখা দিয়েছে, শরৎচন্দ্রের বস্তুতন্ত্রতা সেই রকমের নয়। বাস্তবে ঘটলেও, সব ঘটনাই যে সাহিত্যের সত্য নয়, শরৎচন্দ্র তা জানতেন। তাই, তিনি সর্বপ্রকার বাস্তবকে সাহিত্যে তার নিরাবরণতায় প্রকাশ করেননি। যা আড়ালে থাকবার, তাকে আড়ালেই রেখেছেন ; যা গোপনে রাখবার, তাকে আবরণে ঢেকেছেন। বাস্তব-চিত্রণের নামে রক্তমাংসের কদর্য স্থূলতাকে নিজের লেখায় কুত্রাপি তিনি প্রশ্রয় দেননি। সূক্ষ্মবিচারে শরৎচন্দ্রকে আমরা 'আইডিয়ালিস্ট' বা ভাববাদীও বলতে

পারি। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে বস্তুর যাথার্থ্যকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন, চোখে-দেখার জিনিসকে দেখেছেন ভাবের দৃষ্টিতে। স্পর্শকাতর চিত্তের ভাবালুতা শরৎচন্দ্রের বস্তুতন্ত্রতাকে একরকমের রোম্যান্টিক আদর্শবাদে রূপান্তরিত করেছে।

কাহিনীপরিকল্পনা, চরিত্রনির্মাণ, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, প্রকাশভঙ্গি—সর্বক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু অপরের অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসমৃদ্ধ মনোরম গীতিভঙ্গিমা তাঁর ভাষায় অনুপস্থিত বটে ; কিন্তু প্রাঞ্জলতা ঋজুতা পরিচ্ছতার গুণে এ ভাষা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। শরৎচন্দ্রের ভাষাভঙ্গিটি তাঁর একেবারে নিজস্ব। তাঁর শিল্পিসত্তার স্পর্শে এ অনন্য-সদৃশ, এর অভিনবতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

আর-একটি কথা। বঙ্কিম যে-বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথ যে-বাস্তবকে স্বীকৃতি জানিয়েও তাকে অত্যুচ্চ ভাবলোকের সামগ্রীতে পরিণত করেছেন, শরৎচন্দ্র সেই বাস্তবের একটা দিক আমাদের চাক্ষুষ করিয়েছেন। যাকে এতকাল দেখেও ঠিক দেখিনি, তিনি তা আমাদের দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'বিশেষ' দেখতে দেখতে 'নির্বিশেষ' হয়ে ওঠে, ব্যক্তিমানুষ নৈর্ব্যক্তিকতায় হারিয়ে যায়, বস্তু মুহূর্তমধ্যে ভাবে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় বিশেষ মানুষ, বিশেষ বস্তু তার বাস্তব-সত্তাটি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে না। এইদিক থেকে দেখলে শরৎসাহিত্যকে, রবীন্দ্রসাহিত্যের তুলনায়, অধিকতর বাস্তবধর্মী বলতে হবে। পরবর্তীকালের উপন্যাসকারদের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের কাছে নানাভাবে ঋণী। শরৎরচনাবলী সাহিত্যকর্ম-হিসেবে অতিশয় বিশিষ্ট।

* * *

উপন্যাসের দিকেই শরৎচন্দ্রের শিল্পিমানসের সমধিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, ছোটগল্প তাঁর প্রতিভার ঠিক উপযুক্ত বাহন নয়। তাঁর নির্মিত সত্যকার ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প। সে যা-হোক, যে-কয়টি গল্প তিনি লিখেছেন সেগুলিতে তাঁর প্রতিভার ছাপ অতিশয় স্পষ্ট।

বাস্তব জীবনের কঠিন ভূমিতেই ছোটগল্পকার শরৎচন্দ্রের পদচারণা, মৃত্তিকার স্পর্শ এড়িয়ে স্বপ্নসুন্দর কল্পলোকের দিকে তিনি ধাবিত হননি। একটা বিশেষ কালের সীমায় আবদ্ধ বাঙ্‌লার সমাজ, বাঙালির অনতিউত্তরঙ্গ জীবন ও বাঙ্‌লার জলবায়ুর স্থানীয় রূপ—এদের সঙ্গে তাঁর যে প্রত্যক্ষ পরিচয়, সেই পরিচয়কে পাথেয় করে, এবং নিজের ভাবুকতাময় দৃষ্টি নিয়ে, তিনি গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—

বাঙ্‌লার সমাজজীবনের কতকগুলি মনোজ্ঞ আলেখ্য এঁকেছেন। এমন গভীর বর্ণে অঙ্কিত আলেখ্য অন্যকোনো লেখকের হাত দিয়ে বেরোয়নি। শরৎচন্দ্রের লেখা যে-উপন্যাস বাঙালিচিত্তকে আলোড়িত করেছে, তার রস ছোটগল্পের পাত্রেও তিনি পরিবেশন করে গেছেন। এগুলি পড়ে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবিষ্ট হয়েছি, এদের মধ্যে এক অপূর্ব স্বাদের সন্ধান পেয়েছি।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলির বিশিষ্টতা রয়েছে। সাধারণত ছোটগল্পের আয়তন ক্ষুদ্র এবং এর পটভূমি সংকীর্ণপরিসর। কিন্তু শরৎচন্দ্র এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন যেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এতে পটভূমি বেশ বিস্তীর্ণ, চরিত্রের বা পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অধিক। কাহিনীগুলি যেন উপন্যাসের পক্ষেই বেশি উপযোগী। আবার, কতকগুলি গল্প ক্ষুদ্রায়তন হলেও, এদের অন্তঃপ্রকৃতি খাঁটি ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে না। এগুলি যেন উপন্যাসেরই খসড়া—বিস্তৃত বিশ্লেষণ যুক্ত হলে এরা সহজেই উপন্যাস হয়ে উঠতে পারতো। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘটনার বৈচিত্র্য নয়, ছোটবড়ো চরিত্রের হৃদয়ঘটিত দ্বন্দ্ব, এদের তীব্র অন্তর্বিপ্লব ও সংকটের রূপায়ণ শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্পের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। এরা ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না; চরিত্রগুলির হৃদয়ের তলদেশে যে-আবর্তসংকুল স্রোতোবেগ রয়েছে, এক চরমমুহূর্তে তাকে বাইরে উৎক্ষিপ্ত করে দেয়। সাংকেতিকতা কিংবা আকস্মিকতার চেয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পরিণামের ইঙ্গিতদানই এদের বৈশিষ্ট্য। এইসব গল্পে 'অন্তর্দ্বন্দ্বের লিরিক-বেদনা এক-একটি সংস্থানে পাত্রপাত্রীর [বিশেষ করে নারীর] মুখে বুকের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। কথোপকথনের অবকাশে সেই উক্তিগুলির মধ্যে সমগ্র রচনাব্যাপী ভাববাষ্পের আকাশ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ করে। এইরূপ বিদ্যুৎস্ফুরণের ক্রমিক তীব্রতায় শেষে সেই হৃদয়-ইতিহাস একটা পরিণামের ইঙ্গিত করিয়া সমাপ্তি লাভ করে।' ঔপন্যাসিকের প্রতিভাকে শরৎচন্দ্র ছোটগল্পে নিযুক্ত করেছেন বলেই এরূপ ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের বাস্তব-জীবনবোধ, প্রখর সমাজচেতনা, বহুব্যাপক অভিজ্ঞতাও এইরূপ ঘটবার কারণ বলে মনে হয়। বাস্তবের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যাঁর সতত সঞ্চরণ তাঁর পক্ষে সংকীর্ণ ভূমিতে বিহরণ একটু কঠিন বৈকি।

বাঙালির পারিবারিক জীবনের পরস্পরবিরোধী সংঘাত, হৃদয়মনের বিভিন্ন বৃত্তির বক্রতির্যক গতি, সমাজ ও সংস্কারের কঠিন প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হয়ে নরনারীর প্রাণসত্তার গভীরে যে-সর্বনাশা ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি হয় তার রুদ্ধগর্জনধ্বনি, মূঢ়তার অচলায়তনে আবদ্ধ মানুষের বিকৃত মূর্তি, সামাজিক অসাম্যবৈষম্যজনিত

বহুবিধ অনাচার—এই সমস্তই শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের উপজীব্য। এ ছাড়া, মাতৃস্নেহ ও নারীহৃদয়ের করুণা তাঁর কতকগুলি গল্পকে অমৃতধারায় নিষিক্ত করেছে। এবিষয়ে একজন সমালোচক বলছেন :

'শরৎচন্দ্রের প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরোধের একটা সাধারণ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহাকে কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন —তাঁহার গল্পগুলিতে তথ্যসন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত বিরল, এবং বিশ্লেষণ মনস্তত্ত্ব ও কল্পনাসমৃদ্ধি উভয়দিক দিয়াই মনোজ্ঞ ও রমণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটি আরো তীক্ষ্ণ ও অসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে, কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা পড়ে না। ভাবপ্রকাশের গভীরতাতেও শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি কোথাও কেবল ঘটনাবৈচিত্র্য কিংবা কাব্যসৌন্দর্যের জন্য কোনো দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।'

জীবনের ভালোমন্দ, হাসিকান্না, সুন্দর-কুশ্রী তাঁর গল্পে যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের গল্পে ততখানি নয়। একারণেই মনে হয়, জনচিত্তের ওপর শরৎসাহিত্যের প্রভাবই সমধিক।

শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ভঙ্গিটি মনোজ্ঞ, ভাষা প্রাঞ্জল, ভাষণ প্রায়শ সুমিত, ঘটনানির্বাচনক্ষমতা প্রশংসার্হ। 'মহেশ' গল্পটি শরৎপ্রতিভার এক অতি-উত্তম সৃষ্টি। তা ছাড়া, সতী, মন্দির, অনুরাধা, একাদশী বৈরাগী, দর্পচূর্ণ, মামলার ফল, ছবি, বিলাসী, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি, প্রভৃতি গল্পে শরৎচন্দ্র কম লিপিকুশলতার পরিচয় দেননি।

* *

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যনির্মাণপ্রতিভার পূর্ণতম অভিব্যক্তি তাঁর উপন্যাসগুলিতে—ছোটগল্পে নয়। ছোটগল্পের স্বল্পায়তন পরিধিতে তাঁর সঞ্চরণ যেন বাধাগ্রস্ত। উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অনায়াসগতি, এখানে তাঁর লেখনী নির্বাধ। অনেকগুলি উপন্যাসের নির্মাতা তিনি। এদের মধ্য পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত [চারটি পর্বে সমাপ্ত], গৃহদাহ, দেনাপাওনা, দত্তা, পথের দাবি, বিপ্রদাস, শেষপ্রশ্ন, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, শরৎচন্দ্রের কয়েকটি বই রয়েছে যেগুলি উপন্যাসধর্মী রচনা; কিন্তু উপন্যাসের ব্যপ্তি নেই বলে এদের বড়গল্প বলা হয়ে থাকে, যেমন—বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, পরিণীতা, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, বৈকুণ্ঠের উইল, নিষ্কৃতি, ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে বাঙ্‌লাসাহিত্যে দুজন প্রতিভাধর লেখক উপন্যাসের খাতে লেখনী পরিচালনা করেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথাই বলছি। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্‌লা উপন্যাসের স্রষ্টা। বঙ্কিম বাঙ্‌লা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রবর্তয়িতাই শুধু নন, বঙ্কিমের হাতে এ শিল্পটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতিও লাভ করেছে। প্রধানত অভিজাতসম্প্রদায় ও সমাজের উচ্চস্তরের মানবমানবী বঙ্কিমসাহিত্যে বড়ো একটি স্থান জুড়ে রয়েছে। বঙ্কিমের প্রায় সবগুলি উপন্যাস রোম্যান্সলক্ষণাক্রান্ত। অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ, কল্পনার অবন্ধন বিস্তার, অতীত ইতিহাসের রাজ্যে মানসভ্রমণ, মঙ্গলমুখী আদর্শবাদ বঙ্কিমের উপন্যাসনিচয়ে লক্ষ্য করিবার মতো বস্তু। মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তেমন লক্ষিত হয় না। তুলিকার দুয়েকটা বড়ো আঁচড়ে মানবমনের শক্তিশালী প্রবৃত্তিগুলির আলোছায়ায় খেলাকেই বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন। মনস্তত্ত্বের দীর্ঘায়ত আলোচনা এখানে বিরল। প্রচলিত সমাজনীতির আদর্শকেই বঙ্কিম মেনে নিয়েছেন।

বঙ্কিমের পরেই রবীন্দ্রের অভ্যুদয়। উপন্যাস লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ অভিজাতসম্প্রদায়ের দিকে তাকালেন না, বাঙ্‌লার মধ্যবিত্তসমাজকেই তিনি তাঁর আখ্যানরাজির উপজীব্য করে নিলেন। এদের প্রাত্যহিক জীবনধারার অন্তরালে হৃদয়ের যে-বিচিত্র খেলা চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তার রূপায়ণেই মনোযোগী হলেন। প্রচলিত আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে তিনি মানুষের আচার-আচরণকে বিচার করতে বসেননি, প্রায়-সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়েই সংসারের বাস্তব সত্যের দিকে তাকিয়েছেন। সর্বপ্রকার দুর্বলতাসমেত মানুষকে তিনি সাহিত্যসংসারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। স্বীকার করতেই হয়, বঙ্কিমের তুলনায় রবীন্দ্রবিরচিত উপন্যাসে বাস্তবের প্রতিফলন অপেক্ষাকৃত বেশি। আমাদের কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন—নীতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যতায়, বাস্তবের সহজ স্বীকৃতিতে, সাহিত্যের পাতায় মানুষের প্রবৃত্তি ও হৃদয়দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে।

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র গল্পে-উপন্যাসে রবীন্দ্রপ্রবর্তিত এই ধারারই অনুসারী। রবীন্দ্রানুবর্তন তাঁর রচনায় অতিশয় স্পষ্ট। রবীন্দ্রের লিখিত দুতিনটি উপন্যাস, যেমন—চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে—শরৎচন্দ্রের মনোভঙ্গিকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে। তথাপি, শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা সংশয়াতীত। বাঙ্‌লা উপন্যাসের কথাবস্তুর পরিধিটিকে খুব বেশি না বাড়ালেও, এর মধ্যে যে-পরিবর্তন তিনি আনলেন, এককথায় তা বৈপ্লবিক। তাঁর সমাজজিজ্ঞাসা আরো উগ্র, প্রচলিত অকরুণ সমাজ-

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ প্রবলতর, উচ্চকণ্ঠ। চল্লিশপঞ্চাশ বছর আগেকার বাঙলা-পল্লীসমাজের মূঢ়তা, হৃদয়হীনতা ও কদর্য স্বার্থসর্বস্বতার চেহারাটি শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছেন। আমাদের সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সকলেরই জানা—'সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি না'—এ কণ্ঠস্বর একজন বিদ্রোহীর। এই মনোভাবের জন্যেই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েছেন। নারীর সতীত্বের ধারাণাবিষয়ে তাঁর সঙ্গে পূর্বগামী লেখকদের কারো ধারণার মিল নেই। শরৎচন্দ্রের কাছে নীতিবোধের উৎস ধর্মগ্রন্থের জীর্ণ পাতা নয়। এক্ষেত্রে তিনি মানুষের জীবন্ত হৃদয়ের দিকেই তাকিয়েছেন—মানবিকতা এবং মানবতাই তাঁর কাছে উচ্চতম সত্য। শরৎচন্দ্রের নির্মিত উপন্যাসপাঠে আর কী লাভ হয় জানি না ; জানি যে, এগুলি পড়লে মানুষের হৃদয় চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। মানবমানবীর হৃদয়ের বাসনাবেদনার প্রতি শরৎচন্দ্রের অগাধ সহানুভূতি, তাঁর কাছে মানুষের মূল্য মানুষহিসেবেই। অকুণ্ঠ মানবস্বীকৃতি, মনুষ্যজীবনের নবমূল্যায়ন শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসকে গভীর অর্থবহ করে তুলেছে। বঙ্কিমের ন্যায় বলিষ্ঠ কোনো জীবনদর্শন, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সমুচ্চ কোনো ভাবাদর্শ, শরৎচন্দ্রে অবশ্যই অপ্রাপ্তব্য। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে নরনারীহৃদয়ের যে বিচিত্র আকূতির মর্মস্পর্শী প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, তা অন্যত্র বিরলদৃষ্ট।

বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্রের বড়োগল্প ও উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। তাঁর কতকগুলি আখ্যায়িকায় বাঙালি-পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতের—স্নেহ-ঈর্ষা-স্বার্থবোধকে কেন্দ্র করে বিরোধের—চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যেমন—**বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল**, প্রভৃতি বইতে। দ্বিতীয়ত, কয়েকটি উপন্যাসে সমাজ-অনুমোদিত প্রেমের বিচিত্র লীলা মনোজ্ঞ বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন—**চন্দ্রনাথ, বড়দিদি, কাশীনাথ, স্বামী, বামুনের মেয়ে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই**, প্রভৃতি বইতে। তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে সমাজনিন্দিত প্রেমের আলেখ্য চিত্রিত। দুর্নিবার প্রণয়ানুভব, মানবমনের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অবিবেকী সমাজের হৃদয়হীন কঠোরতা, প্রতিরুদ্ধ প্রেমের অশ্রুসিক্ত কারুণ্য, সামাজিক বিধিবিধানের নিষ্প্রাণ শাসনে পীড়িত নরনারীর প্রাণশক্তির অপচয়ের বেদনাবিজড়িত চিত্র শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র চমৎকার এঁকেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রধান তিনটি উপন্যাস—**চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ**—এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মাধ্যমে উপন্যাসকার যেন বলতে চেয়েছেন, একনিষ্ঠ প্রেম তথাকথিত সতীত্বের চেয়ে বড়ো। নারীজাতির সম্বন্ধে

শরৎচন্দ্র উচ্চধারণা পোষণ করতেন। যেসব রমণী সমাজের চোখে ভ্রষ্টচরিত্র, তাদের মধ্যে তিনি শুভ্রসুন্দর মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন।

'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের বহুআলোচিত একখানি উপন্যাস। এর প্রধান চরিত্র সাবিত্রী, সতীশ, কিরণময়ী, দিবাকর, উপেন্দ্র—প্রভৃতি। এতে নায়কনায়িকা যদি কেউ থাকে তাহলে তারা হলো সতীশ আর সাবিত্রী। শরৎচন্দ্রের কল্পিত আদর্শ-নায়ক ও আদর্শ-নায়িকার বৈশিষ্ট্যগুলি এ-দুটি চরিত্রেই সুপ্রকট। সাবিত্রী ও কিরণময়ীকে অসতী বলতে শরৎচন্দ্র নারাজ। এ দুই নারীর অচরিতার্থ জীবনের বেদনা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সতীশ-সাবিত্রীর মিলনের বাধা তাঁকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে এই বাধার প্রাচীর তিনি ভাঙ্‌তে পারেননি। কিরণময়ীর জীবনপিপাসা তীব্র, কিন্তু সে বঞ্চিত হয়েছে। পরিশেষে সে পাগল হয়ে গেলো। কিরণময়ীর দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব—তার প্রেমার্তি ও ভোগবাসনা—উপন্যাসে সুন্দর ফুটেছে। উপন্যাসহিসেবে 'চরিত্রহীন' অতিশয় বিশিষ্ট, যদিচ ইহার কাহিনীবৃত্ত কিছুটা শিথিলবন্ধ।

আখ্যায়িকাখানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' আর রবীন্দ্রের 'চোখের বালি'র প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। রোম্যান্টিক মেজাজের মানুষ সতীশ এই আখ্যায়িকার ঘটনাধারার নিয়ন্তা। প্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকায় তেমন-কিছু আস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে না। উপেন্দ্রের ভূমিকা ভালো ফোটেনি, অস্পষ্টতা থেকে গেছে। এ বইতে প্রেক্ষণীয় একটি চরিত্র সুরবালা। পাঠক সুরবালাকে কদাপি ভুলবে না।

আরেকখানি বিশিষ্ট আখ্যায়িকা হলো **'গৃহদাহ'**। এখানে নায়ক মহিম, নায়িকা অচলা, প্রতিনায়ক সুরেশ। মহিম ও সুরেশের দ্বৈত আকর্ষণে অচলার চিত্তের দোলাচলবৃত্তি, এবং শেষপর্যন্ত তার জীবনের শোচনীয় পরিণতি, এ উপন্যাসের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়বস্তু। এতে অচলার দেহের অশুদ্ধিকে লেখক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখেছেন। নারী মোহবশে কিংবা সাময়িক ভুলভ্রান্তিতে দাম্পত্যনীতির বিরোধিতা করলেও, অবচেতন মনের স্তরে স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা বিরাজমান থাকে বলে, তার স্বামীপ্রেমের সমাধি রচিত হয় না—এ-ই বোধকরি 'গৃহদাহ' বইটিতে প্রচারিত শরৎচন্দ্রের তত্ত্বকথা। সমালোচ্য উপন্যাসে অচলা ও সুরেশের ভূমিকা সুচিত্রিত, মহিমের ব্যক্তিত্ব অস্পষ্ট, তার আচরণ অস্বাভাবিক—মানবিকতায় সজীব সে নয়।

প্লট-পরিকল্পনায় কিঞ্চিৎ শৈথিল্য লক্ষিত হয়। চরিত্রগুলি কোথাও কোথাও অতিরঞ্জিত। প্রতিনায়ক সুরেশ বড়ো বেশি সেন্টিমেন্টাল—ভাবালুতার আতিরেক সুরেশ-চরিত্রের দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত-প্রকৃতিক হলেও,

রোম্যান্টিক সুরেশ অন্তরে ভালোমানুষ। এইজন্যে, তার স্বেচ্ছাচারিতা নীতিদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও, সুরেশ পাঠকের মমতা আকর্ষণ করে। কেদারবাবুর প্রতি অনেক সময় অযথা ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে। বুঝতে পারি, ব্রাহ্মসমাজকে শরৎচন্দ্র সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেননি। এই সমাজটির সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা কম থাকাতে ব্রাহ্মঘরের নারীপুরুষের চরিত্রচিত্রণে তিনি স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসখানি যে 'গৃহদাহ' রচনার প্রেরণা, লেখক নিজেই তা জানিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রণীত প্রসিদ্ধ একখানি উপন্যাস '**শ্রীকান্ত**'। আত্মস্মৃতি, ভ্রমণকথা, উপন্যাস—'শ্রীকান্ত' নামে আখ্যায়িকাখানি এই ত্রিবর্ণে রঞ্জিত। এর প্রধান আলোচ্য রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের আবাল্যপ্রণয়। দীর্ঘকালের প্রতিরুদ্ধ প্রেম পরিণামে এতে চরিতার্থতা লাভ করেছে। নারীর সংস্কার ও প্রবৃত্তিজীবনের দ্বন্দ্ব আখ্যায়িকাখানিতে চমৎকারভাবে রূপায়িত। দূরবিস্তার জীবনপথে পরিক্রমাকালে শ্রীকান্ত বহু নরনারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন—তাদের কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত মূলকাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে স্ফীতকায় করে তুলেছে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার লিপিচিত্রণে 'শ্রীকান্ত' অতিশয় মনোজ্ঞ। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, অভয়া-চরিত্র শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি—অতি উজ্জ্বল, হৃদয়গ্রাহী এদের জীবনালেখ্য। উপন্যাসের সংহতি না থাকলেও, এতে ধারাবাহিকতা আছে। ভাবের ঐক্য খুব বেশি বিচলিত হয়নি। 'চরিত্রহীন' আখ্যায়িকায় শরৎচন্দ্রের ভাবজীবনের, ও 'শ্রীকান্ত' আখ্যায়িকায় তাঁর বাস্তবজীবনের, প্রতিফলন লক্ষ্য করবার বস্তু। ইন্দ্রনাথ-চরিত্র উপন্যাসকারের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

'**দেবদাস**', '**দত্তা**', '**দেনাপাওনা**', ইত্যাদি আখ্যায়িকার সঙ্গে সকলেই কমবেশি পরিচিত। শরৎচন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এগুলিতেও প্রাপ্তব্য। দেবদাস-পার্বতীর কাহিনী কারুণ্যসিক্ত। এই আখ্যায়িকার কাহিনীতে বঙ্কিমের দুখানি উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। 'দেবদাস'-এ 'সেন্টিমেন্টালিজম্'-এর প্রাবল্য। রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা 'দত্তা'-য় রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর চরিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্রের লিপিকুশলতার প্রস্ফুট পরিচয় মেলে। 'দেনাপাওনা'-র ষোড়শী [অলকা] অভিনব একটি চরিত্র। বাস্তব এবং কল্পনা 'দেনাপাওনা'-য় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ষোড়শী-চরিত্র অনেকখানি বাস্তবভিত্তিক, সন্দেহ নেই।

বাঙ্‌লাদেশের বিপ্লব-আন্দোলন '**পথের দাবি**' আখ্যায়িকাখানির পটভূমি। এ বইয়ের সব্যসাচী-চরিত্র পাঠকের চিত্তে গাঢ় ছাপ এঁকে দেয়। বিপ্লবের উত্তেজনা-

জড়িত আখ্যানের মূলধারার সঙ্গে একটি প্রেমকাহিনী এসে মিশেছে। বিপ্লবপন্থাকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ যেমন সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেননি, তেমনি, শরৎচন্দ্র।

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে কল্পনার রসাবেশকে অতিক্রম করে গেছে লেখকের বিচিত্র ভাবনা-চিন্তা। উদ্দেশ্যমূলক রচনা 'শেষ প্রশ্ন'। সুগ্রথিত কাহিনী বলতে যা বুঝি, এখানে তার অভাব।

'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে'—এ তিনখানি আখ্যায়িকা পাঠকেব সমাদর পেয়েছে। সমাজচিত্র থাকলেও, এগুলিকে, বোধ করি, পারিবাবিক উপন্যাস বলাই সংগত। পল্লীবাঙ্‌লার সমাজ এখানে পটভূমি-হিসেবে স্থান পেয়েছে। 'পল্লীসমাজ'-এ বমা-রমেশের প্রেমকথাই মুখ্যস্থান অধিকার কবেছে। শরৎসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ হলো।

॥ বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

[১৮৬১-১৯৪১]

রবীন্দ্রপ্রতিভা-প্রসঙ্গে ঃ

যতই সাবধানী হোন, যে-কোনো লেখকের পক্ষে, রবীন্দ্রালোচনায়, অতিভাষণ এড়িয়ে চলা অত্যন্ত কঠিন। এই মহাকবির দুর্লভ দৈবী প্রতিভার বহুবিচিত্র প্রকাশ আমাদের একেবারে অভিভূত করে দেয়। তাঁর নির্মিত সাহিত্যের বিশাল অরণ্য-প্রদেশে প্রবেশ করলে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হই। বাক্‌পতি রবীন্দ্রের সৃজনীপ্রতিভা বিচিত্রমুখী। সাহিত্য ও জীবনের প্রায়-সকল ভূমিতে অবলীলায় বিচরণ করেছেন বলে মহাপ্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একরূপ সর্বত্রগামী। এতখানি শক্তিমান কাব্য-নির্মাতা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও দুচারজনের বেশি নেই, এমন একটি কথা বললে ভুল করা হয় না। অতন্দ্রিত সাধনায় কবি-রবীন্দ্র বাণীকে স্ববশে এনেছিলেন। তাঁর পরমাশ্চর্য বাগবিভূতি বঙ্গসরস্বতীকে অপরূপ কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে, ভাষা-ছন্দ ও সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। পদ্যে ও গদ্যে যে-কীর্তি তিনি রেখে গেছেন, তা শুধু আমাদের সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যে অসংশয়িতভাবে অদৃষ্টপূর্ব। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ সকল কালের সকল দেশের বিপুল এক বিস্ময়। রচনার এমন কোনো রূপ নেই যা তাঁর লেখনীর

স্পর্শের বাইরে থেকে গেছে; এবং কী গদ্যে কী পদ্যে, ভাবের যে-অফুরন্ত রূপসৃষ্টি তিনি করেছেন, তার প্রত্যেকটি রীতি বা ভঙ্গি অসাধারণ নতুনতায় দীপ্তিমান। সৃষ্টির এত প্রাচুর্য, রূপভঙ্গিমার এত বৈচিত্র্য যখন দেখি, তখন মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, এসব বস্তু একজন মানুষেরই একক সাধনার ফলসিদ্ধি। ব্যক্তি-বিশেষের রচনায় এহেন বিশালতা ও বিচিত্রতা সত্যই অকল্পনীয়।

রবীন্দ্রনাথ কী কী লিখেছেন, এ প্রশ্ন না করে, জিজ্ঞাসা করা উচিত, কী তিনি লেখেননি। একটু আগেই বলেছি, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অবারিত প্রবেশাধিকার। গদ্যে তিনি লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা, কথিকা, ভ্রমণকথা, পত্রাবলী, গদ্যকবিতা, ইত্যাদি; পদ্যে তিনি লিখেছেন গীতিকবিতা। এক অঙ্গে কত রূপ ধরে, এ যদি কেউ দেখতে চান তবে তাঁকে রবীন্দ্রের গীতিকবিতার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরতে বলি। আবার, পদ্য-বাণীতেই কবি লিখেছেন গাথা, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, নাটক আর অসংখ্য গান— যে-গানের কথা ও সুরের মোহিনী মূর্ছনা শ্রোতার চিত্তকে সৌন্দর্যচেতনার এক সুরম্য ভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু গীতিকার নন, সুরকারও বটেন। তা ছাড়া, স্বতন্ত্র এক গীতিরীতিরও [style] প্রবর্তন করে গেছেন তিনি।

রবীন্দ্রপরিচিতির ইতি টানা এখনো হয়নি। আরো বহুক্ষেত্রে তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ চিত্রী ও নৃত্যশিল্পবিৎ। তিনি দার্শনিক, প্রজ্ঞাবান পুরুষ। তিনি শিক্ষাব্রতী, সংস্কারক ও জননায়ক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষীদের সঙ্গে তিনি সর্বদা ভাব ও চিন্তার বিনিময় করেছেন। কেবল রসক্ষেত্রেই তাঁর বিহরণ ছিল না, সংসারের বিচিত্র কর্মের ক্ষেত্রেও কবি নিজ শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে তিনি সাড়া দিয়েছেন, দেশের সংগঠনমূলক কাজে যত্নবান হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘায়ত জীবনে কর্মে নিষ্ঠা আর রসোচ্ছল উপলব্ধির মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ কখনো দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ভাবনার জগতে যেমন মহত্তর সমন্বয়ের প্রয়াসী, তেমনি, কর্মজীবন ও সাহিত্যিক-জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের একান্ত অভিলাষী। কবি পূর্ণায়ত মনুষ্যত্বের সাধনা করেছিলেন। তাই, শুধু সাহিত্যচর্চাকেই নিজ আত্মার একতম আরামস্থল বলে জানেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা কেবল মহৎ একজন কবিরূপেই পাইনি, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতায়-ভরা আমাদের জীবনের মাঝখানে তিনি ছিলেন পূর্ণতর মানবতার জ্যোতির্ময় বিগ্রহ। স্বর্গে-মর্তে চলাচলের সোনার সিঁড়ি রচনা করেছিলেন তিনি।

দৈবী প্রেরণা ও প্রতিভার আধার এমন একজন মহিমান্বিত পুরুষকে পেয়ে আমরা—বাঙালিরা—নিজেদের ধন্য মনে করি।

*　　　*

*

বাঙ্‌লা সাহিত্যে রবীন্দ্রের দানের পরিমাপ হয় না। আমাদের সাহিত্যকে রূপে-রসে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, শুধু এটুকু বললে খুব সামান্যই বলা হয়—রবীন্দ্র-কবির লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে বাঙ্‌লাসাহিত্য হাজার বছরের পরমায়ু লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্যিক-জীবনের প্রধানতম পুরুষ তিনি।

রবীন্দ্রপ্রতিভার সবচেয়ে বড়ো প্রকাশস্থল কাব্য-কবিতা। রবীন্দ্রের প্রথম ও শেষ পরিচয় তিনি কবি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, কবিতা তাঁর 'জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান'। রবীন্দ্রসাহিত্যের যে বিপুল পরিধি, তার সর্বত্রই একই কবিসত্তার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সূক্ষ্ম কাব্যব্যঞ্জনার ঝংকার শ্রুতিগোচর হয়। গীতিকবিতার বিপুল উন্মুক্ত নভোদেশে এই সৌরলোকের অগ্নিবিহঙ্গের নির্বাধ পক্ষবিস্তার। জগৎ ও জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে মানবচিত্তে যতপ্রকার ভাবের উদয় হয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যতসব অনুভূতির কম্পন জাগে, রবীন্দ্রনাথের সপ্তস্বরা কাব্যতন্ত্রীতে তা অপূর্ব রাগিণীর সুরমূর্ছনার মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যে একটা নতুন অর্থ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের কবি—প্রকৃতির কবি। 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা', 'বহু দিবসের সুখেদুখে আঁকা', 'লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা' এই যে 'সুন্দর ধরাতল', তাতে আসন পেতে কবি মর্তভূমির প্রাণের গান গেয়েছেন। অতিনিবিড় প্রকৃতিপ্রেম ও অগাধ মানবপ্রীতি আমাদের মহাকবির নির্মিত বিপুল কাব্যলোকটিকে অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। এই মাটির পৃথিবীর দিকে দিকে রূপে-রসে-শব্দে-গন্ধে-বর্ণে যে-অফুরন্ত প্রাণময়তার দীপ্ত সমারোহ চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তারই অদ্বিতীয় কাব্যকার। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'—এ দুটি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর—অনিঃশেষ মর্তমমতা ও নিত্যজাগ্রত মানবমুখিতা—গুঞ্জিত হয়েছে। জগৎকে ভালোবেসেছেন, মানুষকে প্রীতির আলিঙ্গন জানিয়েছেন, প্রেমপাশে বেঁধেছেন—নিজের কাব্য-কবিতায় এসব কথা কবি বারংবার আমাদের শুনিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক কবি। তাঁর চোখে নিসর্গপ্রকৃতি জীবন্ত একটি সত্তা। এই সজীব সত্তার সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা—তারো চেয়ে বেশি, নিজের একাত্মতা—অনুভব করেন। নিগূঢ় প্রকৃতিপ্রেম বা অসাধারণ পৃথিবীপ্রীতিই রবি-কবির সর্বানুভূতি অর্থাৎ বিশ্বৈক্যানুভূতির মূল উৎস। প্রবল রোম্যান্টিক কল্পনা কবিকে সুদূরের অভিলাষী করেছে, এক মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, রহস্যসন্ধানী করে তুলেছে। সৌন্দর্যবিধুরতা, নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা, অকারণ বিরহবিষাদ—অসংখ্য গীতিকবিতায় প্রতিফলিত এসকল বস্তুও রবীন্দ্রের রোম্যান্টিক কবিমনের পরিচয়বাহী।

কী ব্যক্তিজীবনে, কী কাব্যজীবনে, রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম-প্রকৃতিক। কবির অরূপচেতনা ও অরূপব্যকুলতার সঙ্গে তাঁর এই আধ্যাত্মিক মানসিকতার সংযোগ রয়েছে। তা ছাড়া, কবির নিসর্গচেতনাও এর সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রের অনুভূত অরূপ বা বিশ্বলোকেশ্বর প্রায়শ নিসর্গলোকবিহারী, যদিচ মানবসংসারেও অরূপের নিঃশব্দ পদসঞ্চার তিনি শুনতে পেয়েছেন। তবে, একথা ভুললে চলবে না যে, অরূপসাধনা কবিকে জীবনবিমুখ করে তোলেনি, বরংচ তাঁকে জীবনপ্রেমিক করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঈশ্বরমুখিতা আছে, অজানার সন্ধান আছে, ভূমাপিপাসা আছে। কিন্তু তাঁর সর্বপ্রকার সন্ধান ও সাধনার পাদপীঠ হলো জগৎ ও জীবন। জীবনরসরসিকতাই কবি-রবীন্দ্রের কবিতাবলীর প্রাণকেন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে নির্মাণ করেছেন এক অত্যুচ্চ ভাবলোক—সর্ববিধ সংকীর্ণতার স্পর্শ থেকে যা মুক্ত ; জাতি, দেশ ও কালের উর্ধ্বে যার অবস্থিতি, নির্মল আনন্দধারায় যা অভিষিক্ত। রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশাল ভাবলোকে প্রবেশ করলে পাঠক চিত্তোৎকর্ষের অধিকারী হয়, একরকম মুক্তির স্বাদ পায়—স্থূল জৈব জীবনের—ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার—বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি। সুতরাং বলতে পারি, রবীন্দ্রকাব্যপাঠের ফলশ্রুতি হলো জীবন্মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথকে গীতিকবি বললে তাঁর প্রতিভার স্বরূপটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয় না। কবির কাব্যের মূল প্রেরণাই সংগীতাত্মক, প্রাণের সুরকে তিনি গীতময় বাণীর মাধ্যমে ফুটিয়েছেন। কবির সমগ্র কাব্য অনবচ্ছিন্ন এক গীতধারা, সংগীতরসে তা নিষিক্ত। কতশত ভাব ও ভাবনা অহরহ আমাদের মনে জাগে, এদের আমরা প্রকাশ করতে পারি না। ভাবকে বাণীরূপ দেবার শক্তি অধিকাংশ লোকেরই থাকে না। তাই, আমরা সকলে প্রকাশব্যাকুল। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের

এই প্রকাশব্যথা কী পরিমাণে যে দূর করেছেন, ভাষায় তা বুঝিয়ে বলা কঠিন। কবিসত্তম রবীন্দ্র নিজেই তো বলেছেন :

না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে—
মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর ॥

রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'না-বলা বাণী'কে কবিতায় গেঁথেছেন, বাঙালির ভাষাকে আশ্চর্য প্রকাশক্ষমতা দান করেছেন, অনির্বচনীয়কে বচনগ্রাহ্য করে তুলেছেন। কবিহিসেবে এর চেয়ে আর বেশি কা তিনি করতে পারেন! রবীন্দ্রানুরাগী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলতে পারি : 'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।'

রবীন্দ্রনাথের গীতাত্মক প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর গানগুলিতে। গানের মধ্যে নিজের কবিসত্তাকে তিনি একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজা, সুরের গুরু। সারাজীবন ধরে কবি এত বিচিত্র গান লিখেছেন যে, পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। তাঁর গানের বিশিষ্টতা হলো, এগুলির মধ্যে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। ভাবব্যঞ্জনায়, ভাষার জাদুতে, চিত্তচমৎকারী সুরময়তায় রবীন্দ্রসংগীত এক আশ্চর্য সৃষ্টি। অন্যকিছু না লিখে, কবি যদি শুধু এই অমৃতসম্পদগুলো রেখে যেতেন, তাতেও তিনি অমর হয়ে থাকতেন। একদা সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

যে-ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলই আছে—

—রবীন্দ্রের কাব্য-কবিতা ও গান সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য কথা আর-কিছু হতে পারে না।

শুধু কবিতা ও গানের ভূমিতে রবীন্দ্রের বিচরণ সীমিত নয়, ছোটগল্প-নির্মাণেও তিনি অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর

অভিনব শিল্পকর্মের প্রবর্তক। এদেশে য়ুরোপীয় আদর্শের ছোটগল্প ছিল না, কবির সৃষ্টিক্রিয়াশীল প্রতিভা আমাদের এ অভাবটি পূরণ করলো। রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে অসংখ্য উৎকৃষ্ট ছোটগল্প বেরিয়েছে,—গভীর কবিদৃষ্টি ও অনবদ্য বাণীসুষমায় এ দেশীয় সাহিত্যে এগুলির তুলনা নেই। বাঙালি-জীবনের ক্ষুদ্রপরিসর গণ্ডির মধ্যে ছোট সুখদুঃখ, হাসিকান্নার যে-স্রোতোরেখাটি ফল্গুর ন্যায় অলক্ষ্যে প্রবাহিত, তার স্পন্দনটি কবি তুলে ধরেছেন স্বকৃত ছোটগল্পমালায়। লিরিকের স্পর্শ থাকলেও, মধ্যবিত্ত-বাঙালির জীবনের উত্তাপ এদের মধ্যে অনুভব করা যায়। যতখানি সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এখানে বাস্তবের মাটিতে পা ফেলে চলেছেন। মানবরস ও প্রকৃতিরস এসব গল্পে যুক্তবেণী রচনা করেছে। 'গল্পগুচ্ছ' রবীন্দ্র-কবির প্রকাণ্ড এক কীর্তি।

আমাদের উপন্যাসসাহিত্যকেও রবীন্দ্রনাথ কম সমৃদ্ধ করেননি। বাঙ্‌লা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের বিচরিত ভূমিতেই যদিও রবীন্দ্রের পদপাত, তথাপি, নিজের প্রতিভার শক্তিতে কবি একটি নতুন পথ কেটে এগিয়ে গেছেন। বাইরের ঘটনার ওপর জোর না দিয়ে, পাত্রপাত্রীর হৃদয়সংঘাত এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকেই রবীন্দ্রনাথ আপনার লেখা উপন্যাসগুলিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' বাঙ্‌লা উপন্যাসের দিক্‌পরিবর্তন সূচিত করলো। এ বইতে কবির আধুনিক মনের পরিচয় সুপ্রকট। সমাজের হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে তা লেখকের অজানা ছিল না, যুগের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। দুয়েকখানি উপন্যাসে লেখক অভিনব আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন—'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে'। 'গোরা'র মতো মহৎ উপন্যাস বাঙ্‌লা সাহিত্যে অদ্যাবধি লেখা হয়নি। 'শেষের কবিতা', এককথায়, গদ্যলিরিক। কাব্যসুরভিত ভাষাভঙ্গিমা একে উজ্জ্বলঃবিশিষ্টতা দিয়েছে। রবীন্দ্রের উপন্যাস শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পথটি প্রশস্ত করে তুলেছে। কবির লিখিত আখ্যায়িকাগুলি অবশ্যই ভাবধর্মী, কিন্তু তাই বলে এদের বাস্তবের সম্পর্কচ্যুত বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বাস্তব তার কিছুটা তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে লেখকের ঊর্ধ্বমুখী ভাবনা-কল্পনার জন্যে। সে-যা হোক, উপন্যাসের এলাকায় রবীন্দ্রনাথ যে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত, এতে সংশয়প্রকাশের অবকাশ নেই।

নাটক-রচনাতেও কবির কৃতিত্ব কম নয়। এক্ষেত্রে অসামান্য গৌরবের অধিকারী অবশ্য তিনি নন। তথাপি, তাঁর নাট্যনির্মণাপ্রতিভাকে স্বীকৃতি জানাতে

হয়। প্রথমের দিকের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি এক স্বতন্ত্র পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন। এই পন্থাটি অর্থাৎ নাটকের এই অভিনব রূপরীতিটি তাঁর অপূর্ব লিরিক-কল্পনার উপযোগী। আমরা রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাট্যগুলির কথাই বলছি। গীতিকবি নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ বলে রবীন্দ্রনাট্যকৃতি কাব্যের গা ঘেঁষে চলেছে। এদের গীতিধর্মী নাটক [Lyrical Drama] বা নাটকের আকারে কাব্য বলা যেতে পারে। প্রচলিত আদর্শের নাটকে আমরা বহির্ঘটনার সংঘাত দেখি। কিন্তু রবীন্দ্রনাট্যের দ্বন্দ্ব অন্তর্জীবনের—আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, ভাবের সঙ্গে ভাবের দ্বন্দ্বকেই কবি নাটকে প্রতিফলিত করেন। এখানে পাত্রপাত্রী মানবমানবীর হৃদয় ও মন, বাইরের প্রেক্ষাগৃহে এদের অভিনয় হলেও এর আসল রঙ্গমঞ্চ হলো মানুষের মনোলোকে। এই অতিমাত্রিক ভাবধর্মিতার জন্যে রবীন্দ্রের নাটকগুলি এদেশে তেমন মঞ্চসাফল্য অর্জন করেনি। সাহিত্যরসিকেরাই কবির লেখা নাটকগুলিকে সমাদর দেখান। সাধারণ স্তরের দর্শক আর পাঠক এজাতীয় নাট্যকর্মের রস উপভোগ করতে পারেন না। নানা ধরণের নাটক কবি রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর সর্বাধিক মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে। সাধারণ নাটকের পর্যায়ে পড়ে না বলে স্বতন্ত্রভাবেই এদের আলোচনা বিধেয়।

রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও মনস্বিতার অপর-এক উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর বিপুলায়তন প্রবন্ধসাহিত্য। কবির গভীর মনন, নানামুখী ভাব ও ভাবনা, দার্শনিকসুলভ বহুবিচিত্র জিজ্ঞাসা এদের অতিশয় মূল্যবান সামগ্রী করে তুলেছে। রবীন্দ্রপ্রবন্ধমালার বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে—সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা. ভাষাতত্ত্ব—কোনোকিছুই তাঁর ভাবুকতার বিশাল পরিধি থেকে বাদ পড়েনি। এ ছাড়া, রয়েছে তাঁর 'ভ্রমণকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, ইত্যাদি গদ্যরচনা। ব্যাপক অর্থে এদেরকেও প্রবন্ধসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রবন্ধ বস্তুটি সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের যে ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তা বদলে দিয়েছেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধমালা যুক্তিপরম্পরার মাধ্যমে সত্যবিশেষের প্রতিপাদন মাত্র নয়। কোথাও কোথাও বিষয়গৌরবী, তথ্যনিষ্ঠ হলেও, সেখানেও সাহিত্যের স্বাদযুক্ত। লেখনভঙ্গির চারুতা, মননের বিচিত্রতা ও গভীরতা কবির প্রবন্ধনিচয়কে এক অপূর্ব সামগ্রী করে তুলেছে। তথ্য যখন রসের স্পর্শ পায়, সত্য যখন

মাধুর্যসিক্ত হয়, তখন তা যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। রবীন্দ্রবিরচিত প্রবন্ধও একজাতের মনোরম সাহিত্য।

রবীন্দ্রের কতকগুলি প্রবন্ধে বিষয়েরই প্রাধান্য, এখানে বক্তব্যই বড়ো। আবার, একশ্রেণীর প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলিতে কবির ব্যক্তিক অনুভূতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। কবিত্বে, কল্পনায়, সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভবের সৌকুমার্যে এই শ্রেণীর রচনা বিশিষ্ট শিল্পমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। কোনো সমস্যার অবতারণা নয়, উপদেশনা নয়, তত্ত্বপ্রচারণা নয়—আনন্দসৃষ্টিই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এধরণের গন্ধবাহিত রচনা আমাদের সাহিত্যে আগে ছিল না, এ রবীন্দ্রনাথের নতুন সংযোজন।

কবি-নাট্যকার-গল্পলেখক-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রের সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় আছে। কিন্তু প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথকে খুব কম লোকেই জানেন। এরূপ একটি অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রবন্ধসাহিত্যকে বাদ দিলে রবীন্দ্ররচনার এক-চতুর্থাংশ বাদ পড়ে। কেবল তাই নয়, কবির বহুমুখী চিন্তার অমূল্য সম্পদ এর মধ্যে নিহিত আছে—রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে হলে তাঁর বিপুল প্রবন্ধসাহিত্যও ভালো করে পড়া দরকার। এখানে বলি, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধলেখকদের মধ্যেও তাঁর স্থান অতিউচ্চে।

॥ শ্রীরবীন্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ॥

কাব্য-কবিতা ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিকৃতির বিশালতা, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়াবহ। পঁয়ষট্টি বছরেরও অধিককাল ধরে কাব্য-কবিতায় যে-শিল্পলোক তিনি নির্মাণ করেছেন, অতন্দ্র সাধনায় যে-আশ্চর্য বাণীজগৎ তিনি গড়ে তুলেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলনা নেই বললে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না। কবি হাতে লেখনী ধারণ করেন তাঁর প্রথম-কৈশোরে ; আর, সেই লেখনীর অনবচ্ছিন্ন গতি স্তব্ধ হয় একাশি বৎসর বয়সে—মৃত্যুলগ্নের প্রাক্কালে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, বার্ধক্য কবির দেহকে জীর্ণ করেছে, কিন্তু তাঁর মনের সজীবতা, কল্পনার সরসতা ও প্রজ্ঞা-দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে ম্লান করতে পারেনি।

রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিণামমুখী। বিচিত্র ভাবানুভূতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ অতিশয় বিশিষ্ট একটা পরিণামে গিয়ে পৌঁছেচে। এরূপ এক-একটা অভিজ্ঞতার স্তরকে আমরা রবীন্দ্রের দীর্ঘায়ত কবিজীবনের এক-একটি পর্ব বা পর্যায়

নামে চিহ্নিত করতে পারি। প্রত্যেকটি পর্বে কবিচিত্তকে একটি বিশেষ ভাবপ্রেরণার বশীভূত দেখতে পাওয়া যায়, এবং সেই প্রেরণাবশেই কবির গীতময় আত্মপ্রকাশ ঘটে। নিঃশেষে আত্মোন্মোচনের পর এই প্রেরণার প্রভাব যখন ক্ষীণতর হয়ে আসে, কবি তখন ভিন্নতর একটা ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেন—আরম্ভ হয় নবতন সৃষ্টিধারা। এইভাবে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রকবিস্বভাবের লক্ষণীয় ধর্ম হলো এর বিরামহীন গতিশীলতা—ভাব থেকে ভাবান্তরে, এক উপলব্ধি থেকে অপর এক উপলব্ধির জগতে, নিরন্তর অগ্রসরণ। একারণে কোনো-একটা বিশেষ পর্বভুক্ত রচনাবলীর মধ্যে কবির সৃষ্টিপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে না। রবীন্দ্রকাব্যের মহিমা এর সমগ্রতায়—যেমন, বিরাট বনস্পতির।

সাধারণভাবে বলতে গেলে **'সন্ধ্যাসংগীত'** থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার শুরু। গ্রন্থখানি কবির উনিশ বৎসর বয়সে লেখা। বলা বাহুল্য, উক্ত গ্রন্থটি কবির লিখিত প্রথম কাব্য নয়। ইতঃপূর্বে অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন— **'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'**, ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসে এইসব রচনা একারণে উল্লেখ্য নয় যে, এগুলির মধ্যে কবির প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় তেমন ফোটেনি। এগুলিকে সাহিত্যসংসারে রবীন্দ্রের হাতেখড়ির কাজ বলা যেতে পারে। এসব লেখায় ভাবাকুলতা ও ভাবালুতা আছে, তার বেশি-কিছু নয়। কবিকিশোরের উক্ত-সব বই শিশুর স্খলিত পদের অস্থির চলনের চিত্রটি মনে পড়িয়ে দেয়। অবশ্য এও স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের রচনায় তাঁর কবিদৃষ্টি ও মনের চমকপ্রদ বিকাশের পরিচয় মুদ্রিত রয়েছে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে ছন্দোনির্মাণে ও ভাষাবিন্যাসে কবি যে-কুশলতা দেখিয়েছেন, কাব্যরসিকেরা তার প্রশংসা না করে পারবেন না। রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁদের কাছে ওপরে কথিত গ্রন্থগুলি উপেক্ষণীয় নয়।

সে যাক্। রবীন্দ্রনাথ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এ। এতে দেখতে পাওয়া যায়, লেখকের বলবার ভঙ্গিতে স্বকীয়তা ফুটেছে, ভাষা ও ছন্দোরীতিতে নিজস্বতার ছাপ পড়েছে, ভাষণ 'গদ্‌গদ' হলেও, তা যে এক বিশেষ কবিব্যক্তির এ বুঝতে কষ্ট হয় না। সন্ধ্যাপ্রকৃতির আলোআঁধারি প্রকাশের মধ্যে যে-একটা বিষাদের ভাব পরিব্যক্ত হয়, 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর সুরে সেই ভাবেরই প্রাধান্য। কেমন যেন একটা অনির্দেশ্য বিষণ্ণতার বেদনা কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করে

তুলেছে, এখন কবির অবস্থান রুদ্ধ হৃদয়াবেগের কারাগারে। এই যে অনির্বাচ্য বিষাদবেদনা, তার মূলীভূত কারণ হলো বহির্জগতের সঙ্গে কবিচিত্তের যোগের অভাব। কবি প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চান, মানবসংসারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রচনা করতে উৎসুক; অথচ রুদ্ধদ্বার মনের কারাগৃহ ভেঙে বাইরে কিছুতেই ছুটে আসতে পারছেন না। তাই, হৃদয়দেশে ব্যর্থতাবোধের পীড়ন ও অসুস্থ বিষণ্ণতা।

'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পর **'প্রভাতসংগীত'**—আঁধারের আস্তরণ সরে যাওয়ার পর রৌদ্রঝলমল প্রভাতের আত্মউন্মোচন। অন্তর্নিহিত এক রহস্যময় শক্তির বলে কবি বিষাদের ঘোর কাটিয়ে উঠলেন, বহির্জগৎকে নিজের প্রাণলোকে আহ্বান করলেন, নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টি হয়ে গেলো যেন। এখানেই রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বৈক্যানুভূতির সূত্রপাত—প্রকৃতি ও মানবকে প্রীতিনিবেদন, নিখিল সংসারকে আত্মার আত্মীয় বলে অনুভব করা। আপনারা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'প্রভাত-উৎসব', ইত্যাদি কবিতার কথা স্মরণ করুন, আর কান পেতে শুনুন প্রকৃতিতান্ত্রিক কবির প্রাণোচ্ছল আত্মঘোষণার গান। 'প্রভাতসংগীত'-কে রবীন্দ্রের অন্তরতর কবি-সত্তার প্রথম জাগরণের কাব্য বলা যেতে পারে। হঠাৎ-মুক্তির উল্লাসে কবিপ্রাণ অধীর—একটা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল মানসিক অবস্থার রচনা এই কাব্যখানি।

এর পর কবি লিখলেন **'ছবি ও গান'**। বহির্বিশ্বের ছবি ও অন্তরলোকের গান এ কাব্যে সংগ্রথিত হয়েছে। এতে দেখি, কবির হৃদয়ে প্রশান্তি নেমেছে, প্রাণের অনির্দিষ্ট আশাআকাঙ্ক্ষা একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে চাইছে। প্রথমযৌবনের কাব্য বলে সৌন্দর্যবিভোরতা, উদ্বেল ভাবপ্রবণতা, প্রণয়বাসনার তীব্রতা এই বইয়ের বহুতর কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে। এখন প্রকৃতির সংসার ও মানবসংসার কবির আরো কাছে এসেছে, মানবের 'জীবন্ত হৃদয়'-মাঝে স্থান পাওয়াকে কবি সৌভাগ্য বলে মনে করছেন। কথায় তিনি ছবি আঁকছেন, গান গাইছেন, কিন্তু নিপুণ শিল্পরচনকৌশল এখনো কবির আয়ত্তের বাইরে। তাঁর পাকা-হাতের লেখার জন্যে আরো-কিছুকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

পরবর্তী কাব্য **'কড়ি ও কোমল'** অনেক বেশি পরিণত মনের রচনা। রবীন্দ্রনাথ যে কতবড়ো সৌন্দর্যরসিক, কতবড়ো রূপতান্ত্রিক তিনি, তার কিছুটা পরিচয় এ কাব্যে মিলবে। এতে কবি যে-বাণীভঙ্গিতে, যে-সুরে নারীর রূপসৌন্দর্যের আরতিবন্দনা করেছেন, বাঙ্‌লা গীতিকাব্যে তার তুলনা নেই। এ সময় মৃত্যুর রহস্যও কবির মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত হৃদয়যন্ত্রণা

কবিকে যে কতখানি বিচলিত করেছে, পাঠক কাব্যখানি থেকে তার কথঞ্চিৎ পরিচয় সংগ্রহ করতে পারবেন। জীবনরঙ্গভূমিতে মরণের চকিত আবির্ভাব কবির আনন্দানুভবের 'কড়ি'র মধ্যে বেদনার 'কোমল' মিশিয়ে দিল। এখানেই রবীন্দ্রকবির মৃত্যুদর্শনের সূত্রপাত। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির তুলনায় 'কড়ি ও কোমল' অপেক্ষাকৃত উন্নত রচনা হলেও, রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণবিকাশের স্বাক্ষর এতে নেই।

অতঃপর **'মানসী'** প্রকাশিত হলো। 'মানসী' কবির সৃজনীশক্তির প্রায় পূর্ণ-জাগরণের পরিচয় বহন করছে। শ্রীরবীন্দ্রের কাব্যভাবনার বিচিত্রতার মধ্যেও এমন কতকগুলি বস্তু রয়েছে যেগুলিকে তাঁর কাব্যের মূলভাবগ্রন্থি বলা যেতে পারে। এদের কয়েকটি 'মানসী'তে সুপ্রকট, বাকি কয়েকটি অর্ধ-উন্মীলিত। এদিক থেকে বিচার করলে কাব্যখানির অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মানবীয় প্রেম ও প্রকৃতিসম্ভোগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, সৌন্দর্যব্যাকুলতা, এক দুর্নিরীক্ষ্য সত্তাকে উপলব্ধির সীমায় ধরবার আকুল আগ্রহ, পার্থিব জীবনের সুখানুভবের মধ্যে থেকেও এক অনির্ণেয় অভাববোধ—এসমস্তই মোটামুটি 'মানসী'-র কবিতাগুচ্ছের আশ্রিত বিষয়বস্তু। এ কাব্যে কবির প্রকৃতিপরিচয় স্পষ্টত গভীরতর হয়েছে, মানবহৃদয় নিসর্গপ্রকৃতির অন্তঃপুরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এতে নিসর্গবিষয়ে রবীন্দ্রের একটি বিশিষ্ট প্রত্যয় সুপরিব্যক্ত। এই প্রত্যয়টি হলো—প্রকৃতি চেতনাময়ী, স্নেহময়ী—মনোমদ সৌন্দর্যের যবনিকার অন্তরালে তার প্রাণোদ্বেল সত্তাটি সতত স্পন্দমান। বসুন্ধরার সঙ্গে আত্মীয়তাস্থাপনের বাসনা, অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের পশ্চাতে ধাবমান কবিচিত্তের আর্তি 'মানসী'কে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কাব্যখানি ছন্দসম্পদেও সমৃদ্ধ। এখানে রবীন্দ্রকবিজীবনের একটি পর্বের শেষ।

'সোনার তরী'-কে নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের শুরু।

'সোনার তরী'-র কবিতাগুলি লিখবার কালে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরে বাস করছিলেন। এই পদ্মাবাসকালেই কবি প্রকৃতির নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিলেন, পল্লীবাঙ্‌লার লোকসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পদ্মার আতিথ্যগ্রহণ কবির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। নিসর্গসৌন্দর্যের স্বপ্নলোক আর মর্তজীবনের সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার বাস্তব রূপচ্ছবি—'সোনার তরী'-তে উভয়েরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, একদিকে, নিসর্গপ্রকৃতিরসে নিমগ্ন, সৌন্দর্যের সন্ধানী, 'সুদূরের পিয়াসী'; অন্যদিকে, মানবজীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ অতিশয় প্রবল। সৌন্দর্যতৃষ্ণার সঙ্গে

জীবনপিপাসা মিশে গিয়ে এখানে দুটি বিপরীতমুখী মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। মর্তপ্রীতিবিহ্বলতা কবিকে ঘরের দিকে টানে; সৌন্দর্যবিধুরতা তাঁকে এক অবাস্তবমনোহর স্বপ্নলোকের দিকে আকর্ষণ করে। স্বপ্ন ও বাস্তবের টানাপোড়েনে 'সোনার তরী'র কাব্যকায়া গঠিত। মানবসংসার ও প্রকৃতির সংসারে প্রবেশ করে কবি যে-অমেয় মাধুর্য-সৌন্দর্য আহরণ করছেন, বর্তমান কাব্যখানির প্রত্যেকটি কবিতার বাণীদেহ থেকে তা বিচ্ছুরিত হয়ে পাঠকচিত্তকে অভিষিক্ত করে। 'সোনার তরী'র স্বর্ণতটে সমুত্তীর্ণ রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভা পূর্ণ-বিকশিত, বলা যেতে পারে। কবি এখন উঁচুদরের শিল্পী হয়ে উঠেছেন, তাঁর কাব্যকলার ঐশ্বর্য মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখবার বস্তু হয়ে উঠেছে।

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা '**চিত্রা**'। সৌন্দর্যতন্ময়তা, বাস্তবজীবনবোধ আর প্রগাঢ় পৃথিবীপ্রীতি 'চিত্রা'র প্রধান সুর। রোম্যান্টিক ভাবাবেগ কবিপ্রাণে প্রবল। এখানে সৌন্দর্যসত্তাকে কবি দুটি রূপে দেখেছেন—একটি, ওর 'চঞ্চলগামিনী'র রূপ, আর-এক, ওর 'প্রশান্তহাসিনী'-র রূপ। 'চিত্রা'তে 'সোনার তরী'-কাব্যে প্রকাশিত কবির মর্তমমতা গভীরতর হয়েছে, লক্ষ্য করা যায়। পূর্বদৃষ্ট এই মর্তমমতা বা অসাধারণ পৃথিবীপ্রীতিই 'চিত্রা'-য় বাস্তবমানবপ্রীতির রূপ নিয়েছে। 'এবার ফিরাও মোরে' নামক বিখ্যাত কবিতাটি উক্ত প্রীতিবিহ্বলতা এবং দুঃখদুর্যোগের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ পরিণামের পথে কবির অগ্রসরণের অভিলাষ প্রকাশ করছে। বাস্তববিমুখ 'রঙ্গময়ী কল্পনা'র জগৎ থেকে কবি ধীরে ধীরে সরে আসছেন। এর কারণ, 'ভালো নাহি লাগে আর আসা-যাওয়া বার বার বহুদূর দুরাশার প্রবাসে'। সুতরাং, 'এবার ফিরাও মোরে'—এখন 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। নবজাগ্রত মনুষ্যত্বের চেতনা কবিকে স্বপ্নাতুর অবস্থায় আর থাকতে দিচ্ছে না। বড়ো মানবজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়সাধনের পালা আসন্ন, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' সমাপ্তির দিকে। সমালোচ্য কাব্যে কবির 'জীবনদেবতা'-বিষয়ক কয়েকটি কবিতা আছে। প্রখর কবিব্যক্তিত্বের চেতনা, নিবিড় প্রেমানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ জড়িতমিশ্রিত হয়ে এই 'জীবনদেবতা'-র বিশিষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

'সোনার তরী'-কে যদি বলি স্বপ্নলোকে বিহরণের কাব্য, তবে 'চিত্রা'-কে বলবো স্বপ্নলোক থেকে ক্রমশ অপসরণের কাব্য—এরকম স্বপ্নভঙ্গ কবিজীবনে কয়েকবার ঘটেছে। এর পর সুদূরাভিসারী কল্পনার পাখা গুটিয়ে কবি মর্তমৃত্তিকা স্পর্শ করলেন। এই ভূমিটির নাম 'চৈতালি'।

'**চৈতালি**'-তে কবির দৃষ্টিভঙ্গির নতুনতা ও কাব্যধারার দিকপরিবর্তনের

পরিচয় আভাসিত। এখন সুদূরব্যাকুলতা নয়, ধূলিধূসর প্রত্যক্ষ চলমান বাস্তবসংসার কবি-রবীন্দ্রের কাব্যভাবনার বিষয়বস্তু হয়েছে। মুক্তপ্রকৃতির সঙ্গে কবি সহজ সরল হৃদয়ের সম্পর্ক পাতিয়েছেন : ক্ষুদ্রতুচ্ছ, সামান্য-সাধারণকে এখন তাঁর কাছে আর উপেক্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে না। কী সুন্দর এই মাটির পৃথিবী, কী সুন্দর এই মনুষ্যজীবন! সবকিছু আশ্চর্য, সবকিছুই দুর্লভ। এ-ই হলো সত্যকার মর্তপ্রীতি। 'চৈতালি'-তে কালিদাস ও তাঁর তপোবনপ্রীতি রবীন্দ্রনাথেও সংক্রমিত হয়েছে। কবি এখন থেকে ধীরে ধীরে সংস্কৃতসাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ কবিকে ধীরে ধীরে প্রাচীন ভারতকে অবলম্বন করে অভিনব জাতীয়তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়েছে। ফলে, 'কথা' ও 'কাহিনী'-র চিত্ররূপময় অপূর্ব কবিতাগুলি আমরা পেয়েছি।

'চৈতালি' কাব্যে কালিদাসপ্রীতি ও তপোবনপ্রীতির মধ্যে কবির যে-প্রাচীনানুরাগের সূচনা দেখা গেলো, 'কথা'-'কাহিনী'-'কল্পনা'য় তা স্পষ্টতর হয়েছে, 'নৈবেদ্য' কাব্যে পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে। এসব কাব্যে মানবমহিমা, মনুষ্যত্বের সমুচ্চ আদর্শ, মহাজীবনের গান একের পর এক উচ্চকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছে। যে-জীবন শৌর্যেবীর্যে দীপ্ত, কঠিন ত্যাগে সমুজ্জ্বল, আত্মার শক্তিতে বিভাসিত, স্বার্থকলুষের ঊর্ধ্বচারী, সেই মহত্তর জীবনের আদর্শ ও বাণী কবিকণ্ঠে এখন ধ্বনিত হচ্ছে। 'কাহিনী' কাব্যের আখ্যায়িকাগুলিতে আমাদের একথার সত্যতার প্রমাণ মিলবে। 'ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের' এমন সোচ্চার ঘোষণা রবীন্দ্রকাব্যে ইতঃপূর্বে কদাপি আমরা শুনিনি। **'কল্পনা'** কাব্যে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রেম ও সৌন্দর্যের সারবস্তুকে কবি নিজ ভাবে ও ভাষায় বিন্যস্ত করেছেন।

সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনাকে নিয়ে রবীন্দ্রের কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্বের শেষ।

ক্ষণিকা-নৈবেদ্য-উৎসর্গ-শিশু-স্মরণ তৃতীয় পর্বের অন্তর্গত।

সংস্কৃত কাব্য-কবিতায় ভাবনামুক্ত, রসানন্দপিপাসু কবিমনের যে-প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেই মানসিকতা নিয়ে **'ক্ষণিকা'**-র ক্ষণমুহূর্তের অবারিত আনন্দের কবিতাগুলি নির্মিত। কবির ক্ষণ-আনন্দ-অভিলাষের প্রেরণা জুগিয়েছে পল্লীবাঙ্‌লার প্রকৃতি। **'নৈবেদ্য'** কাব্যে কবির জাতীয়তাবোধ বা অতীতের প্রতি আগ্রহ কবিকে উপনিষদে-প্রতিফলিত ভারতের মহিমা এবং আদর্শভাবুকতাময় ভগবৎ প্রেরণার দিকে নিয়ে গেছে। 'নৈবেদ্য'-এর পর প্রকৃতিরসভাবুকতার মধ্য দিয়ে কবি অরূপানুভূতির এক রহস্যময় লোকে প্রবেশ করলেন। **'উৎসর্গ'** কাব্যে দেখা

যায়, বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন আনন্দময় বিনির্মল রসানুভবের প্রতি কবির আগ্রহ। এই রসোপলব্ধি থেকে ক্রমশ কবি একটি কল্পিত সত্তাকে আহ্বান করতে পারছেন—'সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।'

'স্মরণ' ও **'শিশু'** এই সময়কার রচনা। শিশুর মধ্যে কবি অসীমের রহস্য দেখতে পান। তার দেহমনে বিশ্বের মাধুর্য-সৌন্দর্য অনুক্ষণ তরঙ্গিত হয়। 'শিশু'-কাব্যখানিতে শিশুচিত্তের কল্পনাপ্রবণতার ও বিচিত্র জিজ্ঞাসার মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন কবি। কবির পত্নীবিয়োগে 'স্মরণ' রচিত। এই কাব্যে স্ত্রীর মৃত্যু কবিকে মৃত্যুর রহস্যচিন্তায় নিয়োজিত করেছে।

খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-বলাকা-পলাতকা-শিশু ভোলানাথ চতুর্থ পর্বের কাব্য। 'বলাকা'-তে একটা সুরস্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও, এই পর্যায়ের কাব্যগুলিতে কবির যে-অধ্যাত্মভাবুকতা প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে বলাকার গূঢ় সংযোগ রয়েছে। ধ্যানের জগৎ থেকে কবি এখনো বাস্তব সংসারে নেমে আসেননি। বাস্তবকে তিনি দেখছেন বটে, কিন্তু দূর থেকে। এখানে বাস্তবচেতনা ও অতিলৌকিক চেতনার সহাবস্থান। তবে, মাধুর্যের দেবতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবি যে রুদ্রদেবতার কাছে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন, তা সহজে বোঝা যায়। **'খেয়া'**তে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত বাউলধর্মী মনোভাব নিয়ে জীবনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন, বস্তুজগতের প্রয়োজন-সম্পর্ক-ত্যাগের দ্বারা অরূপ উপলব্ধির [লীলারসময় ঈশ্বরের অনুভূতির] তত্ত্ব বিবৃত করেছেন, এবং নিসর্গরসভাবুকতা থেকে অরূপভাবুকতায় প্রয়াণ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের অরূপভাবুকতা প্রকৃতিভাবুকতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম ভাগে 'মানসী-সোনার তরী'-যুগে যে কল্পনামূলক মর্তভাববিহ্বলতা কবিকে চঞ্চল বিরহভাবনায় ব্যাকুল করেছে, তা-ই ধীরে ধীরে তাঁকে অরূপরসলোকে নিয়ে গেছে। কাব্যজীবনের মধ্যভাগে কবি যে-অরূপ-রসলোকে প্রবেশ করলেন, এর মূল্য তাঁর কাব্যে অপরিসীম। অরূপভাবুকতার এই অধ্যায়টি তাঁর কাব্যপ্রবাহের বিচ্ছিন্ন একটি অধ্যায় নয়। এর সঙ্গে জীবনবোধ নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে, এবং এ-ই তাঁকে পরিণামে জীবনসত্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

অরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রের ধারণা আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। কবির অনুভূত অরূপ প্রকৃতি ও জীবনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত লীলাময়,

বিশুদ্ধ কাব্যরসলোকে আস্বাদ্য একটি সত্তা-বিশেষ—অতএব শাস্ত্রের বস্তু নয়, কাব্যোপলব্ধির বস্তু। রবীন্দ্রনাথের অরূপ-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যেমন প্রাকৃতিক কমনীয়তার মধ্যে অরূপের সাক্ষাৎলাভ করেন, তেমনি, নিসর্গের ভয়ংকর রূপের মধ্যেও। বরংচ দুঃখদুর্যোগের মধ্যেই এই অরূপ তাঁর নিকট অধিকতর সত্যভাবে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতির রুদ্র-ভয়ংকর রূপের মধ্যে যাঁর প্রকাশ দেখলেন, তাকে ক্রমশ মানুষের সর্ববিধ দুঃখবরণের প্রেরণারূপে লক্ষ্য করলেন। এরই ফলে একালে **'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-গীতালি'**র সর্বনাশকে নির্ভয়ে বরণ করা, মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং অজানার পথে ছুটে চলার বাণী উদ্‌ঘোষিত হলো। অরূপকে অবলম্বন করে কবি, মানুষ সত্য, এই দৃঢ় ধারণায় উপনীত হলেন, এবং এরই ফলে 'গীতাঞ্জলি'র বিখ্যাত মানবপ্রীতিবিষয়ক কবিতাগুলি ['হে মোর চিত্ত', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' প্রভৃতি কবিতা] যেমন রচিত হলো, তেমনি, 'অচলায়তন' নাটকে মানবসত্যবিরোধী কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিদ্রোহ জ্ঞাপন করলেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ অরূপরসে নিমগ্ন হয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক মনোভাবের কবিরূপে দেখা দিলেন।

'গীতাঞ্জলি'-'**বলাকা**'য় [ও 'ফাল্গুনী' নাট্যে] রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কারমুক্তি এবং জীবনের অবিরাম চলার কথা প্রকাশ করলেন। 'গীতালি'-তে 'যাত্রী'-কবির দুঃখবরণের উৎসাহ সম্যক প্রকাশ পেয়েছে, এবং 'বলাকা'য় [ও 'ফাল্গুনী'তে] মৃত্যুর দ্বারা নবায়মান, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সর্বদা অগ্রসরণশীল জীবনকেই কবি যথার্থ জীবন বলে মনে করেছেন। বুঝে নিতে হবে, কবির প্রথমজীবনের সুদূরাভিলাষী রোম্যান্টিক কবিচিত্ত এবং ভয়ংকর-সুন্দর অরূপের ভাবুকতাই কবিকে ধীরে ধীরে এই বৈরাগ্যময় জীবনবোধে প্রবর্তিত করেছে। নিজের অনুভূতিতে যাত্রার সুর উপলব্ধি করে কবি বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যে এই যাত্রা বা গতির স্পন্দন লক্ষ্য করলেন, এবং পরিবর্তন ও ধ্বংসকে সত্যরূপে গ্রহণ করলেন।

'বলাকা', 'গীতালি' প্রভৃতি কাব্যে [এবং 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাট্যে] যে-জীবনভাবুকতা প্রকাশ পেয়েছে তা ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ-র দর্শনের তুল্য হলেও, কবি এই তত্ত্বকে অবলম্বন করে ছন্দিত প্রবন্ধ রচনা করেননি, নিজ অনুভূতির ওপরে নির্ভর করে কাব্যই লিখেছেন। 'বলাকা' কবিতাটির—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে'—তত্ত্বের অনুবাদ নয়, কবিহৃদয়ের উপলব্ধ গূঢ় একটি সত্য।

'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের অতিশয় বিশিষ্ট একখানি কাব্য। এর মাধ্যমে কবি আমাদের মুক্তপ্রাণের গান শুনিয়েছেন, এই মরা জাতির চিত্তদেশে উচ্ছল যৌবনশক্তি

সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। জড়ত্ব-জীর্ণতা আর মোহের জটিল জালে আমরা আবদ্ধ, 'বলাকা'-গীতি ওই বন্ধনজাল ছিন্ন করে আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানব-আত্মার চরম সার্থকতার পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। 'বলাকা'-র কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ললাটে 'যৌবনের রাজটিকা' পরিয়ে দিয়েছেন, জীবনবোধের এক পরমাশ্চর্য বিশালতায় সকলকে তুলে ধরেছেন। ভাবের গভীরতায়, আবেগের তীব্রতায়, ভাষার দীপ্তিতে, মুক্তবন্ধ ছন্দের অভিনবতায় 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ কাব্য, একথা, বোধ করি, বলা যায়।

'বলাকা'র পর কবি দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন—**'পলাতকা'** ও **'শিশু ভোলানাথ'**। এ দুটি কাব্যে অল্পবিস্তর 'বলাকা'র ভাবচিন্তার প্রভাব দেখা যায়। 'পলাতকা'য় বাস্তবের মধ্যেও বাস্তবাতীত এক রহস্যময় সত্তার পদসঞ্চার শুনতে পাই আমরা; আর 'শিশু ভোলানাথ'-এ অনাসক্ত জীবনের প্রাণোদ্বেল চঞ্চলতা। বুঝতে কষ্ট হয় না, কবি এখনো 'বলাকা' কাব্যের ভাবমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রান্ত হতে পারেননি।

পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যগুচ্ছ হলো পূরবী-মহুয়া-বনবাণী-পরিশেষ। **'পূরবী'**তে রবীন্দ্রের কণ্ঠে বেজে উঠলো বেলাশেষের গান। অস্তাচলের ধারে এসে রবিকবি পূর্বাচলের দিকে তাকালেন, অতীতের 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'কে গোধূলিক্ষণের আলোকে বিস্মৃতির তামসলোক থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন। 'পূরবী' কাব্যে কবির দৃষ্টি দুদিকে প্রসারিত—পশ্চাতে ও সম্মুখে। পশ্চাতে হারানো কৈশোর-যৌবনের মধুময় সহস্র স্মৃতি, প্রকৃতি-উপভোগের অমেয় আনন্দ; সম্মুখে বৈতরণীকূলের ওপারের ঘনায়মান অন্ধকার, মরণের দূরশ্রুত অস্পষ্ট পদধ্বনি। ফিরে-পাওয়ার আনন্দ ও ছেড়ে-যাওয়ার বেদনা, এই মিশ্র অনুভূতির জন্যে কবিকণ্ঠ-নিঃসৃত পূরবী রাগিণীও বিমিশ্র হয়ে পড়েছে। বর্তমান কাব্যে কবিচিত্তের আসক্তি ও বৈরাগ্য রৌদ্রছায়ার লুকোচুরিখেলার সৃষ্টি করেছে। ধ্যানলোকে নয়, মাটির মায়ের কোলেরই কাছাকাছি এখন কবির অবস্থান। মানবজীবন, মানবহৃদয়, প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যসুষমা এখন তাঁর কবিতার মুখ্য উপজীব্য। 'ধরণীর কোণে' 'এতটুকু বাসা' আর 'কিছু ভালোবাসা' পেলেই কবি দুদিনের 'কাঁদা আর হাসা'কে নিয়ে শান্তি ও তৃপ্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন। স্বর্গের অমৃত নয়, এই মাটির পৃথিবীর প্রীতিরসই এখন কবি-রবীন্দ্রের অভিলষিত।

পরিণত বার্ধক্যে অপূর্ব প্রণয়গাথা **'মহুয়া'** লিখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবাক করে দিলেন। কবি বুঝি দ্বিতীয়বার যৌবনের রাজ্যে জেগে উঠলেন—এ যেন অকাল-

বসন্তের আবির্ভাব। 'মহুয়া'র কবিতাগুলি থেকে বার্ধক্যবিজয়ী যৌবনের 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি' বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর, তাতে 'ঝল্‌মল্' করে উঠছে আমাদের চিত্ত। বাঙ্‌লাসাহিত্যে এমন বীর্যদীপ্ত প্রেমের সংগীত ইতঃপূর্বে কদাপি আমরা শুনিনি। এসব কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যায়, স্থূল ইন্দ্রিয়জ কামনাবাসনার জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কবি উচ্চতর একটি ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'মহুয়া'-পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জৈববৃত্তিরূপে নয়, মৃত্যুঞ্জয় একটি প্রকাণ্ড শক্তিরূপে, দেখেছেন—নারীকে আত্মার সঙ্গিনী বলে জেনেছেন। এ প্রেম প্রণয়ীযুগলের কাছে বন্ধন নয়। এ প্রণয় আত্মাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়, বৃহত্তর সংসারের সঙ্গে যুক্ত করে, চিত্তদেশ বিপুল বিশ্বাসে ভরে তোলে। এর শক্তিপ্রভাবে নরনারী বিচ্ছেদ, এমন কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত, হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে। প্রেমের এ এক অপরূপ শঙ্কা-সংকোচহীন বিজয়গৌরবঘোষণা। বস্তুত, 'মহুয়া'য় রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, অতি-বড়ো আধুনিক কবি তা করতে পারতেন কিনা, সন্দেহ।

রবীন্দ্রের প্রকৃতিরসভাবুকতার এক অভিনব প্রকাশ দেখতে পাই **'বনবাণী'**-তে। নিসর্গের মর্মলোকে কবির নির্বারিত প্রবেশাধিকার। অন্তঃকর্ণে তিনি অরণ্যের আদিমতম বাণীটি শুনতে পান, বনদেশের তরুলতার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করেন। 'ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত'—একদা কবি বলেছিলেন ; 'বনবাণী'-তে এই প্রাণশক্তিরই বিচিত্র তরঙ্গদোলার কথা বাণীবদ্ধ হয়েছে। নিসর্গ-প্রকৃতির বিশাল রঙ্গমঞ্চে ঋতুতে ঋতুতে নটরাজের নৃত্যলীলা চলছে। এই নৃত্যের ছন্দে বনের লতা-পাতা-ফুল সতত স্পন্দিত—সকলে মিলে গড়ে তুলেছে আনন্দঘন এক রসলোক। সুন্দর সন্ন্যাসী নটবাজের মহানৃত্যের ছন্দের সঙ্গে নিজের প্রাণ-চ্ছন্দকে মিলিয়ে কবি পার্থিব স্বার্থের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চান—বৈষয়িকতাগ্রস্ত, জড়ত্বে আবদ্ধ জীবনের রসানন্দলোকে মুক্তি।

'পরিশেষ' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী 'বলাকা', 'পূরবী', 'বনবাণী' ইত্যাদি বইগুলির ভাবধারার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। দুঃখ-দুর্যোগ-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে-মানুষ নিজ আত্মার প্রকাশকে উজ্জ্বল করে তুলছে, 'পরিশেষ'-এ কবি সেই মানুষের জীবনরহস্যের কথা আমাদের শুনিয়েছে। এ ছাড়া, কবি আপনার আত্মদর্শনের কথা বলেছেন, আত্মস্বরূপ বিশ্লেষ করেছেন। এই কাব্যখানিতে রবীন্দ্রনাথ, জীবনমৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ভারতের স্বাধীনতার সৈনিকদের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

'পুনশ্চ' থেকে আরম্ভ করে 'শেষলেখা' পর্যন্ত বইগুলিকে রবীন্দ্রজীবনের শেষ-

পর্যায়ের কাব্য বলা যেতে পারে জগৎ ও জীবনের প্রতি কবির অনিঃশেষ অনুরাগ, বাস্তবের মধ্যে অ-পূর্বপরিচিত বিচিত্র রসের সন্ধানতৎপরতা, সম্মুখে প্রসারিত 'চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি'-কে দুচোখ মেলে অতৃপ্য তৃষ্ণায় চেয়ে-দেখা, সাধারণ সামান্য মানুষকে অমেয় প্রীতির আলিঙ্গন জানানো, কীট-পতঙ্গ-আদি মানবেতর প্রাণীলোকের বিষয়ে অশেষ কৌতূহলপরায়ণতা, বাস্তব-বিচিত্রতায় এক অজ্ঞেয় ব্যঞ্জনার অনুভব, প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে একটা দুর্জ্ঞেয় অলক্ষ্যের বোধ, মৃত্যুর কূলে দাঁড়িয়ে 'দূর হতে দূরে—অনাহত সুরে সোনার ঘণ্টার ঢং ঢং'-ধ্বনি শুনতে পাওয়া, 'পরীর দেশের বন্ধ দুয়ারে হানা' দেবার তীব্র একটা অভিলাষ, ইত্যাদি নানান্-কিছু রবীন্দ্রের এই শেষ পর্যায়ের কাব্যে ঘুরে ফিরে উঁকি দিয়ে গেছে।

কবির প্রতিভার দীপ্তি এখনো উজ্জ্বল—কবি নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধানী। ভাববস্তু ও আঙ্গিকের নতুনতা এই অন্তিম পর্বভুক্ত কতকগুলি রচনার মধ্যে অতিশয় প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একালে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা সৃষ্টি করলেন, প্রচলিত ছন্দোরীতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, কাব্যে গদ্যের স্বভাবোক্তির আশ্রয় নিলেন। পদ্যছন্দে কবি 'ফুলবাগানের ফুলগুলিকে' তোড়ায় বেঁধেছিলেন। আর, এখন গাছের ফুলে-ডালে-পাতায় সব মিলিয়ে যে-বস্তুটি মেলে তাকেই পাওয়ার প্রয়াসী। এককালে পদ্যের সমুদ্রসৃষ্টি করেছিলেন যে-কবি, সেই কবিই এখন নির্মাণ করলেন গদ্যবাণীর মহাদেশ। রবীন্দ্রের সেকালের কাব্যের প্রতীক পদ্মা, একালের কবিতার প্রতীক কোপাই। কবির লেখা আগের কবিতা আভিজাত্যের অভিমানে নিঃসঙ্গ। পক্ষান্তরে, গদ্যকবিতার রূপটি নিরভিমান—'তার ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা', ছন্দের ও প্রসাধনকলার কোনোপ্রকার জাঁকজমক তার নেই। বিষয়বস্তুর কৌলিন্য গদ্যকবিতার লেখক রবীন্দ্রনাথ একরূপ ভুলে গেছেন, শৌখিন বক্তব্যের দিকে ঝোঁক হ্রাস পেয়েছে। আগে যেসব বস্তুকে কবি অস্পৃশ্য বলে জেনেছেন, এখন তারাই তাঁর কাব্যে এসে ভিড় জমিয়েছে, যেমন—ভবঘুরে কুকুর, ছেঁড়া কাঁথা, মাসিক-তিনটাকা-মাইনের পণ্ডিত, কোলা ব্যাঙ, গোবরে পোকা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পুত্রপুট', 'শ্যামলী'—এই চারখানি কাব্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন। অন্তিম পর্বের প্রথমের দিকে কবি গদ্যকে যে তাঁর কাব্যসরস্বতীর বাহন করলেন, তার কারণ হলো, সর্বপ্রকার পদ্যছন্দকে তিনি একালের নতুন চেতনা, নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশের অনুপযোগী বলেই মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পদ্যছন্দে-নির্মিত কবিতাগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি, গদ্যছন্দে লেখা কবিতাগুলি—এখানেও প্রসঙ্গের বিচিত্রতা ও ভাবনার

বহুমুখিতা লক্ষ্য করবার মতো। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেও কবি যে-সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। সমালোচ্য পর্বের মধ্যে পড়ে প্রধানত এই কাব্যগ্রন্থগুলি: পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, এবং কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত—শেষলেখা। এদের সম্পর্কে সামান্য দুচার কথা বলছি।

গদ্যছন্দের প্রথম কাব্য **'পুনশ্চ'** নামটি থেকে বুঝতে পারা যায়, পূর্ববর্তী কাব্য-কবিতায় যে-কথা অনুচ্চারিত থেকে গেছে, এতে তা পরিব্যক্ত করবেন কবি। 'সর্ব-ব্যাপী সামান্যের স্পর্শ' পাওয়ার জন্যে তাঁর চিত্ত এখন ব্যাকুল, আশেপাশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবিগুলো ফোটাতেই কবির আনন্দ। এ বইতে আমাদের অতিপরিচিত মানুষ ও বস্তুর চেহারাগুলির অনাড়ম্বর মিছিল চোখে পড়ে। 'পরিশেষ' থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গের পরিবর্তন শুরু হয়। এ ঝোঁক আরো স্পষ্ট হলো 'পুনশ্চ'-তে। এতে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে পূর্ণকাব্যমূল্য দিয়েছেন। তিনি বারংবার আমাদের জানিয়েছেন—'আমি তোমাদেরি লোক', সাধারণ মানুষের কবি বলেই তাঁর নাম 'খ্যাত হোক'—এ-ই বর্তমানে কবির মনোগত বাসনা। বাস্তবনির্ভর রসের প্রাধান্য এবং উদার মানবীয়তা 'পুনশ্চ' কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

'শেষসপ্তক' রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার কাব্যায়ন। মহাবিশ্বজীবনের প্রেক্ষাপটে নিজেকে তুলে ধরে কবির আত্মসন্ধান ও আত্মদর্শনই 'শেষসপ্তক'-এর প্রধান সুর। কবি মানবসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যে উৎসুক, আত্মার সত্যমূল্য-নির্ধারণের প্রয়াসী। কবিচিত্ত একালে আসক্তিশূন্য। বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রতুচ্ছ দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে কবি অনুভব করছেন অগাধ বিস্ময়, অনিঃশেষ আনন্দ। 'নামের পূজার অর্ঘ্য, ভাবীকালের খ্যাতি' কোনোকিছুর দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই। তিনি মহাকাল-সন্ন্যাসীর কাছে নিরাসক্তির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। মৃত্যুর শূন্যময়তা কবি স্বীকার করেন না, মানবের আত্মাকে তিনি মৃত্যুঞ্জিৎ বলেই জেনেছেন—মৃত্যুর তোরণের মধ্য দিয়ে নবতন জীবনের পথে সে চিরঅগ্রসরমাণ। এ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় সূক্ষ্মসুকুমার প্রেমানুভবের মৃদু কম্পনের স্নিগ্ধ স্পর্শ লেগেছে। এই প্রণয়ানুভূতি বৈরাগ্যের গেরুয়া-রঙে অনুলিপ্ত।

তারপর, বিখ্যাত **'পত্রপুট'**। অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ, প্রবল মানবানুরাগ ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখব্রত মানুষের সংগ্রামবিক্ষুব্ধ জীবনের অংশীদার হতে না-পারার জন্যে অন্তরে গ্লানিবোধ এবং আন্তরিক আক্ষেপোক্তি,

পশ্চিমের পররাজ্যলোভী হিংস্র সভ্যতার প্রতি ধিক্কারবাণী-উচ্চারণ, মর্তসংসার থেকে বিদায়ের প্রাক্‌কালে 'উদাসীন পৃথিবী'কে প্রণাম-নিবেদন, পরিচিত বস্তু-আশ্রয়ে অজ্ঞাতের অনুসন্ধান, ইত্যাদি 'পত্রপুট' কাব্যখানিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। মননের গভীরতায়, ভাষার বর্ণরাগে, প্রকাশভঙ্গির লাবণ্যে ও রূপনির্মাণকৌশলে 'পত্রপুট' উচ্চাঙ্গের কবিকৃতি হয়ে উঠেছে।

'শ্যামলী'-তে পূর্বকথিত দুটি কাব্যের সেই তত্ত্বভাবুকতার স্পর্শ তেমন নেই। এখানে কবি অপেক্ষাকৃত সহজের মধ্যে সঞ্চরণ করছেন। মানুষ ও প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর চোখে বিস্ময়ের চমক লাগিয়ে যাচ্ছে, অপ্রত্যাশিত আবেগে কবির মন ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হচ্ছে। গদ্যছন্দের পালা এখানে শেষ হলো।

'প্রান্তিক' থেকে শুরু করে পরবর্তী কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র পদ্যছন্দই প্রয়োগ করেছেন—কোথাও মিলযুক্ত, কোথাও মিলহীন। কবি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রোগমুক্তির পরেই 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুলি লেখা। আপাত-ভীষণ মৃত্যুর স্পর্শ কবিকে এক অলৌকিক চেতনায় আবিষ্ট করেছে, তাঁর চিত্তে পার্থিব যাবতীয় বাসনার মালিন্য থেকে মুক্তির আগ্রহ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আত্মার জ্যোতির্লেখার রহস্য-উন্মোচনের জন্যে তিনি ব্যাকুল। চিত্ত পরম-বৈরাগ্যে অধিষ্ঠিত হলেও, জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ এতটুকু কমেনি। মানবতাকে লাঞ্ছিত দেখে 'মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক'-এর নিকট এই বলে প্রার্থনা জানিয়েছেন : 'শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নরঘাতী কুৎসিত বিভৎসা-পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন'। পীড়নমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, বিদায় নেওয়ার আগে কবি উচ্চকণ্ঠে তাদেরই ডাক দিয়েচেন—'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' রবীন্দ্র-কবির এই মূর্তি অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামীর। নির্যাতিত মনুষ্যত্ব তাঁকে অগ্নিবাণীর উদ্‌গাতা করে তুলেছে।

'সেঁজুতি' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থানের পথের পথিক। এই পথিকের মন বলে—'নহে দূর, নহে দূর'। একদিকে, চৈতন্যসীমা পেরিয়ে এক দুর্নিরীক্ষ্য সত্তার—অনির্বাচ্য অস্তিত্বের—অলৌকিক উপলব্ধি, বিচিত্রিত যবনিকার অন্তরালে চরম সত্যের রহস্যানুভব এবং যাত্রার ব্যাকুলতা ; অন্যদিকে, চিরসুন্দর রূপময় বিশ্বধারা, অনিঃশেষ জীবনানুরাগ, সৃষ্টির মূল্যনিরূপণের ঐকান্তিক আগ্রহ। একথায়,

অমর্তচেতনা ও মর্তচেতনার দ্বন্দ্ব, বিশাল বৈরাগ্য আর আসক্তিবিজড়িত পৃথিবী-প্রীতির ভিন্নমুখী তুটি ভাবনা 'সেঁজুতি' কাব্যখানিতে প্রতিফলিত। কবিগুরুর 'সেঁজুতি'—মরণের-ফ্রেমে-বাঁধানো মর্তমমতাস্নিগ্ধ জীবনের একখানি অপূর্ব আলেখ্য।

'আকাশপ্রদীপ'-কে মধুর স্বপ্নরসের কাব্য বলা যেতে পারে। দূরঅতীতে হারিয়ে-যাওয়া তারুণ্যের দিনগুলিকে কবি স্মরণ করছেন। বর্তমানের সঞ্চয় যতই কমে আসছে ততই কৈশোর আর প্রথমযৌবনের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে কাব্যবস্তু কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। চোখ বুজে অতীতের ধ্যান করতে কবির ভালো লাগছে। 'আকাশপ্রদীপ'-এ কবিমানস মুখ্যত রোম্যান্টিক। **'নবজাতক'** কাব্যে নতুন এক উপলব্ধির জগতে কবির পুনর্জন্ম হলো যেন। কবি পৃথিবীতে 'শান্তম্ শিবম্'-কে যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি, অশান্তি, কুশ্রীতা, জীবনযাত্রার তুঃখগ্লানির বিষয়েও সচেতন হয়েছেন। তাই, যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্ঠুরতাকে তিনি ধিক্কার হানেন, তুঃখের আবর্তে নিক্ষিপ্ত মানুষকে সর্বশক্তি-নিয়োগে অমানবীয়তার সমাধিশয্যা রচনা করবার প্রেরণা জোগান। আবার, নিজের 'সুকুমারী লেখনী' মানবজীবনের আঘাত-সংঘাতের দিকটিকে পৌরুষদীপ্ত বাণীতে ফোটায়নি বলে কবির লজ্জাবোধজনিত আক্ষেপও কম নয়।

'সানাই'-এ রবীন্দ্রনাথ কবিস্বভাবে মুখ্যত রোম্যান্টিক। পুরানো দিনের স্মৃতিরোমন্থন, সুদূরের পিপাসা, প্রকৃতিরস-আস্বাদন, পূর্বজীবনের 'লীলাসঙ্গিনী'কে স্মরণ, ইত্যাদি 'সানাই'-এ লক্ষ্য করবার মতো। এখানে বিচিত্র ছবির চিত্রশালা দেখতে পাওয়া যায়, ক্ষুদ্রতুচ্ছ খুঁটিনাটিও কবির সচেতন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের আঁশ, মরা বিড়ালের দেহ—সংসারের এই সংগতি ও অসংগতির মধ্যে—'সানাই লাগায় তার সারঙের তান'। প্রতিটি ছবিই কবির চিত্রণনৈপুণ্যে উজ্জ্বল। উপস্থিত কাব্যে স্বপ্ন ও বাস্তব পাশাপাশি নির্বিরোধ স্থান পেয়েছে।

'রোগশয্যায়' ও **'আরোগ্য'**—নামে তুখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হলেও, এ তুটি আসলে একটি বইয়েরই তুটি খণ্ড যেন। এদের একসঙ্গে পাঠ করতে হবে, নচেৎ সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করা যাবে না। ১৯৩৮ সালের অসুখের পর কবি লিখেছিলেন 'প্রান্তিক'। ১৯৪০-এ কবি যখন গুরুতররূপে অসুস্থ, তখন, এবং রোগ থেকে সেরে উঠে, সমালোচ্য গ্রন্থ-তুটিতে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি রচনা করেন। কবির তুর্দম প্রাণশক্তির কাছে রোগযন্ত্রণা পরাভূত হয়েছে, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি একের পর এক কবিতা লিখে গেছেন। ব্যাধি কবির দেহে মালিন্য সঞ্চার করেছে, কিন্তু

কবিতাগুলিতে এতটুকু মলিনতা কিংবা বিষণ্ণতার স্পর্শ নেই। প্রকৃতিলোকের মতো নিত্যনির্মল প্রসন্নতা রবীন্দ্রের অন্তরলোকেও।

তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে আনন্দের গান, পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হচ্ছে : 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি'। আবার, একটু পরেই লিখছেন : 'বলে, আমি আনন্দিত,ছন্দ যায় থামি, বলে ধন্য আমি'। বই-দুখানির পাতায় পাতায় পৃথিবীপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি, মানবপ্রীতির বাণী ঘোষিত হয়েছে। খ্যাতির বিষয়ে কবি একেবারে মোহমুক্ত, লোকমতের বিষয়ে একান্ত উদাসীন। কারণ—'নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে কীর্তির সঞ্চয়ে', সুতরাং 'আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা'। জীবনের গোধূলিধূসর ক্ষণে কবি যেন নতুন দৃষ্টি লাভ করলেন। নতুন চোখে জগতের যা-কিছু দেখছেন—অতিতুচ্ছ, অতিক্ষুদ্র বস্তু-সব—সমস্তকেই প্রগাঢ় প্রেমের আলিঙ্গনে বাঁধছেন। তাঁর প্রেম বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। পূর্বেকার কাব্যে কবির ব্যক্তিগত কথা এত সহজভাবে কোথাও পরিব্যক্ত হয় নি। 'আরোগ্য'-এর 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রের উল্লেখ্য একটি রচনা—সাধারণ মানবগোষ্ঠিকে, বিপুল জনতাকে, তিনি সমুচ্চ মর্যাদা ও মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো, রবীন্দ্রনাথ রঙিন স্বপ্নকল্পনার গজদন্তমিনারের বাসিন্দা নন—তিনি সমাজসচেতন, সময়সচেতন—কালের রথের গতি কোন্‌দিকে, তা অজানা ছিল না তাঁর। আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বলন্ত ঘৃণা। যুদ্ধবাজদের উলঙ্গ উন্মত্ততার উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ তাঁর কবিতায় অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠেছে। কেবল কাব্যামোদীরা নয়, প্রগতিবাদীরাও, 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' পড়ে [এবং শেষ পর্যায়ের আরো কয়েকখানি বই পড়ে] নিশ্চয়ই খুশি হবেন। রবীন্দ্রনাথ 'Ivory Tower'-এর মানুষ—তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত।

পরবর্তী **'জন্মদিনে'** রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ। এই কাব্যটি জন্মমৃত্যুর মিলনমোহনায় দাঁড়িয়ে লেখা। মৃত্যুর তরী বুঝি প্রস্তুত, জোয়ার এলেই কবি তরীতে উঠে পড়বেন। বইটিতে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে, কিন্তু কালো নয়—রঙিন ছায়া। আমরা শুধু জীবনকে উপভোগ করি, কবি জীবন এবং মৃত্যু উভয়কে উপভোগ করেছেন। তা না হলে আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান ছায়ায় অবস্থান করে কবি এরূপ নির্মল আনন্দ ও অমেয় শান্তির বার্তা আমাদের শোনাতে পারতেন না—'আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ্', কিংবা, 'বিরাট আকাশে/বনে বনে ধরণীর ঘাসে ঘাসে/সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে/গাছে গাছে/অন্তহীন শান্তি-উৎস-স্রোতে'। এ বইতে, একদিকে, প্রকাশ পেয়েছে নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি কবির গভীর

ভালোবাসা, অন্যদিকে, মানবমহিমায় তাঁর অবিচল আস্থা। তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখছেন : 'দিন বদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে'। পৃথিবীতে অনেক পাপ জমেছে, চুকিয়ে দিতে হবে তার দাম, প্রলয় আসন্ন ; প্রলয়ের পরে নবজন্ম, নতুন সৃষ্টি। তার বন্দনাগান গেয়ে কবি বললেন—'আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান ঘোষিছে কামান'। বহুশ্রুত 'ঐকতান' এই 'জন্মদিনে' কাব্যেরই অন্তর্ভূর্ত একটি কবিতা। রবীন্দ্রকাব্যে উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্যে এর স্থান খুব উঁচুতে। দুঃখের বিলাসিতা আর'শৌখিন মজদুরি' নিয়ে যেসব কবির বেসাতি, শুধু 'ভঙ্গি দিয়ে' যারা 'চোখ ভোলায়', 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি' 'চুরি' করে, রবীন্দ্রের 'ঐকতান' তাদের লজ্জা দেবে। জনগণের প্রাণের কথা কবি বলতে পারেননি, এ অবশ্যই নিন্দার কথা। তাঁর আশা ও বিশ্বাস, এদেশে একদিন 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' কাব্যকারের অভ্যুদয় হবে। বিদায়লগ্নে সেই ভাবীকালের কবিকে রবীন্দ্র-কবি 'বারংবার' 'নমস্কার' জানিয়েছেন। রোগশয্যায়-আরোগ্য এবং জন্মদিনে—বই-তিনটিতে মোটামুটি একই ভাবধারা ব্যক্ত হয়েছে। তাই, এদের রবীন্দ্রকাব্যসংসারে তিন সঙ্গী বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রাণের পর আত্মপ্রকাশ করলো **'শেষলেখা'**। বইখানিতে মানবসত্তার দুরবগাহতার কথা আছে, মৃত্যুর কথা আছে, গভীরতম জীবন-উপলব্ধির কথা আছে, মহামানবের জয়ধ্বনি আছে, আর আছে 'মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে' হৃৎপাত্র পূর্ণ করে, 'মানুষের শেষ আশীর্বাদ' নিয়ে, এ পৃথিবী ছেড়ে, প্রসন্ন চিত্তে লোকান্তরে প্রয়াণের কথা। 'শেষলেখা' এক আশ্চর্য কবিতার বই। এর জগৎটি আলোকে-আঁধারে, ঘুমে-জাগরণে গড়া, অর্থ ছুঁতে গেলে মায়াময় ছায়ার মতো পালায়। ছোট ছোট কবিতা, বাক্য সংহত—শুনতে অনেকটা বৈদিক ঋষির কণ্ঠোৎদ্গীর্ণ মন্ত্রের মতো :

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম, এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

অথবা :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে—

কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষপ্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥

—এজাতের রচনাকে কোন্ নামে চিহ্নিত করা যায়? এরা প্রচলিত কবিতার সদৃশ কী? কোনো সজ্জা নেই, কলাকৌশল নেই, মিলবিন্যাস নেই, ছন্দের ঝংকার নেই, এতকালের পরিচিত কাব্যের সমস্ত রীতি এখানে উপেক্ষিত। অথচ, এগুলি আমাদের সত্তার গভীরে গম্ভীর ওঙ্কার-ধ্বনির মতো বাজতে থাকে। এদের 'কবিতা' না বলে রবীন্দ্র-কবির 'বাণী' বলাই বোধকরি সংগত। এরূপ কবিতা কেউ কোনোদিন লেখেন নি; আর, রবীন্দ্রের মতো মহাকবি না জন্মালে, ভাবীকালেও, কেউ যে লিখতে পারবেন, এ কল্পনাতীত।

রবীন্দ্রকাব্য-পরিচায়িকার এখানে ইতি টানা হলো।

নাটক :

এবার রবীন্দ্র-কবির নাট্যসাহিত্যের কথা—খুব সংক্ষেপে।

বর্তমান আলোচনায় প্রবেশের মুখে একটি কথা বলে রাখি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নাট্যকারের নয়, গীতিকবির। তাঁর লেখা নাটক-নাটিকার সংখ্যা প্রায়-পঞ্চাশের কাছাকাছি। এগুলির প্রতি পাঠকচিত্তের যে আকর্ষণ, তা আসলে এদের অন্তর্নিহিত নাট্যগুণের জন্যে নয়—রচয়িতার আশ্চর্য কবিত্বশক্তিই এগুলিকে পাঠকসাধারণের অত্যন্ত আদরের বস্তু করে তুলেছে। এদের মধ্যে বাস্তব-সংসারের রক্তমাংসের নরনারীকে ততখানি বিম্বিত আমরা দেখি না, যতখানি দেখি রবীন্দ্রের কবি-আত্মাটিকে।

নাটকের বিষয়ে আমাদের চল্‌তি ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ একরূপ বিপর্যস্ত করেছেন। লিরিকের প্রতি তাঁর যে-দুর্মর পক্ষপাত, নাটক লিখতে বসেও, তা তিনি এড়াতে পারেন নি। তাই, রবীন্দ্রনাটকে ঘটনাসংঘাত হৃদয়াবেগের কাছে প্রায়শ হার

মানে, কুশীলবেরা বিশেষ কোনো শাশ্বত ভাবের প্রতিভূ হয়ে ওঠে, কোথাও কোথাও ব্যক্তিবিশেষ বিশেষ-একজাতের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। নাটককে দিয়ে যে গানের কাজ করানো যেতে পারে তা আমরা দেখে নিলাম রবীন্দ্রনাথে। নাটকের সাংগীতিক সম্ভাবনার চূড়ান্ত পরীক্ষা তিনি করে গেছেন। বাঙালি-নাট্যকারদের চিরবিচরিত পথে রবীন্দ্রনাথ পদক্ষেপ করেন নি। তাঁর রচিত নাটক সাধারণ দর্শকের জন্যে নয়। রঙ্গমঞ্চে এগুলির অভিনয় দেখবার জন্যে অনুশীলিতরুচির একদল দর্শক তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে, প্রচলিত নাটকের সেই বাঁধা আদর্শে রবীন্দ্রনাটকের বিচারণা চলবে না—একশ্রেণীর নাট্যরসসংবলিত লিরিকপ্রধান দৃশ্যকাব্যরূপে দেখাই হলো এগুলিকে যথার্থভাবে দেখা। পিরান্দেল্লো-র বিখ্যাত এই কথাগুলোর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত : 'Drama is action, sir, action, not confounded philosophy'—এতে যে-নাট্যধর্মের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, রবীন্দ্রকৃত নাটকের সর্বত্র তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া না-যাওয়াটা অবশ্যই মস্তবড়ো ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যটি ধরতে পেরেছিলেন বলেই, 'বিসর্জন' লেখার পর আর প্রচলিত রীতিতে নাট্যরচনায় তিনি হাত দেননি, নতুন রীতির নাটক-রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন—রূপক-সাংকেতিক বা প্রতীকী নাটক, যেখানে ঘটনা ও চরিত্র উভয়ের স্থান গৌণ। 'বিসর্জন' নাটকের উৎসর্গপত্রে কবি যে লিখছেন : 'কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি'—এতে কি নিছক ঠাট্টার সুরটিই ধ্বনিত? আমাদের তা মনে হয় না। আমরা মনে করি, এ রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনা, এবং অভ্রান্ত। রবীন্দ্র-কবির সমালোচন-দক্ষতার কথা কার অবিদিত? মোটকথা, রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখেছেন স্বতন্ত্রভাবে। কী গ্রীক, কী এলিজাবেথীয়, কী আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শের বিশ্বস্ত অনুসৃতি এগুলিতে নেই। এরা ঘটনার নাটক নয়—কবির অভিজ্ঞতা, অনুভব, বিচিত্রমুখী ভাবনাই এদের প্রায়-সর্বস্ব। এসব কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রের নির্মিত নাট্যজগতে প্রবেশ করতে হবে।

গীতিনাট্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকের পালা শুরু করেন, আর, এর শেষ নৃত্যনাট্যে—এখানে এও স্মর্তব্য।

* *

*

কবি-রবীন্দ্রের অপরূপ কাব্যৈশ্বর্যের সঙ্গে তুলনায়, অন্তত বিস্তারের দিক থেকে, তাঁর নাট্যরচনার স্পৃহা খুব নিম্নে স্থান পাবে না। কৈশোর হতেই আখ্যান-

মূলক গীতিকাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য-নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই যে-মানুষটি গানের আবহাওয়ায় লালিত, তাঁর সাহিত্যকৃতির আবহাওয়াটিও গীতিসুরভিত হবে এ তো স্বাভাবিক। কবির কৈশোরদিনের এই যে রচনাগুলি, এরা স্বরূপত নাট্য নয়—নাট্যাকারে কাব্য; অর্থাৎ আখ্যান এবং চরিত্র থাকলেও, অথবা কোথাও চরিত্রের অন্তরে ও বাইরে অল্পবিস্তর সংঘাত দেখা গেলেও, সে-সংঘাত দ্রুত ভাববিপ্লবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, এবং দীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি আদ্যন্ত আত্মভাবুকতার প্রশ্রয় দিয়েছে। বস্তুত, উনিশের শতকে পৃথিবীর সর্বত্র রোম্যান্টিক গীতিকবিদের মধ্যে এ-ধরণের কাব্যরচনার একটা প্রয়াস লক্ষিত হয়। সোজাসুজি আখ্যানমূলক গীতিকাব্য রচনা না করে তাঁরা কয়েকটি চরিত্র ও তাদের মুখের কথাকে অবলম্বন করে, কাব্যোদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথেও এরূপ একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবির জীবনের একেবারে গোড়াকার দিকের ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ এজাতের রচনা হলো—বাল্মীকিপ্রতিভা, রুদ্রচণ্ড, কালমৃগয়া, নলিনী, প্রকৃতির প্রতিশোধ ও মায়ার খেলা। যাঁরা খাঁটি-নাট্যরসের সন্ধানী, এসব কিশোরকোরকগুচ্ছ তাঁদের তৃপ্তি দেবে না। তবে তারুণ্যের অপরাধের প্রতি যাঁরা ক্ষমাশীল, তারুণ্যের মাধুর্য যাঁরা পেতে চান, তাঁরা উক্ত বইগুলো, পড়ে খুশিই হবেন। এখানে রবীন্দ্রের অপরিণত প্রতিভার দরুণ ত্রুটি হলো কুশীলবদের অবাস্তবতা, বর্ণনার আতিশয্য, কাহিনীর অসংগতি, সংলাপের দীর্ঘতা, ইত্যাদি। কিন্তু শিল্পগত এতসব স্খলন সত্ত্বেও, এই রচনাগুলি থেকে যে-কাব্যসৌরভ বিকীর্ণ হচ্ছে তা হৃদয়বান মানুষের চিত্তস্পর্শ করবেই—আর, মনোমদ এদের লাবণ্য।

কবির প্রথম নাটক **'বাল্মীকিপ্রতিভা'**-র রচনাকাল ১৮৮১। রবির বয়স তখন কুড়ি। একালেই রবীন্দ্রের কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয় প্রভৃতি কাব্য লিখিত হয়েছে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-নাট্যের ভাববস্তু হলো বাল্মীকির কবিত্বলাভ। একদা যে-ব্যক্তিটি ছিল দস্যু, সরস্বতীর করুণায় সহসা সে হয়ে উঠলো অদ্ভুতকাব্যরচনশক্তির অধিকারী। দস্যু-রত্নাকরের কবি-বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনীটি ইতঃপূর্বে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-কাব্যে বাণীবদ্ধ হয়েছে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-য় উক্ত 'সারদামঙ্গল'-এর প্রভাব সুপ্রকট। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথকে কতখানি মুগ্ধ করেছিলেন তার কিছুটা পরিচয় এতে মিলবে। জাতিবিচারে 'বাল্মিকীপ্রতিভা' গীতিনাট্য, যেহেতু, এ নাট্যে গীতিই মুখ্যস্থান অধিকার করে বসেছে—মূল নাটকীয় অংশে পদ্য বা গদ্য-সংলাপ নেই।

দ্বিতীয় নাটক—**'রুদ্রচণ্ড'**—প্রকাশকাল ১৮৮১। পূর্বোক্ত নাটকখানিও এই একই সালে রচিত। এ নাট্যরচনাটি কাব্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত। ট্র্যাজেডি-করুণ এর রস, ইংরেজিতে যাকে 'Tragedy of Revenge' বলে, 'রুদ্রচণ্ড' তা-ই। একে আগাগোড়া ব্যাপ্ত করে রয়েছে অনির্বাণ এক প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি। রবীন্দ্রের ট্র্যাজেডি-কল্পনাটি এখানে লক্ষ্য করবার মতো—মানুষের বিকৃত জীবনচর্যার ট্র্যাজেডি। এ নাট্যের কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

'রুদ্রচণ্ড' রাজা পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা-গ্রহণের জন্যে অরণ্যপ্রদেশে তিনি কালভৈরবের পূজা করেন। সঙ্গে রয়েছে তাঁর কন্যা অমিয়া। কিন্তু অমিয়া পিতার উচ্চাভিলাষবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—সে আপন মনে ফুল তোলে, গান গায়। এদিকে, পৃথ্বীরাজের সভাকবি চাঁদকবির সঙ্গে অমিয়ার সখ্য। চাঁদকবি অরণ্যে এসে অমিয়ার সঙ্গে গল্প করে, গান শেখায়। রুদ্রচণ্ডের নিকট এরূপ ব্যাপার অসহ্য। রুদ্রচণ্ড একদিন চাঁদকবিকে অপমানিত করলেন, আর-একদিন তাঁকে আক্রমণ করে বসলেন। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে রুদ্রচণ্ডই পরাজিত হলেন, এবং তাঁকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হলো। দ্বিগুণ আহত হয়ে রুদ্রচণ্ড প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্যে প্রাণপণ করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা, তিনি স্বহস্তে পৃথ্বীরাজকে বধ করবেন। তিনি অমিয়াকেও বিতাড়িত করে দিলেন। এদিকে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করতে এসেছেন। তিনি রুদ্রচণ্ডের নিকট দূত পাঠালেন পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করতে। দূত প্রত্যাখাত হলো, কারণ, তাঁর অঙ্গীকার, নিজ হাতেই তিনি পৃথ্বীরাজকে বধ করবেন। তিনি যখন রাজধানীর দিকে যাত্রা করেছেন, তখন সংবাদ পেলেন, পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত। প্রতিশোধ-গ্রহণের প্রবল ইচ্ছাই রুদ্রচণ্ডকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সুতরাং পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে তাঁর আর বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা রইল না। বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

এ-ই বর্তমান নাট্যকাব্যটির ঘটনা ও চরিত্র-পরিচয়। ঘটনার বাহুল্য নেই, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের ও ঘটনার সংঘাত ভাবময়, আর মেলোড্রামায় সমাপ্ত। আসলে, রুদ্রচণ্ড নাটকটিকে ঘিরে একটি অসংযত ভাবের লীলা রয়েছে। এর কাহিনীতে রোমাঞ্চকর কাল্পনিকতার স্পর্শ আছে, ভাবাভিব্যক্তি অপরিস্ফুট, রসনিষ্পত্তি সন্তোষজনক নয়।

তৃতীয় নাটক **'কালমৃগয়া'**—১৮৮২ সালে প্রকাশিত। এর সমকালীন কাব্য 'সন্ধ্যাসংগীত'। এটি একখানি গীতিময় নাট্য। গানই এখানে আদ্যন্ত সংলাপের কাজ

করেছে—গানের মাধ্যমেই চরিত্রগুলির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন দেশি ও বিলাতি সুর নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পূর্ববর্তী গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-র সংগীতগুলি তখন খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে এই নতুন পন্থায় কবি 'কালমৃগয়া' লিখলেন। এ নাট্যের কথাবস্তু হলো দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ। এতেও করুণ-রসের উৎসার—অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। প্রকৃতির সংসার ও মানবসংসারকে আশ্রয় করে পুত্রহারা মুনির ব্যক্তিগত শোক এই নাটকে বিশ্বগত শোকে পরিণত হয়েছে। অন্ধমুনির চরিত্রটি সুন্দর চিত্রিত, জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞাদৃষ্টি তাঁকে লৌকিক-শোকজনিত চিত্তবিক্ষোভের ঊর্ধ্বচারী করে তুলেছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম নাটক **'প্রকৃতির প্রতিশোধ'**, আর **'নলিনী'**—প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-তে। এসময়ে রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান' এবং 'শৈশবসংগীত'-এর যুগ চলছে। রসপরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখে 'নলিনী'-কে রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি বলা যেতে পারে। এতে নায়কনায়িকার [নীরদ-নলিনীর] মিলনের ওপরে আসন্নমৃত্যুর করাল ছায়া প্রসারিত, পরিণতি বিয়োগান্ত—বিষণ্ণতায় বিধুর। 'নলিনী'-তে ঘটনার আবর্ত নেই, দ্বন্দ্বময়তা অনুপস্থিত, হৃদয়াবেগের সহজ উচ্ছ্বাস অতিমাত্রিক। বাস্তবিককল্পতার অভাবে 'নলিনী' রোম্যান্স্-এর স্তরেই থেকে গেছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রের উল্লেখনীয় একখানি নাট্যকাব্য। নাট্যের দিক থেকে নয়, ভাবের দিক থেকে এ গুরুত্বপূর্ণ। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি তাঁর এই নাট্যকাব্যটির পরিচয় উল্লেখ করেছেন, এবং বলেছেন, এই নাটিকাখানিতেই প্রথম তাঁর একটি অতিপ্রিয় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ভাবনাটি হলো—বিশ্বের স্নেহসম্পর্ক ত্যাগ করে সন্ন্যাস-অবলম্বনে মুক্তি মেলে না—কেউ এরূপ করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর সমস্ত কাব্যের অন্তরালে সীমার মধ্যে অসীমের মিলনসাধনের যে পালা রয়েছে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ তা প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে। নাটিকাখানির কাহিনীটি এই :

নিভৃত গুহায় সাধনায় রত হয়ে সন্ন্যাসী 'জ্ঞানচিতানলে বিশ্ব ভস্ম' করেছে। তার বিশ্বাস, সংসারের মায়ার কুহক সে ভেঙেছে, জগতের সৌন্দর্য-মাধুর্য আর তাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না—সংসারের যাবতীয় আকর্ষণের ওপর সে জয়লাভ করেছে। সাধনার গর্বে সন্ন্যাসী রাজপথে বার হলো, এবং এক অনার্য হরিজনকন্যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। সকলেই এই ম্লেচ্ছকন্যাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর নিকট তো কোনো ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পেতে পারে না; তাই, ওই উপেক্ষিতা অনার্যকন্যাকে

সে আশ্রয় দিল। অতঃপর সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বালিকার প্রতি স্নেহে আবদ্ধ হতে লাগলো। বালিকার 'পিতা' সম্বোধনে তার হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবার স্নেহমায়ার সঙ্গে তার সন্ন্যাসের দ্বন্দ্বের শুরু। নিজেকে সে একবার প্রবোধ দিয়ে বোঝায় যে, স্নেহমোহের অতীত সে। কিন্তু পরক্ষণেই উপলব্ধি করে, প্রকৃতির বন্ধনে সে বাঁধা পড়েছে। এইভাবে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতির হাতে পরাজয় স্বীকার করে সন্ন্যাসী। বালিকার স্নেহ তাকে জগতে আনন্দের মধ্যে টেনে আনলো। পরিশেষে তার উপলব্ধি হয়েছে :

আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু ?···
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পুরাপুরি কাব্য—দৃশ্যে বিভক্ত হলেও, আত্মভাবোচ্ছ্বাসে-পূর্ণ একক চরিত্রের আরম্ভ ও পরিণামপ্রদর্শক কাব্য। এটিকে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সংকেতধর্মী নাটকগুলির অগ্রদূত বলে মনে করেছেন।

'মায়ার খেলা' নাটিকা—প্রকাশকাল ১৮৮৮। এর দুবছর আগে কবির 'কড়ি ও কোমল'-এর আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন পঁচিশ বছর। প্রণয়তৃষ্ণা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা তাঁর চিত্তে মাদকতার সৃষ্টি করেছে, এসময়ে কবি যৌবনস্বপ্নাতুর। মোহগ্রস্ত প্রণয়বাসনার ট্র্যাজেডির আলেখ্য এই 'মায়ার খেলা' —কারুণ্যে সিক্ত। মায়ার ছলনায় মানুষ সুখ-মরীচিকার পেছনে ছোটে। একদিন সুখ চলে যায়, কিন্তু অভিলষিত প্রেম মেলে না। বাসনাবহ্নি না নিভালে প্রণয়াস্পদকে পাওয়া যায় না, তখন কাছের মানুষটি অনেক দূরে। যতক্ষণ মোহাচ্ছন্ন ততক্ষণ মানুষ—'কারে ছেড়ে কারে চায়'। মায়াবশেই ধরার মানবমানবী : 'যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়, যাহা পায় তাহা চায় না'। প্রণয়জীবনের এই তত্ত্বটি 'মায়ার খেলা'-য় বাণীরূপ লাভ করেছে। এ নাটিকায় হৃদয়াবেগের প্রাবল্য, গীতই বড়ো স্থান পেয়েছে, নাটকীয়তা তেমন-কিছু নেই।

এইভাবে কৈশোরে ও প্রথমযৌবনে লেখা নাটকাকৃতি রচনা-কয়টি লিরিক-মুখ্য কাব্য হলেও, কিছু পরবর্তীকালের লেখা 'রাজা ও রানী' আর 'বিসর্জন'কে কাব্য বলে অত সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না। পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রের নাট্যকৃতি-মাত্রেই অল্পবিস্তর ভাবধর্মী। কিন্তু তাই বলে নাট্যরচনায় ঐকান্তিক প্রয়াস তিনি করেন নি, অথবা তাঁর নাট্যরচনায় নাট্যগুণ আদৌ নেই, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। 'রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'-শ্রেণীর রচনায় সংকেতধর্ম এবং 'নটরাজ-

ঋতুরঙ্গে' সংগীতধর্ম প্রভৃতি অভিব্যক্ত হলেও, এবং এগুলির মধ্যে ভিন্নজাতীয় নাট্যরচনার সজ্ঞান প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও, 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'গোড়ায় গলদ', 'চিরকুমার-সভা', 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং বিশেষভাবে 'তপতী'-র মধ্যে যথার্থ নাটকরচনায় কবি উৎসাহিত হয়েছিলেন, এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে প্রচলিত সাধারণ নাটকের মূলনীতিগুলির অনুসৃতি সকলের চোখে পড়বে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, এক প্রবৃত্তির সঙ্গে ভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—যা সাধারণ উত্তম নাট্যের মূলীভূত বিষয়—এগুলিতে তা পরিস্ফুট। এ ছাড়া, ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও অভাব নেই। কাহিনী ও প্লটের নাটকীয় গ্রন্থন, নাটকের সক্রিয় গতিশীলতায় বহু চরিত্র ও ঘটনার সংযোগ, যথোচিত অঙ্ক ও দৃশ্য-যোজনা এবং প্রারম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত পঞ্চসন্ধিসমন্বিত সুপরিকল্পিত নাট্যরীতির প্রয়োগের চেষ্টা এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-কবির নাট্যরচনার উৎসাহপূর্ণ এই প্রয়াসটুকু উপেক্ষা করলে চলবে না।

প্রাচীন হতে মধ্যযুগ ও আধুনিককাল পর্যন্ত নাট্যরীতির বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাঙ্ক নাটক হতে একাঙ্ক, বাস্তবধর্ম হতে ভাবধর্মে রূপান্তর, দৃশ্যপটাদি আনুষঙ্গিক বস্তুর পরিবর্তন, ইত্যাদি নাট্যসৃষ্টিকে নতুনতর পথে পরিচালিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিতেও অনুরূপ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। সাধারণ নাটক থেকে ভাবধর্মিতা ও সংকেতধর্মিতায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে নাটকের আভ্যন্তরীণ সংযোগে বহুবিচিত্র শিল্পকলায় রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করেছেন। সমগ্রভাবে লক্ষ্য করলে তাঁর নাট্যকলায় কাব্যধর্ম বা ভাবধর্মের অনুবৃত্তির সুত্রটিই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় বটে, এবং Thomson সাহেবের মন্তব্য : 'Tagore's dramas are vehicles of ideas rather than expression of actions'—মোটামুটি রবীন্দ্রনাট্য সম্পর্কে যথার্থ উক্তি। তথাপি, তিনি যে-সকল স্থানে সাধারণ নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন এবং সাধারণ নাট্যের আদর্শ যথাসম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন, সেই প্রয়াসের দিকটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে; এবং ওইরূপ নাট্যরচনায় যে অসাফল্য, তাকে ভাবধর্মের বিপাক বলে সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' এ দুটি রবীন্দ্রের উল্লেখ্য নাট্যকৃতি। ১৮৮৯ সালে 'রাজা ও রানী'-র আত্মপ্রকাশ। এসময়ে কবি বিখ্যাত 'মানসী'-র ভাবপরিমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। একালে কবির প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা ও প্রকৃতিচেতনা প্রায়-পূর্ণবিকাশের মুখে।

শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শে বহু বাঙ্‌লা নাটক রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও 'রাজা ও রানী' নাট্যরচনায় শেক্‌স্‌পীরীয় আদর্শ অল্পাধিক গ্রহণ করেছিলেন। এ নাটকের বস্তুপরিচয় খুব সংক্ষেপে এই :

জালন্ধরের রাজা বিক্রম রানী সুমিত্রার প্রতি আসক্তিবশত রাজকর্তব্য হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। এদিকে, সুমিত্রা চান, রাজা আসক্তি-পরিত্যাগপূর্বক কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। সুমিত্রার পিতার দেশের যে-সকল রাজকর্মচারীকে রাজা এতাবৎকাল প্রশ্রয় দিয়ে আসছিলেন, এবং যারা প্রজার কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থের দিকেই বেশি মনোযোগী ছিল, রানীর ইচ্ছা, বিক্রম তাদের বিতাড়িত করেন। ফলে রাজার সঙ্গে রানীর বিরোধ বাধলো। রাজবয়স্য দেবদত্ত রাজার অন্যায়ের পোষকতা করতে না পেরে রানীর সঙ্গে সম্মিলিত হলেন। বিরোধ ক্রমেই বেড়ে চললো। কাশ্মীরদেশের লোকেরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করছে, এবং রানীর প্রতি আসক্তিবশত রাজা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, রানী সুমিত্রার এ সহ্য হলো না। তিনি রাজাকে না জানিয়ে কাশ্মীরে চলে গেলেন এবং ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করে ওইসকল বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারীকে দণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর থেকে ভ্রাতার সঙ্গে জালন্ধর যাত্রা করলেন। রাজা এই সংবাদে অতিশয় ক্ষিপ্ত হলেন, এবং তাঁর রাজ্যে এ অনধিকার হস্তক্ষেপ ভেবে, কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে চললেন। বিরোধ অত্যন্ত উগ্র এবং জটিল আকার ধারণ করলো।

কুমারসেন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন নি এবং যুদ্ধ করবেন না। সুতরাং তিনি কাশ্মীরে ফিরে গেলেন এবং অরণ্যে আশ্রয় নিলেন। বিক্রম কাশ্মীর অধিকার করলেন, এবং কুমারকে ধরে দিলে পুরস্কার দেবেন, একথা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন। এদিকে, কুমারসেনের সঙ্গে ত্রিচূড়ের রাজকুমারী ইলার প্রণয় ছিল, বিবাহও স্থির হয়ে এসেছিল। কুমার পলাতক শুনে, ত্রিচূড়ের রাজা বিক্রমকেই কন্যা দেবেন, স্থির করলেন। বিক্রম কিন্তু ইলার সঙ্গে সাক্ষাতে কুমারের প্রতি তার অনুরাগের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হলেন, এবং কুমারের সন্ধান করে ইলার সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন, কৃতসংকল্প হলেন। রাজা বিক্রম নিজেও সুমিত্রাকে ফিরে পাবার জন্যে অন্তরে উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন। এইরূপে, রাজার অনুতাপের সময় যখন আসন্ন এবং সমস্ত বিরোধের পরিসমাপ্তি যখন স্বাভাবিক, এমন সময় কুমারের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে সুমিত্রা স্বয়ং রাজার নিকট উপহার দিতে আসলেন, এবং এসেই মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। সে-মূর্ছা আর ভাঙলো না। এভাবে মেলোড্রামার মতো করে নাটকটি শেষ হয়েছে।

দেখা যায়, প্রারম্ভিক বিরোধ এবং বিরোধের ক্রমবর্ধমান অবস্থার মধ্য দিয়ে নাটকটি মন্দ চলছিল না। কিন্তু সমাপ্তির মুখে কুমারসেন ও ইলার প্রণয়বৃত্তান্তের ওপর কিছুটা বেশি জোর দিয়ে এবং আকস্মিক মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়ে এই বিরোধের পরিণাম ঘটানো হয়েছে। 'রাজা ও রানীর'-র অসাফল্য কবির নাট্যসৃষ্টিরই অসাফল্য, বিশেষ কোনো আদর্শ-ভাবধর্মের জন্যে এরূপ ঘটেনি। এই নাটকের সংস্কারসাধন করে পরবর্তীকালে [১৯২৯ সালে] কবি '**তপতী**' রচনা করেছিলেন। 'তপতী'-তে হয়তো বিরোধের দিকটিকে উগ্র করে স্বাভাবিক পরিণাম ট্র্যাজেডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত 'তপতী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের আদর্শভাবুকতাও কম প্রসারলাভ করে নি। তা ছাড়া, কারো কারো মতে 'রাজা ও রানী'-তে মানবীয় নাট্যগুণ অধিক ; 'তপতী' ভাবাদর্শে সমাচ্ছন্ন হয়ে মানবীয় স্বাভাবিকতা বিসর্জন দিয়েছে। উভয় নাটকে মূলকথাবস্তুর মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা গেলেও 'তপতী' যে ভিন্ন নাটক হয়ে গেছে এ অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখতে হবে, উভয় নাটকের রচনাকালের ব্যবধান প্রায় চল্লিশ বছরের। এরই মধ্যে রবীন্দ্রের ভাবদৃষ্টিতে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে।

তারপর '**বিসর্জন**'—১৮৯০-তে প্রকাশিত। এটি 'মানসী'-র কাল। এই নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের অতিশয় শক্তিশালী শিল্পকৃতি। প্রেমের সঙ্গে প্রথা ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে প্রেমের জয়—এই ভাবটি নাট্যরচনায় মূল হলেও—রচনায় চরিত্রচিত্রণ, প্লটের গ্রন্থন, দৃশ্যাদির সংযোজনের মধ্যে ভাব প্রধান হয়ে উঠে নাটকীয়তা খর্ব করে দিয়েছে, এরূপ মনে করা সমীচীন হবে না।

প্রথা ও সংস্কারপালন এবং উগ্র ব্রাহ্মণ্যের প্রতিমূর্তিরূপে রঘুপতি দণ্ডায়মান। বলির প্রথা বন্ধ করেছেন বলে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। গোবিন্দমাণিক্যই যদিও নাটকটির সর্বগুণসম্পন্ন নায়ক, কিন্তু অঙ্কনের দিক থেকে রঘুপতি-চরিত্রই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই উগ্র, একরোখা ও অমিতশক্তিসম্পন্ন চরিত্রটি নির্মাণ করে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি ; প্রকট মিথ্যা ও গোপন জঘন্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত করে চরিত্রটিকে তিনি অনেকটা হীন করে ফেলেছেন। নাট্যসৃষ্টির এই ত্রুটি অনস্বীকার্য। অন্যথায়, রঘুপতির অনুতাপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চমৎকার ট্র্যাজেডি নির্মাণ করা চলতো। কিন্তু 'বিসর্জন'-এ ট্র্যাজেডি-রচনায় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল না, শান্তরসে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটানোই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাই, বিরোধকে অধিকদূর অগ্রসর হতে না দিয়েই মাঝপথে আকস্মিকভাবে ছেদ টেনেছেন। এই আকস্মিক পরিণামের পথে প্রধানভাবে

সহায়তা করেছে একটি প্রেক্ষণীয় চরিত্র—জয়সিংহ। এ চরিত্রের নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে জর্জরিত জয়সিংহ দর্শকের যতখানি সহানুভূতি লাভ করে ও দর্শকচিত্তের চমৎকৃতির সহায়ক হয়, এমনটি বিকৃতস্বভাব রঘুপতি নয়, ধীরপ্রশান্ত গোবিন্দমাণিক্যও নয়।

জয়সিংহ প্রথা ও সংস্কার অনুসরণের মধ্যে বর্ধিত হয়েছিল। এদিকে, অপর্ণার আহ্বানে তার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে, তার মোহ ভেঙেছে। কিন্তু পালকপিতা রঘুপতির কথা মিথ্যা, দেবী মিথ্যা, এ স্থিরভাবে বুঝে নিতে গিয়ে তার হৃদয়দেশ বিদীর্ণ হচ্ছিল। এইরূপে ঘোর সংশয়ের মধ্যে পড়ে আত্মহত্যার দ্বারা সে নিজ সংশয়ব্যাকুলতার যেমন অবসান ঘটালো, তেমনি, রঘুপতির চরিত্রেও আকস্মিকভাবে পরিবর্তন আনলো। বস্তুত, এই আকস্মিকতার দ্বারা যুক্ত হয়ে নাটকের পরিণাম বহুলপরিমাণে মেলোড্রামার মতো [অর্থাৎ অতিনাটকীয়] হয়েছে। লেখকের অভিপ্রেত প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্লটে-কাহিনীতে, চরিত্রগত বিরোধে-দ্বন্দ্বে রমণীয় একটি নাটক প্রস্তুতি থেকে পরিণাম পর্যন্ত অনিবার্য বেগে ধাবিত হতে পারলো না। জয়সিংহ-চরিত্রের গঠন ও তার আকস্মিক নির্বাণে নাটকের আকর্ষণীয়তার শিথিলতার দিকটি লক্ষ্য করেই স্বয়ং কবিকেও দর্শকদের সমালোচনা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে লিখতে হয়েছিল : 'কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।' যাই হোক, ভাবগর্ভ হলেও, নাটকীয় প্রস্তুতির দিক থেকে 'বিসর্জন' উল্লেখযোগ্য, এতে সন্দেহ নেই।

'বিসর্জন'-এর পরবর্তী রচনা—'**চিত্রাঙ্গদা**', প্রকাশকাল—১৮৯২। জাতি-বিচারে একে নাট্যকাব্যই বলবো। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ও ভাষাভঙ্গির চমৎকারিত্বে 'চিত্রাঙ্গদা' অপূর্ব। এর রচনার পশ্চাতে—প্রেমে ও জীবনযাত্রায় পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেই নারীপুরুষের মিলন সার্থক, রূপমোহ ও যৌনস্পৃহার চরিতার্থতার মধ্যে নয়—এরূপ একটি আইডিয়া বিদ্যমান থাকলেও, এই ভাবাদর্শ নাটিকাটির রূপায়ণসৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করে নি। অবশ্য নাটিকাটিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরিচয় ক্ষীণ, যৌবন ও সৌন্দর্যস্বপ্নের চিত্র অধিক—সেইদিক থেকে এ চিত্রকাব্যময়। একে নাটক করবার অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না বলেই মনে হয়। কথোপকথনের ছলে এটি মহৎ একটি গীতিকবিতা—এর সর্বাঙ্গে লিরিকের সুকুমার সৌরভ। তথাপি, স্থানে স্থানে বহির্দ্বন্দ্বের পরিচয় ফুটে ওঠেনি এমন নয় ; যেমন, মদন ও বসন্তের বরে রূপযৌবনপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাতে। রূপযৌবন অন্তর্হিত হওয়ার পূর্ব থেকে চিত্রাঙ্গদার, এবং মোহভঙ্গের সময় অর্জুনের, অন্তর্দ্বন্দ্বেরও কিছু পরিচয় রয়েছে। নাটিকাটি ঘটনাবিরল এবং বিরলচরিত্রও বটে। সুতরাং বলা যেতে

পারে, এতে কাব্যের সঙ্গে নাট্যের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা'-র চমৎকারিত্ব এর কাহিনী এবং প্লটের নির্মাণে। মহাভারতের অতিসামান্য ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী এর পশ্চাতে রয়েছে মাত্র, বাকি সবই নতুন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে—কুরূপা চিত্রাঙ্গদার মদন ও বসন্তের বরে রূপপ্রাপ্তি, অর্জুনের মোহ, চিত্রাঙ্গদার নিজ রূপকে সপত্নী বলে ধারণা করা, রূপের বরকে প্রত্যাখ্যান, অর্জুনের মোহভঙ্গ—প্রভৃতি চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার একে সংস্কৃত-নাটকের পরিবেশ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, আর উক্তিভঙ্গির মধ্যেও সংস্কৃতের অনুরূপ অলংকারময় বচন-চাতুর্য রক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে [১৯৩৬] কবি 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছেন। এর মধ্যে যে-সূক্ষ্ম ভাবটি রয়েছে [প্রণয়জীবনে নারীর দেহগত সৌন্দর্যই তার সপত্নীর মতো হয়ে দাঁড়ায়—এই ভাবটি] তা সুরেলা কাব্যে ও ছন্দোময় নৃত্যে যতখানি ফোটে ততখানি নাটকের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে নয়।

বাঙলা সাহিত্যে ভালো কমেডির সংখ্যা অত্যন্ত কম। যে-দুয়েকখানি রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' তাদের অন্যতম। এর কাহিনী শেক্স্পীয়রকেই মনে করিয়ে দেয়—দুই যুগল, ছদ্মবেশ, ভ্রান্তির চক্রে পাত্রপাত্রীর ঘুরপাক খাওয়া, ইত্যাদি বস্তু শেক্স্পীয়র তাঁর কমেডিতে উপকরণ-হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'গোড়ায় গলদ'-এ অনেকগুলি সজীব চরিত্রের দেখা মেলে, প্রত্যেককে তার বিশিষ্টতায় সহজে চেনা যায়। উদার অকুণ্ঠ অথচ অত্যুক্তিবর্জিত হাস্যরস একে মনোজ্ঞ কান্তি দিয়েছে। এ ছাড়া, রয়েছে রসিকতাপূর্ণ সংলাপ। শুধু পরিস্থিতির হাস্যোদ্দীপকতা আর কৌতুকময় আচরণের ওপরে এ নাটক দাঁড়িয়ে নেই। এসব কারণে, প্রহসনের পর্যায়ে বিন্যস্ত না করে, 'গোড়ায়-গলদ'কে আমরা কমেডির শ্রেণীভুক্ত করতে চাই। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। এতে কিছুকিছু ত্রুটি ছিল, তা কবির চোখ এড়ায়নি। তাই, বহুকাল পরে—১৯২৮ সালে—কবি এ নাটককে পরিমার্জিত একটি রূপ দিলেন, এবং তার নাম রাখলেন—'শেষরক্ষা'। নাট্যকর্মহিসেবে 'শেষরক্ষা' নিখুঁত।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিসর্জন'-এর সঙ্গে তুলনায় 'মালিনী' নাট্য [প্রকাশকাল —১৮৯৬, এসময়ে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' প্রকাশিত হয়েছে] অধিকতর ভাব-প্রেরণার দ্বারা গ্রথিত। 'মালিনী'-র উপাখ্যানটি বৌদ্ধকাহিনী থেকে গৃহীত এবং কল্পনার দ্বারা মিশ্রিত। রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন, এতে ব্রাহ্মণেরা ক্ষিপ্ত হয়েছে। তারা মালিনীর নির্বাসন চায়। রাজা মালিনীকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। মালিনীও রাজগৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকতে চান না। রাজগৃহ থেকে মালিনীর নিষ্ক্রমণের ব্যাপারটির সঙ্গে কবির 'এবার ফিরাও

মোরে' নামে বহুশ্রুত কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবের লক্ষণীয় মিল রয়েছে। মালিনীর বৌদ্ধধর্মগ্রহণে প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষ নিয়ে নেতৃত্ব করছেন ক্ষেমংকর; আর, মালিনীর নবধর্ম অনুসরণ করতে চান ক্ষেমংকরের বন্ধু সুপ্রিয়। সুপ্রিয় মালিনীর চরিত্রমাধুর্যে মোহিত। এমন কি, বিদ্রোহী প্রজারাও মালিনীর বশীভূত। কিন্তু ক্ষেমংকর দমবার পাত্র নন। তিনি গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করে রাজ্যের এই অনাচার-দূরীকরণে কৃতসংকল্প। ক্রমে ক্ষেমংকরের সঙ্গে সুপ্রিয়ের বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে। ক্ষেমংকর সৈন্য নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করবার পূর্বে সুপ্রিয় রাজাকে এই সংবাদ দেন, এবং রাজা পথেই ক্ষেমংকরকে পরাজিত করে বন্দী করে আনেন। ক্ষেমংকরের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হলো। মালিনী রাজাকে অনুরোধ জানালেন তাকে ক্ষমা করতে। রাজা স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তার পূর্বে অসমসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষেমংকর মৃত্যুভয়ে ভীত কিনা তা পরীক্ষা করবেন।

বন্দী ক্ষেমংকরকে রাজসকাশে নিয়ে যাওয়া হলো। ক্ষেমংকরের এতটুকু মৃত্যুভয় নেই। বরঞ্চ এমন কথা তিনি প্রকাশ করলেন যে, জীবনদানের দ্বারাই ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। তারপর তিনি বন্ধু সুপ্রিয়কে নিকটে আসতে আহ্বান করলেন। সুপ্রিয় নিকটে এলে বন্দী নিজ হাতের লৌহশৃঙ্খল দিয়ে সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত হানলেন। ফলে সুপ্রিয় প্রাণ হারালেন। মালিনী অপরাধী ক্ষেমংকরকে মার্জনা করতে বললেন। বৌদ্ধধর্মের এইরূপে জয় হলো।

মালিনী, ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়—এই তিনটিই বর্তমান নাটিকার প্রধান চরিত্র। এর মধ্যে মালিনীর চরিত্রচিত্রণ অভিনব, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষেমংকরের চরিত্র-নির্মাণেই সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত যত্ন-সহকারে চিত্রিত করেন, এ একাধিকবার লক্ষিত হয়েছে। 'মালিনী'-তে নাট্য অপেক্ষা কাব্যের অংশই অধিক, যদিও প্লটের গ্রন্থন মন্দ নয়। 'মালিনী'-কে Dramatic lyric বলেই মাঝে মাঝে ভুল হয়, Lyrical drama বলতে মন চায় না।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' [১৮৯৭-তে প্রকাশিত] হাস্যরসাত্মক বহু-অভিনীত একখানি নাটক। বাতিকগ্রস্ত একটি চরিত্রকে ভিত্তি করে এখানে ব্যঙ্গবিদ্রূপবর্জিত হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। কৌতুকজনক পরিস্থিতি, রসিকতাপূর্ণ সংলাপ এতে খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে—হাসির সঙ্গে কারুণ্যের মিশ্রণ। এ নাটিকা বিশুদ্ধ প্রহসন-জাতের, এতে 'dramatising the ludicrous'-ই নাট্যকারের লক্ষ্য।

একালে নতুন পর্যায়ের নাট্যকবিতা বা সংলাপকবিতা লিখতে রবীন্দ্রনাথ

প্রবৃত্ত হন—'বিদায়অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস', '**কর্ণকুন্তী-সংবাদ**', '**সতী**', '**লক্ষ্মীর পরীক্ষা**'—বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এদের কলেবর সংক্ষিপ্ত, চরিত্র স্বল্প, ঘটনা মাত্র একটি। অথচ এই সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যেই স্থানে স্থানে এগুলিতে উৎকৃষ্ট নাটকীয়তার পরিচয় রয়েছে। '**গান্ধারীর আবেদন**' তো তীব্র conflict-এ পূর্ণ এবং অংশবিশেষে উত্তম নাটকের সমকক্ষ হওয়ার যোগ্য। তবে নাটকীয় পরিস্থিতি বলতে যা বোঝায়, নাট্যকার তার সুযোগ বেশি গ্রহণ করেছেন '**কর্ণকুন্তী-সংবাদ**'-এ। '**নরকবাস**'-এর সমাপ্তি ইঙ্গিতপূর্ণ। '**সতী**'-র সমাপ্তিতে ট্র্যাজেডির হৃদয়বিদারক দুঃখ রয়েছে। '**লক্ষ্মীর পরীক্ষা**'-কে অভিনয়যোগ্য ক্ষুদ্রকায় একটি নাটিকা বললে খুব আপত্তি উঠবে, মনে হয় না। এতে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার হাস্যরস জমিয়েছেন। সংলাপের বাস্তবিকতা ও নাটকীয়তা, ছন্দের কারসাজি, চমকপ্রদ মিলের অজস্রতা, হাসির পাশে শ্লেষের চকিত ঝলসন—সবকিছু মিলে একে উপাদেয় একটি শিল্পনির্মিত করে তুলেছে।

'**সতী**' ও 'নরকবাস' 'কাহিনী'-র অন্যান্য রচনাগুলির ন্যায় সকলের তেমন পরিচিত নয়—'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' সর্বজনপরিচিত। মহাভারতের তীব্র জীবনসংঘর্ষের দুয়েকটি সমুন্নত অংশ অথবা কোনো উপাখ্যান, যা নিয়ে আখ্যান-কাব্য রচিত হতে পারতো, কবি তাকে নাট্যরূপে গ্রথিত করেছেন। এর ফলে ব্যক্তির বক্তব্য তার নিজমুখে প্রকাশিত হওয়ায় এক-একটি চরিত্র সমগ্র রূপ পেয়েছে ও তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে। 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' এবং 'গান্ধারীর আবেদন'-এ মহাভারতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত উক্তিকে সামঞ্জস্য দান করে একত্র স্থাপন করেছেন। এইভাবে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে সংক্ষেপে অতি-উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গান্ধারী-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের প্রায় নিজস্ব সৃষ্টি। মহাভারতের স্বল্পপরিসরের মধ্যে গান্ধারী সম্বন্ধে কয়েকস্থলে যে উল্লেখ আছে তার ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ একটি মহীয়সী নারীর চরিত্র গঠন করেছেন। কর্ণের চরিত্রে মাতৃস্নেহব্যাকুলতা এবং কবিত্বময়তা রবীন্দ্রের নতুন যোজনা। কুশলী শিল্পীর হাতে পড়ে এসকল অল্পাধিক নতুনত্ব সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়ে আধুনিক পাঠকের মানস-প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে। একালের ভাবুকতা ও মানসিকতার স্পর্শ পেয়ে পৌরাণিক কল্পনা অভিনব কলেবর গ্রহণ করেছে; বলতে হয়—কবি রবীন্দ্র পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। এ তাঁর মস্তবড়ো এক কীর্তি। বাঙলা পৌরাণিক নাটকগুলির দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের এই কীর্তির সঠিক পরিমাপ করা যাবে।

মহাভারতের এইসকল চিত্র ও চরিত্র-উপস্থাপনের মধ্যে কেউ কেউ কবি-

মানসের বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রবণতার ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন। যেমন, বলা যায়, 'বিদায় অভিশাপ'-এর মধ্যে প্রণয় অপেক্ষা কর্তব্যের মহিমা অধিক, এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে ; 'গান্ধারীর আবেদন'-এ রাজধর্ম থেকে মানবধর্মকে শ্রেয় বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে : 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ লোকধর্মের ভয়ে সহজ মাতৃত্বের অবহেলার নিন্দা করা হয়েছে ; এবং 'নরকবাস'-এ শাস্ত্র ও প্রথার অনুগত নিষ্ঠুর ধর্মপালনের নিষ্করুণ দিকটি উপস্থাপিত করা হয়েছে। আধুনিক কবিমানসের এই ভাবপ্রবণতার দিকটি যথার্থ হলেও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তা এসব নাটিকার কাব্যিক আবেদনকে খর্ব করে কোথাও তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি—চিত্রনির্মাণে ও চরিত্রগঠনে অপূর্ব হয়ে উত্তম কাব্যাকারেই এই অংশগুলি অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এগুলি নাট্যাকারে কাব্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে নানা আকারে অভিব্যক্ত নাট্যগুণও উপেক্ষার বস্তু নয়।

এরপর রচিত হয় 'হাস্যকৌতুক' [১৯০৭], 'ব্যঙ্গকৌতুক' [১৯০৭], 'প্রায়শ্চিত্ত' [১৯০৯], এবং 'শারদোৎসব' [১৯০৮]। **'হাস্যকৌতুক'**-এর অন্তর্গত কয়েকটি কৌতুকনাট্য বালকদের আমোদ দেবার জন্যে লিখিত। নাম থেকেই বোঝা যায়, **'ব্যঙ্গকৌতুক'** বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক নয়, কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশ্রিত রয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত 'বশীকরণ'-এর অভিনয় অনেকেই দেখে থাকবেন। **'প্রায়শ্চিত্ত'** নাটকের বিষয়বস্তু কবির লেখা উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' থেকে সংগৃহীত। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নভাবে—কী ব্যক্তিজীবনে, কী জাতীয় জীবনে—হিংসা ও উন্মত্ততার উলঙ্গ প্রকাশকে নিন্দা করেছেন, রুদ্রপন্থাকে ঘৃণার্হ বলে বুঝিয়েছেন, শক্তির প্রকাশের চেয়ে প্রেমের প্রকাশকে মহিমময় করে দেখিয়েছেন। কবির চোখে 'মারা'র মহিমা অপেক্ষা 'মরা'র মহিমা সমধিক। রবীন্দ্রের ধর্মবোধে হিংসার স্থান নেই, শক্তিমদমত্ততার স্থান নেই। কারণ, এসব বস্তু মানুষকে অমানবিক করে তোলে, তাকে পাপের পথে ঠেলে দেয়, এবং একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় অনেককে। প্রতাপাদিত্যের জীবনসাধনা শক্তিকেন্দ্রিক, মনুষ্যত্বকে তিনি বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি যে-পাপ করলেন তার ফলে কয়েকটি হৃদয় দুঃখের আগুনে পুড়েছে—এরই নাম 'প্রায়শ্চিত্ত'। এই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র অতিশয় উল্লেখ্য। একেই আবার আমরা দেখতে পাই পরবর্তীকালে লেখা 'মুক্তধারা' নাটকে। ১৯২৯ সালে **'পরিত্রাণ'** নামে যে-নাটকটি প্রকাশিত হয়, তার উপকরণ সমাহৃত হয়েছে 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে।

* *
*

'কাহিনী'র নাট্যকাব্যগুলি এবং 'গোড়ায় গলদ' ইত্যাদির মতো নাটক রচনার পরের পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেন, তেমনি, নাট্যরচনাতেও নতুনতর ভাব ও ভঙ্গির প্রবর্তন ঘটান। 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' প্রভৃতি কবির 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য'-এর সমসাময়িক রচনা। প্রকৃতিব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপরাজ্যে পরিভ্রমণের স্পৃহা যেমন একালের কাব্য ও সংগীতগুলি নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি, নাট্যরচনাকেও অতিরিক্ত ভাবময় ও অরূপরাজ্যে প্রবেশের সাংকেতিক মাধ্যম করে তুলেছে। তা ছাড়া, বর্তমানের ধনতন্ত্রশাসিত সমাজের বহুতর সমস্যা, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার অতিশয় নিষ্ঠুরতার দিকও রবীন্দ্রনাথ দুয়েকখানি নাটকে নৈপুণ্যসহকারে রূপায়িত করেছেন। কী সামাজিক, কী রাষ্ট্রিক—মানবতাবিরোধী কোনো প্রতিষ্ঠানকেই কবি ক্ষমার চোখে দেখেন নি। এখন থেকে নাটকের চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ ও দৃশ্যসংযোজন এমনভাবে করেছেন যাতে দর্শকের চিত্ত সহজেই কবির অভিপ্রেত নিবিড় ভাবলোকে পরিভ্রমণ করতে পারে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবীয় সংঘর্ষের দিকটি এইসকল নাট্যে স্বাভাবিকভাবেই স্থান পায়নি। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনবশে এইসকল নাটকে প্রচুর সংগীতের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এইরূপ নাট্যের ধারা 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'তাসের দেশ'-এ শেষ হয়েছে। নৃত্যগীতাদি-সংবলিত ঋতুনাট্য এবং আরো পরবর্তীকালের মূকাভিনয় এবং শুধু নৃত্যের দ্বারা প্রকাশিত নাটিকা রবীন্দ্রনাট্যশিল্পকলাকে অপরিসীম বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাজা'-র [প্রকাশকাল —১৯১০] স্থান সর্বোচ্চে। এ নাটকে রূপক-সংকেতের সার্থকতম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এতে অরূপের রূপ দেখার সমস্যাটিই নাট্যীকৃত হয়েছে। অন্তরের নিভৃত নির্জনে যিনি অরূপ, তিনিই বহির্ভুবনে বহুবিচিত্ররূপে বিরাজ করছেন। সহজবোধের আলোকে আগে অন্তরলোকের অন্ধকাররাজ্যেই রাজাকে [অরূপরূপী প্রিয়তমকে] দেখে নিতে হবে। সেখানে তাঁকে যদি চিনতে না পারা যায়, তাহলে আলোকোদ্ভাসিত বহির্লোকে কদাপি তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না। স্থূল ইন্দ্রয়দৃষ্টি বিভ্রম জন্মায়, রূপের মায়ায় অরূপ কোথায় হারিয়ে যায়। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য, বিশেষের প্রতি আসক্তি, অহংকার—সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পূর্ণ-আত্মনিবেদন যে করতে শিখেছে, হৃদয়ের ধন রাজার সঙ্গে তার মিলন হবেই—আত্মার নিভৃত নিকেতনে, সেই একলা ঘরটিতে। একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারেই 'রাজা' লভ্য, প্রেমের ডাকেই বুকের ভিতরে রাজার পদপাত হয়, তখন—'আমার সমস্ত শরীরে

তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি'—এই হলো 'রাজা' নাটকের মর্মকথা। এ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন, 'রাজা' অর্থাৎ ভগবান শুধু কোমলসুন্দর নন, তিনি ভয়ংকর-সুন্দর। এই উভয় রূপে দেখাই তাঁকে যথার্থ দেখা। প্রতীকী নাটকে পাত্রপাত্রীর মানসসংঘাত তেমন প্রত্যাশিত নয়; সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবানুভূতির সংকেতধর্মী, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ প্রকাশই এখানে লক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু 'রাজা' নাটকে মানসদ্বন্দ্ব আছে, ঘাতপ্রতিঘাতে-চঞ্চল নাট্যক্রিয়া রয়েছে। অধ্যাত্মসত্যের সার্থক নাট্যরূপায়ণে 'রাজা' রবীন্দ্রপ্রতিভার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এরই রূপান্তরিত সংস্করণ **'অরূপরতন'**—প্রকাশকাল ১৯২০।

'রাজা'র দুবছর আগে প্রকাশিত **'শারদোৎসব'** উল্লেখনীয় একখানি ঋতুনাট্য —শান্তিনিকেতনে শরৎকালের ঋতু-উৎসবের জন্যে রচিত। এখানে রবীন্দ্রের প্রকৃতিব্যাকুলতা ও অরূপব্যাকুলতা মিলেমিশে একীভূত হয়ে গেছে। নিসর্গপ্রকৃতির রূপরসের মধ্যে চিত্তকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতে পারলে বৈষয়িকতামুক্ত আনন্দচৈতন্য-লোকে মানবাত্মার মুক্তি, এটি রবীন্দ্রজীবনদর্শনের একটি বড়ো কথা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির অরূপ-অনুভবের কথা—বিশ্বপ্রকৃতির বহুবিচিত্র রূপের মধ্যে রূপাতীত রহস্যময় পরমরসাস্পদকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তখন মানুষের সমগ্র প্রাণসত্তা বিস্ময়াপ্লুত সুরে বলে ওঠে: 'আমার নয়নভুলানো এলে। আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে'। বাইরে থেকে দেখলে 'শারদোৎসব' ছুটির নাটক—স্থূল পার্থিবতার বন্ধন থেকে ছুটি। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে দেখলে, বুঝতে পারি, 'শারদোৎসব'-এ শুধু ছুটি আর খেলার কথাই বলা হয়নি, কর্মময় জীবনে দুঃখকে বরণ ও দুঃখাতিক্রমণের কথাটিও এতে আভাসিত হয়েছে। কর্তব্যকর্ম যতই দুঃখময় হোক তা করে যেতেই হবে। এ না করতে পারলে ঋণশোধ হয় না—মানবজীবনে আনন্দের ঋণ। প্রকৃতির সংসার ও মানবসংসার দুঃখের মূল্যেই অহরহ নিরলস চেষ্টায় এই ঋণশোধ করছে। কষ্ট করার মধ্যেও ছুটির আনন্দ আছে, মুক্তির আনন্দ আছে। রবীন্দ্রদর্শনে দুঃখের রূপ মধুরতম, দুঃখের মধ্যেও অসীম বা অরূপের অভিব্যক্তি। এদিক দিয়ে কবির অরূপতত্ত্বের সঙ্গে দুঃখতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। দুঃখ-বিপদ-মৃত্যুকে বরণ না করলে মানুষের যথার্থ অরূপানুভূতি ঘটে না। 'রাজা' নাটকেও এসব বলা হয়েছে। **'ঋণশোধ'** 'শারদোৎসব'-এরই সংক্ষেপিত রূপান্তর—প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। রবীন্দ্রনাট্যে রূপকপ্রবণতা ও সাংকেতিকতা 'শারদোৎসব' থেকেই। এ নাটক মুক্তআত্মার আনন্দে স্পন্দিত, ভাবরসে উদ্বেল। এর মধ্যে যে গান আছে তা অরূপের সংকেতসূচক।

তারপর, 'ডাকঘর' আর 'অচলায়তন'—উভয়ের প্রকাশকাল ১৯১২। চৈতালি,

উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, ইত্যাদি এ দুটি নাটকের প্রায়-সমকালীন রচনা। 'শারদোৎসব'-এর প্রকৃতিব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপ-উপলব্ধি **'ডাকঘর'**-এ অপূর্বসুন্দর নাট্যরূপ পেয়েছে। অতি উত্তম প্রতীকী নাটকহিসেবে এর স্থান ঠিক 'রাজা'-র পাশে। এসব রচনা প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক, এদের বলা যায়—'Inner drama of the soul'। প্রকৃতিলোক থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই 'ডাকঘর'-এর অমলের মন গৃহত্যাগী, প্রকৃতির সংসারের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের মধ্যে তা উধাও হয়ে যেতে চায়। তার আত্মার তৃষ্ণা তাকে প্রকৃতি-অনুরাগী করে তুলেছে। এই অনুরাগের আবেগে সে চঞ্চল, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুতীব্র বাসনা তার। সংসারী মাধব দত্তের পার্থিবতা ও পুঁথির শাসন সুদূরের পিয়াসী বালক অমলের আত্মাকে পীড়িত করেছে, রুগ্ন করে তুলেছে। সে মুক্তি-অভিলাষী। রাজার চিঠি পাওয়ার জন্যে তার আকুলতার শেষ নেই। রাজার কাছে তার কাঙ্খিত—চিঠি বিলি করতে পাওয়ার দায়িত্বটুকু। চোখের সম্মুখে রাজার 'ডাকঘর' সে দেখতে পায়, যেখান থেকে বিলি হচ্ছে কত কত চিঠি। নিখিল বিশ্বসংসারই তো বিশ্বলোকেশ্বরের প্রকাণ্ড একটি ডাকঘর। রাজা সকলের কাছেই চিঠি পাঠিয়েছেন। যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ তারাই ওই চিঠি পড়তে পায়, সাংসারিকতায়-আবিলদৃষ্টি মানব ওর সন্ধান জানে না। প্রকৃতিব্যাকুল অমলের কাছে রাজা আত্মপ্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমলের আত্মা অসীমতায় মুক্তি পেয়েছে। ঠাকুরদাদা এখানে [যেমনটি 'রাজা' আর 'অচলায়তন' নাটকে] ভগবানের প্রতিভূ। এই মুক্তস্বভাব পুরুষটিই বিশ্বসংসারের বিচিত্র রূপপ্রকাশে অরূপকে চাক্ষুষ করেছেন। 'ডাকঘর'-এ নাটকীয়তার চেয়ে লিরিক-মূর্ছনাই অধিক, একে গদ্য-গীতকবিতা বললে কিছুই ভুল বলা হয় না। এর রচনারীতিতে কিছুটা বাস্তবিককল্পতা আছে, বাকিটা রূপক-সংকেতের মিশ্রণ।

'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপলব্ধ অরূপকে বাস্তব সংসারের সীমায় নামিয়ে এনেছেন, তাঁকে দিয়ে যুগজীর্ণ অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙেছেন। মূঢ় প্রথা, বিচারহীন আচার, অন্ধসংস্কার মানুষের চলমান জীবনকে অতিসংকীর্ণ একটি গণ্ডীর মধ্যে বেঁধেছে। এতে বন্দী থেকে মানবাত্মা পীড়িত, তার উন্নততর জীবনবিকাশের পথ রুদ্ধ—অচলায়তনিকদের জীবনে কল্যাণের শুভ্রভাস স্পর্শ নেই। বর্তমান নাটকে মানবসত্যের সাধক রবীন্দ্রনাথ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছেন। অরূপ এলেন ভাঙনের মহারথে। এই অরূপের স্থান অধিকার করেছেন দাদাঠাকুর বা গুরু। কবির তীক্ষ্ণ শ্লেষ, তীব্র বিদ্রূপ নাটক-

খানিতে লক্ষ্য করবার বস্তু। তবে এতে সাংকেতিকতার রহস্যময়তা তেমন নেই, রূপকের রূপময় আচ্ছাদনের অভাবও সকলে লক্ষ্য করবেন। এ নাটকের রূপান্তরিত সংস্করণ—'**গুরু**' [১৯১৮]।

কবির 'বলাকা'র যুগে লিখিত হয় '**ফাল্গুনী**'—প্রকাশকাল ১৯১৬। 'শারদোৎসব'-এর ন্যায়, এও ঋতু-উৎসবের জন্যে লেখা। এ তত্ত্বনাট্যখানির মূলকথা হলো—মৃত্যু নয়, জীবন—জরা নয়, যৌবন—ধ্বংস নয়, সৃষ্টিই—বিশ্বের পারমার্থিক সত্য। জরা-মৃত্যু-রিক্ততা জগৎসংসারের শ্যামলতা-সজীবতাকে যতই গ্রাস করতে উদ্যত হোক-না-কেন, এর নবীনতা চিরন্তনের। মৃত্যুময় শীতকে নির্জিত করে প্রকৃতিলোকে যেমন প্রাণময় বসন্তের আবির্ভাব, তেমনি, মানবলোকে জরামৃত্যুকে প্রতিহত করে ফিরে ফিরে জীবনযৌবনের আত্মপ্রকাশ। এখানে আরো একটি তত্ত্ব উঁকি দিয়েছে—জীবনের সন্ধানীকে মৃত্যুর গুহায় প্রবেশ করতে হবে ; মরতে যারা ভয় পায় না, যথার্থ বাঁচবার অধিকার তাদেরই। রবীন্দ্রের প্রজ্ঞাময় জীবনদৃষ্টির অন্তর্ভেদী আলোকে 'ফাল্গুনী' বিভাসিত।

অমানবীয়তার বিরুদ্ধে, অমানবিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, রবীন্দ্রনাথের সংগ্রাম অবিরল। বারংবার তিনি আমাদের নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির বাণীই শুনিয়েছেন। এই বাণী 'মুক্তাধারা' এবং 'রক্তকরবী' নাটকেও উচ্চারিত। এ যুগের মহাসংকট বিজ্ঞানসহায় সাম্রাজ্যতন্ত্র আর যান্ত্রিকতানির্ভর ধনিকতন্ত্র। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা মনুষ্যত্বের স্পর্শবর্জিত—আধ্যাত্মিকতাবিরহিত। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানশক্তি আর অধ্যাত্মশক্তির এই বিরোধটি দেখিয়েছেন '**মুক্তধারা**' নাটকে, এবং এতে তিনি বস্তুবাদী সভ্যতার উর্ধ্বে অধ্যাত্মশক্তির পতাকাটি তুলে ধরেছেন। উক্ত বিরোধের একপক্ষে যন্ত্র, মুক্তধারার বাঁধ—যন্ত্ররাজ বিভূতি ; অন্যপক্ষে রয়েছে মুক্তচৈতন্যের প্রতীক, মানবসত্যের পতাকাবাহী, অভীঃ-মন্ত্রের সাধক ধনঞ্জয় বৈরাগী, আর অনিরুদ্ধপ্রাণের বিগ্রহ অভিজিৎ। মানুষ দেবদ্রোহী হয়ে উঠবে, অশিবসাধনার উন্মত্ততা দেখাবে, দেবমন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে উঠবে দৈত্যাকৃতি যন্ত্রের মাথা—মানবের বিকৃত অহং মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করবে—এর চেয়ে মানবাত্মার মহতী বিনষ্টি আর কী হতে পারে! এহেন সংকট থেকে মানবের উদ্ধারের পথটি 'মুক্তধারা'-য় রবীন্দ্র-কবি আমাদের দেখিয়েছেন। প্রাণের পীড়নে ভৈরব জেগেছে, মুক্তিকামী অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছে। যন্ত্রের শক্তি যতই প্রবল হোক, অশিব বলেই, প্রাণের শক্তির কাছে একদিন তাকে পরাভব মানতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের শোষণপীড়ন অমানবীয়। তার অবসান ঘটিয়ে সমাজে মুক্তি-প্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্রের অভিপ্রেত।

মুক্তধারা' নাটকে রূপক-সংকেতের আশ্রয়ে একাজই রবীন্দ্রনাথ করেছেন। নাটকখানি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। ধনঞ্জয় বৈরাগী বর্তমান নাটকের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। এ চরিত্রে সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধীর কিছুটা ছায়াপাত হয়েছে। এইকালে মহাত্মাজি দক্ষিণ-আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।

'রক্তকরবী'-কে [১৯২৬ সাল] বলা যেতে পারে—মানুষ-উদ্ধারের পালা। ধনতন্ত্রী সভ্যতার ক্লেদাক্ত শোষণ ও মনুষ্যত্ববিরোধী শক্তিস্পর্ধিতা এ নাটকে ধিকৃত হয়েছে; আর, একদিকে, স্ফীতকায় লোভের-জালে-আবদ্ধ, অন্যদিকে, দাসত্বে-শৃঙ্খলিত মানুষকে কী করে সহজ মুক্তির অধিকারে ফিরিয়ে আনা যায়, তা-ও এতে দেখানো হয়েছে। ধনতন্ত্রের কেন্দ্রগত অমূর্ত শক্তিটিই 'রক্তকরবী'-র গ্রহণলাগা যক্ষপুরীর রাজার মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। যে-খনি থেকে তাল তাল সোনা আহৃত হচ্ছে, এই রাজা তার মালিক। রাজার অপরিমেয় লুব্ধতায় খোদাইকারগণ শোষণ-জর্জর। লোভের জালে জড়িয়ে পড়ে রাজা মনুষ্যত্ব হারিয়েছে, আনন্দ ও সৌন্দর্যলোক থেকে নির্বাসিত হয়েছে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যে পিষ্ট হয়ে খোদাইকাররা নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়েছে। অভিশপ্ত যক্ষপুরীতে মানব কেউ নেই, এখানে যতসব অপ-মানুষ আর অব-মানুষের ভিড়। বিকৃতির কারাগারে সকলেই স্বেচ্ছাবন্দী, মুক্তির অনাবিল আনন্দ কারুরই নেই। অথচ এরা অন্তরে অন্তরে আলো ও মুক্তির কাঙাল। এহেন যক্ষপুরীতে একদা এক আশ্চর্য মানবীর আবির্ভাব হলো, নাম—নন্দিনী, হাতে তার ভীষণসুন্দর রক্তকরবীর কঙ্কণ। নন্দিনী জীবনসৌন্দর্যের প্রতীক, আনন্দময় সত্তার বিগ্রহ। তার প্রণয়াস্পদ রঞ্জন নিত্যজীবী যৌবনের প্রাণাবেগের ও মুক্তির বাহক। এই নন্দিনী যক্ষপুরীর মানুষগুলির মরা পাঁজরে প্রাণের চাঞ্চল্য জাগালো, তাদের চিত্তে সঞ্চার করলো আলোর পিপাসা—আনন্দ-সৌন্দর্যের তৃষ্ণা। নন্দিনীর প্রচারিত ভাবাদর্শ বৈপ্লবিক। ফলে, একদিন শ্রমিকরা বিপ্লব বাধালো, রাজা জালের আবরণ ছিঁড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন—বদ্ধ মানুষ মুক্তি পেল। 'মুক্তধারা'য় অভিজিতের, এবং 'রক্তকরবী'-তে রঞ্জনের, আত্মবিসর্জন ব্যর্থ হয়নি—আত্মার মুক্তি আসে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বাস্তব-রূপক-সংকেত এ তিনের মিশ্রণে 'রক্তকরবী'র নাট্যকায়া নির্মিত।

যে-কাহিনী নিয়ে 'কথা ও কাহিনী'-র 'পূজারিণী' নামে কবিতাটি রচিত, সেই একই কাহিনী-অবলম্বনে **'নটীর পূজা'** [১৯২৬] নাটিকাটি লেখা হয়েছে। এ নাটিকায় ধর্মের জন্যে পূজারিণী নটী প্রাণ দিয়েছে। প্রাণের মূল্যে যে-পূজা তাকেই বলি শ্রেষ্ঠপূজা। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ও প্রেমাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রের প্রবল অনুরাগ।

নটীর আত্মদানে বুদ্ধের প্রচারিত প্রেমধর্মেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। উগ্র স্বার্থ-কোলাহলের ঊর্ধ্বচারী হিংসাশূন্য ত্যাগময় প্রেমধর্মই যথার্থ মানবধর্ম—'নটীর পূজা' এই সত্যটির প্রতিই অঙ্গুলিসংকেত করছে।

'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ **'গৃহপ্রবেশ'** [১৯২৫] রুগ্ন যুবক যতীনের বেদনাময় আর্তির কারুণ্যে মণ্ডিত। এর অন্তঃপ্রবাহী লিরিক সুরটি 'ডাকঘর'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কবি তাঁর লেখা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' গল্পটিকে নাটকীয় রূপ দিয়েছেন **'চিরকুমার সভা'**-য় [১৯২৬]। এ নাটক বাঙ্‌লা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট High Comedy। সংলাপের চাতুর্য ও মনোজ্ঞ গান এর উজ্জ্বল বিশিষ্টতা। কৌতুকময় পরিস্থিতিচিত্রণও উপভোগ্য। স্বদেশসেবাকল্পে দেশের তরুণরা চিরকুমার থাকবে, নারীজাতিকে তারা ধর্মসাধনার অন্তরায় ভাববে—এ রবীন্দ্রের অভিপ্রেত নয়। তাই, কৌমার্যব্রতধারীদের সভা তিনি ভেঙে দিয়েছেন, যুবকদলের নানা ভ্রান্ত ধারণাকে উপহাস করেছেন। কবির 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ **'শোধবোধ'** [১৯২৬]। বাঙালির সাহেবিয়ানা ও ফ্যাসানদুরস্ত জীবনযাপনের কৃত্রিমতার প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ এ নাটকের বিষয়বস্তু। **'কালের যাত্রা'**-য় [১৯৩২] দেখি, বর্তমানের অচল সমাজরথকে চালাবার জন্যে ডাক পড়েছে তথাকথিত অস্পৃশ্য শূদ্রদের। পুরোহিতের মন্ত্রতন্ত্র, রাজার শক্তিযন্ত্র আজ আর রথ চালাতে পারছে না। তাই, কালের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারায় নতুন চালকের প্রয়োজন অনুভূত হলো। শূদ্ররা জাগলো, নীচের তলার মানুষ উপরে উঠলো। কবি বলছেন: 'যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে ; যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।' এ সুর অস্পৃশ্যতাবিরোধী রবীন্দ্রের উদার মানবীয়তার। রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্মের বড়ো একটি গ্লানি বলে মনে করতেন। মানুষের প্রতি ঘৃণা যে-ধর্মে নিন্দিত নয়, কবি-রবীন্দ্র তাকে ধর্ম বলে স্বীকৃতি জানাতে কুণ্ঠিত। **'চণ্ডালিকা'** [১৯৩৩] অস্পৃশ্যতার পোষক হিন্দুসমাজেরই নিন্দাযুক্ত সমালোচনা। **'কবির দীক্ষা'-য়** রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, কবিরা 'শৈব'—কালিদাসও শৈব কবি। মঙ্গলধন্য আনন্দমুক্তির বাণীই কবিরা যুগে যুগেপৃথিবীর মানুষকে শুনিয়ে এসেছেন। নবজীবনের—মৃত্যুঞ্জয়ের—দীক্ষাই যথার্থ কবির দীক্ষা!

'তাসের দেশ' [১৯৩৩] বহুপরিচিত, বহুঅভিনীত একখানি ব্যঙ্গনাট্য—কবির 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-এর নাট্যরূপ। এতে নৃত্যনাট্যের লক্ষণ আংশিকভাবে পরিস্ফুট। অন্ধপ্রথা, মূঢ়সংস্কার, অর্থহীন নিয়ম স্বদেশের মানুষগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, স্থবির সমাজের অচলায়তনে বন্দী থেকে থেকে তারা আজ একরূপ,

নিষ্প্রাণ। এসব মৃতকল্প মানুষের বুকে প্রাণসঞ্চারের উদ্দেশ্যে কবি এই নাটকখানি লেখেন। রূপকের আদল থাকলেও, 'তাসের দেশ'-কে খাঁটি রূপকশ্রেণীর নাটক বলা যায় না। বলতে পারি, এতে রূপকথার রঙ লেগেছে।

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত **'বাঁশরী'** একখানি সামাজিক নাটক। এতে যে-নরনারীকে চিত্রিত দেখি তারা সাধারণ বাঙালিসমাজের মানুষ নয়, আভিজাত্য ও উচ্চশিক্ষা তাদের স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে। সোমশংকর ও বাঁশরীর প্রেমই এ নাটকের কেন্দ্রগত বস্তু। কিন্তু উভয়ের প্রণয় বিবাহমিলনে সার্থক হয়ে ওঠেনি, পুরন্দরের প্রয়োজনে এরা দুজনে চিরজীবনের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। বাঁশরী অকৃতার্থ জীবনের কারুণ্যে-গড়া একটি নারীমূর্তি—বেদনাবিদ্ধ প্রেমের অগ্নিশিখা। ভাগ্যবৈগুণ্যে প্রণয়াস্পদকে বাস্তবের দাম্পত্যজীবনে সে পায়নি। কিন্তু অন্তরতর ভাবজীবনে সোমশংকরই তার প্রাণের দোসর। এই ভাবসম্মেলনই বাঁশরীর প্রেমকে মৃত্যুঞ্জয় করেছে। কথার বিদ্যুদালোকের চমকে 'বাঁশরী' নাটকের চরিত্রগুলির সজীবতা অনেকটা সমাচ্ছন্ন হয়েছে, আইডিয়া বাস্তবিকতাকে ঢেকে ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভার বিকাশের মুখে গীতিনাট্য, পরিণতিতে নৃত্যনাট্য। এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর নাটক হলো—**'চিত্রাঙ্গদা'** [১৯৩৬], **'চণ্ডালিকা'** [১৯৩৮] এবং **'শ্যামা'** [১৯৩৯]। রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যকার, সংগীতপ্রবণতা তাঁর কবিস্বভাবের সঙ্গে আজন্ম যুক্ত। আর, শেষজীবনে তাঁর মধ্যে দেখা গেলো নৃত্যের প্রতি অতি-আত্যন্তিক ঝোঁক। এ দুটি প্রবণতার সম্মেলন আমরা দেখতে পাই কবির নৃত্য-নাট্যগুলিতে। প্রধানত নাচের তাগিদেই যে এগুলি রচিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। নৃত্যচ্ছন্দের প্রতি রবীন্দ্রের অনুরাগ পূর্বাবধিই ছিল। তাঁর ধ্যানদৃষ্ট 'নটরাজ'-মূর্তির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। মহাকালের নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিয়ে জগতে ও জীবনে যে অখণ্ড লীলারস তিনি উপলব্ধি করেছেন তাতে আনন্দলোকে তাঁর চিত্তমুক্তি ঘটেছে। নৃত্যরসে কবির প্রাণ সিক্ত বলেই নৃত্যশিল্পবিষয়ে তিনি এতখানি উৎসাহী। শেষবয়সে কবি যে নৃত্যের সম্পর্কে এত আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন তার পেছনে আরো একটি কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণ-ভারতে, ভারতের বাহিরে—জাপান, জাভা, বলিদ্বীপ, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে—তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসব দেশের নাচ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বাউল গান, বাউল নাচ, ইত্যাদির সঙ্গে তো তাঁর দীর্ঘকালের পরিচয়। শান্তিনিকেতনে কত বিচিত্র ধরনের নৃত্যকলার চর্চা প্রবর্তিত হয়েছে—যেমন, মণিপুরী, গুজরাটি, দক্ষিণী, ইত্যাদি নৃত্য। কবির নৃত্যনাট্যের আলোচনায় এসমস্ত বিষয় মনে রাখতে হবে।

নৃত্যনাট্যের তিনটি অংশ—নৃত্য-নাট্য-সংগীত। অতিসূক্ষ্ম হৃদয়ভাবের দোলা আর তীব্র-আবেগে-কম্পমান মুহূর্তগুলিকে মূর্ত করে তোলবার ক্ষেত্রে নাচ যে মস্ত-বড়ো একটি সহায় এ অবশ্যস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের সঙ্গে কথাবাহী সংগীতকেও যুক্ত করে দিলেন। ফলে দর্শকচিত্তে ভাবকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার কাজটি আরো সহজ হয়ে উঠলো। তবে একটি কথা। নৃত্যাভিনয়ে নৃত্যেরই সর্বাত্মক প্রাধান্য। এদিক থেকে দেখলে, সংগীতযুক্ত রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য একটি স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হয়েছে। সে যা হোক, রবীন্দ্রের লেখা এজাতের নাটকগুলি নিঃসন্দেহে অভিনব একটি সৃষ্টি। বিশুদ্ধ নাটকের আদর্শে এদের বিচার করা চলবে না; কারণ, সুর ও তাল এখানে কথাকে ছাপিয়ে ওঠে, ভাব অভিব্যক্তি লাভ করে দেহের ছন্দিত ভঙ্গিমায়। নৃত্য-নাট্যে নাচই নাটকের বাহন, এতে উপস্থাপনারীতি ভাবতান্ত্রিক।

রবীন্দ্রকৃত নাটকের ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়কথন এখানে শেষ হলো।

আমাদের সর্বশেষ কথা, বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান কম নয়। কত বিচিত্র ধরনের নাটক তিনি রচনা করেছেন—গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, কৌতুকনাট্য, প্রহসন, কমেডি, রোম্যান্টিক ট্যাজেডি, সমাজ-পরিবেশমূলক নাটক, প্রতীকী নাটক—ইত্যাদি। বিশেষত, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ ছিল না। বাঙ্‌লা নাটকে রবীন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান রূপক-সাংকেতিক রচনাগুলি। এইশ্রেণীর নাট্যকৃতি তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তা ছাড়া, কমেডিগুলি আর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি কবির সৃজনী-ক্ষমতার সুদীপ্ত স্বাক্ষর বহন করছে। কবিহিসেবে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জিৎ; নাট্যকার-হিসেবেও তিনি অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী। তত্ত্বনাট্যরচনায় শ্রীরবীন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবীর সাহিত্যলোকে খুব বেশি নেই।

প্রবন্ধ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল পৃথিবীর মহত্তম কবিদলের অন্যতম নন, গদ্যশিল্পী-হিসেবে তাঁর সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারেন, দেশবিদেশে এমন লেখকেরও সংখ্যা একেবারে মুষ্টিমেয়। কবিতা ও গান বাদ দিলে, বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে কবির গদ্যরচনাই সর্বাগ্রগণ্য। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে যা আমরা বুঝি, তার প্রায় সমস্ত দিকের ওপরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানামুখী মননচিন্তার আলোকপাত করেছেন। কী সাহিত্য-শিল্প-সমালোচনা-ছন্দ-শব্দতত্ত্বের প্রসঙ্গে, কী ধর্ম-দর্শন-শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-ইতিহাসের আলোচনায়, কী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

সমস্যার চিন্তনের ক্ষেত্রে—সর্বথা রবীন্দ্রের লেখনী স্বচ্ছন্দ, অনায়াস—সর্বত্র তাঁর গদ্যলেখা দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবতায় ও প্রকাশরীতির রম্যতায় অপূর্বতা লাভ করেছে। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি, পঞ্চভূত, চারিত্রপূজা, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, আত্মশক্তি, রাজাপ্রজা, স্বদেশ, শিক্ষা, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রধারা, পথের সঞ্চয়, রাশিয়ার চিঠি, যাত্রী, জাপানে-পারস্যে, ছন্দ, বাঙ্‌লা-ভাষাপরিচয়, কালান্তর, ইত্যাদি কত অসংখ্য গদ্যগ্রন্থই-না তিনি লিখেছেন। এসকল বইয়ের নামের দিকে তাকালেই কবির মননভাবনার ব্যাপকতা ও বিচিত্রতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। লেখকহিসেবে একজন মানুষের চিরস্মরণীয়তার পক্ষে এই বিপুলায়তন রচনাবলীই যথেষ্ট।

অথচ আমাদের দেশ শতকরা নব্বুইজন লোক—এঁদের মধ্যে শিক্ষিতসমাজও রয়েছেন—প্রবন্ধশিল্পী রবীন্দ্রের কোনো খবরই রাখেন না। এরূপ হওয়ার নানা কারণ দর্শানো যায়। তার মধ্যে একটি কারণ হলো, রবীন্দ্রনাথের জগৎজোড়া কবিখ্যাতি। তাঁর কাব্যসাহিত্যের ব্যাপক প্রচার তাঁর গদ্যরচনাবলীকে বেশ-কিছুটা আড়াল করে ফেলেছে। তা ছাড়া, কবিতা-গল্প-উপন্যাসের তুলনায় প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে ভারি জিনিস। 'সিরীয়াস' সাহিত্য কজনেই-বা পড়তে চান? এজন্যে, প্রবন্ধকার রবীন্দ্রের উজ্জ্বল পরিচয় বরাবরই আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে গেছে। কিন্তু এখন জানবার সময় এসেছে যে, গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নামকরা বহুতর জাত-গদ্যলিখিয়ের চেয়ে বড়ো।

বঙ্কিমের পর বাঙ্‌লা প্রবন্ধকে রূপগত ও রসগত ঐশ্বর্য দান করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রের গদ্য মহাকবির। জ্যোতির্ময় কবিসত্তার কিরণসম্পাতে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যও সমুদ্ভাসিত। কবির প্রবন্ধরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুয়েকটি কথা এখানে বলে নিই। যেখানে তথ্যের প্রাধান্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি যুক্তিধর্মী। তবে যুক্তির দাবি যতই মেনে চলুন, রচনার অঙ্গে কারুকলার লাবণ্য সঞ্চার করতে কখনো তিনি ভোলেন না। কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, কোনো ধ্রুব মীমাংসায় পৌঁছবার জন্যে তিনি তেমন ব্যগ্র নন। কবি-প্রবন্ধকার রবীন্দ্র লিখতে বসে ভাবেন, ভাবতে ভাবতে লেখেন—লেখা শুরু করে দিয়ে ভাবনা ও কল্পনার জাল বোনেন। প্রবন্ধের মধ্যে ভাবাচিন্তার বন্ধন রয়েছে, এই বন্ধন মেনে

চলতে তিনি যেন অনিচ্ছুক। একারণে, প্রবন্ধ বলতে সাধারণত যে-বস্তুটি আমরা বুঝি, তাঁর লেখা প্রবন্ধমালা সে-জাতের নয়। তাই, বিষয়গৌরবী প্রবন্ধেও [অর্থাৎ যে-প্রবন্ধে তথ্য-তত্ত্ব-যুক্তি-সিদ্ধান্ত, ইত্যাদির প্রাধান্য] কবির ব্যক্তিস্বরূপটি ক্ষণে ক্ষণে আত্মোন্মোচন করে—যুক্তি, বিচার, বক্তব্যকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্বের শুভ্র সৌরভ। রবীন্দ্রের লেখায় বিষয় আর বিষয়ী উভয়েরই সমান মূল্য। তাঁর রচনা কুত্রাপি তথ্যকণ্টকিত নয়, যুক্তিসর্বস্ব নয়, বুদ্ধির চতুর খেলা নয়। মেঘের কোলে বিদ্যুৎবিলসনের মতো, কবির বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সুকুমার অনুভূতি, সূক্ষ্ম ভাবনা, প্রাণপ্রেতীর কম্পন, বর্ণাঢ্য কল্পনা অবলীলায় উঁকি দিয়ে যায়। তাঁর বাচনভঙ্গির এমন একটা জাদু রয়েছে, বিরুদ্ধবাদীর উদ্ধত অবিশ্বাসকেও তা মুহূর্তে স্তম্ভিত করে দেয়, পাঠকসমাজ তাঁর চিত্রল ভাবনার সঙ্গী না হয়ে পারে না। কেবল বক্তব্যের যথাযথ উপস্থাপনায় কবির তৃপ্তি নেই, বলবার ভঙ্গিটির দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়—আত্মকথা, পত্রধারা, ভ্রমণকাহিনী, ভাষা-শিল্প ও সাহিত্য, এবং বিচিত্র। এদের আরো এক-রকমের পর্যায়বিন্যাস হতে পারে—আত্মভাবনামূলক এবং প্রসঙ্গাত্মক। পত্রগুচ্ছ, আত্মপরিচয়, ধর্মদেশনা, ভ্রমণকাহিনী, শিল্পসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা, ইত্যাদি প্রথম ভাগটিতে পড়ে। এর মধ্যে দেখতে পাই কবিদার্শনিক রবীন্দ্রের ভাবসত্তার প্রতিফলন। ওপরে-কথিত দ্বিতীয় ভাগটির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রসঙ্গাত্মক-পর্যায়ের অন্তর্ভূর্ত লেখাগুলির মধ্যে শতাব্দীর অধিনায়ক রবীন্দ্রের মনীষিতা ও মনস্বিতার পরিচয় মুদ্রিত। কবিদার্শনিক নয়, ভাবুক নয়,—ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে হলে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকে না-চেনার অর্থ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এক-চতুর্থাংশকে অপরিচয়ের আড়ালে রাখা। কর্মী, সংস্কারক ও ভাবনায়ক রবীন্দ্রনাথের মহিমা কবি-রবীন্দ্রের মহিমার চেয়ে কম-কিছু নয়। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধমালার শ্রেণীবিভাগ একরূপ অসম্ভব। কারণ, তাঁর সমস্ত রচনা এক অখণ্ড সত্তা থেকে উৎসারিত। রবীন্দ্রের মৌল পরিচয়—তিনি কবি—মহাকবি। তাঁর বিভিন্ন শ্রেণীর লেখায় এই মহাকবিকেই আমরা বহুরূপী-মূর্তিতে দেখি মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি তাঁর আত্মপরিচয়মূলক লেখাগুলি। এইসব রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কবির নির্মিত সাহিত্যের মর্মলোকের দ্বার-উন্মোচন অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে। আত্মপরিচয়, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, ইত্যাদিকে রবীন্দ্রের আত্মকথা বলা যেতে পারে। এরূপ আত্মকথার

পরিপূরক হলো ছিন্নপত্র, পথে আর পথের প্রান্তে, চিঠিপত্র, প্রভৃতি গ্রন্থ। কবির ব্যক্তিজীবন ও অন্তর্জীবনের কথা আরো বহুতর রচনায় বিকীর্ণ। তাঁর পত্রধারা অনেকস্থলে প্রবন্ধেরই নামান্তর মাত্র। এগুলিতে বিচিত্র চিন্তার ঐশ্বর্য ও ভাবানুভূতিরই মনোজ্ঞ রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের প্রকাশহিসেবে এসকল চিঠিপত্র তাঁর পাঠকমণ্ডলীকে অবশ্যই মুগ্ধ করবে। লক্ষণীয়, কবির অনেক ভ্রমণকাহিনী পত্রাকারে লিখিত, যেমন—য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, ইত্যাদি। এগুলি নানা ভাবনার তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা এখানে এসে ভিড় করেছে। লেখনভঙ্গির অদ্ভুত নৈপুণ্যে রবীন্দ্রের চিঠিপত্র, ভ্রমণপঞ্জী সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

এরপর উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য। সমালোচনা কেমন করে সৃষ্টিকর্ম হয়ে ওঠে, কবিই আমাদের প্রথম দেখালেন। এমন উচ্চাঙ্গের সমালোচনা বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট, বলতে হবে। কবির 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থখানির তুলনা হয় না। এ বইয়ের মাধ্যমে সমালোচনার একটি নতুন আদর্শ তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন—গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দানুভবই যে সমালোচনার উৎস, তা আমাদের আভাসে বুঝিয়ে দিলেন; যে-লেখককে আমি ভালোবাসি, সেই ভালোবাসা অপর দশজনের চিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়াই সমালোচকের সবচেয়ে বড়ো কাজ, এও আমাদের বুঝতে শেখালেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মনকে সংস্কৃতমুখী করে তুলেছেন, কালিদাস-বাণভট্ট প্রমুখ কালজয়ী সাহিত্যনির্মাতার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, একথা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যায়। তাঁর আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, প্রভৃতি অতি-উত্তম গ্রন্থ। কবির 'পঞ্চভূত' বাঙ্‌লা সাহিত্যে অনন্য। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' কবির একখানি অতিশয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বই। যে-শ্রেণীর রচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে তাকে অধুনা আমরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—ইংরেজিতে Personal Essay—বলে থাকি। বাঙ্‌লায় এই রচনারূপেরও প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। তথ্যজ্ঞাপন কিংবা তত্ত্বালোচন এখানে রচয়িতার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য—পাঠকের আনন্দবিধান। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটিতে বিচিত্র ভাবনার প্রকাশ আছে; কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের স্পর্শ। এতে যে-সকল রচনা রয়েছে সেগুলিকে আনন্দস্পন্দিত অবকাশমুহূর্তের রূপময় তত্ত্বকথা বলতে ইচ্ছে করে। 'ধর্ম', 'সঞ্চয়', 'মানুষের ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন'-প্রবন্ধমালায় কবির ধর্মানুভব ও দার্শনিক প্রত্যয় বা উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। এসব বইতেও বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে কবির অনুভূতিই বড়ো হয়ে উঠেছে। এসকল

রচনাও স্বরূপত ব্যক্তিক। কাব্যধর্মী, অলংকরণসজ্জায় মণ্ডিত 'সাধু' গদ্যরীতি, আর তীক্ষ্ণ, গতিশীল, বর্ণবন্ত দীপ্তিতে চোখ-ধাঁধানো 'চল্‌তি' গদ্যরীতির ওপরে রবীন্দ্রনাথের কী অসামান্য আয়ত্তি, তাঁর প্রবন্ধনিচয় পড়লে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

কত রকমের অভিনব আঙ্গিকে কবির প্রবন্ধমালা গ্রথিত। আর, রচনায় ভাবচিন্তার বৈভবের কথা যদি, বলি তবে পৃথিবীর কোন্ প্রবন্ধশিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা দেব ? একটি নামও মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যে বড়ো, না, কবিতায়, এ প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। গদ্যরচনার বিস্তৃত এলাকাটিতেও মহাশিল্পী তিনি।

ছোটগল্প :

রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-এক অপূর্ব সৃষ্টি ছোটগল্প। রবীন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্‌লায় উপন্যাস ছিল, উপন্যাসধর্মী বড়োগল্প ছিল, ছোট আখ্যায়িকা ছিল, ছোটগল্পের-ধাঁচের নক্সা বা স্কেচ্ ছিল। কিন্তু একটি বস্তু তখন ছিল না—আধুনিক রূপরীতির ছোটগল্প। চলমান জীবনের বহুবিধ ঘটনার খণ্ড ভগ্নাংশকে নিয়ে তার মধ্যে গূঢ় গভীর জীবনসত্যকে বিদ্যুৎচমকের মতো চকিতে উদ্ভাসিত করে দেখানো, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে ফুটিয়ে তোলা—এই যে বিশেষ ধরনের কঠিন সাহিত্যকর্ম, তা আমাদের প্রথম শেখালেন রবীন্দ্রনাথ। রবি-কবির হাতে বাঙ্‌লা ছোটগল্পের শুধু গোড়াপত্তন হলো না, একে তিনি বারো-আনা পূর্ণতা দিলেন, আমাদের সাহিত্যের এই ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ করে তুললেন। আজকের দিনে বাঙ্‌লা ছোটগল্প অনবদ্য মনোরম শিল্পকায়া পেয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্যে এ অনায়াসে একটি গৌরবদীপ্ত স্থান পেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এর আদিস্রষ্টা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙ্‌লা গল্পের এই অতি-আত্যন্তিক প্রসারের যুগেও কবির লেখা ছোটগল্পমালাকে বাদ দিয়ে এ ধরণের রচনার কোনো আলোচনাই চলতে পারে না। রবীন্দ্রের গল্পগুলি কেবল ঐতিহাসিক কারণেই স্মরণীয় নয়, এদের অসাধারণ সাহিত্যিক মূল্যও রসিকমণ্ডলীর স্বীকৃত। এদেশের ছোটগল্পলেখকরা কবিকে এক্ষেত্রে গুরু না মেনে পারবেন না। 'গল্পগুচ্ছ'-এর আঙ্গিক ও ভাষা যে একদা বাঙালি সাহিত্যকারদের একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ কত লেখককে নতুন পথে তাঁদের লেখনী চালনার প্রেরণা জোগালেন। একসময় এত এত গল্পের প্লট এসে কবির মাথায় ভিড়

করতো যে, তার কিছু কিছু তিনি বিলিয়েছেন তাঁর স্নেহভাজন লেখকদের। এ সত্য ঘটনা। বিধাতাপুরুষ কী অদ্ভুত শক্তির অধিকারীই-না করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে সত্তর-আশি বছরেরও আগে—বাঙ্‌লা সাহিত্যে যখনো বঙ্কিমযুগ চলছে—তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'গল্পগুচ্ছ'-বইখানিতে সংগ্রথিত নিখুঁত-সুন্দর গল্পগুলি। উনিশের শতকের শেষ দশকটিকে রবীন্দ্রের ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কবির মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা-র সোনার কবিতাগুলিও এই সময়কার লেখা। এসব গল্প প্রকাশিত হতো হিতবাদী, ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন, ইত্যাদি পত্রিকার পাতায়।

তিরিশ বছরে পদক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প-নির্মাণে হাতদিলেন। এসময়ে কোন্ পরিবেশে কবির দিনগুলি কাটছে তা-ও জেনে রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রের আসল কাজ 'আশমানদারী', এহেন স্বপ্নলোকের অধিবাসী মানুষটির ওপরে ভার পড়লো 'জমিদারি' তদারকের। জোড়াসাঁকোরপ্রাসাদছেড়ে কবি এলেনমধ্যবঙ্গে—পদ্মার বুকে বোটে, পদ্মার তীরে শিলাইদহের কুঠিতে কবির বাস। কালিগ্রাম পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন—বেশির-ভাগ নৌকোয়, কখনো কখনো গরুর গাড়ীতে চেপে। চলাচলের পথে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—কৌতুহলী চোখ মেলে—কবি দেখে নিচ্ছেন পল্লীবাঙ্‌লার বহুবর্ণরঞ্জিত দৃশ্যপট, সন্নিকটস্থ লোকালয়ের জীবনধারার অশ্রান্ত কলধ্বনি অহর্নিশ প্রবেশ করছে তাঁর কানে, বিভিন্ন স্তরের লোক এসে 'রাজাবাবু' রবীন্দ্রের চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাঙ্‌লার প্রকৃতি ও মানুষের ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে কবির মনের পটে। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে যা ছিল অপরের অ-দৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো তাঁর একালের কবিতায় আর ছোটগল্পে—প্রথমটিতে বস্তুর ভাবরূপ, দ্বিতীয়টিতে তার বাস্তব রূপ। ইতঃপূর্বে কবি প্রকৃতি ও মানবের এতখানি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কখনো আসেননি। 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পমালায় এই প্রকৃতিমানবের ঐকতান রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে। বাঙ্‌লার গ্রামদেশ, জনপদবাসী মানবমানবীর সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য কবির বহুগল্পে গাঢ় ছায়া ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন :

> 'একসময় আমি মাসের পর মাস পল্লীজীবনের গল্প রচনা করেছি। এর পূর্বে বাঙ্‌লা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না ; তাঁরা, প্রায় সকলেই, প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন।'

কবির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প, যেমন,—ছুটি, শাস্তি, দুরাশা, কঙ্কাল, অতিথি, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, একরাত্রি, কাবুলিওয়ালা, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র এবং নষ্টনীড়, ইত্যাদি—হিতবাদী, ভারতী, বালক, সাধনার যুগেই লেখা হয়েছে। তখন কবি সৃষ্টির আনন্দে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। এতখানি একাগ্রতাসহকারে—একেবারে দুহাতে—ছোটগল্প আর কখনো লেখেননি তিনি। এর পর ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হলে কবি পুনর্বার ছোটগল্প লেখার বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। কবির হাত দিয়ে কয়েকটি উত্তম গল্প বেরুলো, যার মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত একটি গল্পের নাম—'স্ত্রীর পত্র'। 'পয়লা নম্বর', 'হৈমন্তী', 'হালদার-গোষ্ঠি' প্রভৃতি রচনা 'সবুজপত্র'-এর আমলেরই সৃষ্টি। এগুলি রবীন্দ্রের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভূর্ত। পদ্মার আতিথ্য থেকে কবি এখন দূরে সরে এসেছেন, ফলে তাঁর গল্পেরও পটপরিবর্তন হলো—পল্লীজীবন স্থান ছেড়ে দিল শহুরে জীবনকে। রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত গল্পগুলি বক্তব্যে, বাচনভঙ্গিতে, স্বাদে স্বতন্ত্র; এরা আধুনিক মননের স্পর্শযুক্ত। এদের মধ্যে কোথাও কোথাও তত্ত্বের দেখা মেলে। কাব্যসৌরভের সঙ্গে তত্ত্বের মিশ্রণে এগুলি অপূর্বতা পেয়েছে।

জীবনের একেবারে অপরাহ্ণবেলায় রবীন্দ্রনাথ আর-একবার ছোটগল্পের খাতে লেখনী চালনা করলেন। তাঁর 'তিনসঙ্গী' বইখানি এসময়ে লিখিত তিনটি গল্পের সংকলন। কবির সর্বশেষ গল্প বেরোয় 'প্রবাসী'-তে—মৃত্যুর কয়েকমাস আগে। শেষের দিকের লেখাগুলিতে প্রতিপাদ্যে-শাণিত যুক্তিতর্কের স্ফুলিঙ্গ আছে, ভাষার দীপ্তি আছে, কিন্তু পূর্বেকার সেই প্রাণধর্মের সুগভীর আবেদন যেন কমে এসেছে। বলতে হবে, তাত্ত্বিকতার প্রাদুর্ভাবে ও আখ্যানের নিপুণ বিন্যাসের কিছুটা অভাবে, রসের সহজ উৎসার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এসব গল্পে কবির দেহমনের ক্লান্তির ছাপ সকলেরই চোখে পড়বে। তথাপি, বৈচিত্র্যে, নতুনত্বে এবং উজ্জ্বলতায় এগুলি সাহিত্যপাঠকের প্রশংসা পাবে।

বহুবিধ গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এদের বিচিত্রতা লক্ষ্য করবার মতো। সমাজজীবনের কোনো-একটা বিশেষ দিকের প্রতি কবি ঝোঁকেননি, তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। কবির অধিকাংশ গল্প মধ্যবিত্তজীবনকে নিয়েই লেখা। অবশ্য, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির চিত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমন মিলবে না। এইদিক থেকে বিচার করলে তথাকথিত 'বাস্তব' তিনি নন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবির অঙ্কিত চরিত্র আর পরিবেশকে কিছুটা কাল্পনিক বলেও মনে হতে

পারে। তথাপি, রবীন্দ্রের গল্পগুলিকে অবাস্তব বলবার জো নেই, কল্পনার পথ ধরে এরা বাস্তব সত্যে গিয়ে পৌঁছেচে। প্রতিভাবানের কল্পনা যেমন দূরচারী, তেমনি, অন্তর্ভেদী। ফলে তাঁদের কল্পনা, কোনোরূপ বিরোধিতা না করে, বাস্তবের হাত ধরেই চলে। অধুনা আমাদের মন যৎপরোনাস্তি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই, কোনোকিছুতে কল্পনার ছোঁয়া লাগলেই সেগুলাকে আমরা অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত করি। কিন্তু এ সত্যটি ভুললে চলবে না যে, কেবল বাস্তব-চিত্রণের জোরেই কোনো লেখা সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠে না—গূঢ়-গভীর জীবনসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্যে উচ্চতর কবিকল্পনা একরূপ অনিবার্য। এ যদি না হতো, প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্কিমের চেয়ে বহুগুণে বড়ো লেখক বলে গণ্য হতেন, ঈশ্বরগুপ্তের কাছে শক্তিশালী অনেক বাঙালি কবি হার মানতেন। কাব্যধর্মী হয়েও, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যে আমাদের বাস্তবের স্বাদ-গন্ধ পরিবেশন করতে পেরেছে, তার কারণ হলো বিরাট প্রতিভা রবীন্দ্র-কবিকে মহৎ স্রষ্টার স্তরে উন্নীত করেছে। প্রধানত কাব্যকার হয়েও রবীন্দ্রনাথ অতি-উঁচুদরের একজন গল্পলেখক।

কত বিচিত্র ধরনের গল্প কবি বাঙালি-পাঠককে উপহার দিয়েছেন—প্লট-ঝাঁকানো গল্প, সামান্য-সাধারণ ঘটনাকে নিয়ে গল্প, মনস্তত্ত্বের-গভীরে-ডুব-দেওয়া গল্প, রোম্যান্সসুরভিত গল্প, জীবন ও প্রকৃতির সমন্বিত রূপের গল্প, অতিপ্রাকৃত রসের গল্প, সমাজসমস্যামূলক গল্প, হাসির গল্প—কী-না তিনি লিখেছেন! 'গুপ্তধন'-এর আখ্যান গোয়েন্দাকাহিনীর মতোই কৌতূহলোদ্দীপক। 'উদ্ধার'-এ ঘটনায় এতটুকু ঘোরপ্যাচ নেই, অথচ এ একেবারে সোজা এসে মনকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্প রবীন্দ্রের বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক মনের সৃষ্টি। এগুলিতে কবির রোম্যান্সরচনার শক্তি সাফল্যের তুঙ্গ সীমা স্পর্শ করেছে। কল্পনার বিস্তারে, বর্ণনের চাতুর্যে, ভাষার বিস্ময়কর কারুসৌন্দর্যে, অদ্ভুত পরিবেশ-নির্মাণের কৌশলে, ভাবানুভূতির ঐশ্বর্যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে এরা অতুলন। প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমন্বিত রূপ দেখতে পাই 'সুভা', 'অতিথি', 'একরাত্রি', 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি', প্রভৃতি গল্পে। এসব রচনায় নিসর্গপ্রকৃতি পশ্চাৎপট মাত্র নয়, এখানে প্রকৃতি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, প্রায় সজীব চরিত্র হয়ে উঠেছে—যেমন, কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে। প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে দিয়ে গল্পের এত কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তা কে জানতো?

রবীন্দ্রের দক্ষতা মানবহৃদয়ের অগাধ রহস্যের দ্বারোন্মোচনে, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের আবির্ভাব দেখানোতে। বাঙালিজীবন সাধারণত অনুত্তরঙ্গ হলেও তার

মধ্যে কত অতৃপ্তি, কত বুভুক্ষা, কত বৈচিত্র্য লুকানো আছে তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দেখালেন। তাঁর ঝোঁক বেশি মনস্তত্ত্বের দিকে, কাহিনীর চেয়ে চরিত্রই তাঁর গল্পে অধিক উজ্জ্বল; ঘটনার চমক নয়, ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যেই কবির গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সমৃদ্ধ। শ্রেণীচেতনাকে কবি কোথাও বড়ো করে দেখাননি। মানুষের কোনো জাত মানেন না তিনি—সর্বমানবিক হৃদয়সত্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। 'বোষ্টমী', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পে মানুষের সামাজিক পরিচয় ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তার মর্মনিহিত শুচিশুভ্র মমতা, যা মানুষকে দেশ-জাতি-ধর্মের সীমিত গণ্ডীর বাইরে টেনে নিয়ে আসে। এখানে কবির চেতনা সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন জানিয়েছে। মানসপ্রকৃতিতে কবি বলেই, রবীন্দ্রনাথের বহুতর গল্পে কবিতার হাওয়া বয়ে গেছে। বস্তুত, কবিতা আর গল্পের মিশ্রণেই রবীন্দ্র-কবির ছোটগল্প। এদের অনেকে ভাবের গল্প বলেন, বলুন; তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সত্যের সংসারেই এরা নিজেদের শিকড় গেড়েছে। আর, একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, রবীন্দ্রের কয়েকটি গল্প আধুনিক বাঙ্‌লা উপন্যাসকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। এসম্পর্কে আরো অনেক কথা বলা চলতো, কিন্তু সেই অবকাশ আমাদের হাতে নেই।

সাম্প্রতিক গল্পের ধারা অনেকখানি বদলে গেছে। কাব্যের মাধুর্য, লিরিকের স্বাদ, এখন লেখক-পাঠক কারো অভিলষিত নয়। বস্তুবিন্যাসে এতটুকু ফাঁক কিংবা শিথিলতা কেউ সহ্য করেন না। একালে সাহিত্যের সুরপরিবর্তন হলেও, বলা আবশ্যক, আজকের বাঙ্‌লা গল্পের এহেন যে দ্রুতপ্রসার তার মূলে রয়েছে গল্পকার রবীন্দ্রের গভীরচারী প্রেরণা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবেন এমন সাধ্য কার! গল্পের ক্ষেত্রেও তো রবীন্দ্রনাথ আমাদের আধুনিকতার পথিকৃৎ। এই ঋণের স্বীকৃতি যিনি না জানাবেন তাঁকে অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কী বলবো! বাঙ্‌লার প্রায় সমস্ত গল্পলেখকই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কবির কাছে ঋণী।

উনিশের শতকে পৃথিবীতে তিনজন খুব বড়ো গল্পকার জন্মেছিলেন—এডগার অ্যালান-পো, আন্তন চেকভ আর গী-দ্য মোপার্সাঁ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পকার-হিসেবে এঁদেরই সমস্তরের লেখক—বর্তমান প্রসঙ্গে এ-ই হলো আমাদের সর্বশেষ কথা।

উপন্যাস ঃ

বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকীর্ণ। কবির এই বহুমুখী সৃষ্টিক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ববর্তী আলোচনায় গ্রথিত হয়েছে। এবার তাঁর উপন্যাসের কথা। বলা বাহুল্য, উপন্যাসকার রবীন্দ্রের পরিচিতিও খুবই সংক্ষিপ্ত হবে—কেবল কবিকৃত উপন্যাসের নামগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৮৩ সাল; তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ ইংরেজি সালে। তাহলে. দেখা যাচ্ছে, কবির প্রণীত উপন্যাসাবলীর রচনার কাল-পরিধি হলো মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর। ওপরে কথিত দুই প্রান্তবর্তী উপন্যাস-দুটির মাঝখানে এ-কয়টি বইয়ের অবস্থান—রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুইবোন এবং চার অধ্যায়। বউঠাকুরানীর হাট ও মালঞ্চ-কে নিয়ে রবীন্দ্রের মোট বারোখানি উপন্যাস আমরা পাচ্ছি। প্রসঙ্গত. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরবীন্দ্রের কাব্যধারায় তাঁর কবিমানসের ক্রমবিকাশের কয়েকটি সুচিহ্নিত স্তর চোখে পড়ে। তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমনটি কিন্তু নয়। ওপরে কথিত অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে দেশে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে, আমাদের সমাজে ও চিন্তায় কত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, বহিরাগত নানা ভাবতরঙ্গ এসে কবির চিত্তদেশটিকে প্রহত করেছে—আলোচ্যমান উপন্যাসগুলি প্রধানত তারই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াজাত। যুগপ্রভাবিত পরিবেশের ভিন্নতা রবীন্দ্রকৃত উপন্যাসনিচয়ে মননগত পার্থক্য এনে দিয়েছে। এদের মধ্যে আঙ্গিকগত ও রূপকলাগত পার্থক্যও কম নয়। মনে রাখতে হবে, রচয়িতার শিল্পদৃষ্টিও কালের ব্যবধানে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। বৌঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথের প্রথম-বয়সের লেখা। চোখের বালি ও নৌকাডুবি তাঁর অবসিতপ্রায় যৌবনের দিনের রচনা। প্রৌঢ়ত্বে তিনি লেখেন গোরা, ঘরে-বাইরে ও চতুরঙ্গ। বার্ধক্যে প্রকাশিত হলো শেষের কবিতা, যোগাযোগ, দুইবোন, চার অধ্যায় আর মালঞ্চ। রবীন্দ্র-উপন্যাসের আলোচনায় কাল, পরিবেশ, বিষয়বস্তু, পটভূমি, ইত্যাদির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ যখন উপন্যাস-লেখায় হাত দেন, তখনো বঙ্কিম জীবিত। তখন আমাদের সাহিত্যসংসারে বঙ্কিমের প্রভাব সর্বত্রচারী। এই কালেই আত্মপ্রকাশ করলো কবির প্রাথমিক পর্যায়ের দুখানি আখ্যায়িকা—**'বউঠাকুরানীর হাট'** এবং

'রাজর্ষি'। বই-দুটিতে বঙ্কিমীরীতির প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। এখনো রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পথটি খুঁজে পাননি। তাই, পূর্বসূরীর প্রদর্শিত পথেই পদক্ষেপ করেছেন। অবশ্য, গল্প বলার মনোরম কৌশলটি লেখকের আয়ত্তে, পরিবেশ-নির্মাণে তিনি দক্ষ। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা এখনো স্বল্প বলে, জীবনের প্রশস্ত ভূমিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা সম্ভব হয়নি। এখানে কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে কবি যেন পুতুল-খেলা খেলেছেন। পাঠক আখ্যায়িকা-দুখানিতে রবীন্দ্রসাহিত্যসুলভ সূক্ষ্ম মননশীলতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেখতে পাবেন না, আঙ্গিকগত কোনো মৌলিকতাও তাঁদের চোখে পড়বে না। এদের মধ্যে কেবল লক্ষ্য করবেন, রবীন্দ্রের বিশিষ্ট জীবনবোধের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ আর তাঁর গদ্যভঙ্গির সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত। কবি নিজেও জানতেন, এ দুটি বই উত্তম সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠেনি। তথাপি, এদের প্রতি মমতা তিনি ছাড়তে পারেননি—পরবর্তীকালে 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক, 'রাজর্ষি'-র বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলেন প্রসিদ্ধ নাটক 'বিসর্জন'।

এর পর প্রায় ষোল-সতেরো বছর-কাল রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িকা-রচনায় হাত দেননি। এই কতিপয় বৎসর তাঁর প্রতিভা উৎসারিত হয়েছে অজস্র গানে-কবিতায়-ছোটগল্পে-প্রবন্ধে। তবে, এরই মধ্যে কবি প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, জীবনরহস্যের গভীরে ডুব দিয়েছেন, মানুষের মনোলোকের অলিগলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন—মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য তাঁকে বিস্মিত করেছে। এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে উপন্যাসকার রবীন্দ্র কাজে লাগালেন বহুশ্রুত **'চোখের বালি'**-তে। এ যুগান্তকারী একখানি আখ্যায়িকা। এর মধ্য দিয়ে বাঙ্‌লা মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন হলো। এখানে রবীন্দ্রনাথ পূর্বের সেই মনোজ্ঞ কাহিনীর জালবোনার ঝোঁক পরিহার করলেন, সমাজসমস্যাবিচারে প্রবৃত্ত হলেন। আখ্যায়িকায় দেখা দিল প্রখর ব্যাপক বিশ্লেষণমুখিতা, কাহিনী পেল কঠিন সজীব বাস্তব ভিত্তি। এ বইতে যে-সমস্যা আলোচিত হয়েছে, বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এও তার অবতারণা দেখা যায়। 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণীকেই মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ এ দুটি নারীর জীবন-পরিণামের মধ্যে কত পার্থক্য। এরূপ হবার কারণ হলো, বাঙালিসমাজের নিয়মশৃঙ্খলাকে বঙ্কিম বিচলিত হতে দেননি : বালবিধবা রোহিণীর তীব্র জীবনপিপাসা ও প্রণয়বাসনাকে স্বীকৃতি জানানো বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজের নির্মিত চরিত্রের বিচারক—যেখানে পদস্খলন হয়েছে, সেখানে তিনি তাদের কঠোর শাস্তিবিধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানবমানবীর হৃদয়ধর্মকে অস্বীকার করতে

পারেন নি, নারীর মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন—জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নির্লিপ্ত শিল্পীর। বাস্তবের আলোকে—মনস্তত্ত্বের রঞ্জনরশ্মিপাতে—মানবের জীবনকে ও নরনারীর হৃদয়কে দেখেছিলেন বলে তাঁর চিত্রিতা বিনোদিনীকে, বঙ্কিমের কল্পিতা রোহিণীর মতো, শোচনীয় মৃত্যুবরণ করতে হয়নি, শৈবলিনীর মতো প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিস্নানে শুচিশুদ্ধ হতে হয়নি। অবশ্য এ সত্যটিও মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথকেও সমাজের মুখের দিকে তাকাতে হয়েছে, ভালোবাসার পূর্ণঅধিকার নারীকে তিনিও দিতে পারেন নি। এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। যাই হোক, 'চোখের বালি' লিখে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইয়ে দিলেন। এর জন্যে তিনি নিন্দাবাদও শুনেছেন প্রচুর।

পরবর্তী উপন্যাস হলেও, **'নৌকাডুবি'** পূর্ববর্তী 'চোখের বালি'-র তুলনায়, দুর্বল রচনা। এতে কাহিনীবর্ণন, ঘটনাবিন্যাস, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় ফোটেনি এমন নয়, তথাপি আখ্যায়িকার পরিণতি কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে। উপন্যাসকার এখানে সনাতনীদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজ লেখনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন বলে মনে হয়। তাই, এ বইতে মানুষের দেহের ও মনের ধর্মের দীপ্ত আলেখ্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। কমলার নারীত্ব যথোচিত মর্যাদা পায়নি। তবে হেমনলিনীর চরিত্র অত্যন্ত সজীব। এই নারীচরিত্রটিকে পাঠক ভুলতে পারে না।

এর পর লেখা হয় **'গোরা'**। উনিশ-শ পাঁচ সালের স্বদেশি-আন্দোলন গোটা দেশে যে-জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল, সেই প্রাণচঞ্চল যুগের অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস এই মহৎ উপন্যাসখানির বৃহৎ পশ্চাৎভূমি। 'গোরা'তে রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রের উদারপ্রেমভিত্তিক বিশ্বমানবতার আদর্শ। স্বজাতির বন্ধনমুক্তির প্রয়াসকে, রাজনৈতিক চেতনাকে, রবীন্দ্রনাথ সেদিন উৎসাহসহকারে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশি উন্মাদনার হিংসাত্মক প্রকাশকে, ইংরেজবিদ্বেষের রক্তাঙ্কিত পথে মুক্তির সন্ধানকে, কবি কোনোমতেই সমর্থন জানাতে পারেননি। জাতীয়-আন্দোলন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতামুক্ত হোক, হীনতা কুশ্রীতা কুটিল হিংসার ঊর্ধ্বে অবস্থান করুক, এ-ই ছিল কবির অভিপ্রেত। কোথায় আমাদের দুর্বলতা, স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে কীভাবে আমরা নিজেদের অন্তরের বন্ধনদশা কাটিয়ে উঠতে পারি, দেশবাসীকে কবি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন ; এবং এও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার চেয়েও মানবপ্রেম এবং মনুষ্যত্বের সাধনা বড়ো। সেদিন কবি জাতীয়তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, হিন্দুসমাজের অনুদারতাকে ভর্ৎসনা

জানিয়েছিলেন—তাঁর এই মনোভাব 'গোরা'র মধ্যে প্রকাশিত। রবীন্দ্রের জীবনদর্শন তথা গোটা ভারতবর্ষের জীবনদর্শন বর্তমান অখ্যায়িকাখানিতে লভ্য। এ উপন্যাসে বিচারতর্ক অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে, মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য মানবের চিরন্তন হৃদয়সত্যের সঙ্গে এসব বস্তুর যোগ রয়েছে বলে এ বই শুদ্ধ মতবাদপ্রচারের বাহন হয়ে ওঠেনি। আনন্দময়ী 'গোরা'র অবিস্মরণীয় এক নারীচরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ প্রচারিত হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদ, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। 'গোরা' যেন এই আখ্যায়িকাখানির প্রতিবাদেই লেখা। অনেক সমালোচকের মতে 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম উপন্যাস।

কবি-রবীন্দ্রের উপন্যাসের ধারা নিয়মিত নয়। দীর্ঘ ছয় বছরের ব্যবধানে—'সবুজপত্র'-এর আমলে [১৯১৬ সালে]—কবির দুখানি উপন্যাস বেরুলো, নাম—'ঘরে-বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ'। প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-কে দেখে মনে হয়েছিল—'এল দুর্দম নবযৌবন ভাঙনের মহারথে'। পত্রিকাখানি কথা বলে নতুন সুরে, নতুন ভঙ্গিতে। চিন্তায়-বৈদগ্ধ্যে ও আধুনিকতায় এ দীপ্ত, দেশবাসীকে যৌবনের বাণী শোনানোই হলো এর প্রধান কাজ। রবীন্দ্রনাথ কাগজখানির সঙ্গে যুক্ত হলেন, এর পাতায় বিখ্যাত 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা লিখলেন, লিখলেন 'ফাল্গুনী' নাটক—এও চিরযৌবনের বাণীতে মুখর। আর. লিখলেন **'ঘরে-বাইরে'** যা বাঙ্‌লাদেশে জাগালো প্রচণ্ড ঝড়। স্মরণ করিয়ে দিই, সেদিনকার দেশব্যাপী রাজনীতিক ঝোড়ো হাওয়ার উত্তপ্ত পটভূমিতেই 'ঘরে-বাইরে' রচিত। এই হাওয়ায় আমাদের ঘরের অন্দরের পর্দা উড়ে গেলো, বাইরের সঙ্গে তার যোগের কোনো বাধা আর রইল না যেন। নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ এসেছিল স্বদেশি প্রচার করতে, বিমলা [নিখিলেশের স্ত্রী] ওই জ্বলন্ত বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত অভিভূত হলো, সন্দীপের প্রতি মাদকতাময় একটা আকর্ষণ অনুভব করলো সে। সন্দীপও বন্ধুপত্নী বিমলাকে নিজের হৃদয়ানুরাগ জানালো। 'ঘরে-বাইরে' এই পারস্পরিক আকর্ষণের কাহিনী। একদিকে, ভারতীয় জীবনাদর্শে দীক্ষিত শান্ত-সংযত-প্রকৃতির পুরুষ নিখিলেশ, অন্যদিকে, পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদী আদর্শে উদ্দীপ্ত সন্দীপ, মাঝখানে মোহগ্রস্ত বিমলা। দুই বিপরীতমুখী জীবনাদর্শ বিমলাকে বিমূঢ়-বিভ্রান্ত করেছে। যে-প্রশান্ত জীবনচর্যা রবীন্দ্রনাথের গ্রহণীয় তাকে তিনি ফুটিয়েছেন নিখিলেশ-চরিত্রে। এর বিরুদ্ধধর্মী ভোগসর্বস্ব জীবনবাদের রূপায়ণ দেখি সন্দীপের মধ্যে। শেষপর্যন্ত বিমলা স্বামী নিখিলেশের কাছে ফিরে এসেছে, কিন্তু বিমলার সত্যকার ভালোবাসা নিখিলেশ পেল কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর উপন্যাসে অনুচ্চারিত থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি-আন্দোলনের যুগের আলোর দিক ও

অন্ধকারের দিক উভয়ই দেখেছিলেন। দেশপ্রেমে প্রাণিত হয়ে কেউ এগিয়ে গেছে আত্মোৎসর্গের পথে, আবার, দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে কেউ ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনেও প্রবৃত্ত হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে'তে এরই মনোজ্ঞ আলেখ্য চিত্রিত। উপন্যাসহিসেবে 'ঘরে-বাইরে' সত্যই অসাধারণ।

'**চতুরঙ্গ**' আখ্যায়িকাখানিতেও দুই ভিন্নমুখী জীবনবোধের সংঘাত রূপায়িত। একদিকে, ভক্তিমার্গের পথিক শচীশ—কামনা ও কামিনী তার কাছে পরিত্যাজ্য; অন্যদিকে, জীবনের সহজ স্বাভাবিক আশাআকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত দামিনী। দামিনী নারী, সে পুরুষের আশ্রয় চায়, তার প্রবল জীবনানুরাগ। কিন্তু শচীশ যে-পথে অগ্রসরমাণ সেই পথ দামিনীর নয়। তাই, সে ঝুঁকলো যথার্থ জীবনবোধসম্পন্ন পুরুষ শ্রীবিলাসের দিকে। এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুস্পষ্ট। বাস্তবসম্পর্কশূন্য জীবনতত্ত্ব মানবিক সত্যের বিরোধী, হৃদয়ধর্মকে উপেক্ষা করলে জীবন রিক্ত হয়ে যায়, কেবল বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করতে থাকে। 'চতুরঙ্গ'তে উপন্যাসকারের অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, মনস্তত্ত্বের বর্ণবস্তু ঘাতপ্রতিঘাতে এই আখ্যায়িকার ঘটনা ও চরিত্র অবলীলায় অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু যথার্থ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এ নয়। পূর্ণায়ত হলে 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের অতি-উৎকৃষ্ট উপন্যাসের গৌরব পেত। লক্ষ্য করতে হবে, বইটি ছোটগল্পের আঙ্গিকে লেখা, এধরণের উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রেরই দান।

পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস '**যোগাযোগ**'-এ নারীর অধিকারের প্রশ্নটিই উত্থাপিত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মানসপ্রকৃতিতে যদি একরূপ না হয়, রুচিতে, শীলে উভয়ের মধ্যে যদি বড়োরকমের পার্থক্য দেখা দেয় তাহলে দাম্পত্যজীবনে কী সাংঘাতিক সংঘাত বাধে, তা আমরা দেখতে পাই বর্তমান আখ্যায়িকাখানিতে। মধুসূদন ঘোষাল গায়ের জোরে স্ত্রী কুমুদিনীকে নিজ অধিকারে আনতে চেয়েছে। কিন্তু কুমুদিনীর স্বাধিকারবোধ প্রবল ধাক্কায় বারংবার তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মন জয় করে নিয়েই নারীকে পেতে হয় এ বোধ মধুসূদনের ছিল না। তাই, স্ত্রী হয়েও কুমুদিনী তার নাগালের বাইরে থেকে গেছে। পরিশেষে দেখা গেলো, যে-স্বামীকে কুমু এতকাল মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তার কাছেই সেদিন সে নতিস্বীকার করলো, যেদিন তার নারীত্বের অধিকারবোধের সঙ্গে যুক্ত হলো নিজের আসন্ন মাতৃত্বচেতনা। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

'**শেষের কবিতা**' রচিত হয় 'যোগাযোগ'-এর সমকালে। অথচ আঙ্গিক, ভাষারীতি, বিষয়বস্তু, জীবনভাবনা—সর্বক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। এ এক নতুন ধরণের রোম্যান্স। বাঙলা সাহিত্যে এজাতের আখ্যায়িকা এর আগে

কখনো লেখা হয়নি, রবীন্দ্রসাহিত্যেও আর দ্বিতীয়টি নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল 'স্যাটায়ার' রচনা করা। সেকালের তরুণ লেখকেরা যৌবনের আস্ফালন করেছিল, 'বুড়ো' রবীন্দ্রকে তারা বলেছিল 'সেকেলে'। এতে কবি কৌতুকবোধ করেছিলেন। ওদের যৌবনের আস্ফালনকে স্তব্ধীভূত করে দেবার জন্যেই লিখলেন 'শেষের কবিতা'। যেন বলতে চাইলেন, ওহে, তোমরা যৌবনের মর্ম কী জান—এই দেখ আসল যৌবনের চেহারা। যে-নব্যতন্ত্রীরা রবিঠাকুরকে 'out of date' বলে অগ্রাহ্য করতে চান, তাদেরই চোখ ফোটাবার জন্যে কবি হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিদ্রূপের সুর কবির যৌবনের প্রতি মমতায় সিক্ত হলো, লেখক নিজেই রোমান্সের মদিরায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন—অমিতরা ও লাবণ্যরা সকলেরই সহানুভূতি কেড়ে নিল। ফলে অপূর্বসুন্দর একটি প্রেমকাহিনী লেখা হয়ে গেলো। এই প্রেমের জগৎটি বাস্তবসম্পর্কবিরহিত, নায়কনায়িকারা সকলেই যেন মায়াজড়ানো এক অপরূপা রূপকথার সংসারের অধিবাসী। তাদের হাস্যে-লাস্যে, বন্ধনভারমুক্ত প্রাণের গানে 'শেষের কবিতা' মুখর হয়ে উঠেছে। এই যৌবনের কাব্যখানিতে লিরিকের অশ্রান্ত কলধ্বনি শোনা যায়, মুহুর্মুহু শাণিত কথার [illegible] হয়। বাঙলা গদ্যের আশ্চর্য প্রকাশশক্তি, গতি ও দীপ্তি যদি কেউ দেখতে চান তাহলে তাকে আমরা 'শেষের কবিতা' বইখানি পড়তে অনুরোধ করব। এতে পাঠক কাব্যরস প্রচুর পাবেন, খাঁটি উপন্যাস-রসের সন্ধান করলে কিন্তু তিনি ঠকবেন।

কবির পরিণত বয়সে প্রকাশিত তিনখানি আখ্যায়িকার নাম—'দুইবোন', 'চার অধ্যায়' ও 'মালঞ্চ'। এগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, উপন্যাসের ব্যাপ্তি এদের নেই। প্রথমোক্ত দুখানি বইকে যুগ্ম-আখ্যায়িকা বলা যেতে পারে। এরা প্রেমজীবনের মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। দুটি আখ্যায়িকাতেই দেখি, স্ত্রীর জীবৎকালে স্বামী অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে, ফলে এতকালের দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরেছে। **'দুইবোন'**-এর অসুস্থ শর্মিলা স্বামীর সুখকেই নিজের সুখ জেনে নতুন আবির্ভূতা রমণীর হাতে আপন স্বামীকে তুলে দিতে বেদনাবোধ করেনি। কিন্তু **'মালঞ্চ'**-এর অসুস্থ নীরজার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সে জানে, তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আর, স্বামীর মনটিকে ধরে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি, মৃত্যুর প্রাক্কালে তার মুখে শুনি—'পারলুম না, পারলুম না—দিতে পারব না, পারব না।' নীরজার আচরণই স্বাভাবিক, মেয়েরা প্রাণ থাকতে স্বামীকে অন্য কোনো নারীর হাতে সঁপে দিতে পারে না। শর্মিলার আচরণ অস্বাভাবিক, কারণ, সে জীবনসত্যের বিরোধিতা

করেছে। 'দুইবোন'-'মালঞ্চ'-এর যে সমস্যা তা ত্রিভুজ সমস্যা। কবির লেখনীতে এর সুন্দর চিত্র ফুটেছে।

ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন **'চার অধ্যায়'**-এর পটভূমি। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে বাঙ্‌লাদেশে সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের বহু তরুণতরুণী এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। বিদেশি-শাসকের কবল থেকে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনকল্পে এদের অকুণ্ঠ আত্মবলি দেশ-প্রাণতার পরিচয়বাহী, সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এভাবে আত্মবিসর্জনকে সমর্থন জানাতে পারেননি। তাঁর মতে এ হলো প্রাণশক্তির অপচয়—কয়েকজন ইংরেজ মেরে দেশোদ্ধারের মতো কঠিন কাজ কখনো সম্পাদিত হতে পারে না, এ হলো কবির বিশ্বাস। দেশের যুবকদল সংগঠনকার্যে ব্রতী হোক, হিংসার পথ তারা বর্জন করুক, কবি বারবার একথা বলেছেন। মানবসত্তাকে হিংসাবিদ্বেষের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। সন্ত্রাসবাদের বহ্নিশিখার মধ্যে মেয়েদের টেনে নিয়ে আসাটাকেও কবির ভালো লাগেনি। বিপ্লবীদলে অনেক যুবক যোগ দিয়েছে—কেউ দেশের টানে, কেউ নারীর আকর্ষণে। তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। স্বভাবের বিরোধিতা করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়—'চার অধ্যায়'-এর এলা ও অতীনের চরিত্র কবির এই বক্তব্যটির দিকে ইঙ্গিত করছে যেন।

উপন্যাসকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোটামুটি এই কথাগুলি বলা চলে :

বঙ্কিমের উত্তরাধিকারকে পাথেয় করে কবি উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজের পথটি বেছে নেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাস-গুলিতে তিনি দীপ্ত স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক রোমান্সের ভূমিতে কবির বিচরণ স্বচ্ছন্দ নয়, ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে তিনি যেন অস্বস্তি বোধ করেন। মানবের মনোলোকের রহস্য-উন্মোচনেই কবির সমধিক উৎসাহ। মনস্তত্ত্বমূলক, বাস্তবপ্রধান সামাজিক উপন্যাসে তাঁর হাত খোলে বেশি। প্রধানত রাজাবাদশা প্রভৃতি আর অভিজাতসমাজের মানুষ নিয়ে বঙ্কিমের কারবার, তাঁর আখ্যায়িকায় অতিলৌকিকের স্পর্শ রয়েছে ; পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের আখ্যায়িকাগুলির উপকরণ জুগিয়েছে বাঙ্‌লার মধ্যবিত্তসমাজ। অবশ্য এরা সমাজসৌধের উঁচুতলার বাসিন্দা। রবীন্দ্রের উপন্যাসেও রোম্যান্স রয়েছে, কিন্তু তা বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভরশীল নয়। তার আশ্রয় নিবিড় আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ মানুষ ও প্রকৃতি এবং মানবমানবীর রহস্যময় হৃদয়লোক। এই দিক থেকে দেখলে বঙ্কিম বহির্মুখ, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্মুখ। রবীন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে, চরিত্রগুলি তত্ত্ব ও মতবাদকে বহন করে

চলেছে। একারণে এদের অনেক সময় রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না; মনে হয়, বিশেষ বিশেষ আইডিয়াই মানবের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। যুক্তিনিষ্ঠ, মননপ্রধান, বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস বাঙ্‌লা সাহিত্যে রবীন্দ্রের বড়ো একটি দান। একালের ঔপন্যাসিকরা, বলতে গেলে, রবীন্দ্রপ্রদর্শিত পথেই চলাফেরা করছেন। এখানে স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাই, তাঁর নির্মিত উপন্যাসগুলিতে কবি-মানুষটির প্রতিফলন সুপ্রকট। কবির লেখা আখ্যায়িকায় কাব্যসৌন্দর্য পাঠকের অতিরিক্ত একটি লাভ। তা ছাড়া, বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ত্র শরৎচন্দ্রকে প্রাণিত করেছে—রবীন্দ্রকৃত কয়েকখানি উপন্যাস শরৎসাহিত্যের অগ্রদূত।

উপসংহারে বলি: বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র—এঁরা বাঙ্‌লা উপন্যাস-সাহিত্যের তিন দিক্‌পাল।

॥ রবীন্দ্রসমকালীন কয়েকজন বাঙালি কবি ॥

॥ দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥

[১৮৫৪-১৯২০]

রবীন্দ্রসমকালীন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর কবিতার ভাবে ভাষায় ছন্দে এমন এক কবিব্যক্তির স্পষ্টরেখ মুদ্রাঙ্কন চোখে পড়ে, যাঁর প্রতিভার মৌলিকতা স্বীকার করতেই হয়। রবীন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রভাবে দেবেন্দ্রের কবিত্ব আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি এ মনে রাখবার মতো একটি ঘটনা। কম কবিতা লেখেন নি তিনি, এবং সাহিত্যের মূল্যবিচারে এদের অনেকগুলির কাব্যোৎকর্ষ সংশয়াতীত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেনের দুর্ভাগ্য, তাঁর কাব্যসাধনার সঙ্গে একালের সাধারণ পাঠকের প্রত্যক্ষ পরিচয় তেমন নেই। অধুনা তিনি বিস্মৃত-প্রায় একজন কবি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে আত্মনিষ্ঠ গীতিময় কবিতার ধারা প্রবর্তন করলেন, সেই ধারায় নিজের কাব্যতরণী ভাসালেন দেবেন্দ্রনাথ। তবে বিহারীলালের দূরযানী রোম্যান্টিক কল্পনাভঙ্গি দেবেন্দ্রনাথে অপ্রাপ্তব্য। সুদূরশায়ী সৌন্দর্যের রহস্যলোকে স্বপ্নপ্রয়াণ তিনি করেন নি, মায়াময়ী অধরাকে ধরবার ব্যাকুলতা দেখাননি, অপ্রাপণীয়ের দিকে হাত বাড়াননি। ইন্দ্রিয়সাক্ষী রূপজগতে প্রায়শ তাঁর সাবলীল সঞ্চরণ—'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'-এর মধুমাধুরী আকণ্ঠ পান করতেই তাঁর মহোল্লাস। রূপতান্ত্রিক দেবেন্দ্রনাথ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের

দ্বারপথে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে কবি ধরতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আত্মমুগ্ধ কাব্যকার। সর্বদা ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। হৃদয়াবেগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে কবিতা লিখতেন। যেমন বিহারীলাল, তেমনি দেবেন্দ্রনাথ, উভয়েই বাইরের প্রতি একরূপ উদাসীন, নিরতিশয় অহংমুখ। এদিক থেকে দেখলে কবি-দুজনার মানস-প্রকৃতি বেশ-কিছুটা সদৃশ।

অবশ্য বিহারীলালের কাব্যসাধনায় যে-সমাহিতচিত্ততা বা ধ্যানতন্ময়তা ছিল, দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তা মেলে না। প্রথমোক্ত কবির কাছে—প্রেমসৌন্দর্য ধ্যানের বস্তু; দ্বিতীয়োক্ত কবির কাছে—নেশার সামগ্রী। দেবেন্দ্রের কবিকল্পনা উদ্দাম, আর্টের সংযম বুঝি শেখেনি। এ কারণে তাঁর কবিতা সর্বক্ষেত্রে শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেনি। কিন্তু কবিস্বপ্নের মাহেন্দ্রক্ষণে যে-সব কবিতা তিনি লিখেছেন, সেগুলি নিটোল মুক্তার মতোই সুন্দর। বিশেষে, সনেট-রচনায় দেবেন্দ্রনাথ অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তীব্র আবেগের তরঙ্গকম্পনে মনোহারী তাঁর দৃঢ়পিনদ্ধকায় সনেটগুলি।

দেবেন্দ্রনাথ সেন গীতিকবি। প্রাণের আবেগোচ্ছ্বাসকেই রূপময় ছন্দিত ভাষায় বেঁধেছেন। বিচিত্রসুন্দর উপমায় তিনি ভাব বা বস্তুর রূপকে ফুটিয়েছেন, সুনির্বাচিত শব্দের ঝঙ্কারে সুরধ্বনি বাজিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হলো, রোম্যান্টিক বিষাদ নামে বস্তুটি দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেনি। তাঁকে আনন্দের কবিই আমরা বলবো। নিজ কাব্যে সবত্র তিনি আনন্দ-ধূপের সৌরভ ছড়িয়েছেন, খুশির পদ্ম ফুটিয়েছেন। প্রেম-সৌন্দর্য-প্রীতির প্রাণভরা আরতিতেই কবির পূর্ণায়ত তৃপ্তি। শেষজীবনে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে ভক্তিভাবনা। ভক্তিপ্রবণতা দেবেন্দ্রনাথের কবিধর্মকে কিছুটা খর্ব করেছে। করুক, তথাপি স্বীকার করতেই হবে, দেবেন্দ্রনাথ একজন উত্তম কবি, নিজস্বতায় বিশিষ্ট। রবি-র কাছে থেকেও ছায়ায় পড়ে যান নি।

ফুল খুবই ভালোবাসতেন কবি। এই অশেষ পুষ্পপ্রীতির পরিচয় পাই তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামগুলির দিকে তাকালে—অশোকগুচ্ছ, শেফালিগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ। 'অশোকগুচ্ছ' কবির সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। এছাড়া আরো কয়েকটি কাব্য তাঁর আছে।

কবিতা-অনুরাগীদের কর্তব্য, প্রায়-বিস্মৃত দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভালো কবিতাগুলি চয়ন করে একখানি সংকলনগ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া।

॥ অক্ষয়কুমার বড়াল ॥

[১৮৬০-১৯১৯]

অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাঙ্‌লা কাব্যসংসারে একই সময়ে উভয়ের আত্মপ্রকাশ। অক্ষয়-রবীন্দ্র দুজনেই স্বনামখ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাছে এক অভিনব কাব্যমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এঁদের কাব্যগুরু বিহারীলাল—এদেশে নব্যতন্ত্রীয় গীতিকাব্যধারার প্রবর্তক। উভয় কবিরই প্রতিভার উন্মেষে বিহারীলালের কল্পনা-ভাবনা সহায়তা করেছিল। গুরুর মতোই, এই কবিশিষ্যদ্বয়—অক্ষয়কুমার ও রবীন্দ্রনাথ—আত্মভাবপ্রধান, গীতাত্মক কবিতা লিখে গেছেন। তবে রবীন্দ্র ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর। বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে অপরূপসুন্দর যে-বিশাল কাব্যের ভুবন তিনি রচনা করলেন, সীমাবদ্ধ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী অক্ষয়কুমারের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। তথাপি, এও অনস্বীকার্য যে, কল্পনার বিশালতা না থাকলেও, নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ভাবের যে-রূপসাধনা তিনি করে গেছেন, তার মূল্য নিতান্ত স্বল্প নয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তী ও ইংরেজ কবি শেলীর কাব্যভাবনা অক্ষয়কুমার বড়ালকে প্রভাবিত করেছিল। নারী ও প্রেম অক্ষয়-কবির কবিতাবলীর প্রধানতম প্রেরণা। বলতে গেলে, তিনি প্রেমেরই কবি। তীব্র প্রেমবেদনা তাঁর কাব্যের নায়কী সুর। এর আশেপাশে কিছু সঞ্চারী সুর বেজেছে। একদিকে, 'রমণীর প্রেমসুখ', অন্যদিকে, 'প্রকৃতির শ্যাম বুক'—এ দুই বস্তুকে নিয়ে প্রায়-সর্বদা তিনি বিভোর থেকেছেন, বাস্তবাতিরিক্ত কল্পনার উল্লাসে মেতেছেন। অক্ষয়কুমারের প্রথমদিককার কাব্যসাধনায় এক অভৌম অতিচারী কল্পনার আতিশয্য দেখা যায়। সেখানে স্বপ্নবিলাসী তিনি—ভাব ও বস্তু, স্বপ্ন ও সত্যের দ্বন্দ্বে কবির চিত্ত ক্ষতবিক্ষত। ফলে অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যের যন্ত্রণা-অনুভব। কিন্তু শেষজীবনে যে-কাব্যখানি তিনি লিখলেন—সেই বহুশ্রুত 'এষা' নামে কাব্য—লোকান্তরিতা পত্নীর স্মরণে লিখিত, তাতে কবিতা ও জীবনের, বাস্তব ও অবাস্তবের যন্ত্রণাময় দ্বন্দ্বের অনেকটা নিরসন ঘটেছে। জীবনে-মরণে প্রেমকে মৃত্যুজিৎ বস্তু জেনে, প্রেমকে জীবনের অমৃতবল্লরী বুঝে, আর ঈশ্বরভক্তির শান্তিপ্রদায়ী সরোবরে ডুব দিয়ে, কবির সতত-অশান্ত চিত্ত অবিক্ষুব্ধ সান্ত্বনা পেয়েছে। অক্ষয়কুমারের প্রেমের কবিতাগুলো পড়তে পড়তে মধ্যে-মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাকুলতার কথা স্মরণে জাগে। পত্নী-প্রেয়সীর প্রণয় এ দুজন কবিরও কাব্যপ্রেরণা। তুলনায়, অক্ষয়কুমার

বড়ালের প্রেমভাবনার বৈশিষ্ট্য হলো, গোবিন্দচন্দ্রের দেহরতিকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন, এবং দেবেন্দ্রনাথের গৃহসীমায় আবদ্ধ প্রণয়াকৃতিকে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। দেহের সীমা ও গৃহের সীমা—উভয়ই তিনি ভেঙেছেন। কবির শোকবাক্য 'এষা' স্মরণীয় একখানি গ্রন্থ। তাঁর অপর রচনাবলীর নাম—প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল, শঙ্খ। এ ছাড়া, গাথা-ধরনের কতকগুলি কবিতা তিনি লিখেছিলেন। এসব রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

রবীন্দ্রসমকালীন গীতিকবি অক্ষয়কুমার। কিন্তু তাঁর কবিতা—দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচনাও—রবীন্দ্রযুগের গীতিকবিতা থেকে স্বতন্ত্র। অক্ষয়ের নির্মিত রচনা-নিচয়ে কারুকর্মের সূক্ষ্মতা নেই, অমেয় গীতিমাধুর্য নেই, গীতিকাব্যসুলভ কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস নেই; কিন্তু কারুণ্যে কোমল, গম্ভীর ও উদাত্ত সুর আছে। অসংযত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নয়, মিতভাষিতা ও ভাবুকতা তাঁর কাব্য-চরিত্রের বিশিষ্টতা। কবিস্বভাবে অক্ষয়কুমার পুরামাত্রায় রোমান্টিক, কিন্তু ভাবের রূপনির্মাণে তিনি ক্লাসিকাল। একদিকে, ভাষার সংযম, অন্যদিকে, ভাবসংহতি, তাঁর কাব্যশিল্পকে অতিশয় বিশিষ্ট রূপকর্ম করে তুলেছে। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে সর্বদা তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। সরল, স্বচ্ছ, গরীয়সী ভাষা-মন্ত্রের নিরলস সাধনা অক্ষয়কুমারের। এ ভাষা যেমন দৃঢ়, মসৃণ, তেমনি, শক্তিশালী। একালের কবিশিল্পীর কারুরই রচনায় ভাষার এতখানি সংযম চোখে পড়ে না।

রবীন্দ্রের কত কাছে ছিলেন অক্ষয়কুমার। অথচ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত এক আলাদা কাব্যলোকের অধিবাসী তিনি—রবীন্দ্রভাবপরিমণ্ডলের কিছুটা দূরবর্তী।

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥

[১৮৬৩-১৯১৩]

খ্যাতিমান কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৮৬৩ ইংরেজি সালে জন্ম। বয়সে রবীন্দ্রনাথের দুবছরের ছোট। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। উচ্চশিক্ষিত। ছাত্রহিসেবে অতিশয় মেধাবী ছিলেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তি উন্মেষ লাভ করেছিল। তিনি যে একজন শক্তিমান সাহিত্যকার এতে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিজেন্দ্রের প্রতিভার স্বধর্ম কবিত্ব। এই শক্তির বেশির ভাগ তিনি পরিচালিত করেন নাটক, গান এবং হাসির গান ও হাসির রচনার ক্ষেত্রে। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হাসির গানগুলিই। হাস্যগীতিনির্মাণে

অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এগুলির সুরে ও ভঙ্গিতে এমন একটি নতুনতা আছে যা যে-কোনো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জাতের রচনা পূর্বে কিংবা পরে আর দেখা যায়নি।

কিন্তু ভেবে অবাক হতে হয়, গানে যাঁর অমন হাত, শব্দের নিপুণ বিন্যাসে ও প্রকাশচারুত্বে যা সত্যিই মনোরম, লিরিক-নির্মাণে তিনি ব্যর্থ হলেন। কবির মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থে মোটামুটি ভালো কবিতা আছে। কিন্তু রূপরসের ঐশ্বর্যে ঝল্‌মল্‌ করছে, সুচিরকালের স্মরণীয়তা দাবি করতে পারে, এমন কোনো লিরিক বোধ করি তিনি নির্মাণ করেন নি। দ্বিজেন্দ্রকাব্যে ভাবে ও ভঙ্গিতে যত নিজস্বতাই থাক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর যতই উচ্চপ্রশংসা করুন না কেন, তা একালের পাঠকের তৃপ্তিবিধান করবে, এমন মনে হয় না। সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, কিন্তু আধুনিক কাল গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রকে বড়ো একটা স্মরণ করে না। নতুন ছন্দে তিনি কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন, তা আমাদের ভালো লাগেনি—ছন্দসুষমার অভাব বোধ করি বলেই। কয়েকটি ইংরেজি কবিতা তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে, সেগুলিতে কবির গভীর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণীয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যাদর্শের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে। রবীন্দ্রসমকালীন কবি তিনি, কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্তর্ভুক্ত নন। জাতির জীবন থেকে দূরে থেকে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস-পরিবেশনে উৎসাহী তিনি ছিলেন না। ভাবভাবনা ও কল্পনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অস্পষ্টতা, দুরূহতা বা অতীন্দ্রিয়তা পরিহার করে সাহিত্যরস সবসাধারণের পানীয় করে তুলতে হবে, দেশের মানুষের প্রাণমনের জাগরণ ঘটিয়ে তাদের বক্ষে ও বাহুতে সাহস সঞ্চার করতে হবে, এ ছিল তাঁর সাহিত্যপ্রতীতি। সাহিত্যকে তিনি জাতীয় কল্যাণবিধানে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই যে আদর্শপ্রীতি, ভাবের ঋজুতা ও তার সহজ সরল প্রকাশের প্রতি অতিআত্যন্তিক পক্ষপাত, এর আদিবাহন হয়েছিল তাঁর জনপ্রিয় গীতাবলি। যেমন আগে বলেছি, স্বাদেশিকতামূলক, লোকসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা-ব্যঞ্জক, সংগীতরচনাতেই তাঁর প্রতিভা সার্থক। সাহিত্যের যে-গণআদর্শ তিনি কবিতায় আর সংগীতে বরণ ও প্রচার করেছিলেন, তাঁর স্বকৃত নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রগুলি যেন তারই প্রাণময় ভাষ্য। নাট্যকার-হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব যেমনই হোক, বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের কথাবস্তুর ক্ষেত্রে সত্যিই তিনি যুগান্তর এনেছিলেন।

কবির জীবিতকালের সেই উজ্জ্বল খ্যাতি অধুনা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার অতিভাস্বর দীপ্তি বোধ করি এর প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ, মনে হয়, যুগরুচির পরিবর্তন। যে-গুণধর্মে সাহিত্যকর্ম যুগের সীমা অতিক্রম করে যায়, দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে নিশ্চয়ই তার অভাব আছে। তাই, কবির কাব্যকীর্তি দীর্ঘকালস্থায়ী হলো না। দ্বিজেন্দ্রলাল যে-পরিমাণে কবি এবং ভাবুক, সেই পরিমাণে সার্থক বাণীশিল্পী নন। তাঁর বিবিধ রচনা স্থানে স্থানে কথার বুদ্বুদ-মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রের কাব্যনাটকাদির উচ্চপ্রশংসা করতে পারলাম না আমরা। পারলে খুশিই হতাম। তথাপি, দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার দান উপেক্ষার বস্তু নয়। তাঁর কণ্ঠে পৌরুষ ও বীর্যের মন্ত্র উচ্চারিত, তাঁর লেখায় কাপুরুষতা জলন্ত ধিক্কারে লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ প্রচারিত। বাঙ্‌লার স্বদেশি-আন্দোলনের যুগে সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিগৌরব জাগ্রত করেছেন— জাতীয় চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে নিজ লক্ষ্য স্থিরবদ্ধ রেখেছেন। দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপ, চন্দ্রগুপ্ত, মেবারপতন-এর লেখককে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা আমরা নিশ্চয়ই দেবো। না-দিলে আমাদের অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে।

কথার পুনরাবৃত্তি করা হলেও বলি, দ্বিজেন্দ্রগীতি ভুলবার সামগ্রী নয়

॥ প্রমথ চৌধুরী ॥

[১৮৬৮-১৯৪৬]

প্রথমে উল্কা বলে ভুল হয়েছিল। পরে বুঝতে পারা গেলো, ধারণাটা ভ্রান্ত। উল্কা নয়—ধ্রুবতারার স্থির দীপ্তির উদ্ভাস রয়েছে গায়ে। আলোর চকিত চমক লাগিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে না, সমানে রশ্মিমালা ছড়াতে থাকবে। সেই আলোয় অনেকে পথ চিনে নেবে। ধ্রুবতারা দিশারীর কাজ করে। বাঙ্‌লা সাহিত্যসংসারে প্রমথ চৌধুরী একদা সেই কাজ করেছিলেন। ধূমকেতুর চমক সৃষ্টি করবার জন্যে তাঁর অভ্যুদয় নয়। আমাদের নব্যতন্ত্রী সাহিত্যমন্দিরের পুরোহিত তিনি। তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত নবীনের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন একালের অনেক খ্যাতিমান লেখক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন রূপ ও রীতির প্রবর্তন এই অনন্যমনা কুশলী বাণীশিল্পীরই মহতী কীর্তি। কালের ব্যবধানে ভুলে যাবার মতো, অনেকের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো ব্যক্তিত্ব নন প্রমথ চৌধুরী—অবিস্মরণীয়, অভিজাত-রুচি সাহিত্য-পত্রিকা 'সবুজপত্র'-এর সুধন্য সম্পাদক। তাঁর সংস্কারমুক্ত মন আর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা

রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত করেছিল। কবিপুরুষ রবীন্দ্র প্রমথ চৌধুরীর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রের উত্তরপর্বের গদ্যসাহিত্যে বাঙ্‌লা কথ্যরীতির যে অনুপ্রবেশ ঘটলো, তাকে প্রমথীয় প্রভাব বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রশাসিত বাঙ্‌লা সাহিত্যে নতুন শাসনসংস্কার প্রবর্তন করলেন যে-মানুষটি, তাঁর শক্তিমত্তার বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে কী?

প্রমথ চৌধুরী। ছদ্মনামে 'বীরবল'। 'পদ্মাপারের বাঙাল'। পাবনা জেলার হরিপুরের বিখ্যাত চৌধুরীপরিবারের সন্তান। জন্মস্থান যশোর। ছেলেবেলায় চলে আসেন কৃষ্ণনগরে। তাঁর মুখে মাধুর্য ও চাতুর্যের বুলি জুগিয়েছে কৃষ্ণনগর। তাঁর মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভূমিকা রচিত হয় এই কৃষ্ণনগরে। নিজেকে 'কৃষ্ণনাগরিক' বলেছেন তিনি। পরে কলকাতা শহর হলো তাঁর সাহিত্যসাধনার কেন্দ্রভূমি। এ না হলে কি তিনি এমন বিদগ্ধ নগর-সাহিত্য নির্মাণ করতে পারতেন? আসতে পারতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের অত্যুজ্জ্বল মানসপ্রকর্ষের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে? আর, 'লোকোত্তর পুরুষ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এতখানি কাছেই-বা ঘেঁষতেন কী করে? রসরুচির—অভিজাত মানসিকতার—সম্রাট যে হলেন প্রমথ চৌধুরী, তার পেছনে রবীন্দ্রসংস্পর্শের দান আছে, এতে সন্দেহ কী?—'খুব সম্ভবত আমি তাঁর দ্বারা [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা] প্রভাবান্বিত হয়েছি'—প্রমথনাথের নিজের স্বীকৃতি, এবং কথাগুলি তাৎপর্যমণ্ডিত। বোধ করি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও তাঁকে স্পর্শ করেছে।

বিলেতফেরৎ প্রমথ চৌধুরী। কৃতবিদ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র। ফিলজফি খুবই ভালোবাসতেন। ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী। ফরাসী সাহিত্যে রীতিমতো দখল ছিল। প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। সেরা পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য-রসিকের নিকট-সংস্পর্শে এসেছেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। বেশ পরিণত মন নিয়েই হাতে কলম ধরেছেন। কাঁচা লেখা তাঁর নেই বললেই হয়। যতখানি চিন্তার অনুশীলন করেছেন তিনি, সেই অনুপাতে লিখেছেন কম। পরিমাণে স্বল্প হলেও ভাবনার মৌলিকতায়, প্রকাশরীতির চারুতায়, বাক্‌-বৈভবে, সূক্ষ্মচতুর রসিকতায়, ভাষাভঙ্গির অভিনবত্বায় প্রমথসাহিত্য অতিশয় বিশিষ্ট। এমন মার্জিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মনন, অনুশীলিত রুচি, আর আভিজাত্যে আলোকিত মনের পরিচয় দ্বিতীয় কোনো বাঙালি সাহিত্যকারের রচনায় চোখে পড়ে না। সাহিত্যাচার্য বলতে পারা যায় প্রমথ চৌধুরীকে। কত নতুন লেখক সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। বঙ্কিমের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর মতোই, তাঁর সম্পাদিত

'সবুজপত্র', লেখক-তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান যেন। সাহিত্যের একটা নতুন পথ তিনি খুলে দিলেন এই পত্রিকাটির মাধ্যমে।

বিদ্বান-শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসাধনা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে শেষ হবার নয়। তিনি প্রবন্ধকার-গল্পকার-কাব্যকার। তাঁর প্রবন্ধের বই 'বীরবলের হালখাতা', 'তেল-নুন-লকড়ি', গল্পের বই 'আহুতি', 'চার-ইয়ারী কথা', কবিতার বই 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ', ইত্যাদির সঙ্গে সকলেই কমবেশি পরিচিত। তবে গদ্যলেখক প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতির নীচে কবিতালেখক প্রমথ চৌধুরীর কীর্তি চাপা পড়ে গেছে।

কবি প্রমথ চৌধুরীকে অনেকেই চেনেন না। তাঁর কবিকর্মের আলোচনাও বড়ো-একটা হয়নি। একশোর মতো কবিতা তিনি লিখেছেন, অধিকাংশই সনেট। এই হিসেবে তাঁকে প্রধানত সনেটকার বলা যেতে পারে। একদা যখন দেশের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অন্ধ-অনুকরণ চলছিল, সেই সময়ে তিনি ভিন্ন একটি মার্গের পথিক হলেন। উচ্ছ্বাস, ভাবালুতা, আবেগাতিরেক, মেয়েলি ধরণের কোমলতা, ইত্যাদি বস্তু তাঁর কবিস্বভাবের বিরোধী। 'জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি' বরদাস্ত করতে পারতেন না প্রমথ চৌধুরী। 'বড়ো কবি' কিংবা 'ভাবুক কবি' হতে তিনি চাননি; নিজের ভাবনা-চিন্তা-কৌতুককে আবেগবর্জিত ভাষায়, স্বল্পাক্ষরে, ছন্দোবদ্ধ করেছেন। ভাব যেমনই হোক, কবিতার অনিন্দ্য কায়াবয়বনির্মাণের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। কবিত্বের ভাগ কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ভাবের শব্দকায় প্রতিমাটি নিখুঁত হওয়া চাই। অতিরিক্ত বুদ্ধিচর্চার জন্যে অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

প্রমথ চৌধুরী নিশ্চয়ই কবিমনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ঠিক জাতকবি বলতে যা বোঝায়, তিনি তা নন। তাঁর লেখা কবিতা তাঁর গদ্যেরই যেন ছন্দোময় রূপান্তর-বিশেষ। গদ্যলেখকের মেজাজটি, তাই, কাব্যেও প্রতিফলিত। শক্তিমান উঁচুদরের কবি তাঁকে বলবো না। রবীন্দ্রের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ কাটিয়ে নিজস্বতায় ফুটে উঠতে পেরেছেন, এখানেই কাব্যকারহিসেবে স্মরণীয় তিনি।

॥ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

[১৮৭৭-১৯৫৫]

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিচক্রের অন্তর্ভুক্ত খ্যাতিমান কবিগোষ্ঠীর একজন—রবীন্দ্রকাব্যপরিমণ্ডলের অধিবাসী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবমন্ত্রে দীক্ষিত

করুণানিধান, রবীন্দ্রের কবিতার স্রোতোধারায় তাঁর নিত্য-অবগাহন। তথাপি, আপন কবিব্যক্তিত্বের স্পষ্টরেখ স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি। স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। প্রধানত রবীন্দ্রীয় ভাবসাধনায় পুষ্ট হলেও, করুণানিধান প্রায়সমকালীন ও সমকালীন আরো তিনজন শক্তিমান বাঙালি কাব্যকারের রচনার অনুরাগী পাঠক ছিলেন—বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের কাব্যভাবনা ও কাব্যকলাবিধির কিছু কিছু মুদ্রাঙ্কন করুণানিধানের বাণী-রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

করুণানিধান কবিতার যে-রমণীয় রূপলোক নির্মাণ করেছেন তার পটভূমিতে বিরাজমান রয়েছে নিসর্গপ্রকৃতি—বাঙ্‌লাদেশের ও বহির্বাঙ্‌লার বিচিত্ররূপা প্রকৃতি—চিরযৌবনা, চিরসুন্দরী। এখানে নিসর্গের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশ স্থূলতামুক্ত, রূঢ়তার স্পর্শবিরহিত। করুণানিধানের আলিঙ্গিতা প্রকৃতি-প্রেয়সী সুশোভনা, কোমলাঙ্গী—মায়াঘেরা লাবণ্যপ্রতিমা। করুণানিধান আত্মমগ্ন রোম্যাণ্টিক কবি। প্রকৃতির সৌন্দর্যধ্যানে সতত আবিষ্ট। রূপমুগ্ধ তিনি। স্বপ্নবিহ্বল। এ স্বপ্ন যৌবনের। তাঁর কবিপ্রাণের যে উল্লাস, তাকে বলতে পারি—রূপোল্লাস। রূপতীর্থের কবি-পথিক তিনি, দুচোখে তাঁর অনুরাগের মোহময় আবেশ। প্রকৃতির রূপমুগ্ধতা কবিকে জগতের আর-সবকিছুর প্রতি একরূপ উদাসীন করেছে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যস্বপ্নের জগতে তাঁকে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই যে অনন্যমনস্ক প্রকৃতিপ্রেম, এই যে নিসর্গের সৌন্দর্যভোগস্পৃহা, এ হলো করুণানিধানের কবিধর্ম ও কবিকর্মের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

প্রকৃতি-প্রিয়ার কত বর্ণাঢ্য আলেখ্য এঁকেছেন করুণানিধান—হৃদয়ের ভালোবাসার রঙে বিলসিত, আবেগতপ্ত। এসব লিপিচিত্র মনের মাধুরীসিক্ত বলে বাস্তব এখানে স্বপ্নসুন্দর মায়ামূর্তি পরিগ্রহ করেছে। চেনা-অচেনার, আলো-ছায়ার লুকোচুরি-খেলা যেন। প্রেমের ধর্মই এই, ভালোলাগার বস্তুটিকে নিয়ে স্বপ্নলোকের মায়াসৃজনে তৃপ্তি পায়, বস্তুকে বস্তুর অতীত জগতে উত্তীর্ণ করে দেয়। তাই বলে বাস্তব তার সত্যতা কি হারিয়ে ফেললো? তা কিন্তু নয়। রোম্যাণ্টিক রবীন্দ্রের মুখে আমরা কি শুনিনি যে: 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'? প্রকৃতিপ্রেমী করুণানিধান এই মায়ালোকের কবি, স্বপ্নলোকের কাব্যকার। তাঁর কাব্যের সংসারটি স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। এ জগতে সোনালি স্বপ্নের মণিমুক্তা যত্রতত্র মিলবে। অপর কোনো বাঙালি কবি, করুণানিধানের ন্যায়, এতখানি স্বপ্নজীবিত নন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিত্ব, এবং এই কবিত্বের

সংশয়াতীত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর শিল্পরচনদক্ষতা। ছন্দ-সরস্বতীকে তিনি বসে এনেছেন ; বিশেষ ছন্দের উপযোগী বিশেষ ভাষা-প্রয়োগে প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন ; ভাবের বাণীবিগ্রহ-নির্মাণের উপযোগী শব্দসমাহরণে অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। কারো কারো হয়তো মনে হবে, ছন্দ-সংগীত আর শব্দের ধ্বনিতরঙ্গসৃষ্টির ক্ষেত্রে করুণানিধান বুঝি সত্যেন্দ্রীয় কাব্যকৌশলের অনুকারী হয়েছেন। পূর্ণ সত্য তা নয়। এই ছন্দ, এই ভাষা, এই শব্দ কবির লেখনীমুখে এসে ভিড় করেছে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আবেগের টানে। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু আবেগসমুদ্ধ কবিতা বেশি লেখেন নি। কাব্যের জগতে সত্যেন্দ্রীয় রূপকর্ম ও করুণানিধানী রূপকর্মে বিস্তর প্রভেদ। সত্যেন্দ্রনাথের মতো সচেতন বুদ্ধির এলাকার মানুষ ছিলেন না করুণানিধান। প্রাণের আকূতিকেই তিনি কবিতার গীতিস্রোতে উদ্বারিত করেছেন।

বর্তমান কবি কিছু প্রেমের কবিতাও লিখেছেন—ব্যক্তিপ্রেমের সৌরভে সুবাসিত। এ প্রেম ইন্দ্রিয়নির্ভর, বাসনাজড়িত, যৌবনস্বপ্নে সুন্দর। মিলনের মধুলগ্নটিকে কবি আনন্দতরঙ্গিত ভাষায় ফুটিয়েছেন, অশ্রুআকুল বিরহের বিষণ্ণ প্রহরগুলিকে বেদনার গীতধ্বনিতে ধরে রেখেছেন। করুণানিধানের এমন কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে যা একালের পাঠকেরও সমাদর পাবে নিশ্চয়ই।

করুণানিধান মুখ্যত প্রকৃতিপ্রেমের কবি, নিসর্গলক্ষ্মীর রূপধ্যানে প্রায়সর্বক্ষণ সমাহিত। এ ছাড়া, সংসার-অনুরাগ এবং মর্তপ্রীতির সুরটিও তাঁর কবিতায় মাঝে-মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালের জটিল জীবনজিজ্ঞাসাকে তিনি বাণীবদ্ধ করেন নি, সংশয়দোলায় দোলেন নি, নৈরাশ্যের হাতে ধরা দেন নি। কোনো তত্ত্ব-ভাবনাও তাঁর ছিল না। সুস্পষ্টতা, সরসতা ও প্রথানুবর্তন সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন তাঁর কাব্যদেহে।

করুণানিধানের কাব্যকবিতার বড়ো ত্রুটি ভাবের এককেন্দ্রিকতার অভাব। হৃদয়াবেগের প্রকাশকে তিনি একমুখী করে তুলতে পারেন না। ফলে কবির ভাবানুভূতি কতকগুলা বিচ্ছিন্ন লিপিচিত্র হয়ে দাঁড়ায়, সংহত রূপগ্রহণ করে না। গভীরতর কোনো জীবনদর্শন তাঁর কাব্যে অপ্রাপ্তব্য। এতে হৃদয়ানুভবের নিবিড়তা আছে, মননের তেমন পরিচয় নেই। করুণানিধানের রচনার আরো একটি ত্রুটি হলো, এখানে ইন্দ্রিয়াশ্রিত তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যচেতনা কোথাও কোথাও বিচলিত হয়েছে জীবনবিমুখ অধ্যাত্মভাবনার আকস্মিক আত্মপ্রকাশে। দুই বিরোধী চেতনার পাশাপাশি সমাবেশ যেখানে, কাব্যরসের সহজ উৎসরণ সেখানে ব্যাহত

না হয়ে পারে না। ক্ষণসুন্দরের পাশে চিরসুন্দরের নির্বিরোধ স্থান করে দিতে পারেননি কবি।

সে যা হোক, রবীন্দ্রের কাব্যভাবপরিমণ্ডলে অবস্থিত থেকেও তিনি যে বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছেন, কবি-হিসেবে এ তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয়বাহী। করুণানিধানের প্রতিভা বহুপ্রসবিনী নয়, অসংখ্য কবিতা তিনি লেখেন নি। খ্যাতিলিপ্সু তিনি ছিলেন না। যখন প্রেরণাবিদ্ধ হয়েছেন, কেবল তখনই হাতে লেখনী তুলে নিয়েছেন। ভালোই করেছেন। ব্যর্থ সৃষ্টির পুঞ্জীকৃত জঞ্জালের বোঝা বহন করতে হয়নি তাঁকে। বঙ্গমঙ্গল, প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদুর্বা, শতনরী [সংকলন] প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

॥ যতীন্দ্রমোহন বাগচি ॥

[১৮৭৮-১৯৪৮]

বিংশ শতকের প্রথমের দিক। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল বিভায় দিগ্‌দেশ আলোয় আলোময়। বাঙ্‌লা কাব্যসংসার ঝলমল করছে। এই গ্রহপতি রবীন্দ্রকে ঘিরে একদল কবি-জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হলো। গড়ে উঠলো রবিচক্র। করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, মোতিলাল, কালিদাস রায় প্রমুখ কাব্য-সাধকরা সম্প্রোক্ত রবিচক্রের অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তশিষ্য —রবীন্দ্রের কাব্যাদর্শে প্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের ভাবসাধনা ও রূপকর্মকে চূড়ান্ত বলে বুঝেছিলেন এঁরা। এসকল রবীন্দ্রশিষ্যদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন প্রধানতম। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি যতীন্দ্রমোহনের প্রগাঢ় অনুরক্তি। অতি-আত্যন্তিক অনুরাগবশে রবীন্দ্রপ্রভাবকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রপূজায় তাঁর অবিচল নিষ্ঠা অতিশয় উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য যতীন্দ্রমোহন, যেমন স্নেহধন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং সেকালের তরুণতম কবি সতীশচন্দ্র রায়।

রবীন্দ্রের প্রদর্শিত পথে সর্বক্ষণ বিচরণ করলেও যতীন্দ্রমোহন বাগচির কবিতায় নিজস্বতার পরিচয় আছে। উচ্চতর ভাবলোকে তাঁর বিহরণ নয়, তাঁর কল্পনাও দূরাভিসারী নয়। দূর দেশে ও দূর কালে নিজ কল্পনাকে তিনি প্রসারিত করে ধরেননি, জগৎ ও জীবনের রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চাননি তিনি। আমাদের এই বাঙ্‌লাদেশ, বাঙ্‌লাদেশের চিরচেনা পল্লী, পল্লীর সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখ যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। বাঙ্‌লা পল্লী-

প্রকৃতির আলেখ্যচিত্রণে তাঁর মুগ্ধ কবিচিত্তের পরিচয়টি আমরা চাই। পনেরো-কুড়ি বছর আগে এদেশে পল্লীকবিতা লেখার প্রতি কয়েকজন কবির বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, শহরে বসেই তাঁরা পল্লীপ্রীতির গান শুনিয়েছিলেন আমাদের। কিন্তু পাড়াগাঁর সম্পর্কে এই অনুরাগের মধ্যে তেমন আন্তরিকতা ফোটেনি। উক্ত রেওয়াজের বহু পূর্বে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, প্রমুখ কবিরা পল্লীপ্রসঙ্গকে তাঁদের কাব্যবস্তু-হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের পল্লীর প্রতি ভালোবাসা অকপট, পল্লীশ্রীর দক্ষ রূপকার তিনি। গ্রামবাঙলাকে নিয়ে যে-সব কবিতা তিনি লিখেছিলেন, সহৃদয়তায় ও সৌকুমার্যে সেগুলি সত্যই মর্মস্পর্শী। প্রকাশকৌশলে ও ছন্দের সহজ সৌন্দর্যে এসকল রচনা সকলের উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহন বাগচির সাফল্য অসংশয়িত।

রূপতৃষ্ণার কবি যতীন্দ্রমোহন। করুনিধানের মতো, তাঁর মধ্যেও, রূপ-সম্ভোগস্পৃহাটি প্রবল। তাঁর কবিতায় নারীসৌন্দর্যের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। কবির হাত দিয়ে ভালো প্রেমের কবিতাও বেরিয়েছে—রোম্যাণ্টিক প্রেম ও বাস্তবের প্রেম। এগুলিতে দেহরতির যন্ত্রণা নেই, উন্মাদনা বা সমারোহ নেই; হৃদয়ের উত্তাপ আছে, আর আছে সংযত-শোভন প্রকাশভঙ্গিমার স্নিগ্ধতা। শান্ত প্রত্যয়ে সুন্দর এসব রচনা।

যতীন্দ্রকাব্যের বিচিত্রতা দৃষ্টি এড়ায় না। নানা বিষয় অবলম্বনে বিস্তর কবিতা তিনি লিখেছেন। দেশানুরাগ এবং পৌরাণিক চরিত্রকথাকেও কবি নিজ কাব্যে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রীয় ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও পৌরাণিক চরিত্রের নবমহিমা-উদ্ঘাটনে তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন কবির প্রভাবে এসেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তথাপি, প্রতিভার স্বকীয়তায় তিনি বিশিষ্ট। তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে প্রধান হলো—রেখা, লেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, নীহারিকা, জাগরণী ও মহাভারতী।

॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

[১৮৮১-১৯২২]

আজকের দিনে কাব্যকার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরানো হয়ে গেছেন, যেমনটি ঘটেছে মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ক্ষেত্রে। এমন কি, নজরুল ইস্‌লামের ন্যায় চমকলাগানো উচ্চকণ্ঠ কবি—যিনি কোলাহলকে গানে

বেঁধেছেন, বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়েছেন, তিনিও আজ পুরাতনের দলভুক্ত। এমনই হয়। নবীন প্রাচীন হয়ে যান, প্রাচীন নতুনকে স্থান করে দেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, এঁরা একসময় আধুনিক ছিলেন—প্রত্যেকেই নতুনের কেতন উড়িয়েছেন। এসকল খ্যাতিমান কবি যুগের অভিনন্দিত।

এককালে সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালি কাব্যপাঠকদের চমকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পর, কবি বলতে, সকলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেই জানতেন। তখন বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্র-অনুজ কবিকুলের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে লোককান্ত। বহুবিচিত্র কবিতার রচয়িতা সত্যেন্দ্রনাথ। ছন্দ ও শব্দের ওপরে তাঁর অদ্ভুত আয়ত্তি। ছন্দের জাদুকর বলা হতো তাঁকে! শব্দশিল্পী-হিসেবে তাঁর জুড়ি খুব কমই আছে। মাত্র চল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। এই সংকীর্ণ আয়ুষ্কালের মধ্যে যে-কাজ তিনি করে গেছেন তা সামান্য নয়। সত্যেন্দ্রের রচনার প্রাচুর্যের দিকে তাকিয়ে বলা চলে, কবির কাব্যলক্ষ্মী কৃপণা ছিলেন না। স্বল্পপরিসর জীবনে মাতৃভাষাকে যে-পরিমাণে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়।

রবীন্দ্রানুরাগী হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। নিজের কাব্যবীণায় একটি স্বতন্ত্র সুর বাজিয়েছিলেন বলেই তাঁকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে একটি অপূর্ণ তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে। সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা।' কী এই 'অপূর্ব তন্ত্র'? সাহিত্যে বাস্তবের অবতারণা। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে, প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে, সাহিত্যের যোগ ঘটাবার একটি নতুন পথ নির্মাণ করেছিলেন তিনি—প্রশস্ত পাকা সড়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুর্বল অনুকরণে বাঙ্‌লা কাব্য যখন একরঙা হয়ে উঠেছিল, অবাস্তবমনোহর স্বপ্নবাসনা, সৌন্দর্যধ্যান আর সুলভ আধ্যাত্মিকতার কাছে সেকালের অধিকাংশ কবিতালেখক যখন অবশে আত্মসমর্পণ করছিলেন, কাব্য-সুন্দরীর মূর্তিরচনব্যাপারে কলাবিধিতে স্পষ্টরেখ শিথিলতা দেখা যাচ্ছিল, তখন সত্যেন্দ্রনাথ নতুন কাব্যবস্তুর সন্ধানে তৎপর হলেন, কবিতার কারুকর্মবিষয়ে সতর্ক সচেতন হয়ে উঠলেন—ছন্দনির্মাণ, শব্দনির্বাচন ও কাব্যের অঙ্গসজ্জায় ঢিলে ভঙ্গির স্থানে শোভন পারিপাট্য নিয়ে এলেন। বাস্তবকে সোৎসাহ আমন্ত্রণ জানিয়ে, জ্ঞানের চর্চাকে কাব্যলোকে স্থান করে দিয়ে, এবং কবিতাকে যথার্থ শিল্পকর্মের স্তরে তুলে ধরে, সেকালটিকে সত্যেন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক কালের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের অন্যতম প্রধান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্র-

প্রতিভার সেই মধ্যদিনেই সত্যেন্দ্রকাব্য এক চমকপ্রদ অভিনবতার স্বাদ বিতরণ করেছিল, এ ঘটনা মনে রাখবার মতো।

রবীন্দ্রকবির ভক্তশিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর কবিপ্রকৃতি কিছুটা স্বতন্ত্র। বুদ্ধিবৃত্ত কবিশিল্পী তিনি। হৃদয়াবেগের তুলনায়, তাঁর কাব্যে, মননেরই বেশি প্রাধান্য। প্রেরণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন না সত্যেন্দ্রনাথ, পটুত্ব প্রদর্শনেই তিনি সমধিক উৎসাহী। 'খাঁটি কল্পনার রসাবেশ' বলতে যা বোঝায়, সত্যেন্দ্রকাব্যে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়—'সজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কারুকুশলতা'র প্রতি সত্যেন্দ্রের প্রবল ঝোঁক। সত্যেন্দ্রনাথে সূক্ষ্ম কল্পনার দৈন্য সকলেরই চোখে পড়বে। তাঁর লেখায় খেয়ালী কল্পনা বা শিশুসুলভ কল্পনাবিলাসের প্রাচুর্য সকলে দেখতে পাবেন। তথ্যচয়নে কবির বিপুল উৎসাহ। মনের গভীরে ডুব দেওয়া যেন তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, রচনায় ভাবগভীরতার বিষয়ে কেমন যেন উদাসীন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ ধ্যানী হতে শেখেন নি। লিরিক লিখতে বসেও মন্ময়তার পথ থেকে দূরে সরে এসেছেন, আত্মগত ভাবনাকে এড়িয়ে চলেছেন।

জ্ঞান-চিন্তার বহুবিচিত্র আয়োজন তাঁর বুদ্ধি ও মনকে প্রসারিত করেছিল; সামাজিক ও রাজনীতি-বিষয়ক বহু তত্ত্ব, ইতিহাস-ভূগোলের বিচিত্র তথ্য তাঁর অধিগত ছিল। এগুলিকে কবি নিজ কাব্যে নির্বাধ প্রবেশ-অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু সৃজনী-কল্পনার স্পর্শের অভাবে এ সমুদয় বস্তু অধিকাংশ স্থলে কবিতার ভারস্বরূপই হয়েছে, আস্বাদনীয় রসের সামগ্রী হয়ে ওঠেনি। ভাবাবেগে স্পন্দিত, অনুভূতির উত্তাপে বিগলিত, করতে না পারলে তথ্য-তত্ত্ব-ঘটনা শিথিলবদ্ধ রূপহীন সুদীর্ঘ তালিকা হয়ে দাঁড়ায়, কাব্যের সত্যে পরিণত হয় না। কবিত্বের চাইতে বহিরঙ্গসর্বস্ব কারুকর্মের দিকে, জ্ঞানের সংবাদ পরিবেশনের দিকে, অধিকতর মনোনিবেশ করার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ সচেতন শিল্পীর মর্যাদাটুকুই পেলেন, প্রথমশ্রেণীর কবিগোষ্ঠির পর্যায়ভুক্ত হতে পারলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অধ্যবসায়ী কবি, সহজকবিত্বের অধিকারী তিনি নন। কল্পনার যে-বিস্তার, অনুভূতির যে-নিবিড়তা, আবেগের যে-তীব্রতা পাঠকচিত্তকে সবলে আকর্ষণ করে, সত্যেন্দ্রকাব্যে তা বিরলদৃষ্ট। ছন্দ ও ভাষার আশ্রয়ে ভাষার অতীত তীরে উত্তরণের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের দূরভিসারী কল্পনা, ধ্যানতন্ময়তা ও গভীরতার পর মধুকরস্বভাব সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও ছন্দকুশলতা রসিক পাঠকের কাছে আর তেমন তৃপ্তিদায়ক মনে হয় না।

সত্যেন্দ্রের শ্রবণেন্দ্রিয় সর্বাধিক প্রখর ছিল; তারপর, চক্ষুরিন্দ্রিয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রত্যক্ষ জগতের কানে-শোনা ও চোখে-দেখার জিনিসকে ছন্দে ও শব্দে

সহজে তিনি ধরে রাখতে পারতেন। এইকারণে তাঁর রচনা প্রধানত ধ্বনিতরঙ্গিত, চিত্ররূপময়। সুরের ডানায় ভর করে উড়তে তাঁর উল্লাস, কথার ছবি আঁকতে অশেষ আনন্দ। ছন্দের কারিগরিতে এবং শব্দপ্রয়োগের নিপুণতায় সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা মেলে না। ক্লাসিকাল কাব্যরীতির সংযমকে রোম্যান্টিক ভঙ্গির ব্যাকুলতার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন। কিছু কিছু লেখায় কবির রূপতৃষ্ণা ও সৌন্দর্যধ্যানের পরিচয় ফুটেছে। রূপসম্ভোগের বাসনায় কবি বলছেন : 'দাও গো মোরে অযুত আঁখি কুলায় না যে দুই চোখে'। তাঁর রূপব্যাকুলতাময় এই লেখাগুলির আবেদন অবশ্যস্বীকার্য।

সত্যেন্দ্রের রচিত কবিতা সংখ্যায় অল্প নয়। কয়েকটি বিভাগে এদের বিন্যস্ত করা যায়। মানবপ্রীতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, স্বদেশপ্রেম, জাতিবৎসল্য, সর্বমানবের সাম্যের স্বীকৃতি, চারিত্রপূজা, প্রেম ও প্রকৃতি, ইত্যাদি বিচিত্র প্রসঙ্গকে তিনি কাব্যবস্তু-হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর লেখনী থেকে প্রচুর অনুবাদ-কবিতা আমরা পেয়েছি। সত্যেন্দ্রের অনুবাদ-দক্ষতার কথা বহুশ্রুত। দেশবিদেশের কত কত কবির কত কত কাব্য যে তিনি পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। অধ্যয়নে ছাত্রের মতোই তাঁর নিষ্ঠা, শিশুর মতোই তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় ত্রুটিবিচ্যুতি কম নেই। থাকলেও, কবিহিসেবে অদ্যাপি তিনি স্মরণীয়। এতখানি একাগ্র সাধনায় খুব কম বাঙালি কবিই কাব্যভারতীর অর্চনা করেছেন। মহৎ কবির গৌরব ও মর্যাদা সত্যেন্দ্রের প্রাপ্য নয়, তিনি অমরতার দাবিও করতে পারেন না। অথচ সমকালীন কয়েকজন খ্যাতিমান কবির ওপর—মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ কাব্যকারের রচনায়—তাঁর প্রভাব অনায়াসলক্ষ্য। এ থেকে বোঝা যায়, বাঙ্‌লার কবিকুল একসময়ে সত্যেন্দ্রকাব্যের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম—তীর্থসলিল, কুহু ও কেকা, অভ্র-আবীর, মণিমঞ্জুষা, বিদায়-আরতি, বেলাশেষের গান, ইত্যাদি।

॥ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

[১৮৮২-]

নামগুলির দিকে তাকান—অজয়, উজানী, একতারা, নূপুর, বনতুলসী, বনমল্লিকা—কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম। এসব কাব্যের নির্মাতা—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। গ্রন্থগুলার নামের মধ্যে কুমুদরঞ্জনের বিশিষ্ট কবিস্বভাবের পরিচয় রয়েছে।

কবি আজো জীবিত। বয়স আশির ওপর। বাণীর-অর্চনা কিন্তু এখনো চলছে। নিরলস তাঁর কাব্যসাধনা। আশ্চর্য নিষ্ঠা। দীর্ঘ অনুশীলনের যে সুযোগ পেয়েছেন তাকে কদাপি অবহেলা করেন নি। রবীন্দ্রকবিব্যক্তিত্বের প্রভাবে লালিত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রের প্রবর্তিত কাব্যধারাটি অনুসরণের প্রমাণ-পরিচয় মুদ্রিত আছে তাঁর প্রথমের দিকের রচনায়। তৎসত্ত্বেও কবিহিসেবে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করতেই হয়। যে-কোনো বাঙালি কাব্যপাঠক তাঁর কবিকণ্ঠস্বরটি সহজেই চিনে নিতে পারবেন।

শহরের আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের উন্মাদ কোলাহলের বাইরে কুমুদরঞ্জন নিজের সারাটি জীবন কাটালেন, পল্লীমায়ের কোলটি ছেড়ে অন্য কোথাও গেলেন না। আত্মভোলা ব্যক্তি তিনি, নিস্পৃহ—সমকালীন অপরাপর কবিগণের তুলনায় একটু বেশি নির্লিপ্ত,—চলমান জগৎ-সংসারের বিরোধ-বিক্ষোভের দিকে বড়ো-একটা দৃষ্টি দেন না। নিজ গ্রামটির মাটির টানে কবির মনটি সর্বদাই পল্লীমুখী। গ্রামতীর্থের চিরকালের পথিক তিনি। এই তীর্থভূমির ভাবরসে মগ্ন থাকতেই তাঁর পরমানন্দ। পল্লীপ্রাণ কুমুদরঞ্জন, পল্লীপ্রকৃতির ভক্ত। বলতে পারা যায়, কুমুদরঞ্জনের কাব্য-কবিতার মূল প্রেরণা গ্রামবাঙলার নানান্ বস্তু-ঘটনা-মানুষ ও নিসর্গপ্রকৃতি। জল ছাড়া মাছ বাঁচে না,—পল্লীর পরিবেশ ব্যতিরেকে কুমুদরঞ্জনের লেখনী অচল। পল্লী-অনুরাগে তাঁর জুড়ি বাঙলাসাহিত্যে নেই বললেও চলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শহরবাসীর পল্লীপ্রীতি এ নয়—অর্থাৎ নাগরিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে সমুদ্ভূত পল্লীঅঞ্চলের বা যে-কোনো পল্লীর জীবনের প্রতি অনুরাগ নয়। এ তাঁর আপন গ্রামের প্রতি জননীবোধে ভক্তি। অজয়তীরবর্তী সেই গ্রামটির তৃণ-তরু-লতা এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ মানুষগুলি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর প্রিয়। কবি বলছেন, নিজ গ্রামকে এত যে ভালোবেসেছেন তিনি তা কাব্যকল্পনার আশ্রয়ে নয়, এ প্রীতি প্রত্যক্ষ সম্পর্কজাত।

কুমুদরঞ্জনের এই নিজ পল্লীপ্রীতির সঙ্গে তাঁর অন্তরের একটি সহজ বৈষ্ণব ভক্তিভাবের সুরও বিজড়িত রয়েছে। এ বিষয়ে কবির সমানধর্মা হলেন করুণানিধান। উভয়েই বৈষ্ণবভাবুকতার দেশের আলোবাতাস-মাটি-জলে মানুষ। তবু কুমুদরঞ্জনের হরিভক্তি কিছু প্রবল। তাঁর কাব্যের অতিসরল ভাষাভঙ্গির সঙ্গে যেন কোথায় এই গ্রামপ্রীতি ও হরিভক্তির যোগ রয়েছে। বহু কবিতায় কবি আপনার বৈষ্ণবীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সরল পল্লীর মানুস যেমন নিজ পল্লীর সবকিছুকে মমতা দিয় ঘিরে রাখে এবং সংসারযাত্রার সঙ্গে হরিভক্তি প্রার্থনা করে, কুমুদরঞ্জন তারই মর্মের কথাকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। কুমুদরঞ্জনের দরিদ্র, দুঃখী এবং

ক্ষুদ্রের প্রতি অনুরাগও এই পল্লীবাসী একান্ত উদার-ব্যক্তির-মতো মানসিকতা থেকে উৎপন্ন। এদের প্রতি তাঁর সমবেদনার অন্ত নেই। ছোটখাট ব্যথার ওপর কবির আগ্রহ অপরিসীম। যে-সকল দীন তুচ্ছ অসহায় মানুষ সাধারণত আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়, কবি অশেষ মমতাসহকারে তাদের অখ্যাত আবাস থেকে বার করে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন—এ কুমুদরঞ্জনের কবিপ্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর সুগভীর মানবপ্রীতি কোনো ভাবকল্পনার অধীন না হয়ে সহজ প্রত্যক্ষ আধারে প্রকাশিত হয়েছে।

কবির এই মনোভাবের সঙ্গে তাঁর গার্হস্থ্যপ্রীতিও স্মর্তব্য। ঠাকুরদার সঙ্গে নাতির মিলন কয়েকটি কবিতাতে তিনি বর্ণনা করেছেন। গৃহের পুরানো তৈজস-পত্রের সঙ্গে যে-সকল পারিবারিক মমতাময় ইতিবৃত্ত বিজড়িত রয়েছে, একটি কবিতায় তারই মধুর-করুণ চিত্র পাঠককে উপহার দিয়েছেন। গৃহপ্রেমিক কুমুদরঞ্জনের এই পরিবারপ্রীতির দিকটি দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক উদ্বোধিত হতে পারে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের দাম্পত্যপ্রীতির উচ্ছল প্রকাশ এ কবিকে আদিরসে তেমন অনুপ্রাণিত করেনি। মাত্র সামান্য দু'চারটি কবিতায় দাম্পত্যপ্রীতিরসের মিলন-বিরহময় আনন্দকরুণ ইতিবৃত্তের পরিবেশন দেখতে পাওয়া যায়। কুমুদরঞ্জন গীতিকবি হলেও ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখকে বড়ো করে দেখাতে কোথায় যেন তাঁর সংকোচ ছিল।

সাধারণ সুখদুঃখের কথা নিয়ে রচিত ব্যালাড্-জাতীয় কবিতার লেখক বাঙ্‌লা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। কুমুদরঞ্জন এরূপ কাহিনীমূলক ভাবুকতার গীতিকারদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাঁর পল্লীতে এবং তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে এরকম বহু কাহিনী ও চরিত্র আশ্রয় লাভ করেছিল। তিনি কোনো ক্ষুদ্র ঘটনাকেই ভুলতেন না, স্মৃতির মধ্যে জীবন্ত করে রেখে দিতেন—কোনো অনুকূল মুহূর্তে তাকে সহজ ভাষায় ও ছন্দে গাঁথতেন। এইরূপ কাহিনীর পশ্চাতে তাঁর বিশিষ্ট আদর্শমূলক চিন্তার ছায়া যে না থাকতো তা নয়; তবু সরলতা ও প্রত্যক্ষতার স্পর্শে সেগুলি গাথা-কাব্যের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে।

কুমুদরঞ্জনের কবিতায় নীতিভাবুকতা সুলভ হলেও, দার্শনিক মনন বোধ করি তাঁর স্বভাবের ধর্মানুগত নয়। তিনি নিজ ভাবজীবনকে নিয়ে যেমন খুব বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি, তেমনি, বিশ্বসৃষ্টি ও মানুষের দুঃখপরিতাপ ইত্যাদি নিয়ে খুব বেশি দার্শনিকতার রাজ্যে বিচরণ করা তাঁর মনোধর্মের বিরোধী ছিল। প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষবৎ স্মৃতিকে নিয়ে যাঁর এক-একটি কাব্যকুসুমচয়ন, তিনি যে নিজ মানস-

কল্পলোক অথবা ভাবজগৎ নিয়ে কাল কাটাবেন এরূপ প্রত্যাশা আমরাও করি না। তথাপি, যেহেতু কুমুদরঞ্জন আধুনিক গীতিকবি, এবং যেহেতু তিনি না চাইলেও, বিহারীলাল-রবীন্দ্রের ভাবপরিমণ্ডল সকল উত্তরসাধকের জন্যে প্রতীক্ষা করেই ছিল, সেহেতু আত্মভাবুকতার প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর দুয়েকটি কবিতা এরূপ মানসকল্পনার মধুর সৃষ্টি।

কুমুদরঞ্জন তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর অঙ্গসজ্জাবিধানের জন্যে ভাষার সংস্কার করেন নি। বস্তুত, ভাষার মণ্ডনশিল্প তাঁর কবিস্বভাবের বাইরে ছিল। প্রচুর তদ্ভব ও গ্রাম্য শব্দের যত্রতত্র প্রয়োগ কবির অনায়াস ভাষাবিন্যাসের পরিচয় দেয়। তবে ফার্শি শব্দের অল্পবিস্তর ব্যবহার যে তাঁর সত্যেন্দ্রসংস্পর্শ থেকে সঞ্জাত এতে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না। অলংকারের মধ্যে উপমা আর অতিশয়োক্তির বহুল প্রয়োগ, এবং ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রবণতাও, সত্যেন্দ্রনাথের সজাতীয়ত্ব প্রমাণ করে। সহজ ভাষায়, সহজ ছন্দে, আর্টের সূক্ষ্ম কারুকৌশল ব্যতিরেকেই, আপন হৃদয়ের অকপট অনুভূতিকে তিনি খাঁটি লিরিক ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন। সমুচ্চ ভাব-ভাবনা কিংবা কল্পনার বিস্তার নয়, ভাবের একাগ্রতাই কুমুদরঞ্জনের কবিতার বড়ো বৈশিষ্ট্য। আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা ও কোনোরূপ প্রসাধনকলার রঙ্ লাগেনি বলে মোহিতলাল কুমুদরঞ্জনের রচনাকে বলেছেন 'ডাবের জল'। ভারি সুন্দর একটি কথা, এবং যথার্থ।

॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ॥

[১৮৮৭-১৯৫২]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইস্‌লাম—রবীন্দ্রযুগের বাঙ্‌লা কাব্যে এ তিন বিদ্রোহী—কবি-বিদ্রোহী। অগ্রনায়ক যতীন্দ্রনাথ, এক তির্যক চাহনির কবিতা-লেখক—যিনি স্বপ্নে বিভোর কখনো হলেন না, জীবনে অগ্নিদাহের কথাই কেবল শোনালেন, বসে বসে দুঃখবচনের মালা গাঁথলেন আমৃত্যু। বিশের শতকের বাঙ্‌লা কবিতার ইতিহাসে মরুচারণার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দীপ্যমান নিজত্বে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়।

বাস্তুবিদ্যাবিৎ—ইঞ্জিনিয়ার—হলেন কাব্যকার। ইঁট-চুন-বালি-সুড়কি, লোহা-লক্কড়, কড়ি-বরগার জগতের মানুষটি লিখলেন কবিতা। কৌতুককর বৈপরীত্য।

এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। কঠিন বাস্তবসংসারে রুক্ষ শুষ্ক পথপরিক্রমাই কি চিরশ্যামল বাঙ্‌লাদেশের সন্তান যতীন্দ্রনাথকে 'মরীচিকা-মরুশিখা-মরুমায়া'-র দেশের দিকে ঠেলে দিল! বুঝতে পারি, কর্মজীবন প্রভাবিত করেছে তাঁর কাব্যজীবনকে! এই কবির কণ্ঠেই প্রথম শোনা গেলো একটি নতুন বাস্তবতার সুর। নিজেকে 'দুঃখবাদী বৈরাগী' বলেছেন তিনি। 'দুঃখবাদী' আখ্যা পেয়েছেন। তাঁর কাব্যদর্শনের পরিচিত নাম 'দুঃখবাদ'। 'নৈরাশ্যবাদ' বলাই ভালো, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো—'পেসিমিজম্'। যতীন্দ্রকাব্যের মূল কথা : 'সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুঃখ'। এ এক অভিনব জীবনবেদ—খেদে-পরিতাপে-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যবাদ বা দুঃখদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের রোম্যান্টিক স্বপ্নবিজড়িত নিসর্গপ্রীতি, সৌন্দর্যরতি, আনন্দতন্ময়তা, অরূপব্যাকুলতা প্রভৃতি থেকে সাম্প্রতিক বাস্তবতায় উত্তরণের নবনির্মিত মজবুত একটি সেতু। 'কল্লোলীয়' বিদ্রোহীদের তিনি নিজ সত্তা অর্পণ করেছেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি সানুরাগ শ্রদ্ধা পোষণ করা সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভাবে তৃপ্ত ও আবিষ্ট থাকতে পারেন নি। চোখ থেকে মোহাঞ্জন মুছে ফেলে পরিদৃশ্যমান জগতের দিকে নিরাবরণ দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন—মানুষকে দেখতে পেলেন দুঃখের নাগপাশে বাঁধা, ছলনা-বঞ্চনার নিষ্ঠুর দংশনে ক্ষতবিক্ষত। বিশ্ববিধানে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা কবির চোখে পড়েনি, ঈশ্বরকল্পনা তাঁর কাছে মূঢ় অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। জগৎস্রষ্টা বলে যদি কেউ থাকেন, তিনি নির্মম—মানুষের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন। নিসর্গলোকে কবি লক্ষ্য করেছেন রক্তাঙ্কিত জৈব সংগ্রাম, স্বার্থান্ধ হিংস্রতা। জগতের সর্বত্র অতৃপ্তি-বেদনা-হাহাকার, চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে মর্মান্তিক অসামঞ্জস্য। জীবনের পরিণাম কী? প্রকাণ্ড শূন্যতা। জীবনকে ঘিরে রয়েছে 'মৃত্যুর মহারাত্রি'। জীবনপথের চতুর্দিকস্থ এই প্রাণান্তকর পরিবেশের মধ্যে কোথায় আনন্দ, কোথায় সুখ, কোথায় মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির অবকাশ? এখানে সুন্দরের স্বপ্ন প্রাণঘাতী মায়ামৃগ, সুখের কল্পনা প্রখরদহন মরুভূমির মরীচিকা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন, এই বাস্তবসংসার গোবি-সাহারা, জীবনপথের পথিককে দুঃখের জ্বলন্ত শিখায় দগ্ধিয়ে মারে। তৃষ্ণা জাগায়, নিবৃত্ত করে না। সম্মুখে-পেছনে-ডাইনে-বাঁয়ে সব ছলনা—আলেয়া আর মরুমায়ার।

এই যে জগৎ-সংসারকে একেবারে খোলাচোখে দেখা, এখানেই যতীন্দ্রনাথের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। যতীন্দ্রকাব্য রবীন্দ্রকাব্যের সোচ্চার প্রতিবাদ যেন। আশাবাদী-আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথই কি যতীন্দ্রনাথকে 'দুঃখবাদী বৈরাগী'-র ভূমিকায়

নামালেন! রোম্যান্টিক ভাববিলাসকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি, স্বপ্নাবেশবিহ্বল নির্দ্বন্দ্ব আত্মরতির বৃত্তে অবস্থান করেন নি, কল্পিত সৌন্দর্যরাজ্যে পা বাড়ান নি— নিজ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে মানুষের আঘাত-বেদনা-ব্যর্থতা-বঞ্চনা-অতৃপ্তি-ক্রন্দনের অশ্রুস্নাত, নিরানন্দ ছবি এঁকেছেন। কুড়ির শতকে 'দুঃখের নব-ভগবদ্‌গীতা' রচনা করলেন নৈরাশ্য-মনোভাবের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কবির এই দুঃখবাদকে কেউ কেউ দুঃখের বিলাসিতা বলেছেন। বলেছেন, একটা কৃত্রিম ভঙ্গি। আমাদের বিবেচনায় যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ যদিচ সৃষ্টিভেদকারী প্রত্যয় নয়, কৃত্রিমও একে বলা যায় না। মানুষের দুঃখযন্ত্রণা অবশ্যই তাঁকে বিচলিত করেছে, সমগ্র সত্তা দিয়ে নিশ্চয়ই তিনি একে অনুভব করেছেন। এ ভঙ্গি দিয়ে চোখ-ভোলানোর ব্যাপার হলে তাঁর রচনাবলী পাঠকের মর্মস্পর্শ করতে পারতো না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখদর্শন তাঁর সংবেদনশীল প্রাণের অমেয় পিপাসা, জীবন-ব্যাপারে নশ্বরতাবোধ, অগাধ মানবমমতা, তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা, বাস্তব-চেতনা প্রভৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। অবশ্য শেষজীবনের তিনখানি কাব্যে যতীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিবাসী। এখানে মরুচেতনা আর নয়—বিষণ্ণ সায়াহ্নচেতনা। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে, এতকালের মরুতাপে দগ্ধ কবি প্রত্যাখ্যাত প্রেম-সৌন্দর্যের কথা ভেবে সকরুণ দীর্ঘশ্বাসমোচন করেছেন। ফিরিয়ে-দেওয়া যৌবন, ফিরিয়ে-দেওয়া সৌন্দর্য, ফিরিয়ে-দেওয়া প্রেম কবির বিষাদক্লিষ্ট চেতনাকে আজ ক্ষণে ক্ষণে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদের সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর দিন যে চলে গেছে। দীর্ঘশ্বাসশ্বসিত একটি বিষণ্ণতা কবির শেষ পর্যায়ের রচনাগুলিকে কারুণ্যে-বিগলিত সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে।

প্রচলিত কাব্যভাবনাকে যেমন, তেমনি প্রচলিত কাব্যরীতিকেও, যতীন্দ্রনাথ আন্তরিক সমর্থন জানাতে পারেন নি। কাব্যবস্তু আর রূপরীতি, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ভিন্ন মহলের বাসিন্দা। সাধারণত যাকে আমরা কবিত্ব বলি, বর্তমান কবি তাকে অস্বীকার করেছেন। শব্দের পেলব-মসৃণ রূপ, পদবন্ধের অতিলালিত্য ও চিক্কণতা যতীন্দ্রনাথের চোখে কৃত্রিম বলে প্রতিভাত হয়েছে। শব্দপ্রয়োগে তিনি নিরঙ্কুশ। সাবেকি ছন্দকেই ভাবপ্রকাশের বাহন করেছেন। অস্পষ্টতা, দুরূহতা তাঁর লেখায় চোখে পড়ে না। এই বুদ্ধিদীপ্ত কবির বক্তব্য যেমন স্বচ্ছ, প্রকাশভঙ্গি তেমনি ঋজু—বলিষ্ঠতায় সুন্দর। শ্লেষ ও ব্যঙ্গমিশ্র বাক্যনির্মাণে তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা। ভাষায়, শব্দযোজনায়, কয়েকটি অলংকারপ্রয়োগে, চিত্রকল্পতৈরিতে যতীন্দ্রনাথের নিজত্বের ছাপ গাঢ়-মুদ্রিত।

ভেবে বিস্মিত হই যে, এহেন শক্তিমান কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে যে-আলোচনা-প্রত্যালোচনার আবশ্যকতা ছিল, তা হয়নি। অথচ তুলনায় ক্ষুদ্রশক্তি কয়েকজন কবির রচনা বহুআলোচিত।

যতীন্দ্রনাথের লেখা কাব্যগুলির নাম: মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্‌, ত্রিযামা, নিশান্তিকা, এবং অনুপূর্বা [কবিতা-সংকলন-গ্রন্থ]।

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥

[১৮৮৮-১৯৫২]

'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু'—বহুশ্রুত 'কল্লোল'-এর বিদ্রোহ-ভাববন্যার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত তরুণ সব্যসাচীদের অসন্তোষক্ষুব্ধ প্রাণের প্রার্থনা— 'দ্রোণাচার্যে'র কাছে। সেদিনের বাঙ্‌লা কাব্যসংসারের দ্রোণাচার্য কখনো মোহিতলাল, কখনো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এদুজন গুরু শিষ্যদের যে-অস্ত্র জোগালেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিরাট কবিপুরুষ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রের আত্মতৃপ্ত প্রশান্তির প্রতিক্রিয়ায় মোহিতলাল আর যতীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠে নতুন সুর বাজলো। স্পষ্টত, বিদ্রোহের সুর। বিদ্রোহী মোহিতলাল মজুমদার মানবের দেহসন্নদ্ধ আত্মার বলিষ্ঠ ভাষ্যরচনা করলেন, দেহাত্মবাদের মন্ত্র ছড়ালেন; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একালের কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে বসে 'দুঃখের নবভগবদ্‌গীতা' লিখলেন, 'দুখবৈরাগী' সেজে দুঃখবাদের মন্ত্রপাঠ করলেন। আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের স্রষ্টার মর্যাদা এদুজন কবিকে দিতেই হয়।

শ্রীরবীন্দ্রের পর প্রবল কবিপ্রতিভা মোহিতলাল মজুমদার—স্বপনপসারী-বিস্মরণী-স্মরগরল-হেমন্তগোধূলির প্রখ্যাত অভিজাত আত্মস্বতন্ত্র কাব্যকার। আমাদের একালের কাব্যসাহিত্যে মোহিতলালের স্থান অতিউচ্চে, বোধকরি, সর্বোচ্চে। কিন্তু লোকপ্রিয় কবিতালেখক তিনি নন। যে-প্রকারের কাব্যনির্মাণ তিনি করেছেন তার রসাস্বাদনেও কতকগুলি বাধা আছে। একান্ত জনবল্লভ না হয়েও কবিতার সংসারে যে কীর্তির কেতন ওড়ানো যায়, শক্তিমত্তার পুরো স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়া সম্ভব, মোহিতলাল তার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

সবল সুস্থ দেহধর্ম ও প্রাণধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে, জগৎ ও জীবনকে বীর্যবানের মতো অমেয় কামনা নিয়ে ভোগ করার আদর্শটি নানাকারণে বাঙ্‌লাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পায়নি—বলা যেতে পারে, দেহকেন্দ্রিক প্রেমের কবিতা দীর্ঘকাল ধরেই

নির্বাসিত। সেই কতকাল আগে জয়দেব-বিদ্যাপতি-বড়ুচণ্ডীদাসের অভ্যুদয়। তাঁদের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রেমকাব্যে আধ্যাত্মিকতা যা-ই থাক, দৈহিকতাও কম ছিল না। তারপর দীর্ঘকালব্যাপী গৌড়বঙ্গ শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রদীক্ষা পেয়ে হ্লাদিনীশক্তির আনন্দরাগ সন্ধান করে ফিরলো—দেহপ্রতিষ্ঠিত প্রেম অতীন্দ্রিয়তা ও বৈরাগ্যবাদের গৈরিকের নীচে সংকোচে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলো। এভাবে প্রায়-পাঁচশ বছর কেটে গেলো। অবসিত হলো মধ্যযুগ। যুগান্তে আধুনিক কালের শুরু। মধু-হেম-নবীন কেউ দেহের দেউলে প্রেমের আরতি করলেন না। 'সারদামঙ্গল'-এর নির্মাতা প্রেমগান বেঁধেছিলেন। এ কবিরও অধিষ্ঠান দেহরতির জগৎ থেকে বহুদূরে।

এরপর মহাকবি রবীন্দ্রের উদয়। কিন্তু কাব্যসাধনার স্থির লক্ষ্যে সমাসীন হওয়ার পূর্বেই—যৌবনের সেই প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নেই—তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হলো 'নিষ্ফল কামনা'-র গীতি। স্পর্শাতীত করে তুললেন তিনি মানুষের দেহকে। যে-রবীন্দ্রনাথ প্রেমের গানে গানে বাঙ্‌লাকাব্যের অঙ্গন ভরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর প্রেমসিদ্ধান্ত হলো : 'দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন, রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস' ; 'ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে'। রবীন্দ্রনাথে প্রেম সার্থক রসমূর্তি পেয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেমের বিগ্রহ এখানে অশরীরী। দেহমিলনের গান রবীন্দ্রকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়নি। কত বড়ো প্রেমকল্পনার কবি রবীন্দ্রনাথ, অথচ দেহদীপ জ্বেলে প্রেয়সীকে প্রাণমন্দিরে আহ্বান জানালেন না একবারও। বিস্ময়কর ঘটনা। রবীন্দ্রপ্রেমকবিতায় দেহের পূর্ণনির্বাপণ বিঘোষিত।

সুতরাং বাঙ্‌লা কাব্যে এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ১৩৩০ বাঙ্‌লা সালে আত্মপ্রকাশ করলো 'কল্লোল' মাসিক পত্রিকা। অল্পকালের মধ্যেই চারদিকে নতুন ভাববন্যা বইয়ে দিল। এই পত্রের বিদ্রোহী লেখকগোষ্ঠির দিশারী হলেন মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালই বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ বা ভোগবাদকে রসাভিষিক্ত করে প্রথম প্রতিষ্ঠা দান করলেন। কবি মোহিতলাল দেহাত্মবাদী—জীবনাদর্শের দিক দিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি 'প্যাগান'। ইন্দ্রিয়ের দীপ জ্বেলে জীবনমন্দিরে দেহদেবতারই আরতিবন্দনা করেছেন তিনি। দেহকামনার প্রাণদীপ্ত গতিপথ পরিক্রমণ করে জীবনের যে-অমৃততটে উত্তীর্ণ হলেন, অনন্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ['পান্থ' কবিতায়] কবি তা অমর করে রেখে গেছেন :

সত্য শুধ কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা,—
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠস্বপন
যমদ্বারে বৈতরণী,' সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ।
এই জন্মমালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালোবাসা—
প্রকৃতি জোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন,—
পুরুষ পরিয়া গলে চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন।

রবীন্দ্রের প্রেমকল্পনা কেবল স্পর্শের দ্বারাই এই সংসারকে আস্বাদন করে গেলো। মোহিতলাল তার চেয়ে নিবিড়তর জীবনসান্নিধ্যে এলেন—উচ্চতটে দাঁড়িয়ে না থেকে, আনন্দকল্লোলিত প্রাণগঙ্গার স্রোতে অবগাহন করে নিলেন। কবির জীবনবাদের স্বাভাবিক পরিণতি দেহবাদ। দেহ সসীম, বস্তুবিশ্ব ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু শক্তিমান মানুষের প্রাণের আকূতি যে অশেষ, কামনাবসনা যে দুর্বার, তার হৃদয়পিপাসার যে অন্ত নেই। দুঃখের দার্শনিক শোপেনহাওয়ের-এর মতোই, কবি সহজে বুঝতে পারেন : 'মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান'। কিন্তু এও তিনি যথার্থ উপলব্ধি করেছেন যে, ধুলার পৃথিবীতে কেবল মানুষেরই রয়েছে 'আনন্দের ক্ষণ অধিকার'। তাই, 'প্রাণের খেলায় দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার'। বিচ্ছেদ-বেদনা-কণ্টকিত এই পৃথিবীর প্রতি কবির কী প্রগাঢ় মমতা! মর্তজগতের সহস্র দুঃখযন্ত্রণা মোহিতলালের কণ্ঠে 'ব্যথার আরতি'-সংগীত হয়ে বেজে ওঠে। জগৎসংসারের ক্ষণস্থায়িত্বের অনুভবসঞ্জাত 'saddest thought' এক অপূর্বসুন্দর 'sweetest song'-এ রূপান্তরিত হয়েছে মোহিতলাল মজুমদারের কবিকণ্ঠে।

দুঃখময় মানবজীবনে আঘাতযন্ত্রণা থেকে কবি ত্রাণ কামনা করলেন না, মোক্ষসন্ধানী হয়ে পুনর্জন্মের বিভীষিকাগ্রস্ত হলেন না—জন্মচক্রের অশ্রান্ত আবর্তনচ্ছন্দে নব নব রূপে মানবলোকে ফিরে আসবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষরই নিজের লেখায় অঙ্কিত করে রাখলেন। মর্তমাধুরীলুব্ধ, জীবনরসিক মোহিতলালের কণ্ঠে আমরা শুনি :

জীবনের সুখদুঃখ বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো।
যাতনার হাহারবে গান গাই,—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু, উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো!

তাই, আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
'আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো।

প্রাণজাহ্নবীর কূলে দাঁড়িয়ে কবি জীবনবিমুখ শোপেনহাওয়েরকে যেমন, তেমনি, 'মোহমুদ্গর'-প্রণেতা বেদান্তবাদী শংকরকে, তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিলেন। দেহের গৌরবে উদ্ভাসিত জীবনবন্দনাই যৌবনযজ্ঞের ঋত্বিক মোহিতলালের কাব্যের মূলসুর। দেহগত প্রেমের অশ্রুতপূর্ব কাব্যসিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রোত্তর যুগে শ্রেষ্ঠ কবির আসন লাভ করেছেন মোহিতলাল। এই প্রসঙ্গে এও স্মরণে রাখতে হবে, বাঙ্‌লা কাব্যে বুদ্ধিবাদের রসোজ্জ্বল প্রথম প্রকাশ তাঁর কবিতাতেই দেখতে পাই। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি, প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্যবোধ এই কবির কাব্যে যুক্তবেণী রচনা করেছে। অভিজাত মোহিতলালের কবিতার যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন অনুশীলিত রুচির পাঠক। তাঁর কাব্যদর্শন আয়ত্ত করা কিছুটা আয়াসসাধ্য।

মোহিতলাল মজুমদারের কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি, লক্ষণীয়, কাব্যকায়া-নির্মাণে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। ছন্দের ওপর কবির বিস্ময়কর অধিকার। উজ্জ্বল খরশান বাণীভঙ্গি এবং অদ্ভুত শব্দচয়নকৌশলে মোহিতলালের কবিতা প্রাণবন্ত, গতিমান। কাব্যভাবনায় তিনি রোম্যান্টিক, কিন্তু রূপায়ণরীতিতে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গির অনুসারী। তাঁর কবিতার শিল্পমূর্তি সত্যিই অনিন্দ্য। কবির প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা [যেমন, নারীস্তোত্র, বুদ্ধ, মোহমুদ্গর, পান্থ, স্পর্শরসিক, যম ও নচিকেতা, পুরূরবা, কালাপাহাড়, ইত্যাদি] ক্লাসিক্যাল কাব্যকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

॥ কালিদাস রায় ॥

[১৮৮৯-]

কালিদাস রায় রবীন্দ্রযুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালি কবিকুলের অন্যতম। নিরলস তাঁর কাব্যসাধনা। তিনি একনিষ্ঠ সাধক। কবিতার সংসারে তাঁর অধ্যবসায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কী কঠিন শ্রমস্বীকার! শিথিলপ্রযত্ন কখনো হন নি। বিপুল পরিমাণ আয়াস-স্বীকারে এতটুকু কুণ্ঠিত নন। প্রায়

পঞ্চাশ বছর ধরে কবিতা লিখছেন। লেখনী এখনো অক্লান্ত। অজস্র তাঁর সাধনার ফসল। অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ—কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট, বল্লরী, ব্রজরেণু, ক্ষুদকুঁড়া, ঋতুমঙ্গল, লাজাঞ্জলি, রসকদম্ব, আহরণী, হৈমন্তী, বৈকালী, সন্ধ্যামণি, এবং আরো কত। লেখার প্রাচুর্য দেখে কালিদাস রায়কে 'স্বভাবকবি' বলতে ইচ্ছা করে। তবে লেখনীর বহুপ্রসবিনী হওয়ার মন্দ দিকও রয়েছে ; অপকৃষ্ট রচনার বূ্যহবেষ্টনী থেকে উৎকৃষ্ট রচনাকে উদ্ধার করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সিসৃক্ষাকে সংযমে শাসিত করার প্রয়োজন আছে। বর্তমান কবি এ বিষয়ে বোধকরি কিছুটা কম সতর্ক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়াতে পারেন নি কালিদাস রায়। অসম্ভব বলেই। রবিকরস্পৃষ্ট তিনি হয়েছেন, যেমন হয়েছেন বিংশ শতকের আরো অনেক কবিব্যক্তি। হলেও, স্বকৃত রচনায় তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতার প্রধান একটি প্রসঙ্গ পল্লীবাঙ্‌লা—পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন। কালিদাস রায়ের কবিপ্রতিভা সহজ স্ফূর্তির অবকাশ পায় গ্রামবাঙ্‌লার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে। আমাদের পল্লীজীবনের অন্তর ও বাহিরের রূপচিত্রণে তিনি যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন প্রমুখ কবির সমানধর্মা। অবশ্য কুমুদরঞ্জনের ন্যায় এতখানি পল্লীপ্রাণ নন কালিদাস রায়। একালের নাগরিক জীবনজিজ্ঞাসার কাছেও মাঝেমধ্যে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন,—পল্লীপ্রীতিরই একটিমাত্র তারে নিজের গান বাঁধেন নি। এক্ষেত্রে কুমুদরঞ্জন মল্লিক অনন্য কবিব্যক্তিত্ব। সে যা হোক, পল্লীবাঙ্‌লার প্রতি তাঁর অগাধ মমতা। তাঁর কাব্যলোকে যে-পথটি সর্বাধিক প্রশস্ত, তার নাম রাখা যেতে পারে পল্লীপথ—সেখানে পাড়াগাঁর মাটির গন্ধ, তরু-লতা-পাতার মনোমদ শোভা, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার অনুচ্চ ধ্বনি, ছোট সুখ ছোট দুঃখের মৃদু কম্পন।

কালিদাস রায়ের কাব্যে আরেকটি সুর শুনতে পাওয়া যায়। সুরটি পুরাতন বৈষ্ণবভাবের। বৈষ্ণবসংস্কার তাঁর কবিসত্তায় গভীর গাঢ় রেখাপাত করেছে। বিংশ শতকের মানুষ হয়েও বৃন্দাবনী স্বপ্নে বিভোর থাকতে তিনি অণুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। রবীন্দ্রকাব্য ও বৈষ্ণবের গান তাঁকে মুগ্ধ করেছে, সাহিত্যনির্মাণের প্রেরণা জুগিয়েছে। ইংরেজি রোম্যান্টিক কবিতাও তাঁর মনোভূমিতে ভাবকল্পনার বীজ ছড়িয়েছে। কালিদাস রায়ের কবিজীবনে এ তিনের প্রভাব সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কৃতের বাগবৈদগ্ধ্য ও অলংকারপ্রীতি।

পূর্বে বলেছি, বাঙ্‌লামায়ের প্রতি কবির প্রগাঢ় অনুরাগ, পল্লীজননীর স্নেহমমতার দক্ষ রূপকার তিনি। বাঙ্‌লার গ্রামদেশের প্রতি এই অনুরাগের

ভিন্নতর প্রকাশ দেখতে পাই কালিদাস রায়ের লেখা বাঙালি-সংস্কৃতিভিত্তিক কবিতাগুলিতে। বাঙ্‌লার নিসর্গপ্রকৃতি, বাঙ্‌লার গার্হস্থ্যজীবন ও বাঙ্‌লার সংস্কৃতিকে [ভারত-সংস্কৃতিকেও] খাঁটি বাঙ্‌লা ভঙ্গিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাব্যে রূপায়িত করেছেন তিনি। তাঁকে যথার্থ বাঙ্‌লার কবি—বাঙালির কবি—বলতে পারা যায়। স্বরচিত 'শেষকথা' নামে কবিতাটিতে কবি নিজেও বলেছেন : 'আমি বাঙালির কবি ; বাঙালির অন্তরের কথা, বাঙ্‌লার আশা-তৃষা, স্মৃতিস্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা ছন্দে গেয়ে যাই আমি'···। 'বাঙালি-ভাবনা'-র বিশেষ দাবি করতে পারেন কালিদাস রায়, পারেন সমকালীন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রভৃতি কাব্যকার। তবে সাম্প্রতিক কালে এ দাবির জোর যে অনেকখানি কমে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙ্‌লাপল্লীর সঙ্গে আমাদের যোগ এখন ছিন্নপ্রায়, অধুনা সকলে আমরা শহরেরই বাসিন্দা হয়ে গেছি, গ্রামাঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ-সৌভাগ্য হারিয়ে ফেলেছি। গ্রামবাঙ্‌লাকে দেখবার সাধ আমাদের কারো মনে জাগলে দেখতে হবে এসকল কবির ছন্দিত রচনার মুকুরে।

যুগের রুচি যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে বর্তমান কবি সে-বিষয়ে সচেতন। পুরানো ভঙ্গির লেখা একালের পাঠককে তৃপ্তি দেবে না, তা তিনি জানেন। জানেন বলেই, কবিতার সেইসব পাঠকগোষ্ঠির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, যাঁরা 'বাঙালি মর্ম'-কে এখনো জীইয়ে রেখেছেন, আঙিনার তুলসীমঞ্চে এখনো সন্ধ্যাদীপ জ্বালেন। এসব কাব্য-পাঠক যেদিন বিদায় নেবেন, বলছেন কালিদাস রায়, সেদিন—'ডুবুক আমার গান, দুঃখ নাই, বঙ্গোপসাগরে'।

কবি কালিদাস রায় যতখানি ঐতিহ্যপ্রেমী, যুগপ্রেমী ততখানি নন। অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানেও তাঁর কাব্যানুভূতি বা মনোভঙ্গিতে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। অথচ এরই মধ্যে যুগের হাওয়া কত বদলে গেছে। কবির এই আত্মকালবিস্মৃতির জন্যে তাঁর কাব্যকবিতার আবেদন বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে। আধুনিকরা তাঁকে প্রাচীনের পর্যায়ভুক্ত করতে চাইবেন। কালে কালে অনেক কবিই পুরানো হয়ে গেছেন। এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। তথাপি, পুরাতন আমলের কবিদেরও যথোচিত শ্রদ্ধা জানাবো আমরা। একদা তাঁরাই তো আমাদের কাব্যরসপিপাসার পানীয় জুগিয়েছিলেন। আমরা জানি, বাঙালি কাব্যানুরাগীর কাছে কবিশিল্পী কালিদাস রায়ের অনাদর ঘটবে না।

॥ নজরুল ইস্‌লাম ॥

[১৮৯৯-   ]

কালবৈশাখীর ঝড়। সহজ প্রবল তার আত্মপ্রকাশ। চকিত আবির্ভাবে বিশ্বসংসারকে একেবারে অভিভূত করে দেয়। এই কালবৈশাখীর ঝড়ের মতোই বাঙ্‌লা কাব্যজগতে একদা কাজি নজরুল ইসলামের চমক-লাগানো আবির্ভাব। তিনি এলেন। নতুনের কেতন উড়লো। নজরুল প্রণতি রাখলেন মহাকবি রবীন্দ্রের চরণে। অনুরাগভরা দৃষ্টিতে তাকালেন কবিঅগ্রজ সত্যেন্দ্রের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাগত জানালেন দুর্দান্ত যৌবনের কবি, শাসনের শিকল-ছেঁড়া নজরুল ইস্‌লামকে। স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। বাঙ্‌লা কবিতার ইতিহাসের পাতায় নজরুল-কাব্য স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়। উজ্জ্বলন্ত। নজরুল ইস্‌লাম কবি-বিদ্রোহী—'বিদ্রোহী'-র অমর কাব্যকার।

সহসা 'এক অসাধারণ কবি-বালকের' দেখা মিললো। দুরন্ত আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে, হৈচৈ-কে সংগীতে ফোটাচ্ছে, উচ্চকণ্ঠে যৌবনমন্ত্র উচ্চারণ করছে, কাব্যাঙ্গনে সৈনিকের মতো কদম কদম পা বাড়িয়ে যাচ্ছে, অপূর্ব ছন্দোনৈপুণ্যে প্রাণের কথাকে গাঁথছে, প্রবল কবিত্বের অনর্গল অজস্রতায় বঙ্গের তরুণসমাজকে ভাসিয়ে নিচ্ছে। আর, ভগ্নপাঠ করা সোল্লাসে চীৎকার করে বলছে : 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, ঐ নতুনের কেতন ওড়ে—কাল-বোশেখীর ঝড়।' কথাগুলি নজরুলেরই। কবির কথায় কবির প্রশস্তি গাইছি।

অদ্ভুত জনপ্রিয় কবি নজরুল ইস্‌লাম। শ্রীরবীন্দ্রকে বাদ দিলে, তাঁর মতো এতখানি খ্যাতি একালের আর-কোনো বাঙালি কাব্যকারের ভাগ্যে জোটেনি। এত লোককান্ত যে নজরুল, আমাদের মনে ঈর্ষা জাগায়। কোনো দুর্বল মুহূর্তে ভাবি আমরা—যদি নজরুল ইস্‌লাম হতাম! আবার, তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে ব্যথিত হই। কবি জীবিত থেকেও প্রায়-মৃত। কণ্ঠ তাঁর নির্বাক হয়ে গেছে, লেখনী স্তব্ধ। আমাদের মাঝে কখনো আর তাঁকে পাবো না আমরা। তিনি আজ পঙ্গু, ভাষাহারা, শূন্যদৃষ্টি। মহাশূন্যতার জগতে কবি নির্বাসিত।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র যুগে নজরুল ইস্‌লামের অভ্যুদয়। রবি-কবি যখন স্থবিরের শাসননাশন চিরবিদ্রোহী যৌবনের আশ্চর্য কবিতাগুলি লিখছিলেন, অবুঝ সবুজের প্রাণোন্মদনার আগ্নেয় স্পর্শে জীর্ণ জরাকে ঝরিয়ে দিচ্ছিলেন, মরানদীর দেশে ভরানদীর কলধ্বনি জাগাচ্ছিলেন সেই সময়ে নজরুল-প্রতিভার উন্মেষ।

রবীন্দ্রকণ্ঠের যৌবনসংগীত উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিলেন সেদিনের তরুণ নজরুল। শুনে, উদ্দীপিত হয়েছিলেন। 'আগুনের পরশমণি'-র ছোঁয়া লাগলো বুঝি প্রাণে—নজরুল ইস্‌লাম অকস্মাৎ একদিন 'বিদ্রোহী'-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

শুরু হলো নজরুলের রক্তটগ্‌বগানো কবিতা লেখার পালা। কবিতা তো নয়, যেন ভেরীরব—দুন্দুভিধ্বনি। দীপক রাগিণীতে গান ধরলেন কবি: 'অগ্নিবীণা' বাজালেন, 'বিষের বাঁশি'-তে ফুৎকার হানলেন, হাঁক দিয়ে 'ভাঙার গান' শোনাতে লাগলেন, 'সর্বহারা'-র বেদনার মুখে ভাষা দিলেন, কম্বুকণ্ঠে 'সাম্যবাদ' প্রচার করলেন, 'প্রলয়শিখা'-য় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে চাইলেন সমাজের যুগসঞ্চিত জীর্ণতাকে—অতিরুদ্ধ অন্ধ-সংস্কার ও নির্জীব আচারকে। সর্বপ্রকার অসাম্য-বৈষম্য, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দৃপ্তভঙ্গিতে ও অধীন ছন্দে এমন প্রতিবাদ সে-যুগে অপর কোনো কবির লেখায় ধ্বনিত হয়নি। নজরুল ইস্‌লাম সংগ্রামী কবি, শিল্পীযোদ্ধা—কবিতাকে তিনি লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিণত করেছেন। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে পুরুষ-কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা গেলো মধুসূদন দত্তের কণ্ঠে, তারপর নজরুলকণ্ঠে।

বিংশ শতকের প্রথমভাগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনমোচনের আগ্রহ বাঙালি জাতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, এবং তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছিল। নজরুল বাঙালির সেই নবজীবনভাবুকতার কবি। বন্ধনমুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করেছে নজরুল ইস্‌লামের কবিতায়। এমন কি, তাঁর কাব্যের বাণীভঙ্গিতেও এ আকাঙ্ক্ষা স্পন্দমান। অবন্ধন স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেগের প্রচণ্ডতা তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ। হতে পারে, ভাবের দিক থেকে যুগোত্তর মানুষের কামনা-বাসনা এই কবির রচনাবলী তেমন বহন করেনা; কিন্তু একটি জাতির সাময়িক আশা-উদ্দীপনার এমন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব একালের আর কোনো বাঙ্‌লাকাব্য করতে পারেনি। পরাধীনতার দুর্বিষহ জ্বালা, রাজনীতিক মুক্তির তীব্র পিপাসা, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অন্নহীনের দুঃখ, ইত্যাদিকে নজরুল আবেগময়ী ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছেন। একটি বিশেষ যুগের সমস্যা ও আদর্শ কবির রচনায় চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে স্মর্তব্য, অসহযোগ-আন্দোলন আর খিলাফৎ-আন্দোলনের দিনগুলিতে নজরুল ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ কবিতার অধিকাংশ লেখা হয়েছিল।

নজরুলের কবিতার একদিকে জ্বালা-নেশা-উন্মাদনা, অন্যদিকে, প্রেমানুভবের আতপ্ত মধুর মাদকতা, স্বপ্নসুন্দর কল্পনাবিলাস, প্রকৃতিপ্রীতির মৃদু গুঞ্জরণ। রণতূর্য

এবং বাঁশি—দুই-ই বাজিয়েছেন কবি। একদিকে, 'চির-উন্নত মম শির', অন্যদিকে, 'হে মোর রানি, তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।' দুই বিপরীত কোটিতে তাঁর কবিসত্তার অবস্থান। কবির অন্তরের গভীরে এই দুই কোটির দ্বন্দ্ব ছিল একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে।

বিস্তর গান লিখেছেন নজরুল, বিচিত্র বিষয় নিয়ে। মনে হয়, তাঁর কবিপ্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে এই গানগুলিতে। নজরুল ইস্‌লামের কবিতায় প্রায়শই যে-শিল্পগত ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, তা সংগীতে তিনি অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। যেমন বাঙ্‌লা কাব্যের ক্ষেত্রে, তেমনি, বাঙ্‌লা গানের ক্ষেত্রেও, নজরুলপ্রতিভার দান সামান্য নয়।

কবিব্যক্তি-হিসেবে নজরুল অ-সাধারণ। তাঁকে আমরা ভুলবো না।

বাঙ্‌লা প্রবন্ধসাহিত্য : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যেমন, গল্প উপন্যাসাদি, তেমনি, বাঙ্‌লা প্রবন্ধ-নামক বস্তুটি, আধুনিক কালেরই সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে এর ভিত্তিপত্তন হয়। বাঙ্‌লা গদ্যের সূচনা ও পরিপুষ্টির সঙ্গে এ-জাতীয় গদ্যরচনার ইতিহাসটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা খ্রিস্টানধর্মপ্রচারে অগ্রসর হলে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু এঁদের উদ্যম প্রতিহত করবার জন্যে হাতে লেখনী তুলে নিলেন। ফলে, ধর্মসম্পর্কিত বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হলো, এবং একে কেন্দ্র করে যে-ধরনের গদ্যরচনা আত্মপ্রকাশ করলো তাকে আমরা বাঙ্‌লা প্রবন্ধের আদিরূপ বলতে পারি। খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণের কিছু কিছু লেখা, রামমোহনের 'বেদান্তসূত্র', ঈশোপনিষৎ ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা, মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা', ইত্যাদি রচনা অনেকাংশে প্রবন্ধলক্ষণাক্রান্ত। তবে অতি-আত্যন্তিক উদ্দেশ্যমূলকতা, যুক্তিতর্কের বহুলতা, প্রকাশসৌষ্ঠবের অভাব, ইত্যাদি কারণে ওইসব লেখা সাহিত্যগুণান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং এগুলার যদি কিছু মূল্য থাকে তবে তা ঐতিহাসিক।

রামমোহনের রচনা নিঃসন্দেহে উপদেশাত্মক, যুক্তিসর্বস্ব। ধর্মীয় মত-প্রচারের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল স্থিরবদ্ধ—সাহিত্যরসসৃষ্টির কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। প্রবন্ধে সাহিত্যিক-গুণধর্মের বিকাশ ঘটে তখন, যখন বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত

য় বাচনকলার রম্যতা, যখন আত্মপ্রচারের ইচ্ছা স্থান ছেড়ে দেয় আত্মপ্রকাশের াসনাকে। যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্ত যতই অকাট্য ও সারবান হোক, উক্তির চারুতা া থাকলে তা কখনো উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। রচনার হৃদয়গ্রাহিতা সপরতন্ত্র, যেখানে রসের স্পর্শ নেই সেখানে সাহিত্যও নেই।

বাঙলা প্রবন্ধ যথার্থ সাহিত্যস্তরে উন্নীত হলো আরো পরবর্তীকালে। ামমোহনের পর প্রবন্ধকারহিসেবে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তনি তখনকার বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। প্রবন্ধ ব্যতীত ন্যকোনো শ্রেণীর রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্য ও াবুকতা সংশয়াতীত। এর নিশ্চিত মুদ্রাঙ্কন আমরা দেখতে পাই তাঁর বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', চারুপাঠ', প্রভৃতি পুস্তকে। জ্ঞানগর্ভ রচনায় তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় রখে গেছেন। চিন্তার স্বচ্ছতা, যুক্তির বলিষ্ঠতা, মননের পরিচ্ছন্নতা, তথ্যবিন্যাসের ৃশলতা, ইত্যাদির জন্যে অক্ষয়কুমারের রচনা অভিনন্দনযোগ্য। জ্ঞানবিতরণ মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও, তাঁর 'চারুপাঠ'-এ আমরা রসের উদ্বোধনও লক্ষ্য করেছি। উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভূত 'স্বপ্নদর্শন'-নামে তিনটি প্রবন্ধ সত্যই উপভোগ্য। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধরীতি পরবর্তী কয়েকজন লেখককে যে প্রভাবিত করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এঁদের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ্য। দেবেন্দ্রনাথ প্রধানত ধর্ম-প্রচারক—সমাজসংস্কারক। তথাপি, ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশনাগুলিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। পূর্বোক্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাখানি তাঁর উৎসাহ-উদ্যমেই প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে তাঁর শক্তিমান সহকর্মী ছিলেন অক্ষয়কুমার। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', 'আত্মজীবনী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রবন্ধধর্মী : তাঁর লেখায় তত্ত্বালোচনা, শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ইত্যাদি বস্তু কুত্রাপি বড়ো হয়ে ওঠেনি। এগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের সুকুমার ব্যক্তিক অনুভূতি, নিবিড় ধর্মবোধ, শুচিসুন্দর আধ্যাত্মিক আকূতি। ভাবাবিষ্টতা, সৌন্দর্যমুগ্ধতা, মনোজ্ঞ কল্পনা, ভাষণের প্রাঞ্জল মাধুর্য দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনাকে খাঁটি সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রের নিবন্ধমালায় মহর্ষির আত্মভাবনামূলক রচনারীতির প্রভাব অনায়াসলক্ষ্য।

ঠিক 'প্রবন্ধ' বলতে যা বোঝায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমশায় সেরূপ কোনো লেখায় হাত দেন নি। কিন্তু তাঁর 'আত্মচরিত' ও 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ'-এ প্রবন্ধের

মন্ময় অন্তরঙ্গতার সুরটি বেজেছে। ভাষার লালিত্যে, তাললয়সম্‌ন্বিত প্রসাদগুণে, ব্যক্তিহৃদয়ের স্পর্শে বিদ্যাসাগরের রচনা যথার্থ সাহিত্যগুণোপেত। বাঙ্‌লা-গদ্যের একজন বড়ো শিল্পী তিনি। এরূপ ব্যক্তিক মানসানুভূতির স্পর্শ লেগেছে প্রাণময়তায় উচ্ছল, হাস্যপরিহাসকুশল রাজনারায়ণ বসুর লেখায়। আঙ্গিকরীতি এবং উদ্দেশ্য যাই হোক, 'একাল ও সেকাল' আর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে রাজনারায়ণের যে-মেজাজ ও মনোভঙ্গির পরিচয় প্রতিফলিত, তা নিঃসন্দেহে সার্থক প্রবন্ধকারের।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙ্‌লা প্রবন্ধকে উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত প্রবন্ধরীতির ধারা ভূদেবের হাতে লক্ষণীয় পূর্ণতা লাভ করেছে। সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর সমস্ত বই 'প্রবন্ধ'-নামে চিহ্নিত—'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ'। ভূদেবের চিন্তাক্রম অতিশয় স্পষ্ট, বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ, প্রকাশভঙ্গি ঋজু। তা ছাড়া, বলিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা তাঁকে যুক্তি-বাদী, সংস্কারমুক্ত করে তুললেও, হিন্দুর সামাজিক আচারপ্রথা, হিন্দুর জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর জীবনের মহৎ লক্ষ্য ছিল যুক্তির কঠিন ভিত্তির ওপরে উক্ত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা। সাহিত্যিক-সৌরভ ভূদেবের প্রবন্ধনিচয়ে তেমন চোখে পড়ে না, এগুলির অধিকাংশই লোক-শিক্ষামূলক। বক্তব্যকে সরস ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় না। তথাপি, স্বীকার করতে হবে, ভূদেব আদর্শ গদ্য লিখে গেছেন, গদ্যরচনাকে তিনি স্বধর্মচ্যুত কখনো করেন নি।

আমাদের প্রবন্ধসাহিত্য সহসা আশ্চর্যরকমে সমৃদ্ধিলাভ করলো মহৎ শিল্পী বঙ্কিমের আবির্ভাবে। তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে প্রবন্ধরচনা খাঁটি সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠলো। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র, তেমনি, বিচিত্র বহিরঙ্গ রূপাবয়ব। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্যসমালোচন, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় অবলম্বনে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব রচনার কোনোটার উদ্দেশ্য তথ্যপ্রতিপাদন, কোনোটার উদ্দেশ্য সাহিত্যরসসৃষ্টি। অদ্ভুত লেখনীচাতুর্যে তাঁর তথ্যপ্রতিপাদক প্রবন্ধগুলিও স্থানে স্থানে সাহিত্যিক-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে—যুক্তিতর্কের শুষ্কতা পরিহার করেছে। এতকাল প্রবন্ধ প্রধানত বহুবিচিত্র ভাবনার বাহক ছিল। বঙ্কিমই সর্বপ্রথম একে তথ্য ও তত্ত্বালোচনার সীমিত ক্ষেত্র থেকে মুক্তি দিয়ে সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির উদার উন্মুক্ততায় অবাধ সঞ্চরণের সামর্থ দান করলেন। যথার্থ সাহিত্যরসবাহী প্রবন্ধ বঙ্কিমের পূর্বে কদাচিৎ নির্মিত হয়েছে। কেবল

জ্ঞানবিতরণ নয়, উপদেশকথানিবেদন নয়—বঙ্কিম স্বরচিত প্রবন্ধসাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের রসপিপাসাও নিবৃত্ত করেছেন।

যে-সব প্রবন্ধে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা মুখ্য, সেখানে বঙ্কিম এক মনোরম শিল্পলোকের নির্মাতা। এ-জাতীয় রচনায় কোথাও তিনি ভাবুক, কোথাও নিপুণপরিহাসরসিক। কখনো তিনি ভাবগম্ভীর, অন্তর্মুখিতায় সমাহিত ; কখনো-বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর কৌতুকমিশ্র ভাষণে মুখর। তাঁর বাক্যে কোথাও বুদ্ধির চমক, কোথাও হৃদয়াবেগের স্নিগ্ধ লাবণ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় তাঁর ব্যক্তিমানস ও শিল্পীমানস উভয়েরই স্বচ্ছ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধসাহিত্য ব্যক্তিনির্ভর না হয়ে পারে না। মনীষী বঙ্কিমের জীবনবোধ গভীর, আদর্শ-ভাবনা উচ্চতর। বাঙালিকে তিনি বলিষ্ঠ জীবনচর্যার পথে আহ্বান করেছেন, জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছেন বহুমুখী জিজ্ঞাসা।

বঙ্কিম কেবল সাহিত্যস্রষ্টা নন, তিনি একজন প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যপ্রমাতাও বটেন। বাঙ্‌লাসাহিত্যে সমালোচনার উচ্চতর মানগঠনে তাঁর দান সামান্য নয়। এক্ষেত্রে তিনি যে কাব্যবোধ, বিচারশক্তি, বিশ্লেষণদক্ষতা, তথ্যের যথাযথ উপস্থাপন-কুশলতা দেখিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সাহিত্যবিচারে কেবল ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রকে নিয়ে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, প্রয়োজনবোধে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনপদ্ধতিকেও কাজে লাগিয়েছেন। স্রষ্টা ও সমালোচকের এই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে বাঙ্‌লাসাহিত্যের 'সব্যসাচী' বলে আখ্যাত করেছেন। 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি', 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর লেখক বঙ্কিম অবিস্মরণীয়।

বঙ্কিম প্রবন্ধসাহিত্যের একটি প্রশস্ত পথ নির্মাণ করলেন। এ-পথে বহু শক্তিমান লেখকের আনাগোনা শুরু হলো। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রবন্ধকার বঙ্কিমের চিহ্নিত পথে এগিয়ে গেছেন। এঁদের রচনায় ভাবৈশ্বর্য, তত্ত্বগভীরতা, তথ্যানুসন্ধিৎসা, কল্পনার বিস্তার, দর্শন-ইতিহাসাদির অনুশীলন লক্ষ্য করবার মতো। ভাবুকতা ও কল্পনার সৌন্দর্যে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা যতখানি মনোজ্ঞ, চন্দ্রনাথ বসু ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা ততখানি নয়। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের দিকেই রাজকৃষ্ণের ঝোঁক বেশি। চন্দ্রনাথের দৃষ্টি কিছুটা সংস্কারজড়িত, নতুনকে বরণের উৎসাহ তাঁর কম। অত্যধিক তত্ত্বমুখীনতা তাঁর সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির শিল্পোৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ করেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশায় প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ, সাহিত্য, ইত্যাদি নানান্ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচনার আকর্ষণ শুধু বস্তুগৌরবে নয়, বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত রসের স্পর্শও ওতে মিলবে। সংস্কৃতসাহিত্যে হরপ্রসাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। অথচ সংস্কৃতপণ্ডিত হয়েও কেমন সুন্দর সহজ বাঙ্‌লায় তিনি অবিরল লিখে গেছেন। তাঁর লেখা প্রাঞ্জল, প্রসন্নতায় চিত্তগ্রাহী।

‘স্বপ্নপ্রয়াণ’-এর কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক-প্রবন্ধ-নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গম্ভীর পরিবেশে মাঝে-মাঝে হাল্কা চালে কথা বলে স্বকৃত রচনাকে তিনি সরস করে তুলেছেন। শব্দপ্রয়োগে তাঁর কুশলতা পাঠকের প্রশংসা দাবি করে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলির জন্যে স্মরণীয়। বাঙ্‌লা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্বতার পরিচয় রেখে গেছেন। কালীপ্রসন্নের লেখা বেশ গুরুগম্ভীর, ভাষায় পারিপাট্য রয়েছে। একালে তাঁর প্রবন্ধাবলীর তেমন সমাদর নেই। ‘উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম’ বইখানি লিখে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় একদা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর ভাবালুতা ও অবল্গিত উচ্ছ্বাস আধুনিক যুগের পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারবে না, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বঙ্কিমেব পর বাঙ্‌লা প্রবন্ধকে রূপরীতিগত ও রসগত ঐশ্বর্য দান করলেন কবিসত্তম রবীন্দ্রনাথ। কেবল কাব্যশিল্প নয়, প্রবন্ধশিল্পেও তিনি অতুল্য। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রের গদ্য মহাকবির। শুভ্রভাস কবিসত্তার রশ্মিপাতে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যও সমুদ্ভাসিত। রবীন্দ্র-প্রবন্ধমালার পরিধি বিপুলয়াতন। এর রূপবৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। এমন বস্তু খুব কমই আছে যা তাঁর মননে-ভাবনায় ধরা পড়ে নি। শিক্ষা, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, শিল্প, সাহিত্য, সমালোচনা, এবং আরো বহুতর বিষয়কে উপজীব্য করে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এর সর্বত্র মননশীলতার দীপ্তি, ভাবুকতার নিবিড় স্পর্শ, সাবলীল সালংকারা ভাষার ঐশ্বর্য, প্রকাশভঙ্গির অপূর্ব মহিমা অতিশয় প্রেক্ষণীয়।

যেখানে তথ্যের প্রাধান্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি যুক্তিধর্মী। তবে যুক্তির দাবি যতই মানিয়া চলুন, রচনার অঙ্গে কারুকলার লাবণ্য সঞ্চার করতে কখনো তিনি ভোলেন না। কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিংবা ধ্রুব মীমাংসায় পৌঁছবার জন্যে তিনি তেমন ব্যগ্র নন। এ কারণে, ‘প্রবন্ধ’ বলতে সাধারণত যে-বস্তুটি আমরা বুঝি, রবীন্দ্রের নির্মিত প্রবন্ধাবলী সে-জাতের নয়। বিষয়গৌরবী প্রবন্ধেও কবির ব্যক্তিস্বরূপটি ক্ষণে ক্ষণে আত্মোন্মোচন করে—তথ্য, প্রমাণ, বক্তব্যকে ছাপিয়ে ওঠে

তাঁর ব্যক্তিত্বের মনোমদ সৌরভ। শ্রীরবীন্দ্রের লেখায় বিষয় আর বিষয়ী উভয়েরই সমান মূল্য। কেবল বক্তব্যের যথাযথ উপস্থাপনায় কবির তৃপ্তি নেই, বলবার ভঙ্গিটির দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

রবীন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়—আত্মকথা, পত্রধারা, ভ্রমণকাহিনী, ভাষা-শিল্প ও সাহিত্য, এবং বিচিত্র। এদের আরো একরকমের পর্যায়বিন্যাস হতে পারে—আত্মভাবনামূলক এবং প্রসঙ্গাত্মক। পত্রগুচ্ছ, আত্মপরিচয়, ধর্মদেশনা, ভ্রমণকাহিনী, শিল্পসাহিত্যবিষয়ক আলোচনা, ইত্যাদি প্রথম ভাগটিতে পড়ে। এর মধ্যে দেখতে পাই কবিদার্শনিক রবীন্দ্রের ভাবসত্তার প্রতিফলন। ওপরে কথিত দ্বিতীয় ভাগটির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রসঙ্গাত্মক পর্যায়ের অন্তর্ভূ‍ত লেখাগুলির মধ্যে শতাব্দীর অধিনায়ক শ্রীরবীন্দ্রের অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় মুদ্রিত।

কবি-দার্শনিক নয়, ভাবুক নয়—ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে হলে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকে না চেনার অর্থ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এক-চতুর্থাংশকে অপরিচয়ের আড়ালে রাখা। কর্মী, সংস্কারক ও ভাবনায়ক রবীন্দ্রনাথের মহিমা কবি-রবীন্দ্রের মহিমার চেয়ে কম-কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি তাঁর আত্মপরিচয়মূলক লেখাগুলি। এসব রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কবির নির্মিত সাহিত্যের মর্মলোকের দ্বারমোচন অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে। 'আত্মপরিচয়', 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', ইত্যাদিকে রবীন্দ্রের আত্মকথা বলা যেতে পারে। এরূপ আত্মকথার পরিপূরক গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'চিঠিপত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ। কবির ব্যক্তিজীবন ও অন্তর্জীবনের কথা আরো বহুতর রচনায় বিকীর্ণ। তাঁর পত্রধারা অনেক স্থলে প্রবন্ধেরই নামান্তর মাত্র। লক্ষণীয়, কবির কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী পত্রাকারে লিখিত, যেমন—'রাশিয়ার চিঠি', 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র'। এগুলি নানা ভাবনার তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা এখানে এসে ভিড় করেছে। লেখনভঙ্গির অপূর্ব কৌশলে রবীন্দ্রের চিঠিপত্র, ভ্রমণপঞ্জী সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এরপর উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য। সমালোচনা কেমন করে সৃষ্টিকর্ম হয়ে ওঠে, কবিই আমাদের প্রথম দেখালেন। কবির 'প্রাচীন সাহিত্য' নামিক গ্রন্থখানির তুলনা হয় না। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ন্যায়, তাঁর 'পঞ্চভূত', আরেকটি আশ্চর্য গ্রন্থ।

কত রকমের অভিনব আঙ্গিকে রবীন্দ্রের প্রবন্ধমালা গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বড়ো, না কবিতায়, এ প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রের পর আর-একজন উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধনির্মাতা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রবন্ধ-রচনায় তিনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞানের ভূমিতে সঞ্চরণ নির্বাধ হলেও, আরো বহুতর বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা সদাজাগ্রত ছিল। এককথায় বলা যায়, তিনি সর্বত্রচারী ছিলেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ের অনুরাগী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর, এবং তাঁর অধ্যয়নের পরিধি ছিল বিস্তৃত। কোনো বিষয়ের ওপরে প্রভূত দখল থাকলেই তবে বিষয়টিকে সংক্ষিপ্তাকারে ও সহজভাবে উপস্থিত করা যায়—সুন্দর করে বলা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দুরূহ বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাষায় বাণীবদ্ধ করতে পারতেন। সাধারণ লেখকের পক্ষে যা একরূপ অসাধ্য, রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে সেটা সহজসাধ্য ছিল। তাঁর প্রবন্ধের বাহন সাধুভাষা, অথচ তা সারল্যে-সুষমায় মণ্ডিত, প্রসাদগুণে উপাদেয়—স্বচ্ছন্দ, নমনীয়, পরিচ্ছন্ন, সংহত। গম্ভীর বিষয়-সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যেও, কোথাও কৌতুক, কোথাও পরিহাস-রসিকতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রচনাকে তিনি সরস করে তুলেছেন। পাণ্ডিত্য ও প্রকাশসৌষ্ঠবের এমন মনোরম যৌগপদ্য খুব কম প্রবন্ধকারের লেখায় দেখা যায়।

হৃদয়চর্চা আমরা যতখানি করেছি, বিজ্ঞানচর্চা আর দর্শনবিদ্যার অনুশীলন ততখানি নয়। মনে হয়, নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানসাধনার দিকে আমাদের ঝোঁক তেমন নেই। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে রামেন্দ্রসুন্দর খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, জটিল তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যান তাঁর এজাতীয় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব উল্লেখ করবার মতো। বিজ্ঞান-পর্যালোচনাকে তিনি কাব্য-রসে অভিষিক্ত করে গেছেন। এস্থলে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির নামটিও স্মরণ করতে হয়। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাগুলির সৌন্দর্য চিন্তার পরিচ্ছন্নতায়, সারল্যযুক্ত মিতভাষণে। আমাদের সাহিত্যে এই বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিজ্ঞানবিষয়ে অনেকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি।

বাঙ্‌লা প্রবন্ধসাহিত্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান অবশ্যস্মর্তব্য। সংখ্যায় খুব বেশি প্রবন্ধ তিনি না লিখলেও, যে-কয়টি লিখেছেন, ওইগুলির মধ্যেই তাঁর চিন্তাশীলতা, বিচারশক্তি ও সাহিত্যবোধের নিশ্চিত পরিচয় মেলে। বাঙালিজাতি,

বাঙালিসমাজ, বাঙ্‌লা ভাষা, বাঙ্‌লা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রশংসার্হ। সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে রেখে তিনি সাহিত্যের বিচার করেছেন। বঙ্কিমসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান লেখক। কিন্তু প্রতিভার অনুপাতে তাঁর প্রবন্ধকর্মের পরিমাণ সামান্যই, বলতে হবে।

লেখকহিসেবে বিপিনচন্দ্র পালের শক্তিমত্তা অবশ্যস্বীকার্য। রাজনীতিচর্চার পরিবর্তে অনবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনায় যদি তিনি নিরত থাকতেন, তাহলে বাঙ্‌লা প্রবন্ধের ভাণ্ডারটি তাঁর মূল্যবান দানে অবশ্যই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতো।

সন্ন্যাসীপুরুষ বিবেকানন্দ ধর্মভাবনা ও অধ্যাত্মসংসারের বাসিন্দা ছিলেন। বেদান্তপ্রচার ও সমাজসেবা তাঁর জীবনের মহৎ ব্রত ছিল। তাঁকে সাহিত্যসাধক বলা যায় না। কিন্তু ধর্মব্যাখ্যা করতে বসে, এবং কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গে, এমন কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, যা সত্যিই সাহিত্যের স্বাদযুক্ত। অগাধ মানব-প্রীতি, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, যুগচেতনা, অতিশয় বিশিষ্ট লেখনভঙ্গি বিবেকানন্দের রচনাকে আকর্ষণের বস্তু করে তুলেছে। এগুলিতে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের উত্তাপ অনুভব করা যায়।

মন্ময় প্রবন্ধনির্মাণে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিদ্ধি অবিসংবাদিত। বাঙ্‌লা গদ্যের একজন প্রথমশ্রেণীয় শিল্পী তিনি। কাব্যভূমিতেও তাঁর পদক্ষেপ ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে গদ্যরচনা। চিত্রশিল্প এবং সাহিত্যশিল্পের প্রতি বলেন্দ্রের অনুরাগ সমধিক। মানসপ্রকৃতিতে রোম্যান্টিক বলে তাঁর কল্পনা সাধারণত অতীতমুখী। কিন্তু বর্তমানকে তিনি উপেক্ষা করেননি। অকালে লোকান্তরিত না হলে তাঁর রচনাশিল্পের পূর্ণপরিণতি আমরা দেখতে পেতাম। তথাপি, প্রবন্ধসাহিত্যে যে-দান তিনি রেখে গেছেন তা সামান্য নয়। ভাষার অদ্ভুত গ্রন্থনে আর ধ্বনিসুষমায়, মননের স্বচ্ছতায়, কাব্যসুরভিত বাণীর গাঢ়বন্ধতায় বলেন্দ্রনাথের রচনা চিত্তহারী। অকালমৃত্যু ঘটাতে আরো দুজন শক্তিমান লেখকের প্রত্যাশিত দান থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, এঁদের নাম—অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র রায়।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে যুগান্তকারী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাণীশিল্পেও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। স্বকীয়তার স্বাক্ষরমুদ্রিত বিশেষ একটি ভঙ্গিতে তিনি গদ্যসাহিত্য নির্মাণ করেছেন। স্বাদে-বর্ণে এগুলি অপূর্ব। তাঁর রূপকথাভঙ্গিম লেখার তুলনা হয় না। কবিকল্পনার পাখায় ভর করে অবলীলায় তিনি দূরদূরান্তরে

বিচরণ করেন, পাঠককে একটি মায়ারাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়ে দেন। তবে, এই ভঙ্গিটির প্রয়োগের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' আর 'জোড়া-সাঁকোর ধারে' সকলের আদরণীয় দুখানি গ্রন্থ।

প্রবন্ধসাহিত্যের দিকপাল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দরের নামের সঙ্গে উল্লেখনীয় আর-একটি নাম—প্রমথ চৌধুরী। স্বাতন্ত্র্যে অতিশয় উজ্জ্বল, ব্যক্তিত্বে অনন্য তিনি। তাঁর আবির্ভাবের পর বাঙ্‌লা প্রবন্ধরীতি একটি নতুন ভূমিতে পদক্ষেপ করলো। সাহিত্যের এই দিকপরিবর্তনটি সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রমথ চৌধুরীর রচনার অভিনবতা বিষয়বস্তুতে নয়—প্রকাশভঙ্গিতে। মেজাজে, মানসিকতায়, চিন্তায়-মননে, ভাষাবিন্যাসে তিনি এমন একটা নতুনতা দেখালেন যার চমৎকারিত্বে সকলে মুগ্ধ হলো, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। গদ্যভাষার সৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা সংশয়াতীত। বলা যায়, অভিনব একটি স্টাইলের স্রষ্টা তিনি।

এতাবৎকাল বাঙ্‌লা প্রবন্ধসাহিত্য গড়ে উঠেছে ইংরেজি-আদর্শে। প্রমথ চৌধুরী নিজের রচনায় অনুসরণ করলেন ফরাসি-রীতি। প্রবন্ধরচনক্ষেত্রে স্পষ্টত তিনি মতেঁনপন্থী। সাহিত্যের আসরে বৈঠকি আলাপ তিনি পছন্দ করেন, বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা-প্রাঞ্জলতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন, ভাবালুতাকে সর্বদা পরিহার করে চলেন, কাব্যকল্পনার চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠাকে বেশি মূল্য দেন, হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের প্রকাশনের ওপরে স্থান দেন বুদ্ধির প্রাখর্যকে। ভারি কথাও তিনি বলেন হাল্কা চালে, চতুর রসিকতায় পাণ্ডিত্যকে লঘুভার করে তোলেন; শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমিশ্র তীক্ষ্ণ বচনে মনের কুসংস্কার দূর করেন, শাণিত বাক্যের আঘাত হানেন চিত্তের অসাড়তার ওপরে। আদর্শের দিক থেকে প্রমথ চৌধুরী নবীনের পূজারী, ঐহিকতাবাদী, সুস্থ মানসিকতা ও নাগরিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী। যা বুদ্ধিগ্রাহ্য, যুক্তিসিদ্ধ, ইন্দ্রিয়গোচর, তাকে তিনি সহজ স্বীকৃতিজ্ঞাপনে সতত অকুণ্ঠ। বাস্তববিমুখ মনোভঙ্গি আর ভাবের কুহেলিকাকে লেখায় এতটুকু আমল দিতে তিনি নারাজ। রচনার নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। রুচি ও মানসপ্রবণতার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য বাঙ্‌লাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী অ-সাধারণ।

তথাপি বলতে হয়, তাঁর অভিনব সাহিত্যরীতি বাঙালিপাঠককে যতখানি মুগ্ধ করেছে ততখানি সঞ্জীবিত করেনি। সাহিত্যের যে-নতুন পথটি তিনি খুলে দিলেন, সে-পথে খুব অল্পসংখ্যক লেখকেরই আনাগোনা। মনে হয়, প্রমথীয় রচনার

আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছে বলে, হৃদয়ধর্মী বাঙালি ওই আদর্শের অনুসরণে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেনি। এক্ষেত্রে রবীন্দ্ররীতিরই ব্যাপক আধিপত্য। অতুল গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশংকর প্রমুখ কয়েকজন লেখককে প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্য বলা যেতে পারে। এস্থলে প্রবন্ধকার রাজশেখর বসুর নামটিও উল্লেখ্য।

সমালোচনামূলক আধুনিক প্রবন্ধসাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদার স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত একটি নাম। গভীর রসবোধ, গূঢ়গহন অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণবুদ্ধি, অশেষ পাণ্ডিত্য তাঁর প্রবন্ধগুলিকে উজ্জ্বল মহিমা দান করেছে। সাহিত্যসাধনা মোহিতলালের জীবনের একতম ব্রত ছিল, শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় তিনি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উচ্চতর একটি মাননির্ধারণের প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সমালোচনাশাস্ত্রে মোহিতলালের পারদর্শিতা সংশয়াতীত। তাঁর সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন, বাঙালির জাতিপ্রকৃতির ওপর এর ভিত্তি রচিত। গূঢ়দর্শী তাত্ত্বিক মনোভঙ্গির জন্যে মোহিতলালের সমালোচন গভীর দার্শনিকতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। সৎসাহিত্যকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, কিন্তু এই শিল্পসংসারে শৌখিন বিলাসিতাকে কদাপি বরদাস্ত করতে পারেননি। সাহিত্য সম্পর্কে মোহিতলালের নিজস্ব মতামত ও তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য কারো কারো মনে অবশ্যই প্রতিবাদস্পৃহা জাগাবে। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ, অকম্পিত নিষ্ঠা, সত্যসুন্দরের বেদীর সম্মুখে বসে তাঁর গম্ভীর মন্ত্রোচ্চার, সাহিত্যশিল্পের শুচিশুভ্র আদর্শের দিকে তাঁর স্থিরবদ্ধ দৃষ্টি অবশ্যই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। এখানে উল্লেখ করি, ক্ষণিকের দুর্বলতাবশে রবীন্দ্রনাথের লেখনীও যখন কেঁপেছে, তখন সমালোচক মোহিতলাল নির্দ্বিধায় প্রতিবাদবাণী উচ্চারণ করেছেন। কারো স্খলন-পতন-ত্রুটি তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেননি। বাঙ্‌লা সমালোচনাসাহিত্য তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ কথা কাউকে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের প্রবন্ধসাহিত্য সর্বাধিক পুষ্ট হয়ে উঠেছে সমালোচনাশাখায়। এ-ক্ষেত্রটিতে অনেকেই মৌলিক চিন্তা ও যথার্থ রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচনার দিকপরিবর্তন, এর বিভিন্ন রীতিপদ্ধতি সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। একালের কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের বিদ্যাবত্তা, বহুপঠন, অনুশীলিত রুচি, এবং এ সমস্ত জড়িয়ে এঁদের সাহিত্যমিতির নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার্হ।

প্রবন্ধবিভাগে বাঙ্‌লাসাহিত্যের দীনতা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। অধুনা এর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি, লক্ষণীয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির নতুনতা।

বিশ্ববিদ্যার দিকে এখন আমরা নিজেদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে প্রসারিত করে ধরেছি। আমাদের অনুসন্ধিৎসা যতই বাড়ছে, জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হচ্ছে, ততই চিত্তের মোহমুক্তি ঘটছে। চিৎশক্তির এই ক্রমিক স্ফুরণ বাঙ্‌লা প্রবন্ধসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নিশ্চিত ইঙ্গিত বহন করে।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
নানা নিবন্ধ : সুশীলকুমার দে
আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্যবিতান : মোহিতলাল মজুমদার
বিবিধ কথা : মোহিতলাল মজুমদার
বিচিত্র কথা : মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্যকথা : মোহিতলাল মজুমদার
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মোহিতলাল মজুমদার
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্‌লা সাহিত্যে গদ্য : সুকুমার সেন
বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন
শরৎচন্দ্র : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
বাঙ্‌লা গদ্যের চার যুগ : মনমোহন বসু
বাঙ্‌লা গদ্যের পদাঙ্ক : প্রমথনাথ বিশী
বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভূমিকা : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
কথাকোবিদ্ রবীন্দ্রনাথ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্য ও সাহিত্যিক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার : সাধনকুমার ভট্টাচার্য
বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : অজিতকুমার ঘোষ
History of Bengali Literature in the 19th Century : Susilkumar De

কয়েকটি আদর্শ-প্রশ্ন

॥১॥ উনবিংশ শতকে আবির্ভূত কবিওয়ালাদের গানের ভাল-মন্দ দুইদিকই নির্দেশ কর।

॥২॥ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব পর্যন্ত বাঙ্‌লা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

॥৩॥ বাঙ্‌লা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান নিরূপণ কর।

॥৪॥ বাঙ্‌লা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে খ্রিস্টান মিশনারিগণের দানের পরিমাণ নির্ণয় কর।

॥৫॥ সাহিত্যিক-গদ্যের সৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, এবং আলালী ও হুতোমী রীতির দান কি, তাহা নির্ণয় কর।

॥৬॥ বাঙ্‌লা গদ্যের ক্রমবিকাশে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের স্থান নির্ণয় কর।

॥৭॥ বঙ্কিমপূর্ববর্তী বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি নির্ণয় কর।

॥৮॥ ১৮৫৪ হইতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্‌লা নাটকের যে-পরিণত রূপ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই যুগের মুখ্য নাটকগুলি অবলম্বন করিয়া তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

॥৯॥ রামনারায়ণের কাল পর্যন্ত বাঙ্‌লা নাটক কিভাবে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর।

॥১০॥ মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে বাঙ্‌লা নাট্যকলা কতখানি উন্নত রূপ লাভ করিয়াছে, উভয়ের কয়েকটি নাটক বিচার করিয়া তাহা নির্দেশ কর।

॥১১॥ বাঙ্‌লা নাটকের ক্রমবিকাশে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় কর।

॥১২॥ মধুসূদন হইতে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বাঙ্‌লা নাটকের বিকাশের ধারাটি অনুসরণ কর।

॥১৩॥ মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

॥১৪॥ গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

॥১৫॥ বাঙ্‌লা নাটকে ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাট্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

॥১৬॥ রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলির নাট্যকলা ও রস-আবেদন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

॥১৭॥ রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে সাংকেতিকতার স্থান কতখানি, এবং তাহাতে সাংকেতিকতার ক্রমবিবর্তন কিভাবে হইয়াছে, তাহা বিবৃত কর।

॥১৮॥ ঈশ্বরগুপ্ত হইতে মধুসূদনের কাব্যকৃতি অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঊনবিংশ শতকের কাব্যধারার বিবর্তন অনুসরণ কর।

॥১৯॥ রঙ্গলাল হইতে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত বাঙ্‌লা আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যের বিবর্তনধারার অনুসরণ কর।

॥২০॥ ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাঙ্‌লা মহাকাব্য-রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

॥২১॥ মধুসূদনের পর ও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে—এই অন্তর্বর্তীকালে বাঙ্‌লা কাব্যের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

॥২২॥ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের হাতে মহাকাব্যধারার কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা পরিস্ফুট কর।

॥২৩॥ ঊনবিংশ শতকে প্রাক্-রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার উদ্ভব ও ক্রমপরিণতির বিবরণ দাও।

॥২৪॥ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার কর।

॥২৫॥ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিরূপ আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কর।

॥২৬॥ বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে-নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্‌লা সাহিত্যে ঐ জাতীয় উপন্যাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাও।

॥২৭॥ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও রসোৎকর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

॥২৮॥ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পল্লীজীবনের সহিত লেখকের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ পরিচয়সূত্রটি নির্দেশ কর।

॥২৯॥ ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

॥৩০॥ বাঙ্‌লা উপন্যাসে রবীন্দ্রোত্তর উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ আলোচনা কর।

॥৩১॥ ছোটগল্পলেখকরূপে প্রভাতকুমার বা শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের যে-পরিচয় ঘটিয়াছে তাহা পরিস্ফুট কর।

॥৩২॥ ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

॥৩৩॥ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রবন্ধধারার অগ্রগতির একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাও।

॥৩৪॥ রবীন্দ্রসমালোচনার সূক্ষ্মদর্শিতা ও উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

॥৩৫॥ বাঙ্‌লা প্রবন্ধসাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

॥৩৬॥ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

কুলীনকুলসর্বস্ব ; বিহারীলাল চক্রবর্তী ; নবীনচন্দ্র সেন ; রাজশেখর বসু ; প্যারীচাঁদ মিত্র ; শ্রীকান্ত ; সবুজপত্র ; নীলদর্পণ ; হুতোম প্যাঁচার নক্সা ; আলালের ঘরের দুলাল ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ; কাজী নজরুল ইস্‌লাম ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ; দীনবন্ধু মিত্র ; সধবার একাদশী ; নাটুকে রামনারায়ণ ; মাধবী-কঙ্কণ ; কুরুক্ষেত্র ; বিসর্জন ; কৃষ্ণকুমারী ; পদ্মিনী-উপাখ্যান।

[প্রশ্নগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৎসরের ত্রৈবার্ষিক বাঙ্‌লা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে সমাহৃত]
